জন্মজন্মান্তরের মা

জন্মজন্মান্তরের মা

সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

অনুক্রমণিকা

মাতৃমহিমা

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

শিবের যেমন শক্তি, তেমন শ্রীসারদা দেবীও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার সহায়িকা ছিলেন, তাঁর সাহচর্য সাধারণের গোচরীভূত হত না। তাঁর সহযোগিতা ফল্গুধারার মতো অন্তঃসলিলা ছিল। শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপযুক্ত সহধর্মিণীরূপে তাঁর সকল কাজে সাহায্য করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ জননী।

আত্মাকে আশ্রয় করে যে ধর্ম প্রকাশ পায় তাই অধ্যাত্ম ধর্ম, তাই আমাদের ধ্রুব ধর্ম। সেখানে নারী-পুরুষ অধিকারের ভেদ নেই। আমাদের নারীদের সাধনা বা মহিমা সম্বন্ধে চর্চা বা আলোচনা করতে হলে নারীর মাতৃত্ব, আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে চর্চা করতে হয়।

শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘজননী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর থেকে শ্রীশ্রীমায়ের জীবিতকাল পর্যন্ত অপূর্ব মাতৃভাবের স্ফুরণ ঘটেছে তাঁর জীবনে। আমাদের শাস্ত্রে মাতৃত্বের আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাতৃত্বের মধ্যে নারীমহিমার পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। মাতৃত্ব পবিত্রতম বস্তু। নারী নিজেকে মাতারূপেই সহজে প্রকাশ করে থাকে। আমাদের পূর্ব সমাজব্যবস্থা এমনই ছিল। মাতাপুত্রের সম্বন্ধ তাই এত সহজ ও গভীর ছিল আমাদের দেশে, এজন্য মাতৃভক্ত সুসন্তানের বিশেষ স্থান ছিল তখনকার সমাজে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যে ভোগমুখী সমাজব্যবস্থার প্রভাবে মাতাপুত্রের অপূর্ব স্নেহবন্ধন ক্রমশ শিথিল হতে চলেছে। তাই সাংসারিক অশান্তি সর্বত্র। সামাজিক স্নেহের বন্ধনগুলো ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু।

যে-সকল নারীর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক যোগ্যতা আছে তাঁদের সমাজের প্রতি কর্তব্য অবশ্য পালন করতে হবে। মাতৃত্বের দায়িত্ব তাঁরা এড়াতে পারেন না। শ্রীসারদা দেবীর ক্ষেত্রে আমরা এই আদর্শই দেখতে পাই। তিনি নিঃস্বার্থ, গভীর ভালোবাসায় বিশ্বব্যাপী সন্তানদের আকৃষ্ট করেছেন। যে যেমন আদর্শ বা পথ অবলম্বনের উপযোগী তাকে তেমনভাবে চালিত করেছেন, কখনও কখনও সেই ভক্তসন্তানের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে। এ এক আশ্চর্য মাতৃশক্তি। শ্রীসারদা দেবীর মহিমময় জীবন সম্বন্ধে নানা গবেষণা ও বিশ্লেষণ, চলছে। এই চৈতন্যরূপিণী, চিৎশক্তির ধারণা সাধারণের বুদ্ধিগম্য নয়। "মা তুমি কে কেউ জানে না... চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তাদের বোধের সীমানা।"

সকল জাতির মধ্যেই যথার্থ নারীধর্মপালনে স্বাধীনতা বা সহায়তা দেওয়া যদি হয় তাহলে এইপ্রকার উন্নত ও মহীয়সী নারী জন্ম নেয়। স্ত্রীজাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত আদর্শ নারীত্ব। কেননা প্রত্যেক জাতির জীবনীশক্তি নারীর উন্নতির মধ্যেই নিহিত। বর্তমানে জগতের সর্বত্র সমস্ত জাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। কারণ মাতৃশক্তি সুসন্তান লাভের

জন্য লালায়িত নয়। হিন্দুধর্মে শিবশক্তির ধারণা সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। এটি আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। তাই আমাদের সমাজের গড়ন ছিল অতি সুসঙ্গত। সেই ধারণা আমাদের সমাজকে রক্ষা করে এসেছে এতকাল। এর দ্বারা জাতিও সুরক্ষিত থাকে।

আমাদের ধর্মের ভিত্তি প্রত্যক্ষ-অনুভব। অভিজ্ঞতামূলক না হলে ধর্ম অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে। বৈদিক ঋষি বলেন—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" ঋষিগণ সর্বদাই দর্শন করেন সেই পরম সত্যকে, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা সকলেই এক অদৃশ্য মন্দিরের পূজারী।

আমাদের ধর্মের ভিত্তি অধ্যাত্মজীবন। ধর্মের অভিব্যক্তি হচ্ছে সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি দূর করে মানবজাতির প্রতি অসীম প্রেম। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ। মানবসেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আরাধনা।

এদেশ নারীত্বকে মহিমান্বিত করেছে। কারণ ব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি শিবব্রহ্মস্বরূপের অংশসম্ভূতা হয়ে মানবজাতিকে উচ্চ আদর্শের পথনির্দেশ করেছেন যুগ যুগ ধরে। ঊনবিংশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষকে তার মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করে যথার্থ পথের সন্ধান দিতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন জগজ্জননী শ্রীসারদা দেবী। তাঁর অনন্যসাধারণ চরিত্র মানবসংস্কৃতিকে এক উঁচুসুরে বেঁধে রেখেছিল। যদিও সাধারণ মানুষ এসব ব্যাপারে বিশেষ আস্থা রাখতে নারাজ। কিন্তু যাঁরা জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন, তাঁদের চিন্তা গভীর সুরে বাজে বলেই তাঁদের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ধরা পড়ে কোন দিকে এবং কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রের গতি প্রবাহিত হচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতি দীর্ঘদিন যাবৎ পল্লীর নিঃস্ব শান্তজীবন অবলম্বনপূর্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কপর্দকহীন ধর্মগুরুদের উচ্চাসন দিয়ে আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করেছে।

শ্রীসারদা দেবীর পিতা শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একদিন স্বপ্নে দেখেন একটি সুন্দরী বালিকা তাঁর পিঠে পড়ে কোমল বাহুপাশে তাঁর কণ্ঠ জড়িয়ে সুমধুর কণ্ঠে বলছে, "এই আমি তোমার কাছে এলুম।"[১] রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কে গো তুমি?" সহসা নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন-বিবরণ চিন্তা করে তাঁর ধারণা হয়, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখের কথা—তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই সদাচারনিষ্ঠা, লোককল্যাণসাধন ইত্যাদি সদ্‌গুণের জন্য গ্রামবাসীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁদের সরলতা, পবিত্রতা এবং দৃঢ়চিত্ততার জন্য প্রতিবেশীরা সকলেই তাঁদের ভালোবাসতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবীও কন্যার দিব্য আবির্ভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় তিনি শৌচে যান। বসে থাকাকালীন, দেখেন একটি সুন্দরী পাঁচ-ছয় বছরের বালিকা বেলগাছ থেকে নেমে এসে তাঁর পিঠের ওপর পড়ে বলছে—"এই আমি তোমার কাছে এলুম।"[২] এরপর তিনি কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞা হারান। পিতামাতা উভয়েই তাঁদের পরিবারে যে দেবী কৃপা করে আবির্ভূতা হবেন তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা অত্যন্ত পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে দেবীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় কাল কাটাতে থাকেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাল্য ও শৈশব সকলের অলক্ষিতে এক অলৌকিক শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁর নিজ বাল্যকালের কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং বলেছেন—তাঁরই মতো এক মেয়ে সর্বদা তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে সব কাজে সাহায্য করত, আমোদ-আহ্লাদ করত। অন্য লোক এলে তাকে আর দেখা যেত না। শ্রীশ্রীমা দরিদ্রের কুটিরে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই

দরিদ্রতম সংসারে দরিদ্র সন্তানের যথাকর্তব্য করতে কোনও ত্রুটি রাখেননি। আমরা আধুনিককালের মানুষরা দৈবলীলায় তেমন বিশ্বাসী নই। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের দেবশরীর রক্ষণার্থ দৈব পরিবেশ সৃষ্ট হত—একথা শ্রীসারদা দেবীর স্বমুখেই প্রকাশিত।

শ্রীমায়ের একাদশ বৎসর বয়সে ভীষণ দুর্ভিক্ষ লাগল। অজস্র দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামবাসীদের জন্য নিজ মরাই-এর সংগৃহীত চাল দিয়ে কলাইয়ের ডাল মিশিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রান্না করে মায়ের বাবা সকলকে খাওয়াতে লাগলেন। ছোট্টো মেয়ে সারদা মানুষের খিদের জ্বালা নিজ অন্তরে অনুভব করে দু-হাতে পাখা নিয়ে গরম খিচুড়িকে ঠাণ্ডা করতেন। মায়ের সন্তানবাৎসল্য তাঁর মধ্যে তখনই জাগরূক। তাঁর শ্রীমুখ নিঃসৃত বর্ণনায় দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ চিত্রখানি আমাদের হৃদয় মথিত করে।

শ্রীশ্রীমায়ের অনন্যসাধারণ চরিত্রের মাধুর্য তাঁর বাল্যলীলায় পিতামাতা ও পরিজনদের বারবার অভিভূত করেছে। শ্যামাসুন্দরী দেবী কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন—"সারদা, তোর মতন মেয়ে আমার যেন হয় মা।" আবার বলেছেন, "মাগো, তুই যে আমার কে মা! আমি কি তোকে চিনতে পারছি, মা?" কন্যা বাহ্যিক বিরক্তি সহকারে বলেছিলেন—"কে আবার? আমার কি চারটে হাত হয়েছে? তাহলে তোমার কাছে আসব কেন?"[৩] শ্যামাসুন্দরী স্নেহময়ী কন্যার শান্তিপ্রদ অতীত স্মরণপূর্বক বলেছিলেন—"তোকেই যেন আবার আমি পাই, মা।"[৪] ভ্রাতাদেরও দিদির দেবীত্বের ওপর ছিল বিশ্বাস। শ্যামাসুন্দরীর উক্তিকে সমর্থন করে তাঁরাও বলেছেন—"দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কি না করেছেন! ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজই তো দিদি করেছেন।"[৫]

ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়ার যেমন ধারা আছে তেমনি আমাদের স্থূলজগতে তাঁর বিভিন্ন প্রকাশও লক্ষ্য করা যায় যদি আমবা এইসব ভাগবতী ভাবধারা সম্বন্ধে চিন্তা করি।

বর্তমান কালে এদেশীয় নারীসমাজকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় কিছুটা অভিষিঞ্চিত কবার প্রয়োজনবোধেই স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশিনী শিষ্যাদেব সাগ্রহে আহ্বান জানান। আবার পাশ্চাত্যের নারীসমাজও যদি প্রাচ্য ভাবধারার অংশবিশেষ গ্রহণ করেন তাহলে তাঁরাও নারীজাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারবেন। ভারতীয় নারীর আদর্শ সতীত্ব ও মাতৃত্ব। কারণ এদেশে এইসকল পবিত্র গুণের মাধ্যমেই পরমার্থলাভ সম্ভব বলে এই শাশ্বত ভারতীয় রীতিগুলির প্রচলন হয়ে এসেছে। যে আদর্শ আমাদের দেশ ও জাতিকে চিরকাল অস্থিমজ্জায় জাগিয়ে রেখেছে—বর্তমানে তার মধ্যে কিছু অন্য ভাবের মিশ্রণ হলেও আপন সত্তায় আজও সে স্থির আছে। এইক্ষেত্রে মানবী সত্তা নয়, দৈবী আধ্যাত্মিক সত্তার পুনর্জাগরণের প্রয়োজন।

কাল এবং যুগোপযোগী ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি যুগপুরুষের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। ভারত নামক এই বিশেষ দেশেও মানবধর্ম ও বিশ্বধর্মকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব বিশ্বস্রষ্টারই নির্দেশ অনুযায়ী ঘটেছে। সেইজন্যই তো তাঁর শুভ আগমন এই ধূলার ধরণীতে।

শত দুঃখ-কষ্ট-ঝঞ্ঝাপীড়িত এই মাটির জগতে মানুষের প্রেমে উদ্বেল সেই প্রেমিক ভগবান বারে বারে সশক্তিক অবতরণ করেন—মানুষকে ভালোবাসেন—মানুষকে জাগান, ভালোবাসার মন্ত্র শেখান—তাকে নিজের কাছে রাখবেন বলে। মায়াময় এই বিশ্বসংসারকে প্রেমময় জগৎ বলে বোধ করান, তাকে আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করেন।

শ্রীশ্রীমা ও স্ত্রীমঠ

স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর লীলাসংবরণের পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে বলেছিলেন, তিনি সকলের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল এ জগতে থেকে কাজ করবেন। মা হয়তো তখন সম্মত হননি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁর মহিমা কেমন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, মা সঙ্ঘনেত্রী হবেন এবং তাঁর অধীনে অনেক সন্ন্যাসিনী সমবেত হয়ে ভারতের চিরন্তন চিন্তা, কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ধারাকে শুধু প্রচার করবে তা নয়, দীর্ঘকাল ধরে তাকে বর্ধিত করবে। সেই ধারায় চলে এসে আজ এখানে শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ক্রমে মন্দির স্থাপিত হতে যাচ্ছে। মন্দিরকে কেন্দ্র করে চাবিদিকে কত ভাব ছড়াবে।

হিন্দুসমাজ চিরকাল মায়ের সম্মান দিয়ে এসেছে। পূজা করেছি আমরা মা কালী, মা দুর্গা, মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মীকে। উপনিষদেব যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির সম্মান আমরা দেখে এসেছি। যখন প্রলোভন উপস্থিত হয়েছে তীক্ষ্মবুদ্ধি মৈত্রেয়ী বলেছেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্যাম্'—যা দিয়ে আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না, তা নিয়ে আমার কী হবে?

শাণিত বুদ্ধি নিয়ে গার্গী দাঁড়িয়েছেন জনকেব সভাতে। বলেছেন—কাশীর নরপতি যেমন দুটি শাণিত অস্ত্র নিয়ে দণ্ডায়মান হন, তেমনিভাবে আজ সভাতে দাঁড়িয়েছি দুটি প্রশ্ন নিয়ে। যদি যাজ্ঞবল্ক্য এদের সমাধান করতে পারেন, তাহলে জানব যাজ্ঞবল্ক্য অপরাজেয়। আমরা চিরকাল তাঁদের সম্মান দিয়ে এসেছি, মেনে এসেছি এমনিভাবেই।

ভগবানের শক্তি অবতীর্ণ হয়েছেন সীতারূপে এবং পাতিব্রত্য দেখিয়ে গেছেন। শ্রীরাধারূপে এসে দেখিয়েছেন ভগবানের জন্য সর্বস্বত্যাগ কীভাবে করতে হয়। আমরা জানি, যখন মণ্ডনমিশ্র এবং শংকরাচার্যের মধ্যে বিচার আরম্ভ হয়েছিল, সরস্বতীরূপিণী দেবী উভয়ভাবতী সেখানে মধ্যস্থতা করেছিলেন। তাঁদের এই ধীশক্তি, আধ্যাত্মিকতা ও কর্মকুশলতা সুবিদিত। সুতরাং আজকে এটা কিছু অভিনব বস্তু নয়, অতীতকালেও ছিল। বর্তমান কালে যদি সন্ন্যাসিনীরা দাঁড়িয়ে আধ্যাত্মিকতা প্রচার করতে থাকেন, তবে সেটা কিছু নতুন নয়। কিন্তু তার ভিতরে একটা বিশেষত্ব আছে। মা এসেছিলেন প্রাচীন সংস্কৃতির শুধু সমষ্টিরূপে নয়, বিভিন্নভাবে তিনি তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

তাঁর সমস্ত জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতাময়। সকাল থেকে রাত্রি এবং পরদিন প্রত্যূষ পর্যন্ত চলত আধ্যাত্মিক সাধনার ধারা। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, নিজের সুখ-সুবিধার চিন্তা নেই, ঠাকুরের সেবাতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সর্বদা তাঁরই কথা ভাবছেন। কোথায় থাকতে

হবে, কী করতে হবে—নির্বিচারে সে-সমস্ত ভুলে গিয়ে তাঁরই সেবাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। প্রগতিশীল ছিল তাঁর বুদ্ধি, প্রগাঢ় ছিল তাঁর দৃষ্টি। যখন ঠাকুরের আগমনের প্রকৃত তাৎপর্য কেউ বুঝতে পারেনি, অথবা বুঝেও পরিষ্কার বলতে পারেনি তেমন দিনে তিনি বলেছিলেন—ঠাকুর, তোমার ছেলেরা চারিদিকে এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াবে? তাদের মাথা গোঁজবার স্থান নেই। এইভাবে সন্ন্যাসীরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, ছায়া নড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-গাছের তলা থেকে ও-গাছের তলায় যায়—সে তো আমরা দেখেছি। তার জন্য যদি তোমার আগমন হয়ে থাকে, এইটুকুতেই যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তোমার আসার আর তাৎপর্য কী! প্রার্থনা তিনি করেছিলেন যাতে তাঁর ছেলেদের একটা স্থান হয়। মা বলতেন, এর পরেই এ সমস্ত মঠ-মিশন তৈরি হল। ঠাকুরের প্রথম পূজা আরম্ভ করেছিলেন তিনি, ঠাকুরের প্রতিকৃতিকে নিয়ে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমনি। সকলে যখন ঠাকুরকে চেয়েছিলেন চিন্তার ভিতর দিয়ে বুঝতে, প্রাচীন কাঠামোর ভেতর ফেলে দিয়ে তাঁকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে, তখন মা তাঁকে দেখেছিলেন অন্য দৃষ্টিতে। তিনি জানতেন, ঠাকুর একটি নবীন বাণী নিয়ে এসেছেন, একটি নব প্রেরণা ভারতে এনেছেন, যার অর্থ হয়তো তখনকার দিনে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি, দিনে দিনে আরও পরিষ্কার হবে। ক্রমে তাঁর কাজ আপনা থেকেই প্রসার লাভ করবে—যার চিন্তা হয়তো আমরা এখনও করতে পারি না। ঠাকুর ও মায়ের চিন্তাধারা কতভাবে কতদিকে রূপায়িত হবে, সমাজে নতুন প্রেরণা জাগিয়ে নবভাবে তাকে উদ্বুদ্ধ ও রূপায়িত করবে—তা কল্পনা করা সাধ্যাতীত।

মা জন্মগ্রহণ করেন পল্লীগ্রামে কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল কী গভীর! সম্মুখে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। রাধু তখন ছোট্টো মেয়ে—যদিও তার বিয়ে হয়ে গেছে—যেমন তখনকার দিনে ব্যবস্থা ছিল। সে ইস্কুলে পড়তে যাবে, গোলাপ-মা বারণ করলেন—না ওর যাওয়া উচিত নয়, ওর বিয়ে হয়ে গেছে, লোকে কী বলবে? মা বললেন—না গো ওর বিয়ে হয়েছে পাড়াগাঁয়ে, কিছু লেখাপড়া শিখে এলে লোকের উপকার হবে। শ্রীশ্রীমায়ের যেসব সন্ন্যাসী যুবক সেবক ছিলেন তাঁদের বলতেন—ওই একজন শ্রীবাসানন্দ স্বামী এসেছেন, পণ্ডিত লোক, ইংরেজি শিখে নাও। এরপর বিদেশ থেকে কত লোক আসবে, তাদের সঙ্গে তোমাদের কথা বলতে সুবিধা হবে। ঠাকুর স্বয়ং বলেছিলেন, মা অতি বুদ্ধিমতী।

শ্রীশ্রীমা বলে গেছেন—'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।' সকলকে এক করে নাও, কাউকে বাদ দেওয়া নয়। বলেছিলেন—ঠাকুর কত বাছ-বিচার করে নিয়েছিলেন, আর আমার দিকে ঠেলে দিয়েছেন পিঁপড়ের সার। মা কিন্তু ছেড়ে দেননি, সকলকে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর শেষ উপদেশ, 'কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।' যদি ভালোবাসতে পার তবে প্রতিদান পাবে। এই ছিল মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি, সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকা। আর কতখানি তাঁর ভালোবাসা, মনের সাহস! যখন সমস্যা দাঁড়াল স্বামীজীর সামনে—নিবেদিতা এসেছেন, বিদেশিনী মেয়ে, কোথায় তাঁকে রাখা যায়, তখন ভেবেচিন্তে বললেন, একমাত্র স্থান আছে মায়ের বাড়ি। পল্লীগ্রামে জন্ম, ব্রাহ্মণের বিধবা—তাঁরই বাড়িতে স্থান দিতে হবে বিদেশিনী নিবেদিতাকে। তখনকার দিনে কোন মহিলা সাহস করে এ-কথায় রাজি হতে পারতেন? কিন্তু মাকে বলামাত্র রাজি হলেন। নিবেদিতাকে তিনি রাখলেন নিজের মেয়ের মতো আদরযত্ন করে।

কেন রেখে গিয়েছিলেন ঠাকুর তাঁকে?—বলেছিলেন, এযুগে মাতৃভাব প্রচারের জন্য। শুধু মাতৃভাব প্রচারের জন্য নয়, বুদ্ধির কথা বলেছি, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথাও বলছি। একদিন একজন বিদেশি পর্যটক এসে আমাকে প্রশ্ন করেন, মায়ের মন্দিরের সামনে—আপনারা এঁর কাছে কি কেউ দীক্ষাগ্রহণ করেছেন? আমি বললাম—আমি ছাড়া এই বেলুড় মঠের যে কয়জন ট্রাস্টি বা 'গভর্নিং বডি'র মেম্বার আছেন, সকলেই মায়ের শিষ্য। ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন।

মা পরিচালিত করছেন সঙ্ঘকে, শুধু আমাদের ওখানে (বেলুড় মঠে) নয়, এখানেও (সারদা মঠে)। পৃথক মঠ করা হয়েছে, প্রয়োজন ছিল বলে। স্বাধীনভাবে চললে কাজ ভালো হয় এবং অনেকক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়। এরা স্বাধীনভাবে চলুক, হয়তো আমাদের চেয়ে অনেক ভালো কাজও করতে পারবে। যেক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ নিষেধ বা যাওয়া সম্ভবপর নয়, সেসব ক্ষেত্রেও মেয়েরা কাজ করতে পারে। এই কয়েক বছরের ভিতরেই আপনারা দেখেছেন, এই প্রতিষ্ঠান কতটা সাফল্য অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে এর চেয়েও বেশি সাফল্য অর্জন করবে।... কার্যকুশলতা এবং কাজের গণ্ডি হিসাব করলে বলা যায় এদের সামনে একটি প্রকাণ্ড জগৎ রয়েছে। মেয়েদের ভিতর যে শক্তি আছে, এটি আমরা চিরকাল দেখে এসেছি ভারতের অতীতে এবং বর্তমান কালেও আমরা দেখছি—মেয়েদের দিয়ে কাজ হবে।

এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—একে কেন্দ্র করে জগতে, ভারতের অন্যান্য জায়গায়, আরও বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। আমরা বেঁচে থাকব না দেখার জন্য। কিন্তু জগৎ দেখবে এবং জানবে যে মায়ের আগমনের তাৎপর্য কতখানি।
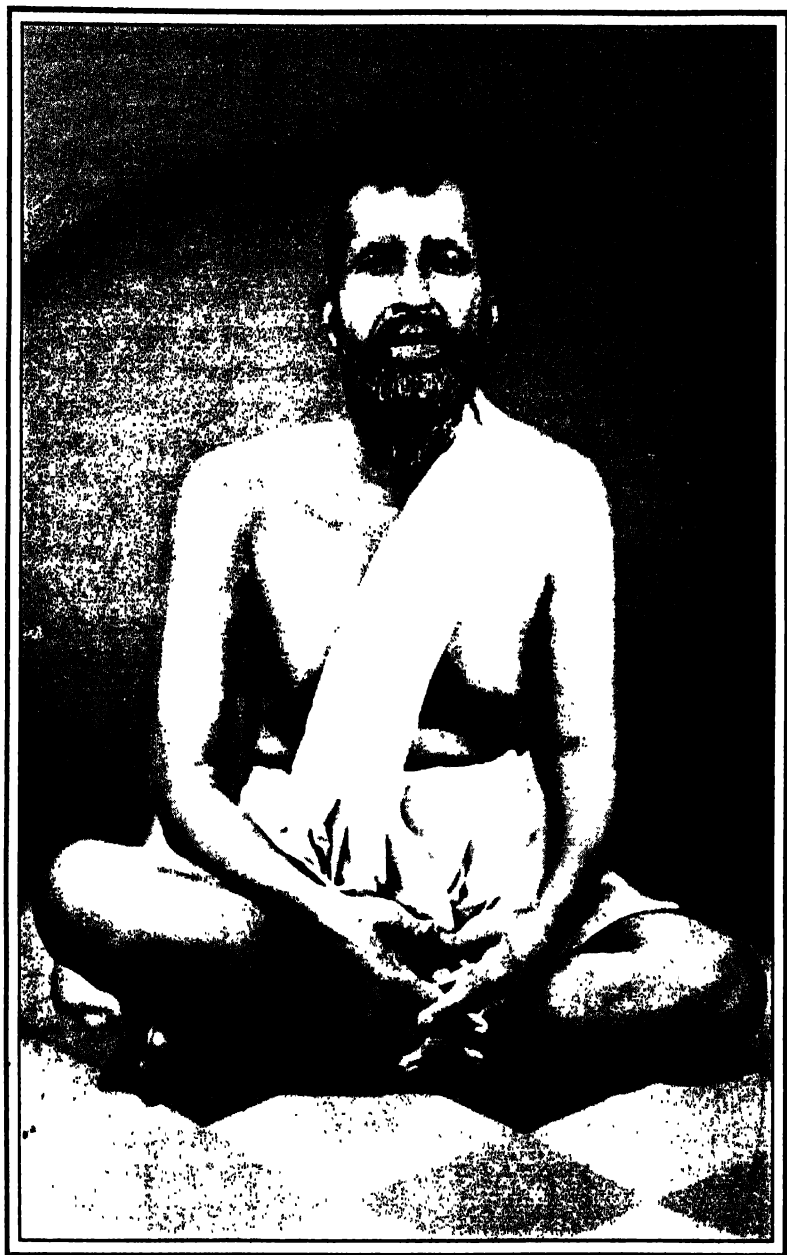
শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীমা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি অবতার হন, তবে শ্রীমা নিশ্চয় তাঁর শক্তি। পূর্ব পূর্ব অবতারগণের শক্তির তেমন বিকাশ ছিল না। এযুগে সবই নূতন, অদ্ভুত। শক্তির বিশেষ ভূমিকা। শ্রীমার মধ্যে আমরা দেখতে পাই সীতার অপার সহিষ্ণুতা—বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে যিনি মহাদুঃখের জীবন যাপন করে গেছেন, নিত্য সাধ্বী, নিত্য শুদ্ধস্বভাবা। দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দেহবোধরহিত অপার ভালোবাসা—'তৎসুখে সুখিত্বম্', যশোধরার মতো তিনি একান্তভাবে স্বামীর আদর্শের অনুবর্তিনী, বিষ্ণুপ্রিয়ার মতোই নীরব মহাসাধিকা। আবার অবতারতত্ত্বে যাঁরা উৎসাহ বোধ করেন না. তাঁরাও উপলব্ধি করেন তাঁর দিব্য জীবনের মহিমা। তাঁর মাতৃত্বের স্নেহলাভে ধন্য ভক্তহৃদয় জননীরূপে তাঁকে চিন্তা করে—যিনি পরম আশ্বাস দেন, সন্তানের সকল তাপ হরণ করে পরিচালিত করেন শান্তির পথে। সর্বদাই সর্বভূতহিতে রতা।...

শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' এক নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছে মানবজাতির সামনে। সমগ্র মানবজাতিকে তার অধ্যাত্ম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করা অন্যতম উদ্দেশ্য অবতার জীবনের। ধর্মের সংজ্ঞা তখন কতগুলি মতবাদ, বিবিধ আচার ও অনুষ্ঠান যা প্রাণহীন পূজা-অর্চনা, গঙ্গাস্নান, নিরামিষ ভোজন এবং সেইসঙ্গে বহু কুসংস্কার। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ধর্মের অর্থ আত্মসাক্ষাৎকার।... ধর্ম সম্বন্ধে নূতন চেতনা প্রবর্তন, সমগ্র জগতে তাঁর সমন্বয় বার্তা ঘোষণা এবং নূতন করে জগতের সামনে ত্যাগের আদর্শ প্রচার করার জন্য নব আদর্শে তরুণ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন—এই ত্রিবিধ সাধনায় শ্রীমার সম্পূর্ণ সহযোগিতার কথা এবার আমরা আলোচনা করব।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে আসার পর শ্রীমার প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা। কঠোর সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর তখন অতিশয় কোমল ও সুকুমার। সেই দেহরক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন তিনি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে। প্রথম দিকে আহার্য প্রস্তুত ছাড়া নানাভাবে ব্যক্তিগত সেবাও করেছেন। উত্তরকালে বহু ভক্ত পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখাই হত না কতদিন। কিন্তু অলক্ষ্যে তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টি অতন্দ্র সেবায় ছিল তৎপর। তাঁর সেবার উপর নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণ একবার অসুস্থ হলে শ্রীমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন, যেমন করে হোক তিনি যেন চলে আসেন। জগতের কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন ছিল তাঁর মহামূল্য শরীরের সংরক্ষণ। শক্তিরূপে শ্রীশ্রীমা সর্বদা তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন অসুস্থকালে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে মহাসমাধির দিন পর্যন্ত।

দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে অবস্থানকালে ভাগ্নে হৃদয়ও তাঁর সেবার অধিকার লাভ

করেন কিন্তু শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাঁকে তিনি অধ্যাত্মবিদ্যা দান করেছেন বলে শোনা যায় না। শ্রীশ্রীমা প্রথমাবধি অনুগত শিষ্যা। তাঁর অসীম অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারিণী। দক্ষিণেশ্বরে এবং পরেও আমরা শ্রীমার নানাবিধ সাধনা সম্পর্কে কিছু কিছু জানতে পারি। বহুবার তাঁকে ভাবস্থ এবং সমাধিস্থও দেখা গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে বাসকালেই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার সমাপ্তি এবং আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিষ্ঠালাভ। উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন করার জন্য তাঁরই তো বহুদিন থাকার প্রয়োজন হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই সর্বতোভাবে নিজ শক্তিকে যুগের উপযোগী সক্রিয় করেছিলেন। ষোড়শীপূজা উপলক্ষে প্রথমে দেবীশক্তির উদ্বোধন, অতঃপর তাঁর সাধনলব্ধ শক্তিপ্রদান, অবশেষে গুরুশক্তির উন্মীলন—যার ফলে উত্তরকালে শত শত নরনারীকে অধিকারিভেদে আধ্যাত্মিক পথে পরিচালনায় শ্রীশ্রীমা ছিলেন সদা তৎপর এবং উন্মুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে অধ্যাত্ম বিদ্যাদানে আগ্রহী থাকলেও সে বিদ্যাগ্রহণে যদি শ্রীমার অভিলাষ, ক্ষমতা ও স্বতঃপ্রবৃত্ত সহযোগিতা না থাকত তাহলে তা কি সম্ভব হত? ভক্তদের কাছে শ্রীমার ঐশ্বরিক শক্তির কথা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেই কি ব্যক্ত হয়নি? নিজ মুখে কি তিনি ইঙ্গিত করেননি—"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥"

শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমপ্রাণতা বা সমধর্মিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ জীবন, তাঁর সর্ববিধ আচার-আচরণ, জীবনের উদ্দেশ্য—সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন শ্রীশ্রীমা এবং সেই একই সুরে নিজের জীবনতন্ত্রীও বেঁধে নিয়েছিলেন। কালীমন্দির থেকে মাতালের মতো টলতে টলতে ঘরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি মদ খেয়েছেন। একবার মাত্র তাঁর দিকে চেয়ে শ্রীমা বললেন, "না, মদ খাবে কেন? তুমি মার ভাবামৃত পান করেছ।" মাড়ওয়ারি ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দশ হাজার টাকা দেবার প্রস্তাবে শ্রীমার পরামর্শ চাইলে তাঁর তৎক্ষণাৎ উত্তর, ত্যাগের জন্যই লোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে মান্য করে সুতরাং এ টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না। ৮

শ্রীমার কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের আস্থা কতদূর ছিল তার প্রমাণ, একবার তাঁর কোনও জায়গায় যাবার কথা উঠলে শ্রীমা নিষেধ করেন। ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সে কথা ব্যক্ত করেন : "আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম। রামলালের খুড়ীকে (শ্রীমাকে) জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে; আর যাওয়া হল না।"

তাদের উভয়ের সম্পর্কটা বাস্তবিক বিচিত্র ও মধুর। "আমাকে তোমার কি মনে হয়"—শ্রীমার এই প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর, "সাক্ষাৎ আনন্দময়ীব মূর্তি বলে সত্য সত্য তোমাকে সর্বদা দেখতে পাই।" ভাবাবেশে তিনি কখনও নিজেকে জগদম্বার সখী বা পরিচারিকা মনে করতেন। শ্রীমাও সানন্দে তাঁকে নারীবেশে সাজিয়ে দিতেন। ওই কথা উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "দুজনেই মার দাসী ছিলাম তা নইলে কি পরিবারকে আট মাস কাছে রাখতে পারতাম।"...

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ সম্পর্কে শ্রীমা কেবল অবহিত ছিলেন না, তাঁর নিকট সমাগত সব ভক্তকেই তিনি চিনতেন, যদিও দুই-একজন ব্যতীত তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল না। কে কোন স্তরের, কার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কিরূপ ব্যবহার, সব তাঁর জানা ছিল। যার ফলে পরবর্তী কালে একদিকে তিনি যেমন শত শত নরনারীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে তাদের অধ্যাত্মজীবন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণেরও তিনিই

ছিলেন আশ্রয়স্থল। আবার বহুবিধ সমস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষকেও মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। একদিকে আত্মীয়স্বজন, ভক্ত, ভালোমন্দ নিয়ে বৃহৎ সংসারের সুগৃহিণী, অন্য দিকে অধ্যাত্মপিপাসু ভক্তগণের তৃষ্ণা নিবারণ, আবার সতত সঙ্ঘের কল্যাণে রত। আর সবগুলিই এত সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে করতেন যে কারও মনে করার অবকাশ ছিল না যে তিনি অতিশয় দুরূহ কোনও কাজ সম্পাদন করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কিছুকাল কামারপুকুরে দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, লোকশিক্ষার জন্য তার প্রয়োজনও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ—সাধারণ লোকের জন্য সংসারত্যাগ নয় বরং সংসারে থেকেই ঈশ্বরলাভের পথ প্রশস্ততর। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো কখনও সংসার-জীবন যাপন করেননি। সেখানে প্রতিপদে যে দ্বন্দ্ব, সমস্যা, কলহ, অশান্তি—সেই পরিবেশে ঈশ্বরচিন্তা কি সম্ভব? নিজের জীবন দিয়ে ওই আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই যেন শ্রীশ্রীমা আজীবন সংসারে বাস করে গেলেন। সেখানে প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিপদে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে তাঁর যে অপূর্ব সহনশীলতা, অপার স্নেহ, বিচক্ষণতা ও অনন্ত ক্ষমার পরিচয় পাওয়া যায়, নারীমাত্রেরই তা আদর্শস্থল, শত কর্মকোলাহলের মধ্যে তাঁর ঈশ্বরাভিমুখী চিত্ত প্রমাণ করে অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসার করা সম্ভব। নিজের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমার উক্তি, ঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন মাতৃভাব বিকাশের জন্য। তাঁর এই অপূর্ব মাতৃভাবের কথা এখানে পৃথগ্‌ভাবে বলব না কারণ তাঁর জীবনী ছাড়াও বহুজন এ তত্ত্ব আলোচনা করেছেন বিস্তৃতভাবে। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে এই মাতৃত্বের বিকাশ ছিল সহজাত, এখনও আছে যা বহুক্ষেত্রে নিজ সন্তানের গণ্ডি অতিক্রম করে। শ্রীশ্রীমার জীবনে অবশ্য তার বিকাশ অদ্ভুত। দেশ-কাল, জাতি-বর্ণের কোনও পার্থক্য দেখা যেত না। তাঁর উদার মাতৃহৃদয় নির্বিচারে যে কাছে এসেছে তাকেই আশ্রয় দেবার জন্য সতত উন্মুখ। কিন্তু সেই মাতৃহৃদয়ে কেবল স্নেহ-বাৎসল্য ছিল মনে করলে ভুল হবে। প্রয়োজনস্থলে সন্তানের কল্যাণের জন্য কঠোরতাও ছিল, আর কদাপি ছিল না জাগতিক উচ্ছ্বাস। তাঁকে উপলক্ষ বা কেন্দ্র করে ভক্ত ও শিষ্যদের উচ্ছ্বাস, প্রচারের বাহুল্য, ভাবের অতিশয়োক্তি ইত্যাদি কোনওদিন তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি।

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ আজ বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত। বর্তমানে ওই সঙ্ঘের অনুসরণে বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও লোককল্যাণকার্যে অগ্রণী। কিন্তু ঠিক সেই সময় তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা কঠিন ছিল। বিরুদ্ধ সমালোচনা কম ছিল না। এমনকি, তাঁর গুরুভাইদের মধ্যেও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষাবিহীন, অতি সাধারণ এক পল্লীরমণী সর্বতোভাবে ওই আদর্শকে সমর্থন ও সাহায্য করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন সকলকে স্বামীজী প্রবর্তিত সেবাব্রত বা নিঃস্বার্থ কর্মযোগে।

সেবাশ্রম চালানো, বই বিক্রয়, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি কাজগুলি সাধুজীবনের পরিপন্থী—একজন সাধুর এই অভিযোগের উত্তরে দৃঢ়ভাবে নানা কথা বলবার পর শ্রীমার উক্তি: "ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনি ভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না, তারা চলে যাবে।" কাশী সেবাশ্রম পরিদর্শনে অতীব প্রীত হয়ে তিনি কিছু অর্থ সাহায্যও করেন। সঙ্ঘের সম্প্রসারণে সদা উৎসাহী সঙ্ঘজননী কোনও বৈরাগ্যবান যুবক তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তাকে গৈরিক বস্ত্র প্রদানান্তে সঙ্ঘে যোগ দিতে বলতেন। মঠের তিনজন প্রাচীন সাধু তাঁর কাছে ওইভাবে সন্ন্যাস লাভ করেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁদের অন্যতম। তাঁর

ইচ্ছা প্রাচীনপন্থী সাধুদের মতো জীবন কাটাবেন তীর্থভ্রমণ ও তপস্যায়। শ্রীমা কিন্তু তা অনুমোদন করলেন না। নির্দেশ দিলেন পদব্রজে কাশী পর্যন্ত গিয়ে অদ্বৈত আশ্রমে যোগ দিতে। স্বামীজী প্রবর্তিত সঙ্ঘের আদর্শ বোধহয় তিনিই প্রকৃত অনুধাবন করেন। সঙ্ঘ যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হয়, তার জন্য ছিল তাঁর নিরন্তর প্রার্থনা, সেইসঙ্গে ছিল সাধুজীবনের আদর্শের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানগণের পর মঠের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত অথবা সঙ্ঘ পরিচালনার কাজে নিযুক্ত প্রাচীন সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই শ্রীশ্রীমার দীক্ষিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয় বা সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা শ্রীমার জীবনে অতি সহজ ছিল। অপর ধর্মের প্রতি এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল আশ্চর্য উদার। তাই মুসলমান আমজাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার তাঁর কাছে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি। আবার সিস্টার নিবেদিতা যখন কাজের আরম্ভে তাঁর কাছে থাকতে চাইলেন, তখনও তিনি সহজেই তাঁকে নিজের শয়নকক্ষে স্থান দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানে সাদা লোকেদের দেখেছিলেন। স্বামীজীর শিষ্য শ্বেতাঙ্গ রমণীরা যখন এলেন—নিবেদিতা, মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, কৃস্টিন, কত সহজেই না শ্রীমা তাদের গ্রহণ করেন! ছিল না কোনও আদব-কায়দা, আড়ম্বর-উচ্ছ্বাস। নিজ স্বভাবে অবিচলিত, প্রাচ্য পরিবেশেই তাদের সাদরে গ্রহণ; তারাও মুগ্ধ, অভিভূত। তখনকার সমাজে কিন্তু খ্রিষ্টানমাত্রেই ম্লেচ্ছ, সুতরাং অন্তঃপুরে তাদের প্রবেশ প্রশ্নের অতীত। চালচলনে শ্রীমা সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী কিন্তু কাজে ও আচরণে অতিশয় প্রগতিশীল। আধুনিক শিক্ষার মূল্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।...

পুরুষ ও নারী উভয় মিলে সমাজ। ভারতীয় নারীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছেন, "ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী"—সীতার পবিত্রতা ও সহিষ্ণুতা, সাবিত্রীর তেজস্বিতা যা মৃত্যুর সামনে অবিকম্পিত, দময়ন্তীর নির্ভীকতা চিরকাল আদর্শের প্রতীক কিন্তু সেইসঙ্গে প্রয়োজন বর্তমান যুগের উপযোগী নূতন আদর্শ। সেই আদর্শ আধ্যাত্মিক যা সকলকে নিজ স্বভাবে প্রতিষ্ঠ রাখে, জগতের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করে, কারও অমঙ্গল চায় না। স্বামীজী বলেছিলেন, "বরং শ্রীরামকৃষ্ণ যান আমি ভীত নই—মা ঠাকরুন গেলে সর্বনাশ," মা ঠাকরুনের জীবনেই যে নারীজাতির পথের নির্দেশ, এ-বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না।

তিনি দেখেছিলেন, নূতন যুগ আসছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় তরঙ্গ আছড়ে পড়বে ভারতের সমাজজীবনে। অন্তঃপুরের শিকল ঘুচে গিয়ে প্রখর দিবালোকে উন্মুক্ত জীবনে এসে দাঁড়াবে ভারতীয় নারী। তখন কোন আদর্শ থাকবে তার সামনে?

আশ্চর্য, ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে অতি অল্পসংখ্যক লোক যখন শ্রীশ্রীমার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত, মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ ভক্ত কেবল শ্রদ্ধা-ভক্তি-যুক্ত, অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ বিদিত তাঁর মহিমা, যদিও তাঁর যথার্থ ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত এ কথা বলা যায় না, তখনি স্বামীজী তাঁর এক গুরুভাইকে লিখছেন : "মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখন কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে, মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।" শ্রীমার সম্বন্ধে এত বড়ো উক্তি সেই সুদূর অতীতে তিনি অকারণে করেননি এবং

অতিশয়োক্তি বলেও তা উপেক্ষা করা যায় না। এখন আমরা বুঝতে পারছি, সত্যই শ্রীমার আবির্ভাবে এক মহা আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটছে। সমাজজীবনে নারী-পুরুষের ভেদ থাকবে না, জাগতিক সর্বক্ষেত্রে নারীপুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার লাভ করবে—বর্তমান যুগের এই দাবি থামিয়ে রাখা কঠিন। পাশ্চাত্যের ছাঁচে আমাদের দৈনন্দিন ও সমাজ জীবন গঠিত হতে চলেছে, তাকেও কি রোধ করা সম্ভব হবে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহায়ে জীবনকে সমৃদ্ধ ও সম্ভোগপূর্ণ করবার প্রবল গতিকে ব্যাহত করা যাবে কী দিয়ে? বস্তুত আজ আমাদের জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণ। এই সংকট যে আসন্ন তা অবশ্যই স্বামীজী বুঝেছিলেন। আদর্শের এই সংঘাতের অবসান এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব একমাত্র আধ্যাত্মিক আলোকে—যার চরম বিকাশ আমরা দেখতে পাই শ্রীশ্রীমার জীবনে।

এই আধ্যাত্মিক শক্তিই একমাত্র সমর্থ নারীকে সর্বাবস্থায় অবিচল ও আত্মস্থ রাখতে। আশ্চর্যের বিষয়, এই উন্মাদনা ও আদর্শ-বিভ্রান্তির যুগে কেবল ভারতীয় নারী নয়, বিদেশের নারীও তাকিয়ে আছে শ্রীশ্রীমার আত্মসমাহিত মূর্তির দিকে। তাঁর কাছেই চাইছে আশ্রয়, জানাচ্ছে কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধযুগ-অবসানের দীর্ঘকাল পরে সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছে—যা ভারতের ইতিহাসে নূতন। এই সঙ্ঘের মাধ্যমে তাঁর শক্তির যে প্রকাশ ঘটবে তা অবশ্য এখনও অজানা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী বলেছেন : আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশো বছরের মধ্যে যে ইতিহাস লেখা হবে তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম বাদ পড়তে পারে না। অন্যত্র তিনি বলেছেন, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ অপরিহার্য। আমাদের মনে হয়, সেদিন আসন্ন, যখন এই কথাগুলি শ্রীমার সম্পর্কেও প্রযুক্ত হবে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না, জগতের অন্যান্য অবতারপুরুষ বা আচার্যের মতোই তাঁর আবির্ভাব তিথি সর্বত্র প্রতিপালিত হচ্ছে? এ-বিষয়ে আমাদের কোনও সংশয় নেই যে শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও মেয়েদের মধ্যে এক বিরাট জাগরণ ঘটবে। অবশ্যই তা আধ্যাত্মিক। বর্তমানে আমরা তার সূচনা বা পূর্বাভাসমাত্র দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীমার শেষ উপদেশ : ''যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'' উপদেশের প্রথম অংশ নির্দেশ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শান্তির পথ। দ্বিতীয় অংশে বিধৃত বেদান্তের চিরন্তন সত্য অর্থাৎ সকলের মধ্যে অবস্থিত এক এবং অদ্বিতীয় আত্মা—শ্রীমার সমগ্র জীবন ও উপদেশের মধ্যে সেই শাশ্বত বাণীই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'আমি পাতানো মা নই'

প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

মা! তোমার একশো একান্নতম জন্মতিথি ১৬ ডিসেম্বর। তোমার বয়স তাহলে একশো পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। তবে কি মা তুমি ছিলে না ১৮৫৩-র ২২ ডিসেম্বরের আগে? তোমাকে ছাড়া একটি দিনও কি ভাবা যায়! তোমার সৃষ্টি ছিল, ছিল কীট-পরমাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলকে নিয়ে তোমার এই জগৎ অথচ তুমি ছিলে না!! তাও কি সম্ভব? কোন যুগে ছিলে না, মা, তুমি? কবি মনে করিয়ে দিলেন—

"ত্রেতায় জানকী তুমি, দ্বাপরে শ্রীরাধিকা
এযুগে সারদা তুমি, নাহি তার তুলনা"

যুগে যুগে তোমার ভূমিকা স্বমহিমায় প্রকাশিত। কিন্তু যখন কবি প্রশ্ন তোলেন—

"আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল সত্যি করে
মা তো আমার নয়রে কল্পনা, সে যে চিন্ময়ী হাস্যবদনা।"

তখন 'বল সত্যি করে'—এই কথায় মনে আসে বিভ্রান্তি। কারণ ১৯২০ সালে তো শ্রীমার লীলানাটকের ওপর পড়েছে যবনিকা। তাহলে সত্যি করে দেখা হয়েছে কথাটা দ্বিধাহীনচিত্তে কী করে বলা যায়! প্রশ্ন জাগে মনে, শুধু চোখ দিয়ে দেখাই কি সত্যিকারের দেখা? দর্শন তো সম্ভব নানাভাবে। শ্রীমার সাক্ষাৎ সন্তানদের মুখ থেকে শুনেছি তাঁর অনেক কথা। তখন যেন তাঁদের চোখ দিয়ে মাকে দেখেছি যেমন আধুনিক যুগে ফিল্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উপস্থিতিকে বাস্তব হতে দেখি। শ্রীমার জীবনালেখ্য দিন দিন উজ্জ্বলতর হচ্ছে। ধ্রুবতারার মতো সে-জীবন পথ দেখিয়ে চলেছে বহু মানুষকে তাদের লক্ষ্যে। তবু খুঁজে নিতে চাই তাঁর জীবনের সেই ঘটনা, তাঁর বলা সেই কথা, যা আজও ভাবায়, আজও সমানভাবে প্রেরণা দেয়।

জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যে ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর কন্যা সারদার ছয় বছর বয়সে বিয়ে হল কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্যে ও চন্দ্রমণি দেবীর পুত্র চব্বিশ বছরের গদাধরের সঙ্গে। কাকা ঈশ্বরচন্দ্রের কোলে ছোট্টো সারদা গেলেন শ্বশুরালয়ে। সামাজিক রীতি অনুযায়ী সারদা মাঝে মাঝে থেকেছেন পিত্রালয় জয়রামবাটীতে, কখনও বা রয়েছেন কামারপুকুরে শ্বশুরালয়ে। কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু অধিকাংশ সময় দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন সাধনায় নিমগ্ন। একবার সংবাদ এল তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন। সারদা এই সংবাদ মেনে নিতে পারলেন না' তাঁর মনে হল যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে তবে তাঁর কি কর্তব্য নয় এইসময় শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করা? দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে চাইলেন—সারদা কি তাঁকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছেন? সারদার উত্তরটি আজও

আমাদের বিস্মিত করে—"আমি তোমাকে ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি।" আধুনিক অর্থে অশিক্ষিতা, জয়রামবাটীর মতো অজ পাড়াগাঁয়ের এক পল্লীবধূর পক্ষে এ ঘোষণা কি অসাধারণ নয়? শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহধর্মিণীর প্রতি নিজ দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন ছিলেন। অবশ্যই তা স্থূল অর্থে নয়। সারদা দেবীর উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তিনি। তাঁর মুখেই শুনেছি—"ও কি যে সে? ও আমার শক্তি।"

শ্রীমার জীবন একান্ত ঈশ্বরনির্ভর। সেখানে ছিল না অভিমান, অহংকারের লেশ। একটি ঘটনার কথা ভুলতে পারি না। একবার শ্যামাসুন্দরী সারদাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। আর তাঁদের দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে হৃদয় বলতে থাকে, "কেন এসেছে? কি জন্যে এসেছে? এখানে কি?" শ্যামাসুন্দরী একটি কথারও উত্তর দেননি। শুধু বললেন, "চল, ফিরে দেশে যাই, এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?"[১] হৃদয়ের ভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আগাগোড়া চুপ করে ছিলেন। সেদিনই তাঁদের ফিরে আসতে হল। এখানে মনে রাখার কথা—এই অপ্রীতিকর ঘটনায় সারদার মনে কিন্তু স্বামীর ওপর কোনওরূপ অভিমান হয়নি, হয়নি ভাগনে হৃদয়ের ওপরও কোনও অভিশাপ বর্ষিত। শুধু বিদায়কালে মনে মনে মা কালীকে বললেন—"মা যদি কোন দিন আনাও তো আসব।'

এর পরে আমরা সারদাকে দেখব, দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাগ্রহ আহ্বানে। শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে শ্রীমাকে বলে পাঠিয়েছিলেন, "তুমি অবশ্য আসবে—ডুলি কবে হোক, পালকি করে হোক; দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক—আমি দেব।"[২] দক্ষিণেশ্বরে তিনি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাতেই নয়, নিরতা থাকতেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভক্তসেবায়। সে এক বিস্ময়কর তপস্যা! আবার তারই মধ্যে নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর সাধনায় ডুবে আছেন। জানেও না অনেকে যে তিনি নহবতে বাস করছেন। দুহাত দূরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। তবু অনেক সময় দিনের পর দিন পরস্পরের দেখাসাক্ষাৎ নেই। নিজের মনকে বোঝাতেন, "মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি!"[৩] এতখানি আত্মবিলুপ্তি কি আমরা ধারণা করতে পারি?

ভাবী সঙ্ঘ গঠনের বিশেষ দায়িত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যস্ত করেছিলেন তাঁর লীলাসহায়িকা সারদার ওপর। এও এক অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত! শুধু নির্দেশ দিলেই কি তা সম্ভব হত? কারণ সেই যুগে সমাজে মেয়েদের অবস্থা ছিল অতি করুণ। শ্রীমার ওপর এই দায় অর্পণ শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে অভূতপূর্ব এক নারীজাগরণের ইঙ্গিত। যিনি ভবিষ্যতে হবেন শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্মসাধনের সহায়িকা, তাঁর মধ্যে ভাগবতী শক্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালীপূজার দিন ষোড়শী পূজার মাধ্যমে। শ্রীসারদাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করে দেবীর বোধন করলেন প্রার্থনামন্ত্রে : "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!"[৪] পূজান্তে তাঁর পদতলে জপমালাসহ নিজের সাধনার সব ফল অর্পণ করে প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করলেন : "হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।" সকলের অলক্ষ্যে, নীরবে সারদা দেবীকে দেবীজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণের এই পূজা অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা।

সারদা দেবীর সঙ্ঘজননীর ভূমিকার সূচনাও দক্ষিণেশ্বরে নহবতজীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ-

সন্তান নরেন, রাখাল, লাটু, বাবুরাম, শরৎ, শশী ইত্যাদিকে উপলক্ষ করে শ্রীমার অন্তরে এক অভূতপূর্ব মাতৃভাবের সঞ্চার দেখি। তাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই শ্রীরামকৃষ্ণের। সে দায়িত্ব শ্রীমা নিলেন। তাই তো চেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমার উপস্থিতি ভিন্ন তীব্র ত্যাগ ও বৈরাগ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের একত্র সমবেত হয়ে সাধন-ভজন ও অধ্যাত্মভাবপ্রচার কি সম্ভব হত? শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর চৌত্রিশ বছর শ্রীমা এই গুরুদায়িত্ব পালন করে সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দৃঢ়ভিত্তির ওপর। শ্রীসারদা দেবী এই নবযুগধর্মের মহানায়িকা।

সঙ্ঘজননী শ্রীমা ভালোবাসাকেই সঙ্ঘের প্রাণ বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন সঙ্ঘের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব যেন অটুট থাকে। মনান্তর যেন না ঘটে। তাই একবার একজন ব্রহ্মচারীকে শ্রীমা বলেন, "দেখ, সব বনিয়ে বানিয়ে চলতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স।' সব সয়ে যাও, তিনি আছেন।"[৫] তিনি আশ্রমজীবনের শত অসুবিধা সত্ত্বেও সকলকে আশ্রমেই থেকে ঠাকুরের কাজ করতে বলতেন।

শ্রীমার জীবনের বহু ঘটনা ও অনুপম বহু উপদেশ মনের মধ্যে ভিড় করছে। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি যা তাঁর চরিত্রকে করেছে মাধুর্যময়।

মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। কিন্তু একমাত্র মা-ই জানেন কার পেটে কী সয়। একদিন নবাসনের বৌদিদি শ্রীমাকে প্রশ্ন করলেন, "মা আপনার তো সব ছেলে সমান; যে বিয়ে করার মতামত চেয়েছে তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, আর যে সংসারত্যাগ করতে চায় তাকে সেইমতো ত্যাগের প্রশংসা করে উপদেশ দিচ্ছেন। আপনার তো উচিত যেটি ভাল সেই পথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া।" মা বললেন, "যার ভোগবাসনা প্রবল, আমি নিষেধ করলেই কি সে শুনবে? আর যে বহু সুকৃতিবলে এইসব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে তাঁকেই একমাত্র সার ভেবেছে, তাকে একটু সাহায্য করব না! সংসারে দুঃখের কি অন্ত আছে?"[৬]

আর একদিনের কথা। শ্রীমা বসে আছেন জয়রামবাটীতে বাড়ির দোরগোড়ায়। খানিকটা জমির দখল নিয়ে কালী ও বরদা শ্রীমার দুই ভাইতে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। কিছু সময় মা ওদের থামানোর চেষ্টা করলেন। তারপর বাড়ির মধ্যে এসে বসে হাসতে হাসতে বলছেন, "মহামায়ার কি মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে, এও পড়ে থাকবে! জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না।"[৭] শ্রীমার হাসি আর থামে না। মহামায়া স্বয়ং আপন মায়ার জাল জগতে বিস্তার করে আছেন। আবার সেই মায়াজালে বদ্ধ জীবের খেলা দেখে হাসছেন।

শ্রীমার চরিত্রে অসাধারণ বিনয় আমাদের চমৎকৃত করে। একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। শ্রীমা তখন পুরীতে। বলরামবাবুর গুরুপত্নীকে উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শন আবশ্যক। সেইজন্য তাঁদের পাণ্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারী শ্রীমাকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিবিকার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু মা তা শুনে বললেন, "না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি দীনহীন কাঙ্গালিনীর মতো তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথদর্শনে যাব।"[৮] স্বয়ং জগন্মাতার এই অকৃত্রিম বিনয় কি আমাদের অভিভূত করে না?

শ্রীমার জীবনই ছিল তাঁর বাণী। তাই দেখি তাঁকে অতি সহজ সরল ভাষায় উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সাধন-ভজনের নির্দেশ দিতে। বলছেন, "সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি।"[৯] জাতিধর্মনির্বিশেষে জগতের সকলের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে জগতের সকলকে

দেখাই তো অধ্যাত্মসাধনার শেষ কথা। আজকের এই আত্মকেন্দ্রিক জীবনে এই কথার মর্ম গ্রহণ করা সহজ নয়।

মা, আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ এমন কোনও প্রশ্ন তো নেই যার উত্তর তোমার কাছে পাইনি। যা শিখেছি—সবই তোমার কাছে।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নলিনীদিদের বলেছিলে—"আচ্ছা, তোরা বল দেখি কোন জিনিসটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়।" নলিনীদি বললেন—"কেন পিসীমা, জ্ঞান, ভক্তি, মানুষ যাতে সংসারে সুখে থাকে এইসব প্রার্থনা করতে হয়।" সঙ্গে সঙ্গে তুমি বললে—"এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেন না, বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ।"[১০] মা, তোমার মতো এমন উত্তর কে আর দিতে পারত? ওই এক প্রার্থনায় সব চাওয়ার অবসান কি ঘটল না?

আবার কী অনুপম ভাষাতেই না তুমি শেখালে প্রার্থনার আকুতি! তোমাকেই বলতে শুনেছি—"যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠত, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানেব কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম—চন্দ্রেতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।"[১১] মা চাইছেন মন যেন জ্যোৎস্নার মতো নির্মল হয়। আহা! তুমি ছাড়া এমন ব্যাকুল প্রার্থনা কে আর আমাদের শেখাত?

মা আরও বলতেন, "সন্তোষের সমান ধন নেই।" উপকরণবহুল জীবনে আজ সন্তোষেরই একান্ত অভাব। অথচ শ্রীমাকে দেখি—কি জয়রামবাটী-কামারপুকুরের গ্রামীণ পরিবেশে, দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, কি কলকাতার শহুরে আবেষ্টনীতে—সর্বত্রই তিনি সন্তোষের সচল প্রতিমা।

শ্রীমার আর একটি ঘোষণাও যুগান্তকারী। সমাজে, পরিবারে, ব্যক্তিজীবনে এত অশান্তি কেন?—এ প্রশ্ন আমাদের মনে অবিরাম জাগে। আত্মবোধে সদা প্রতিষ্ঠিতা শ্রীমার কথায় পাই ওই প্রশ্নেব অপূর্ব সমাধান, "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

আগামী কয়েক বছর ধরে শ্রীমার শুভ আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ পূর্তির মহোৎসব চলতে থাকবে কেবল ভারতব্যাপী নয়, বিশ্বব্যাপী। এখন সময় এসেছে ভালো করে জানার : শ্রীমার সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্কটি কী? শ্রীমাই কি কেবল চাইছেন সন্তানদের, না সন্তানেরও একান্ত প্রয়োজন মাকে? বিশ্বজুড়ে অগণিত সন্তান মায়ের। কিন্তু সন্তানদের তো আপদে-বিপদে, সুখে-সম্পদে একমাত্র আশ্রয় 'মা'। স্বামীজীও একদিন মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন, "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই!"[১২] আর সবার ওপরে রয়েছে মায়ের স্বমুখের স্বীকারোক্তি—"আমি পাতানো মা নই, সত্যিকারের মা—জন্মজন্মান্তরের মা।"

যুগের এই পুণ্যলগ্নে বিশ্ববাসীর প্রতি শ্রীমায়ের আশীর্বাণী আজ স্মরণ করি : "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।"[১৩] শ্রীমার এই অভয়বাণী অনুপ্রাণিত করুক আগামী প্রজন্মের সন্তানদের, আশ্বস্ত করুক সকলকে এই বিশ্বাসে—আপদে-বিপদে, হতাশায়-বিফলতায়—তাদের একজন মা আছেন।

হে বালে হে ত্রিপুরসুন্দরি

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

অধ্যাত্মসাধনায় যা কিছু উপলব্ধি বা প্রাপ্তির জন্য মানুষ সচেষ্ট হয়, তার সবই কিন্তু শক্তি-আশ্রিত। এই শক্তির সঙ্গে শক্তিমান—তাঁকে আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা ভগবান, যে নামেই নির্দেশ করি না কেন, ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোথাও এই শক্তিকে মায়ারূপে নির্দেশ করা হয়েছে, কোথাও বা প্রকৃতিরূপে, কোথাও বা সাক্ষাৎ শক্তিরূপেই। যে নামেই তাঁকে নির্দেশ করা হোক, মূলত তিনি ক্রিয়ারূপিণী, পরিণামপ্রদায়িনী, রূপান্তরসাধনী।

আমরা যে জগতে আছি তা প্রতিক্ষণে পরিণামিনী। অবিরাম এর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সে পরিণাম ঘটাচ্ছেন এই শক্তি। ছিলাম শিশু, হলাম কিশোর বা কিশোরী। তারও পরে যুবক বা যুবতী, শেষে প্রৌঢ়াদিক্রমে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। এইভাবে 'জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি'—এই ষড়ূর্মিচক্রে নিখিল সৃষ্টি আবর্তিত হয়ে চলেছে। কোথাও একে বলা হয় ষড়্ভাববিকার। 'ভাব' মানেই বস্তু যার অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ অভাব নেই এবং তার 'বিকার' মানে রূপান্তর, বিবিধ ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তন।

এই পরিবর্তন যিনি ঘটাচ্ছেন, তাঁরই নাম শক্তি। এই পরিবর্তন দ্বিমুখী হয়ে থাকে; ঊর্ধ্বমুখী এবং অধোমুখী, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় উন্নতি ও অবনতি বলে থাকি। উন্নতি আমরা সবাই চাই এবং সে উন্নতি সাধারণ সকলের কাছে জাগতিক উন্নতি অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থে-সামর্থ্যে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে। বিরল কেউ কেউ একে বাইরের উন্নতি মনে করেন এবং তাই অন্তরের উন্নতিতে মনোনিবেশ করেন। সে উন্নতি আত্মোন্নতি বলে চিহ্নিত হয়। যথার্থ মানুষ হওয়া বলেও বর্ণিত হয়। তার জন্যই অন্য সবকিছু ত্যাগ করে তাঁরা শুধু অধ্যাত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করে থাকেন এবং তাঁদের আমরা সাধু-সন্ন্যাসী, মহাত্মা, ত্যাগী বলে চিহ্নিত করি।

কিন্তু কী জাগতিক, কী পারমার্থিক, সবকিছু উন্নতিই নির্ভর করে শক্তির বিকাশের উপর। তাই পরমার্থ পথের পথিককেও শরণ নিতে হয় শক্তির, আরাধনা করতে হয় শক্তির, তা তিনি শৈবই হন, বৈষ্ণবই হন, গাণপত্যই হন বা সৌরই হন অর্থাৎ গণেশ, সূর্য, শিব বা বিষ্ণু যাঁকেই তিনি ইষ্ট মনে করে আরাধনা করুন। সর্বত্রই লক্ষ্য শক্তির উদ্বোধন বা জাগরণ আপন-আপন ইষ্টের আরাধনার মাধ্যমে।

সেইজন্যই সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, সমস্ত ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক উপাসনায় বা পূজার্চনায় কোথাও একলের উপাসনা বা পূজা করা হয় না, পূজা একমাত্র যুগলের অর্থাৎ শক্তিযুক্ত সেই সেই ইষ্টের এবং তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা জেনে বা না জেনে শক্তিকেই প্রথম ও প্রধান স্থান দিয়ে থাকি। যেমন রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম, গৌরী-শংকর ইত্যাদি নামের মধ্যে।

কোথাও সশক্তিক ছাড়া ইষ্টের আরাধনা হয় না। 'সাম্ব-সদাশিবায় নমঃ' বলে অম্বা বা মায়ের সঙ্গে যুক্ত করেই আমরা শিবের মাথায় জল ঢেলে থাকি।

আর যাঁরা শাক্ত অর্থাৎ একান্তভাবে শক্তিই যাঁদের ইষ্ট বা আরাধ্য, তাঁরা এই শক্তির অনন্ত বিভাব বা বৈভবের মধ্য দিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নিয়েই তাঁর আরাধনায় ব্রতী হন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে তাঁরই আরাধনায় আত্মনিয়োগ করে জগতকে চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এই শক্তির দুটি মৌল বিভাব : একটি বিদ্যা-মায়া, অপরটি অবিদ্যা-মায়া। আমাদের শাস্ত্রে সর্বত্র শক্তির এই দ্বিবিধ, পরস্পর বিপরীত রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে অথচ সে-সম্বন্ধে আমরা সচেতন ছিলাম না। ঠাকুর এসে সকলকে চিনিয়ে দিয়ে গেলেন, বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যেন চক্ষু উন্মীলন করে দিয়ে যে বাঁধতেও তিনি এবং ছাড়তেও তিনি। মুক্তি যদি চাও, তাঁর বিদ্যারূপের আরাধনায় নিমগ্ন হও কারণ তিনি ছাড়া এ ভব-বন্ধন ঘোচানোর সামর্থ্য বা শক্তি আর কারও নেই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাই বলা হয়েছে : 'সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী'। আবার 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'।

যেখানে তিনি মোচিকা, মুক্তিদায়িনী সেখানে দশ মহাবিদ্যারূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ, যার নামগুলিমাত্র আমাদের জানা বা পড়া, যেমন মুণ্ডমালাতন্ত্রে, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বা চামুণ্ডাতন্ত্রে প্রায় একইভাবে বিঘোষিত :

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা
বগলামুখী সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র ১/৬-৭)

আবার এই দশ মহাবিদ্যার মধ্যে ষোলোকলায় পূর্ণা ষোড়শী মূর্তিটি বিশেষভাবে আরাধিতা বা পূজিতা হয়েছেন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীরূপিণী সারদাকে তাই ষোড়শীরূপে পূজা করে শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে গিয়েছেন জগতের কাছে এবং মঠ-মিশনের সমৃদ্ধি, শিষ্যভক্তদের অধ্যাত্ম-সিদ্ধি—সবকিছুর মূলেই যে একমাত্র তিনি, এটি বিঘোষিত হয়েছে তাঁর এই ষোড়শী পূজার মাধ্যমে। এই ষোড়শীই তন্ত্রশাস্ত্রে পরিচিতা আর দুটি নামে : সুন্দরী এবং ত্রিপুরা। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনা অনুসারে তিনি, 'সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।'—অর্থাৎ জগতে অশেষ যত সৌন্দর্যময়ী সৌম্যমূর্তি আছে, তাদের সকলকে ছাপিয়ে বা অতিক্রম করে বিরাজমানা এই অতিসুন্দরী রূপটি তাঁর। দেববৃন্দ বিহ্বল হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর শক্রাদিকৃতস্তুতিতে আরও বলেছেন : 'কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ?'—কেমন করেই বা বর্ণনা করি তোমার এই অচিন্ত্যরূপ? এ যে—'ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারি-/ কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।'

শুধু অবাক হয়েছেন দেবতারা এই ভেবে যে মায়ের এই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির দিকে কি মহিষাসুর তাকিয়েছিল, দেখেছিল তাঁর এই কমনীয় আননের এক ঝলকও? তা হলে সে মারল কেমন করে, আঘাত করল কেমন করে—

'বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ' 'প্রহৃতম্?'—এ যে 'অত্যদ্ভুতম্', পরম আশ্চর্যের ব্যাপার, মা!

এই সুন্দরীই আবার তিনটি পুর বা আবাসস্থল আলো করে বিরাজমানা, তাই তিনি

ত্রিপুরা বা ত্রিপুরসুন্দরী।

"ত্রিপুরেতি সমাখ্যাতা কামদা সা মহেশ্বরী।
ত্রীণ্ যস্মাৎ পুরতো দদ্যাৎ দুর্গা সা পরমেশ্বরী ॥" (গন্ধর্বতন্ত্র ২.৮-১৩)

সব ছাপিয়ে তাঁর এই রূপ 'তুরীয়া' বা চতুর্থীরূপ। তিনরূপে তিনি তো তিনভুবন ব্যেপে বিরাজমানা, যার কথা ঐতরেয় উপনিষদে যেন অঙ্গুলিনির্দেশ করে চিনিয়ে দিয়েছেন :

'অয়মাবসথঃ, অয়মাবসথঃ, অয়মাবসথঃ।'

এই দেখ তাঁর একটি আবাসস্থল, এই আর একটি, এই আর একটি। আর সর্বাতিক্রান্ত রূপটি তাঁর তিনের ঊর্ধ্বে। তাই বলেছেন ওই গন্ধর্বতন্ত্রেই :

"আদৌ কামেশ্বরী জ্ঞেয়া, দ্বিতীয়া ভগমালিনী।
বজ্রেশ্বরী তৃতীয়া চতুর্থা ত্রিপুরসুন্দরী ॥"

স্বয়ং ঈশ্বর তাঁরই অনুকম্পায় লাভ করেছেন জগতের আধিপত্য। তাই তিনিও তাঁরই চিন্তায়, তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীপূজান্তে আত্মহারা হয়েছিলেন। ঈশ্বর তাই বলছেন নিজেই সবশেষে :

"ময়াপি চিন্ত্যতে সা তু তৎপ্রসাদাদহং প্রভুঃ।
জগতামীশ্বরত্বং চ লব্ধং তদনুকম্পয়া ॥"

সেইসঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, এ সবই তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছেন ওই তাঁরই অনুকম্পায় বা দয়ায়।

"ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মণা প্রাপ্তং বিষ্ণুত্বং বিষ্ণুনা তথা।
সুরাসুরমুনীন্দ্রাণাং মহত্ত্বং তৎপ্রসাদতঃ ॥"

স্বয়ং ব্রহ্মাও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে 'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা' বলে তাঁর স্তব করে সেই কথাই জানিয়ে গিয়েছেন একটি শ্লোকে : "বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ?"

—কে মা! তোমার স্তব করতে সমর্থ বা শক্তিমান হবে, কারণ বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা এবং ঈশান বা মহেশ্বর শিব, সকলকে তো তুমিই দেহধারণ, শরীরগ্রহণ করিয়েছ অর্থাৎ আমরা তো তোমারই সৃষ্টি।

এই সুন্দরীর, এই ত্রিপুরার সেবনে যাঁরা তৎপর, তাঁদের ভোগ এবং মোক্ষ, ভুক্তি এবং মুক্তি উভয়েই যুগপৎ করতলগত হয়ে থাকে। সাধারণত দেখা যায় এ দুটি পরস্পরবিরোধী, যেখানে ভোগ আছে অর্থাৎ যারা ভোগে ডুবে আছে, তাদের মোক্ষ বা মুক্তি নেই। আবার যারা মোক্ষাভিলাষী তাদের ভোগ জোটে না, তারা ভোগে বিমুখ তথা বঞ্চিত। কিন্তু শ্রীসুন্দরীর সেবকগণের ভোগ এবং মোক্ষ, উভয়ই একসঙ্গে করতলগত। তাই যথার্থই বলা হয়েছে :

"যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীসেবকতৎপরাণাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥"

এই সুন্দরী ত্রিপুরার আছে দুটি রূপ : একটি বালা ত্রিপুরা, অপরটি মহাত্রিপুরা। এই বালারূপেরই মহিমা আরও বেশি এই কারণে যে এটি তাঁর কৌমারী রূপ, অক্ষত-যৌবনা, আপনাতে আপনি পরিপূর্ণা, বিশুদ্ধা মূর্তি। সাধারণ দুর্গাপূজাদিতে যে কুমারীপূজা করা হয়

তা এই বালা ত্রিপুরারই পূজা এবং সেই কারণেই মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে এই 'ইচ্ছাশক্তি উমা কুমারী'র ধ্যানেই সাধক নিমগ্ন হন এবং সেইটিই আসল পূজা বলে দলে দলে, নর-নারী-নির্বিশেষে সব লোক ছোটেন বেলুড় মঠে কুমারী পূজা দেখতে। অথচ এই কুমারী বা বালাটি যে কে, কী তাঁর তত্ত্ব, তার অনুধাবন আমরা কেউই করি না।

স্বরূপে তাঁকে যাঁরা চেনেন বা জানেন, তাঁরা তাই আপন আপন আরাধ্যের প্রতি ভক্তি বা অনুরক্তির জন্য এই মায়েরই কাছে প্রার্থনা জানান। যেমন গোস্বামী তুলসীদাস, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত ভক্ত এবং 'রামচরিতমানস' রচনা করে তাঁর স্বরূপ ও জীবনকথা অমর করে রেখে গিয়েছেন, তিনিও তাঁর অনবদ্য একটি মাতৃবন্দনায় 'ভুক্তি-মুক্তি দায়িনী' জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে রচিত ভজনটিতে সবশেষে প্রার্থনা জানিয়েছেন এই মহাশক্তির চরণে :

"রঘুপতি-পদ পরম প্রেম, 'তুলসী' কহই অচল নেম,
দেহু হে প্রসন্ন পাহি প্রণত-পালিকা!"

—মা গো! আমার রঘুপতির চরণে অচলা ভক্তি এনে দাও, প্রসন্ন হয়ে। কারণ তুলসীদাস জানেন এই জননীই 'মহেশ-ভামিনী, অনেকরূপ নামিনী,' এবং 'সমস্ত লোক-পালিনী'। তিনি 'হিম-শৈল-বালিকা' মাত্র, ওই হিমালয়কন্যকা বালা ত্রিপুরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার নরেনকে ঠেলে দিয়েছেন মায়ের দিকে : যা চাইবার চেয়ে নে না মার কাছ থেকে, অভাব-অভিযোগ যা জানানোর বল্ না গিয়ে মাকে।

সুতরাং উপাসনা, অর্চনা, বন্দনা যদি কারও করতেই হয়, তাহলে এই পরা জননীরই উপাসনা করো, তার কারণ বলছেন 'মাতৃকাচক্রবিবেক' নামক একটি প্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থে :

"তস্মাৎ পরৈব জননী সমুপাসনীয়া
ব্যোম্নঃ পরস্য গতজাড্যমিদং হি রূপম্।
বধ্নাতি চেয়মিদমংশসমুচ্ছ্রয়েণ
জন্তূন্ বিমোচয়ত্যুন্নমিতাহমংসাৎ॥"

—এই পরা জননীই হলেন পরব্যোমস্বরূপিণী, সমস্ত জড়তা, তামসিকতা যাঁর থেকে বিগত, বিদূরিত, সেই একান্তরূপে চিন্ময়ী। তিনি একদিকে সকলকে বন্ধনে ফেলেন 'ইদং'রূপ অংশকে বাড়িয়ে তুলে, আবার জন্তু বা প্রাণীদের মোচন করেন, মুক্তি দেন 'অহং'রূপ অংশটিকে উন্নমিত করে, উর্ধ্বে তুলে ধরে। 'অহং'-'ইদং' নিয়ে এই তাঁর খেলা, নিত্যলীলা চলছে সারা সৃষ্টি জুড়ে।

উপনিষদের একমাত্র উদ্‌ঘোষণ প্রারম্ভেই তাই শুনিয়ে দিয়েছেন সবাইকে সজাগ করে : 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—এই জগতীতলে যা-কিছু চলমান, গতিমান, অস্থির তাকে ঢেকে ফেলো, আচ্ছাদন করো এই 'ইদন্তা'কে কেবলমাত্র ঈশরূপী 'অহন্তা' দিয়ে। বাইরে তোমার কোথাও তো কিছুই নেই, যা-কিছু আছে 'সর্বো মমায়ং বিভবঃ', এসবই তো আমারই বৈভব, আমারই ঐশ্বর্য।

মা সারদা এসেছিলেন এই জ্ঞান দিতে। কালপথে এসেছিলেন তিনি, যিনি স্বরূপত কালবিহীনা। আমরা কালে কালে ভুলে যাই বলে কখনও শতবার্ষিকীতে, সার্ধশতবর্ষে আবার তাঁর স্মৃতির উদ্বোধনে সচেষ্ট হই। কিন্তু 'নিবোধন', নিঃশেষে তাঁকে বোঝা কবে হবে আমাদের, যিনি নিত্যা ষোড়শিকা, বালা ত্রিপুরা? তাও একান্তভাবে তাঁরই কৃপাসাপেক্ষ।

যা দেবী সা সারদা

স্বামী চেতনানন্দ

যা (যিনি) দেবী ভগবতী, সা (তিনি) সারদা সরস্বতী। চণ্ডীতে দেবী বিভিন্ন নামে বর্ণিত হয়েছেন : যেমন দুর্গা, কালী, কৌশাম্বী, চামুণ্ডা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিবদূতী, শাকম্ভরী, অম্বিকা, কাত্যায়নী, গৌরী, জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, মহামায়া, মঙ্গলা, জয়ন্তী ইত্যাদি। দৈত্যরাজ শুম্ভ দেবী দুর্গাকে বলল : তুমি গর্ব কোরো না। তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তি আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ। তখন দেবী বললেন, 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—এ-জগতে একমাত্র আমিই বিরাজিতা। আমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? এ-সকল দেবী আমারই অভিন্না শক্তি। এই দেখো, এরা আমাতেই বিলীন হয়ে গেল।[১]

মা সারদার জীবনীগ্রন্থ সমূহ পড়লে আমরা দেখতে পাই তিনিও বিভিন্ন নামে বর্ণিত হয়েছেন : যেমন সরস্বতী, কালী, বগলা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, ত্রিপুরসুন্দরী, দুর্গা, ভগবতী, পর্বতবাসিনী, সীতা, রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া, উমা, মহামায়া, জগদম্বা, শিবানী, সতী ইত্যাদি। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী কেশবানন্দ বললেন, "মা, আপনাদের পরে ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাকে আর কেউ মানবে না।" শ্রীমা বললেন : "মানবে না কেন? তারা ত আমারই অংশ।"[২]

সারদা নামের রহস্য। সা—সামীপ্যে। স অর্থাৎ সাধনা, সহিষ্ণুতা, সেবা, সমদৃষ্টি, সদাচার, সরলতা; স অর্থে সবুজ বা তারুণ্য, সাদা বা শুচিতা। এসব দৈবী গুণাবলীর প্রতীক যিনি এবং যাঁর ধ্যানে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি হয়। র—রক্ষণে। কামক্রোধাদি ষড়রিপু, বিপদ আপদ, আধি-ব্যাধি, রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু থেকে যিনি রক্ষা করেন। দা—দানে। জ্ঞানভক্তিবিবেকবৈরাগ্য, ধর্ম-অর্থকামমোক্ষ, সুখসম্পদ, আনন্দ যিনি দান করেন। যিনি জীবের ভরণ, পোষণ ও রক্ষণ করেন তিনি সারদা।

বেদান্ত শাস্ত্রে তত্ত্ব নিরূপণের জন্য শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব এবং স্বসংবেদ্য ও পরসংবেদ্য প্রভৃতি নানা প্রণালী অবলম্বন করা হয়। তেমনি মা সারদার দেবীত্ব নির্ধারণের জন্য আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, মায়ের নিজমুখে স্বরূপ প্রকাশ এবং সন্ন্যাসী ও ভক্তদের দর্শন ও অনুভব সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

শ্রীমা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সময় শ্রীমা সম্বন্ধে নানা উক্তি করেছেন : "ও সারদা-সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" "ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী, ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।"

"ঐ যে মন্দিরে মা (ভবতারিণী) রয়েছেন, আর এই নহবতের মা (শ্রীমা)—অভেদ।" "ওরে, হৃদে একে (নিজ দেহ দেখাইয়া) তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনো এমন কথা বলিস নি। এর ভিতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস; কিন্তু ওর ভিতর যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।" "অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥"[৩]

ষোড়শী পূজাকালে ঠাকুর শ্রীমাকে অভিষিক্তা করে প্রার্থনা মন্ত্রে দেবীর বোধন করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে ষোড়শী পূজার পূর্বে কি মা সারদা দেবী ছিলেন না? তিনি দেবীই ছিলেন। পূজামণ্ডপে দুর্গা প্রতিমাকে আমরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পূজার দ্বারা জাগিয়ে তুলি, তেমনি ঠাকুর 'মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনা করে তাঁর দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ করলেন।' স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেন : "যাঁহাকে ঠাকুর অতঃপর স্বীয় লীলা সম্পূরণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাকে অন্তরের পূজা প্রদানপূর্বক নিজসকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও মহিমামণ্ডিত এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তিবিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। এইজন্যই ষোড়শী পূজার আয়োজন।"[৪]

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপকথন

"আমার মা শিওড়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময়... দেবালয়ের কাছে... একটা বায়ু যেন তাঁব উদরমধ্যে ঢোকায়, উদর ভয়ানক ভারি হয়ে উঠল।.. তখন মা দেখেন যে, লাল চেলি পবা একটি পাঁচ-ছ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম, মা!' তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে; তা থেকেই আমার জন্ম।"[৫] মায়ের জন্ম ও কর্ম দিব্য। শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে বলেছেন, 'জন্মকর্ম চ মে দিব্যম্।'

"অনেক সময় ভাবি যে, আমি তো সেই রাম মুখুজ্যের মেয়ে, আমার সমবয়সী আরও তো অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ হাকিম, কেউ উকিল। এরাই বা এমন আসে কেন?" একবার এক ভক্তমহিলা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?" মা বললেন : "সকলেই কি আর চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে, সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা। ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান। আমি আর কে, আমিও ভগবতী।"[৬]

একবার মায়ের শিষ্য স্বামী ঈশানানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আমরা বাড়িতে মা, মাসি, পিসি, বোন প্রভৃতি মেয়েদের জানি। তাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কি পার্থক্য?" তিনি শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "তুমি কোনও মানুষ দেখেছ যার কোনও বাসনা নেই? আমরা মাকে দেখেছি সম্পূর্ণ নির্বাসনা। জীবের বাসনা থাকে, ঈশ্বর বাসনাহীন। মা স্বয়ং ঈশ্বরী ছিলেন।"

উদ্বোধনে ঠাকুরপুজোর সময় পাগলিমামী কটুকথা বলছেন। মা পুজো সেরে তার

অভিসম্পাতের উত্তরে বললেন : "কত মুনি ঋষি তপস্যা করেও আমাকে পায় না; তোরা আমায় পেয়েও হারালি।" একদিন কাশীতে পাগলিমামী মাকে গালি দিয়ে বলছে : "ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক।" পরে মা ভক্তদের বলেন, "ছোট বৌ জানে না যে, আমি মৃত্যুঞ্জয়।" একদিন রাধুর অত্যাচারের প্রসঙ্গে বলেন, "এ শরীর দেবশরীর জেনো। ভগবান না হলে কি মানুষ এত সহ্য করতে পারে?"

সন্ন্যাসী ও ভক্তদের দর্শন ও অনুভব

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরূপে ভক্তদের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন—যেমন শিব, কালী, কৃষ্ণ, রাধা, সীতা, গোপাল, চৈতন্য, যিশু প্রভৃতি। শ্রীমা তেমনি জগদ্ধাত্রী, কালী, সরস্বতী, বগলা প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

স্বামী হরিপ্রেমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মা রাধুর চিকিৎসার জন্য বাঁকুড়ায় যান। সেখানে এক সন্ধ্যায় মায়ের পায়ে তেল মালিশ করতে করতে হরিপ্রেমানন্দের মনে হল এই জীর্ণশীর্ণ মা কি সত্যিই জগজ্জননী? তাঁর আত্মকথা : "পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম, এ তো একজন বৃদ্ধার শীর্ণ পা নয়, এক যুবতী নারীর সুপুষ্ট পা। কাছেই একটা হ্যাবিকেন জ্বলছে; তার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, আলতা-পরা অপরূপ দুটি চরণ, ঘন-সন্নিবিষ্ট পরিপুষ্ট অঙ্গুলিতে অর্ধচন্দ্রের মতো পদনখের শোভা। দুই চরণে সোনার নূপুব—নূপুরে খচিত মণি-মুক্তা।.. বিস্ময়ে... মায়ের মুখের ওপর... তাকিয়ে দেখি—স্বর্ণকান্তি, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, নানা অলংকার-শোভিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি! মাথায় মুকুট, হাতে অস্ত্র! তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপরূপ জ্যোতি! ভাল করে দেখবার আগেই 'মা' 'মা' বলে চৈতন্য হারালাম।"[৭]

চন্দ্রমোহন দত্ত একবার মায়ের সঙ্গে কোয়ালপাড়া হয়ে গরুর গাড়িতে বিষ্ণুপুরে যান। পথে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মা বিশ্রাম করছেন গাছের ছায়ায়। নিরিবিলি দেখে মাকে চন্দ্রমোহন দত্ত বললেন : "আপনার আসল রূপ দেখাই আমার শেষ বাসনা।" মা কিছুতেই রাজি হলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় মা গররাজি হয়ে অন্যান্যদের বললেন : "তোমরা একটু সরে যাও। ওর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।" চন্দ্রকে বললেন : "দেখ, শুধু তুমিই দেখবে। ওরা কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু আমার আসল রূপ দেখে ভয় পেয়ো না, আর যা দেখবে কাউকে বলবেও না যতদিন আমি বেঁচে থাকব।"[৮] এই কথা বলে মা তাঁর সামনেই নিজমূর্তি ধরলেন। জগদ্ধাত্রী মূর্তি!

তেলোভেলোর মাঠে মা ডাকাতের সম্মুখীন হন এবং মা তাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেন। মায়ের মৃদুতা ও ঐশী শক্তি ওই নিষ্ঠুর বাগদি ডাকাতের মনকে গলিয়ে দিল। পরবর্তী কালে মা কোনও কোনও ভক্তকে বলেছিলেন : "আমি তাদের (বাগ্‌দি-দম্পতিকে) ব'ল্লুম, 'তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো?' তারা উত্তর দিলে, 'তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখলুম।' আমি ব'ল্লুম, 'সে কি গো, সে কি গো, তোমরা এটা কি দেখলে?' তারা ব'ল্লে, 'না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম'; আমরা পাপী ব'লে তুমি রূপ গোপন ক'চ্চ।' "[৯]

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মা কামারপুকুরে এক বছর ছিলেন। ওই কালে বিকৃত-মস্তিষ্ক হরিশ একদিন মায়ের পিছু নেয়। মা ধানের গোলার চারদিকে সাতবার ঘুরে ক্লান্ত হয়ে

পড়লেন। তাঁর আত্মকথা : "তখন... নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙ্গুল লাল হয়ে গিছল।"[১০] শ্রীমা 'নিজ মূর্তি' শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন, এখন তা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। তবে জীবনীকারদের মতে তিনি বগলামূর্তিতে হরিশের কুপ্রবৃত্তিকে কঠোরহস্তে দমন করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষার জন্য যান। স্বামীজী তাঁকে দীক্ষা না দিয়ে বলেন, "ঠাকুর বললেন, আমি তোর গুরু নই। তিনি দেখিয়ে দিলেন, তোকে যিনি দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চাইতেও বড়।" সুরেন্দ্র সেন মর্মাহত হলেন। কিছুকাল পরে তিনি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে একটি উজ্জ্বল দেবীমূর্তি তাঁকে বলছেন, "একটি মন্ত্র নাও। আমি সরস্বতী।"[১১] সুরেন্দ্র সেন পরবর্তী কালে জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে দীক্ষা নেন। মার দেওয়া মন্ত্র শুনে তাঁর স্বপ্ন-দীক্ষার কথা মনে জেগে উঠল এবং বিস্ময়ে দেখলেন যে তার স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি ও মায়ের মূর্তি এক।

১৯১২ সালে শ্রীমা মঠে দুর্গাপূজা দেখতে যান। দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের গাড়ি মঠে পৌঁছাল। গোলাপ-মা মাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামালেন। নামবার পরেই সমস্ত দেখে মা বললেন, "সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গাঠাকরুন এলুম।"[১২] স্বামীজীর ভাষায় মা সত্যি ছিলেন 'জ্যান্ত দুর্গা'।

কোয়ালপাড়ার হরিপদ মাঝি তাঁদের কুলগুরুর কাছে দীক্ষা পান। শ্রীমা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। একদিন মা তাঁকে বললেন, "তোমার ইষ্টমন্ত্রটি উচ্চারণ করে শুনাও তো আমাকে।" হরিপদ অসঙ্কোচে মায়ের আদেশ পালন করা মাত্র—সম্মুখে দাঁড়ানো দেবী সারদাকে দর্শন করলেন অশেষ মহিমান্বিতা শ্রীদুর্গারূপে। ইষ্টসাক্ষাৎকার অমন আচম্বিতে হওয়ামাত্র তিনি মায়ের শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করেন।[১৩]

এখন চণ্ডীর আলোকে আমরা মা সারদার দেবী রূপ দেখার চেষ্টা করব। চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভকে (অহং ও মম-র প্রতীক) বধের জন্য দেবীর স্তুতি শুরু করলেন। গ্রন্থের ১৪ থেকে ৮০ মন্ত্রে দেবীর ২৩টি রূপ বর্ণিত হয়েছে। আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে 'যা দেবী সর্বভূতেষু... নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' শোনা যায়। প্রথম 'নমস্তস্যৈ' পদের দ্বারা মায়ের স্থূলরূপ, দ্বিতীয় পদের দ্বারা সূক্ষ্মরূপ, তৃতীয় পদের দ্বারা কারণরূপ এবং 'নমো নমঃ' পদের দ্বারা মায়ের কারণাতীত তুরীয় প্রকৃতিকে প্রণাম করা হয়েছে। এতবার প্রণামের উদ্দেশ্য কী? শাস্ত্র বলেন অহংকারই মূল অসুর। এই অসুর মারার একমাত্র অস্ত্র আছে 'নমঃ', অর্থাৎ 'ন মম'—আমার নয়। মা, সব তোমার। এইভাবে অহংবোধ নস্যাৎ করলে মা আবির্ভূত হন। এই প্রণাম মন্ত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দেবগণের সম্মুখে নিজরূপে প্রকটিত হলেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা

বিষ্ণুমায়া—ভগবতী দুর্গা। ইনিই যোগমায়া, মহামায়া। এই মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতির ভেদে বিষ্ণুমায়া ত্রিবিধা। বেদান্তমতে ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াধীন। ঈশ্বর মায়া নিয়ে লীলা করেন কিন্তু মায়া তাঁকে অভিভূত করতে পারে না। যেমন সাপের বিষ সাপের ক্ষতি করতে পারে না।

মা সারদা ছিলেন চণ্ডীতে বর্ণিত বিষ্ণুমায়া। তিনি নিজে মায়া স্বীকার করে এ-জগতে লীলা করে গেছেন। মায়ের ভাইঝি রাধুর বাপ মারা যায়, মা ছিল পাগলি। ওই ছোটো শিশু রাধুকে দেখিয়ে ঠাকুর শ্রীমাকে দর্শন দিয়ে বলেন, "একে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।" একবার স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ মাকে বলেন, "মা আপনার কেন এত আসক্তি? রাতদিন 'রাধী, রাধী' করছেন, ঘোর সংসারীর মত।" মা : "তুমি এরকম কোথায় পাবে? আমার মত একটি বের কর দেখি? কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মত মনে হয়।"[১৪]

কেউ প্রশ্ন করেছিল, "মা, আপনার স্বরূপ কি মনে পড়ে না?" মা : "হ্যাঁ, এক একবার মনে পড়ে; তখন ভাবি, এ কি করছি! এ কি করছি! আবার এইসব বাড়ি-ঘর ছেলেপিলে (সামনের সব দেখাইয়া) মনে আসে ও ভুলে যাই।... তবে কাজকর্মের ভেতর যখনই ইচ্ছা হয় সামান্য চিন্তাতে দপ করে উদ্দীপনা হয়ে মহামায়ার খেলা সব বুঝতে পারা যায়।"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মতো আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন।" মাকুর শিশুপুত্র ন্যাড়ার মৃত্যুতে মাকে কাঁদতে দেখে নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রশ্ন করেন, "মা, আপনি আবার ন্যাড়ার মৃত্যুতে সাধারণ মানুষের মতো এরকম কাঁদলেন কেন?" মা : "আমি সংসারে আছি—সংসারবৃক্ষের ফলভোগ করতে হবে। তাই আমার কান্না।"[১৬]

অন্য একদিন রাধুর প্রতি মায়ের আসক্তি দেখে এক মহিলা বলেন, "মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।" মা উত্তর দিলেন : "কি করব, মা, নিজেই মায়া।"[১৭]

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে

চেতনা—অন্তঃকরণবৃত্তি, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি। চেতনা স্থূলে নামরূপ আকারে পরিব্যক্ত; সূক্ষ্মে প্রাণশক্তিরূপে এবং কারণে অব্যক্ত বীজরূপে অবস্থিত মা চৈতন্যরূপিণী।

'সারদে জ্ঞানদায়িকে।' শ্রীমা ছিলেন প্রজ্ঞা ও বিদ্যারূপিণী এবং জ্ঞানদায়িনী। তিনি বহু নরনারীকে দীক্ষা ও উপদেশের দ্বারা তাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে জাগিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্র বলেন, 'জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ' (জ্ঞানেই মুক্তি)। মা বলেছেন : "বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্মমৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।... নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি (তত্ত্বজ্ঞান) হয়।"[১৮]

মা অন্তরঙ্গদের আশীর্বাদ করতেন, "জ্ঞান চৈতন্য হোক।" কোনও সন্তানদের বক্ষঃস্থল ও মস্তকে জপ করে দিতেন; দু একস্থলে পৃষ্ঠদেশে হাত বুলিয়ে 'কুণ্ডলিনী জাগুক' বলে আশীর্বাদ করতেন।[১৯]

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা

বুদ্ধি—মতি, প্রজ্ঞা, বিবেকশক্তি, বিচারশক্তি, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি। দেবী "বুদ্ধিরূপিণী। ব্যষ্টি বুদ্ধিরূপে প্রতিজীবে, সমষ্টি বুদ্ধিরূপে মহত্তত্ত্বরূপে ও বুদ্ধির বীজরূপে

অব্যক্তক্ষেত্রে অবস্থিত।"[২০]

শ্রীমা আমাদের মতো স্কুলে লেখাপড়া শেখেননি। মা সরস্বতীর পক্ষে স্কুলে কলেজে পড়া শোভা পায় না। তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। পাণিহাটির উৎসবে মা ঠাকুরের সঙ্গে না যাওয়ায় ঠাকুর পরে মন্তব্য করেন : "ও সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে। ওকে সঙ্গে দেখিলে লোক বলিত 'হংসহংসী এসেছে।' ও খুব বুদ্ধিমতী।" শ্রীমায়ের বুদ্ধির প্রশংসা করে ঠাকুর বলেন : "মাড়োয়ারী ভক্ত যখন দশহাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল। মাকে বলিলাম, 'মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি।' সেই সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলায় তোমার নামে দিতে চাহিতেছে। তুমি উহা লও না কেন—কি বল?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে। টাকা লওয়া হইবে না। আমি লইলে ওই টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, আমি উহা রাখিলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না। সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য—অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি।"[২১]

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা

নিদ্রা—দেবী নিদ্রারূপিণী। যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার ও অন্তঃকরণবৃত্তি সম্যক নিরুদ্ধ থাকে, তখন জ্ঞানময়ী দেবী সর্বভাবের নিরোধ বিষয়ক বোধরূপে প্রকাশিত হন। এটি দেবীর নিদ্রামূর্তি। নিদ্রা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। দেবী তাঁর সন্তানদের সুষুপ্তিতে রেখে ইন্দ্রিয়ব্যাপার-জনিত কর্ম-ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম দেন। এই নিদ্রারূপিণী দেবীর কৃপায় মানুষ রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে সাময়িক শান্তি পায়। চণ্ডীতে আছে—এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা (তমঃপ্রধানা শক্তি)। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ লাটু মহারাজকে ঢুলতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে লেটো, বলতে পারিস ভগবান ঘুমোয় কিনা?" "হামনে জানে না।" ঠাকুর বললেন, "ওরে, সবাই ঘুমোতে পারে, জীবজগতে সকলেই ঘুমের অধীন, কিন্তু ভগবানের ঘুমোবার যো নেই। তিনি ঘুমোলে সব অন্ধকার—জগতে মহাপ্রলয় ঘটে যায়। তিনি সারারাত সারাদিন জেগে জেগে জীবজন্তুর সেবা করছেন, তাই নির্ভয়ে জীবজন্তু ঘুমোতে পারছে।"[২২]

এবার মহামায়া সারদা বিনিদ্র থেকে সেবা করেছেন ঠাকুর এবং সন্তানদের। তিনি সত্ত্বগুণের প্রতিমা। তাই ওই তমঃপ্রধানা নিদ্রাশক্তি তাঁরই বৈভব হলেও কোথাও তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা

ক্ষুধা—ভোজনেচ্ছা। "আমাদের স্থূল শরীরের রস-রক্তাদি ধাতুর অপচয়ের জন্য যে অবসাদ উপস্থিত হয়, ওই অবসাদ দূর করিবার জন্য আহার গ্রহণের যে আবশ্যকতা বোধ হয়, ইহাই দেবীর ক্ষুধামূর্তি। কেবল স্থূল শরীরে—অন্নময় কোষেই যে এই বুভুক্ষামূর্তির

প্রকাশ হয়, তাহা নহে; প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষেও এই ক্ষুধামূর্তির অভিব্যক্তি হয়। প্রাণময় কোষের আহার জীবনী শক্তি, মনোময়ের চিন্তা, বিজ্ঞানময়ের জ্ঞান, আনন্দময়ের আহার প্রীতি হয়।"[২৩] দেবীর ক্ষুধামূর্তির শরণ নিলে জীবের ভবক্ষুধা দূর হয়।

ক্ষুধারূপে দেবী জীবের অন্তরে বাস করছেন। তাই এবার মা সব সময় তাঁর সন্তানদের খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। নিজে খাবার জোগাড় করছেন, রান্না করছেন, সাধুভক্তদের নিজ হাতে পরিবেশন করছেন এবং বলছেন, "বাবা, খাও; মা, খাও।" স্বামী বিরজানন্দ লিখেছেন : "নানা ব্যঞ্জনাদি নিজ হাতে দুবেলা রাঁধিতে ব্যস্ত থাকিতেন ও বসিয়া খাওয়াইতেন, খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া পাতে দেওয়াইতেন। অমন অমৃতের মতো রান্না জীবনে কখনওই খাই নাই।"

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা

ছায়া শব্দের এক অর্থ জীব। বিম্ব হল ব্রহ্ম; এই বিম্ব যখন অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হন তখন বলা হয় জীব। জীব ব্রহ্মের ছায়া। পরমার্থত জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এক। কঠ উপনিষদে আছে, 'ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।' শংকর এই ছায়াকে জীবাত্মারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ছায়ার তিনটি অবস্থা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল দেহে যে ছায়া বা চিৎপ্রতিবিম্ব, তা ছায়ার স্থূলমূর্তি, সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মমূর্তি এবং কারণ দেহে কারণমূর্তি।

মা সারদা নিজমুখে বলেছেন যে তিনি প্রতিজীবে বিরাজিতা। মা একদিন কথাপ্রসঙ্গে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে বলেন : "দেখ, পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে খুব লাফালাফি করে খেলা করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্বাবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই বুঝতে পারলে না।"[২৪] আর একদিন ছবিতে ঠাকুর আছেন কিনা কেউ প্রশ্ন করায়, মা বলেন, "ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁর ছায়া।"[২৫]

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। শিব ও শক্তি একই সঙ্গে বর্তমান থাকে। শিব ছাড়া শক্তি অচল, আবার শক্তি ছাড়া শিব নিষ্ক্রিয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্'—প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার আত্মভূত, অভিন্নরূপে অধ্যস্ত ও অস্বতন্ত্র এই শক্তি। এই শক্তি জীবশরীরে তিনভাবে বিকশিত হয় : স্থূলদেহে ও ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়াশক্তিরূপে, মনে ইচ্ছাশক্তিরূপে এবং বুদ্ধিতে জ্ঞানশক্তিরূপে।

শ্রীমা নিজমুখে বলেছেন : "আমি সেই চির পুরাতন আদ্যাশক্তি জগন্মাতা, জগৎকে কৃপা করিতে আবির্ভূতা হইয়াছি। যুগে যুগে আসিয়াছি, আবার আসিব।"[২৬]

কাশীতে লক্ষ্মীনিকেতনে উপরের বারান্দা থেকে গোলাপ-মা বললেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।"[২৭]

একবার এক ভক্ত আতঙ্কে বলে উঠে, "মা, আমি রসাতলে গেলুম!" মা অমনি

সন্তানকে অভয়বাণী শুনালেন : "কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।"[২৮]

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা

তৃষ্ণা জীবের জল-পিপাসা বা বিষয়বাসনা। জলের আর এক নাম প্রাণ। জলপানে প্রাণ শীতল হয়। শাস্ত্রে আছে—আপোময়ো প্রাণঃ। মা কেবল জলপানেচ্ছারূপিণী তৃষ্ণা নন, তিনি জীবহৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনারূপে বিরাজিতা। বাসনাহীন হয়ে মানুষ চলতে পারে না। বাসনা দ্বিবিধ—শুভ ও অশুভ। অশুভ বাসনা দিয়ে মা জীবকে সংসারে বাঁধেন আবার শুভ বাসনা দিয়ে মুক্ত করেন।

শ্রীশ্রীমার জীবনীকার লিখেছেন : "বালবিধবা শবাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখিয়া শ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি, তুই জল খা।' সুরবালা দেবী পতিবিয়োগের পর অবশিষ্ট জীবন হবিষ্য করিয়া কাটাইবার প্রস্তাব করিলে মা বলিয়াছিলেন, 'আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়; সে কাঁদে, "আমাকে দিলে না" বলে।' "[২৯]

মা সারদা অধিকারী ভেদে উপদেশ দিতেন। কাউকে বলতেন, 'নির্বাসনা' প্রার্থনা করো। সংসার-বাসনা ত্যাগে সংকল্পবান যুবকদের বলতেন, "সংসারীদের কত কষ্ট। তোমরা হাঁফ ছেড়ে ঘুমিয়ে বাঁচবে।" আবার কেউ যদি বলত, "মা, আমি বে করব না।" অন্তর্যামী শ্রীমা হেসে বলতেন, "সে কি গো? সংসারের সবই দুটি দুটি। এই দেখ না চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি—তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি।"[৩০]

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা

ক্ষান্তি—ক্ষমা, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা। সামর্থ্য সত্ত্বেও অপকারীর প্রতি অপকারের অনিচ্ছা। দেবী জগজ্জননী। তিনি মূর্তিমতী ক্ষমা। এই ক্ষমাময়ী মূর্তিতে তিনি জীবজগতকে অনাদিকাল থেকে বুকে ধারণ করে আছেন। মায়ের এই মূর্তির প্রকাশ হলে জীব যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারে।

মায়ের অসাধারণ ক্ষমাগুণের কথা মনে করে বলরাম বসু বলতেন : "ক্ষমারূপা তপস্বিনী।" সারদানন্দ বলেছিলেন : "আমাদের তো দেখছ—পান থেকে চুন খসলে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভাইয়েরা কি কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন—ধীরস্থির।"[৩১]

একদিন রাধু রেগে চুবড়ি থেকে একটা বড়ো বেগুন মায়ের পিঠে সজোরে ছুঁড়ে মারল। দুম করে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় মায়ের পিঠ বেঁকে গেল এবং স্থানটি লাল হয়ে ফুলে উঠল। মা ঠাকুরের দিকে চেয়ে জোড়হাতে বললেন, "ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না—ও অবোধ।" তারপর রাধুকে বললেন, "তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস। তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায়? আমি যদি রুষ্ট হই, ত্রিভুবনে তোর আশ্রয় নেই।"[৩২]

মা বলতেন : "পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ থাকা চাই। পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত উৎপাত, কত উপদ্রব হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী কিন্তু সব একভাবে সহ্য করে যাচ্ছে। এইরকম সহ্যগুণ মানুষেরও হওয়া চাই।"[৩৩]

যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা

জাতি—জন্ম, উৎপত্তি, ব্রহ্মসত্তা; গোত্ব-মনুষ্যত্বাদি। দেবী নিত্য হয়েও বহু পদার্থে সমবেত, এটি তাঁর জাতিমূর্তি। যতদিন জীবজগৎ আছে জাতিভেদ থাকবে, তবে দেশ-কাল-অবস্থা ভেদে জাতিভেদের রূপান্তর হয় মাত্র।

শ্রীমাকে একদিন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে দেখে নলিনী বলেন, "মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে।" মা উত্তরে বললেন, "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?" যিনি সকলকে আপনার সন্তানরূপে দেখেন, তাঁর কাছে জাগতিক ভেদ থাকে না।[৩৪]

দুর্গাপূজার সময় মা ঈশানানন্দকে আত্মীয়দের জন্য কাপড় কিনতে বলায় তিনি বলেন, "ও সব বিলিতি হবে, ও আবার কি আনবো?" মা হেসে বললেন, "বাবা, তারাও (বিলাতের লোকেরাও) তো আমার ছেলে। আমাকে সকলকে নিয়ে ঘর করতে হবে।"[৩৫]

একবার মা আমজাদ নামে এক মুসলমানকে নিজের বারান্দায় খেতে দেন এবং নলিনী উঠান থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাবার পরিবেশন করেন। তা দেখে মা বলেন : "অমনি করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস, আমি দিচ্ছি।" খাওয়ার পর আমজাদের এঁটো পাতা তোলা হলে, মা স্থানটি পরিষ্কার করেন। তাতে নলিনী বলে ওঠে, "ও পিসীমা, তোমার জাত গেল।" মা ধমক দিয়ে বললেন, "আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"[৩৬]

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা

লজ্জা—ব্রীড়া, নম্রতা। দেবী জীবহৃদয়ে লজ্জামূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন বলে সন্তানগণ অনেক সময় নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠানে বিরত হয়। জীবহৃদয়ে এই লজ্জামূর্তিটির অভিব্যক্তি না থাকলে জগৎটা পশুরাজ্যে পরিণত হত। দেবী ক্ষমামূর্তিতে জীবকে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দিয়েছেন আবার লজ্জামূর্তিতে উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত করতে বলেছেন।

মা সারদা ছিলেন অবগুণ্ঠনবতী, অত্যন্ত লজ্জাশীলা। লজ্জার আবরণ ঘোমটা দিয়ে তিনি অধিকাংশ সময় নিজেকে ঢেকে রাখতেন। মা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন : "লক্ষ্মী ঠাকুরের কাছে কীর্তনীয়াদের অনুকরণ করে গাইতে গাইতে নেচে অঙ্গভঙ্গি করে দেখাত। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'ওর ওইভাব। তুমি যেন ওর লয়ে লয় দিয়ে লজ্জা ভেঙ্গো না।' "[৩৭]

একবার জয়রামবাটীতে রাধু, মাকু, নলিনী প্রভৃতি নানা কথাবার্তায় হৈ চৈ করছে, লজ্জাসরমের বালাই নেই। মা তাদের বললেন, "ও কি হচ্ছে তোদের? তোদের একটু লজ্জা-সমীহ নেই। মেয়েদের ওসব বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মেয়েমানুষকে কত সাবধানে চলাফেরা করতে হয়, সম্ভ্রম রেখে চলতে হয়।" তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, "কেন পিসিমা, ঠাকুর তো বলেছেন—"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।" শ্রীমা অমনি

১৩০৫ সাল বিশ্বহিতে ধ্যানমগ্না মা মিসেস বুলের ব্যবস্থানুসারে

বললেন, "না, না। সে যাঁরা ভগবৎপ্রেমে পাগল, তাঁদের কথা। আমি বলছি—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে হয়। যার আছে ভয়, তার হয় জয়—বিশেষ করে মেয়েমানুষের।"[৩৮] লজ্জা নারীর ভূষণ। লজ্জা নারীর সতীত্ব রক্ষা করে। ঘৃণা—মানুষকে ঘৃণা নয়। নোংরামি, অপকর্মকে ঘৃণা। ভয় সাপকে, বাঘকে বা মরণকে নয়। মর্যাদাহানির ভয়, লোকাপবাদের ভয়, লোকলজ্জার ভয়। এই তিনটির দ্বারা নারী তার জীবনকে সুরক্ষিত করতে পারে।

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা

শান্তি—শম, উপশম, নিবৃত্তি, সর্বদুঃখোপরম, কামক্রোধাদি প্রধ্বংস, দুর্দৈবপ্রশমন, মোক্ষ, কৈবল্য, নির্বাণ। বিষয়ভোগে জীবের কদাপি শান্তি হয় না। কেবল তাদের ভোগেচ্ছা বেড়ে চলে। শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে শান্তি পায়, তেমনি জীব মাতৃলাভে প্রকৃত শান্তির অধিকারী হয়। শান্তি বাইরে নেই, তা অন্তরের মণিকোঠায়।

শান্তিরূপিণী মা সারদার আত্মকথা : "রাত তিনটার সময় উঠে আমার ঐ দিকের (উত্তরের) বারান্দায় বসে জপ করুক না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে। তা তো করবে না, কেবল অশান্তি, অশান্তি—কিসের অশান্তি তোর! আমি তো মা অশান্তি কেমন জানতুম না।"[৩৯]

মা একদিন শ্রীম-র স্ত্রী শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীকে বলেন : "এই সংসারে সুখদুঃখ ভালমন্দ আছেই; যার যখন সময়, ঠিক আসে, ভোগও করিয়ে নেয়। মনে জোব করতে হয়, আর ঈশ্বরে মন রাখতে হয়। কেবল এমন অশান্তি অশান্তি বলতে নেই।"[৪০]

এ-জগতে আনন্দ ও শান্তি বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে মা সারদা সকল জীবের প্রতি তাঁর শেষ বাণী দিয়ে গেলেন : "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পব নয়, মা, জগৎ তোমার।"[৪১]

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা

শ্রদ্ধা—বিশ্বাস, প্রত্যয়, আস্তিক্যবুদ্ধি। গীতায় আছে—"শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"—পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেরূপ হয়ে থাকে। "শ্রঃ সত্যম্ ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা"—যে প্রত্যয় সতত সত্যকে ধারণ করে রাখে, তাই শ্রদ্ধা। গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।"

মা সারদা ছিলেন শ্রদ্ধার মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন কীভাবে শ্রদ্ধা করতে হয়। একদিন একজন ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটি ছুঁড়ে একদিকে ফেলে রাখল। তা দেখে মা বললেন : "ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে। তা ছাড়া, এ সংসারের ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।"[৪২] মায়ের এ উপদেশ অনবদ্য।

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।

কান্তি—শোভা, সৌন্দর্য, দ্যুতি, দীপ্তি, প্রভা। চণ্ডীতে আছে দেবী 'সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।' দেবী দেবগণের প্রতি সৌম্যা ও দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা; এবং তিনি সকল সুন্দর বস্তুর থেকেও সুন্দরী। (১।৮১) গীতায় আছে : "যাহা যাহা ঐশ্বর্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও বলশালী, সেই সেই পদার্থই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে।" (১০।৪১) দেবী সর্ববস্তুতে সর্বজীবে কান্তিরূপে উদ্ভাসিতা। জীব যতই কুৎসিৎ বা কদাকার হোক না কেন, প্রত্যেকের মধ্যে কান্তির বিকাশ অল্পবিস্তর থাকে। পুষ্পে, পদ্মে, চন্দ্রে, শিশুতে, কামিনীর কমনীয় মুখমণ্ডলে, এমনকি বৃক্ষ, লতা, পর্বত, নদনদী ও গ্রহনক্ষত্র পর্যন্ত সর্বত্রই এই কান্তিমূর্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীমায়ের শিষ্য স্বামী সারদেশানন্দ মা সারদার কান্তি বর্ণনা করেছেন · "মায়ের হস্ততল রক্তাভ ছিল, অনেকেই দেখবার সুযোগ পাইয়াছেন। পদতলও ছিল লাল—ঠিক স্থলপদ্মের আভা, সুস্থ অবস্থায় তাঁহার কৃপায় কাহারো কাহারো ভাগ্যে দর্শন মিলিয়াছে। মস্তকের সুদীর্ঘ ঘন কেশরাশি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ যেন সূক্ষ্ম রেশমসূত্র, অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কুটিল বক্র। সুগঠিত মুখমণ্ডলে দীর্ঘ নাসা সত্যই তিল ফুলের মতো, ডগার দিকে। প্রশান্ত স্থির কৃপাদৃষ্টি, যাহা সকলেরই অন্তরে সর্বদা করুণা বর্ষণ করিত। প্রশস্ত উজ্জ্বল কপাল, প্রসন্ন বদনমণ্ডল—দেখিলেই চিত্ত শান্ত হইত। শ্যাম-গৌর রঙ প্রথমে ছিল উজ্জ্বল, শেষ বয়সে ম্লান হইয়াছিল। দীর্ঘাবয়ব, হস্তপদ্মযুগলও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, একটু বাঁ দিকে কাৎ হইয়া চলিতেন ধীরে ধীবে। পরে হাঁটুতে বাত ধরে।"[৪৩]

একবার কাশীতে এক মহিলা গোলাপ-মাকে শ্রীমা ভেবে প্রণাম করেন। গোলাপ-মা শ্রীমাকে দেখিয়ে বলেন, "উনিই মা-ঠাকরুন।" শ্রীমাও তখন রঙ্গ করে হেসে বললেন, "না, না, ঐ উনিই মা-ঠাকরুন।" মহিলাটি হতভম্ব হয়ে গোলাপ-মার দিকে চাইলে, তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন : "তোমার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই! দেখছ না—মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?"[৪৪] বাস্তবিকই মায়ের সরল প্রসন্ন দৃষ্টিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা স্বতই আপন অসাধারণত্ব জ্ঞাপন করত।

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা

লক্ষ্মী—শ্রী, সম্পত্তি, সম্পদ, বিত্ত, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য, শোভা, প্রাণ। জীবদেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণই সে লক্ষ্মী ও শ্রীযুক্ত থাকে। দেবী প্রাণরূপিণী লক্ষ্মী।

ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় জনৈক ভক্তমহিলার মন্তব্যে মা গায়ের সব অলংকার খুললে গৌরী-মা বলেন, "তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী; তোমার কি এমন বেশ ধরতে আছে?" আবার ঠাকুরের শরীর গেলে লোকাপবাদ থেকে বাঁচবার জন্য মা গয়না খুলতে চেষ্টা করলে, গৌরী-মা বলেন : "ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সধবার বেশ ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।"[৪৫]

জয়রামবাটীতে মাকে সাধারণ নারীর মতো রুটি বেলতে দেখে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, "এসব মায়া নাকি?" মা উত্তর দিলেন : "মায়া বই কি! মায়া না হলে আমার এ

দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।"[৪৬]

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা

বৃত্তি—স্থিতি, বিদ্যমানতা, ব্যাপার, ক্রিয়া, ব্যবহার, আচরণ, মনোভাব, জীবিকা, ব্যবসা, পেশা। সাধারণত বৃত্তি শব্দের অর্থ জীবিকা অথবা চিত্তবৃত্তি।

শ্রীমা মেয়েদের শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষায় উৎসাহ দিতেন। এক স্ত্রীভক্তের অবিবাহিত পাঁচটি কন্যার জন্য দুশ্চিন্তার কথা শুনে শ্রীমা বলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।" সূচীকর্মাদি শিল্পকার্য তিনি নিজে জানতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ নিজেই করতেন। অপর কেউ পশমের দ্বারা কার্পেটের আসন, দেবতার প্রতিকৃতি, মন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত করে আনলে শতমুখে প্রশংসা কবতেন।[৪৭]

একবার জনৈক ভক্ত চাকরির ক্ষেত্রে কখনও কখনও মিথ্যা বলতে হয়, সেজন্য তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে চান—এই মর্মে মাকে চিঠি লেখেন এবং এ ও জানান যে তাঁর ভরণপোষণের আর কোনও উপায় নেই। এই অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মায়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন। মা একটু ভেবে সেবককে বললেন, "তাকে লিখে দাও চাকরী না ছাড়তে।" সেবক লিখতে ইতস্তত করায়, মা বললেন : "আজ একটু সামান্য মিথ্যা কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু চাকরী ছেড়ে অভাবে পড়লে তখন চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে ভয় পাবে না।"[৪৮] সেবক মায়ের দূরদৃষ্টি ও সন্তানকে রক্ষা করার আগ্রহ দেখে বিস্মিত হল।

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা

স্মৃতি—স্মরণ, চিন্তা, স্মরণশক্তি, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান। প্রথমে বৃত্তিরূপে যে ভাবটি মনে প্রকাশিত হয় পরে তা সংস্কাররূপে চিত্তে আহিত হয়। এই আহিত ভাবটি যখন পুনরায় চিত্তক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তখনই তা স্মৃতি নামে আভাসিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"আহারশুদ্ধি হলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়, স্মৃতি লাভ হলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়।" চণ্ডীতেও আছে, 'মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা'—দেবী, লোকে যাঁর কৃপায় সর্বশাস্ত্রের মর্ম অবগত হয় সেই মেধারূপিণী সরস্বতী আপনি।[৪৯]

শ্রীমা শিষ্য ও ভক্তদের মনে সর্বদা ভগবৎস্মৃতি জাগিয়ে রাখতেন। পরবর্তী কালে মায়ের স্মৃতি অগণিত সাধুভক্তদের মনে দৃঢ়ভাবে স্থান পেয়েছে এবং তা প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' (দুখণ্ড), 'মাতৃদর্শন', 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' (তিন খণ্ড), 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা', 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী', 'মাতৃসান্নিধ্যে', 'জননী শ্রীসারদা দেবী' প্রভৃতি গ্রন্থে। লীলাপ্রসঙ্গ রচনাকালে স্বামী সারদানন্দ মায়ের অনেক স্মৃতি ব্যবহার করেছেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা

দয়া—পরদুঃখহরণেচ্ছা, পরদুঃখসহন, অনুকম্পা, কৃপা, করুণা। জীবের দুঃখ দেখলে, সেই দুঃখ দূর করার যে ইচ্ছা জাগে, তা দেবীর দয়ামূর্তি। প্রত্যেক জীবহৃদয়েই অল্পাধিক

পরিমাণে দেবীর এই দয়ামূর্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

একদিন পাগলিমামী একটি ছেলেকে খাওয়ানোর জন্য গ্লাসে করে জল আনলে বিড়াল এসে তাতে মুখ দেয়। তিনি বিড়ালকে তাড়া করলে মা বলেন : "পিপাসার সময় বাধা দিতে নেই। আর ও জলে তো মুখ দিয়ে ফেলেছে।" পাগলিমামী রেগে বললেন, "তোমায় আর বিড়ালকে অত দয়া দেখাতে হবে না। মানুষকে দয়া কর না।" মা গম্ভীব হয়ে বললেন : "আমার দয়া যার উপরে নেই সে নেহাত হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার উপর নেই তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।"

তিনি বলতেন : "দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি শরীবটা তো যাবেই. তবু এদের হোক।"[৫০]

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা

তুষ্টি—তোষ, সন্তোষ, প্রীতি। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। দেবী তুষ্টিরূপিণী। ইষ্টপ্রাপ্তি বা অনিষ্টনিবৃত্তিতে ক্ষণকালেব জন্য অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়, সেটিই দেবীর তুষ্টিমূর্তি। সংসারে রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারিত হয় তুষ্টিতে। জীব জ্ঞানে ও অজ্ঞানে এই তুষ্টির সেবা করে, পূজা করে, তুষ্টির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। গীতায় আছে—যারা সদা সন্তুষ্ট, তারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

মা সারদা বলতেন: "সন্তোষের সমান ধন নেই, আর সহ্যের সমান গুণ নেই।" এই অমূল্য ধন এবং অনন্ত গুণ মায়ের প্রজ্ঞাকে সদা অচঞ্চল রেখেছে। তাঁর আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, তুষ্টি জীবের মনে এনে দেয় অনুপ্রেরণা ও শান্তি।

শ্রীমায়ের আত্মকথা : "রামনাদের রাজা, আমি (রামেশ্বরে) এসেছি শুনে, তাঁর দেওয়ানকে হুকুম দিলেন, তাঁদের বাড়ী ও ধনাগার যেখানে যা আছে সব খুলে আমাকে দেখাতে। আর আমি যদি কোন জিনিস পছন্দ করি, তখনই যেন তা আমাকে উপহার দেওয়া হয়। আমি আর কি বলব? কিছু ঠিক করতে না পেরে বললুম, 'আমাব আর কি প্রয়োজন, বাবা? আমাদের যা কিছু দরকার সব শশীই ব্যবস্থা করছে।' আবার তারা ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে বললুম, 'আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।' রাধুকে বললুম, 'দেখ, তোর যদি কিছু দরকার হয় নিতে পারিস।' তারপর যখন হীরাজহরতের জিনিস সব দেখছি তখন কেবলই আমার বুক দুরদুর করছে। ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করছি, 'ঠাকুর, রাধুর যেন কোন বাসনা না জাগে।' তা রাধু বললে, 'এ আবার কি নেব? ওসব আমি চাই না। আমার লেখবার পেন্সিলটা হারিয়ে ফেলেছি, একটা পেন্সিল কিনে দাও।' আমি একথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাইরে এসে রাস্তার দোকান থেকে দু-পয়সার একটা পেন্সিল কিনিয়ে দিলুম।"[৫১]

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

মাতৃ—মাতা, ধাত্রী, দেবী। অসুরনিধনকালে ব্রহ্মাদির অষ্টশক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা, চর্চিকা। আবার গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী প্রভৃতি

ষোড়শ মাতৃকা। দেবী মাতারূপে সমস্ত জীবকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনিই সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার নিজের মধ্যে সব জীবকে টেনে নেন। এটাই মায়ের লীলাখেলা।

মা সারদা ছিলেন জগজ্জননী, রামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী, ভক্তজননী, লোকজননী। তাঁর মাতৃরূপ সর্বদা, সর্বত্র, সর্বজীবের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। একদিন স্বামী অরূপানন্দ শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সকলের মা?" মা—"হ্যাঁ"। অরূপানন্দ—"এইসব ইতর জীবজন্তুরও?" মা—"হ্যাঁ, ওদেরও।"[৫২]

মা সারদার আত্মকথা : "আমি মা, জগতের মা, সকলের মা।" (একটা বাছুরের হাম্বা রব শুনে ব্যস্ত হয়ে বলছেন—) "যাই মা যাই, আমি এখুনি তোকে ছেড়ে দেব।" মায়ের বাড়িতে একটা পাখি ছিল, নাম গঙ্গারাম। মা তাকে স্নান করাতেন, খাওয়াতেন, নানা বুলি শেখাতেন। মাঝে মাঝে গঙ্গারাম ডাকত, 'মা—মা'। (মা অমনি জল ও ছোলা দিতে যেতেন আর বলতেন)—"যাই, বাবা, যাই।"

"আমি সতেরও মা অসতেরও মা। বাবা, তারাও (বিদেশিরাও) তো আমার ছেলে। (পাগলিমামীকে) আর যা বলিস, আমায় সর্বনাশী বলিস নে; জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে। সকলের মঙ্গলের জন্য আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি সকলের মঙ্গল করুন।"[৫৩]

একবার গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি রকম মা?" মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন : "আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য—সত্য জননী।"[৫৪]

এক পদস্খলিত যুবকের মাথায় হাত দিয়ে মা বলেন, "মায়ের কাছে ছেলে—ছেলে।" অভিভূত যুবক বলল, "এত দয়া তোমার কাছে পেয়েছি বলে যেন কখনো মনে না আসে যে, তোমার দয়া পাওয়া বড় সুলভ।"[৫৫]

মা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে বলেছিলেন : "যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে তখন নিশ্চিত জেনো আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। ভয় পেয়ো না। হতাশ হয়ো না, বাবা। আমি থাকতে তোমাদের ভয় কি? আমি তোমাদের মা—সত্যিকারের মা। জেনো, বিধাতারও সাধ্য নেই যে, আমার সন্তানদের কোন ক্ষতি করেন। আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।... আমি তোমাদের ইহকালের মা, তোমাদের পরকালের মা। আমি তোমাদের জন্মজন্মান্তরের মা। আমি মা থাকতে তোমাদের ভয় কি?"[৫৬]

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা

ভ্রান্তি—ভ্রম। দেবীমাহাত্ম্যের 'মাতৃরূপেণ' ও 'ভ্রান্তিরূপেণ' শ্লোক দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চৈতন্যরূপিণী মাতৃরূপা দেবী এই জীবজগতের সত্যতা আনয়ন করছেন, আবার মায়ারূপিণী ভ্রান্তিরূপা দেবী জীবজগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করছেন। ঠাকুর বলতেন : "বাজীকর আর তাঁর ভেল্কী। জীবজগৎ, বাড়ী-ঘর-দ্বার, ছেলেপিলে, এসব বাজীকরের ভেল্কী। বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য।"[৫৭] বেদান্ত শাস্ত্রে আছে—অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ—যা যা নয় তাকে তা মনে করা হচ্ছে ভ্রান্তি বা মিথ্যাজ্ঞান। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির ন্যায় নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্মে জগৎ ভ্রান্তি হয়। বেদান্তে অসৎ ও মিথ্যা—এ দুটি শব্দেব খুবই প্রয়োগ হয়। অসৎ মানে যা নেই

এবং দেখাও যায় না—যেমন নরশৃঙ্গ। মিথ্যা মানে যা নেই কিন্তু দেখা যায়—যেমন মরীচিকা। এ-জগৎ মরীচিকা সদৃশ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

বেদান্তমতে ভ্রম দুই প্রকার—সংবাদিভ্রম ও বিসংবাদিভ্রম। যে ভ্রমের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে মানুষ অভিপ্রেত অর্থ লাভ করে, তা সংবাদিভ্রম; যেমন মণিপ্রভাতে মণিভ্রম করে মণিলাভ। আর বিসংবাদিভ্রম হচ্ছে দীপপ্রভাতে মণিভ্রম করে প্রবৃত্ত পুরুষ দীপকে পায়, মণিকে পায় না। বেদান্তে অধ্যাস বা আরোপপূর্বক উপাসনা সফল হয় বলে তা সংবাদিভ্রম।

ব্রহ্মরূপিণী মা সারদা সগুণ ও সাকার রূপ ধারণ করে লীলা করে গেছেন। ভ্রান্তি না থাকলে জগৎ খেলা চলে না। মায়ের শরণাগত হলে তিনি জীবের ভ্রান্তিজ্ঞান (জগৎ-জ্ঞান, ভেদজ্ঞান) সরিয়ে প্রকৃত আত্মস্বরূপটি দেখিয়ে দেন।

শ্রীমাও লীলার জগতে জনৈক সাধুর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন, "মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।"

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা

ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবী সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, চার অন্তরিন্দ্রিয়), অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজিতা এবং পঞ্চভূতের প্রেরয়িত্রী। এটাই দেবীর ব্যাপ্তিমূর্তি।

ইন্দ্রিয়দর্শন মানুষকে প্রতারিত করে। গীতায় আছে, বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যে কোনও ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে, সে ইন্দ্রিয়ই মনের প্রজ্ঞা হরণ করে তাকে নাশ করে। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভৃঙ্গ—এরা এক একটি ইন্দ্রিয়ের সেবা করতে গিয়ে নাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমা একদিন এক ভক্তকে বলেন, "জপ-টপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়।"[৫৮] এক সময় এক সন্তান মাকে বলেন, "মা, আমার মনে খারাপ ভাব আসে না।" মা অমনি চমকে উঠে বাধা দিয়ে বললেন, "বলো না, বলো না, ও কথা বলতে নেই।"[৫৯]

এক ভক্ত মাকে বলেন: "মা, আমার তো শান্তি হয় না, মন সর্বদা চঞ্চল। কাম যায় না।" মা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ভক্তের দিকে চেয়ে রইলেন। কিছুই বললেন না। মায়ের মুখ দেখে ভক্তের আত্মগ্লানি হল। মায়ের পদধূলি নিয়ে ভক্তটি মাস্টারমহাশয়ের কাছে গিয়ে বলল, "আপনি ঠাকুরের অনেক পদসেবা করেছেন, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন—মাথাটা গরম।" তিনি বলেন: "সে কি? আপনি মায়ের ছেলে; মা আপনাকে খুব স্নেহ করেন। মা কি আপনাকে চেয়ে দেখেন নাই।" ভক্ত: "হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেছেন।" মাস্টারমহাশয়: "তবে আর কি? সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।"[৬০] ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সারদেশ্বরীর চকিত দৃষ্টিপাতে ওই ভক্তের কামচিন্তাগ্নি নির্বাপিত হয়।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ

দেবী চিৎশক্তিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যেপে অবস্থান করছেন। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় শ্লোকে দেবীকে 'চেতনারূপে' প্রণাম করা হয়েছে; তা বিশিষ্ট চেতনা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণবর্গ

দ্বারা যে চৈতন্য অনুভূত হয়। আর এই মন্ত্রে নির্গুণ চৈতন্যকে লক্ষ্য করে 'চিতি' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। জল জমে যেমন বরফ হয়, তেমনি সর্বব্যাপী চিতিশক্তি ঘনীভূত হয়ে অবতার (বা মা জগদম্বা) মূর্তি ধারণ করেন। "চণ্ডীতে আছে যে দেবী চণ্ডী দেবগণের শক্তির সমষ্টিস্বরূপা। ইহাব অর্থ এই যে দেবগণ অসুর নাশের জন্য নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের অভিমান বিসর্জন দিয়া এক হইয়াছিলেন। তখন দেবগণের সত্ত্বশক্তির সমষ্টিভূতা শুদ্ধসত্ত্বরূপা অভেদদর্শনকারিণী বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল—ইনিই চণ্ডী।"[৬১]

মায়ের কৃপায় জ্ঞানচক্ষু খুললে জীব মায়ের এই জগদ্‌ব্যাপী বিশ্বরূপ দেখতে পায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানালোকে উদ্ভাসিতা চৈতন্যময়ী জগন্মাতা জগতের কল্যাণের জন্য রক্তমাংসে গড়া সারদাপ্রতিমার রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।... অদ্বৈতবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমা তাঁর সমীপবর্তীদের বলেছিলেন "সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি।"[৬২]

২০০৩ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ শুভবর্ষ। সাবা পৃথিবীতে শ্রীমা সারদা দেবীর দেড়শত বৎসর উপলক্ষে জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই প্রবন্ধে আমরা চণ্ডীর আলোকে দেবী সারদার তেইশটি রূপের মনন ও ধ্যানের চিত্র পাঠককে উপহার দেবার চেষ্টা করলাম। মাকে নানাভাবে দেখতে কার না ইচ্ছা জাগে? শ্রীরামকৃষ্ণও মা কালী দর্শনের পর তাঁকে বহুভাবে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "সমুদ্রের তীরে যে বাস করে, তার মনে যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়—রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকারের রত্ন আছে দেখি—তেমনি মাকে পেয়েও, মাব কাছে সর্বদা থেকেও আমার তখন মনে হত, অনন্তভাবময়ী, অনন্তরূপিণী তাঁকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখব।"[৬৩]

চণ্ডীতে দেবগণের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন। তারপর দেবগণ বিপদ্‌মুক্ত হয়ে আবার দেবীকে প্রাণের প্রার্থনা জানান—হে ভক্তদুঃখহারিণি দেবি, আপনি প্রসন্না হোন। হে নিখিল-বিশ্বজননি, আপনি প্রসন্না হোন। হে বিশ্বেশ্বরি, আপনি প্রসন্না হয়ে বিশ্ব পালন করুন। হে দেবি, আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী।

দেবগণের মতো আমরাও মা সারদা দেবীকে প্রণাম ও প্রার্থনা জানিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব : "জননী, ব্যভিচারী আমাদের প্রাণ, চঞ্চল চিত্ত, অহংকারাচ্ছন্ন বুদ্ধি। মা, আমাদের মানুষ কর, তোমার করিয়া লও। তোমার নিকট আমাদের চাহিবার অনেক আছে, কারণ আমরা যে সর্বগুণহীন। মা, আমাদেব বীর্য দাও, স্থৈর্য দাও, জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য দাও, সংযম দাও, তপস্যা দাও—আর দাও কার্যে একপ্রাণতা। শুনেছি, তোমার নাম কপালমোচন, তুমি আশিস করে আমাদের ললাটের সব কুকর্মরেখা মুছিয়া ঘুচাইয়া দাও। আমরা বিশ্বের মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াই।"[৬৪]

অধ্যাত্মশাস্ত্রে মাতৃশক্তি

ব্রহ্মচারিণী বেলা দেবী

অধ্যাত্মশাস্ত্র আগম-নিগম ভেদে দ্বিবিধ। নিগম হল বেদ আর আগম হল তন্ত্র। আমরা নিগমকে বলি থিওরি আর আগম হল প্র্যাকটিস। যেমন, H_2O হল জলের থিওরি। আর যখন গবেষণাগারে ঢুকে ওই হাইড্রোজেন ২ ভাগ ও অক্সিজেন ১ ভাগ মিশিয়ে জল হতে দেখব তখন সেটা হবে প্র্যাকটিস। তেমনই বেদের বিষয়ের প্রতিফলন আমরা তন্ত্রে দেখি। এটা শুধু বই পড়া নয়, হাতে-কলমে অনুশীলন করা।

অধ্যাত্মশাস্ত্র বলতে তাহলে আমরা বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিকে বুঝি। এইসব শাস্ত্রে মাতৃভাবের প্রকাশ কীভাবে কীর্তিত ও পূজিত হয়েছে সেটিই এখানে আলোচ্য বিষয়।

আমরা সর্বাগ্রে দেখব কোন কোন বেদে মাতৃমহিমা কীর্তিত হয়েছে। প্রথম ঋগ্‌বেদের ১০ মণ্ডল, ১০ অনুবাক, ১২৫ সূক্তটিতে দেবীমহিমা কীর্তিত হয়েছে। এটিকে বৈদিক দেবীসূক্ত বলে। সূক্তটিতে আছে ৮টি মন্ত্র। তার মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি তুলে ধরছি—

> "ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
> মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
> অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
> মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥"

এই সূক্তটি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋষি ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মরূপে অনুভব করে বলেছেন—আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

বাক্ হলেন নারী। তাঁর অনুভব কতদূর! তিনি একজন ব্রহ্মজ্ঞা ঋষি। কিন্তু তাঁর একাত্মতা বিশ্বজগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী মহাশক্তির সঙ্গে। এতে তো মাতৃমহিমাই কীর্তিত হচ্ছে।

এই ঋগ্‌বেদেই ১০ মণ্ডল, ১০ অনুবাক, ১২৭ সূক্তটিকে রাত্রিসূক্ত বলে। এখানেও মাতৃভাবের প্রকাশ কীর্তিত হয়েছে। শ্রীজগদম্বার প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের পূর্বে এই রাত্রিসূক্ত পাঠ করতে হয়।

> "ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ
> বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত ॥"

ওঁকারময়ী সর্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী রাত্রি দেবী সর্বদেশে তাঁর চক্ষুস্থানীয় মহদাদিতত্ত্ব দ্বারা সর্ববস্তুর প্রকাশিকা হয়ে নিজ কর্তৃক উৎপাদিত সদসৎ-কর্মপূর্ণ জগজ্জাল বিশেষরূপে দর্শন করলেন। অনন্তর সকল জীবের স্ব-স্ব-কর্মানুরূপ ফল প্রদান করলেন। এই মাতৃরূপী রাত্রিদেবীকে পরমাকাশরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মাপন্ন-কন্যা বলা হয়েছে।

আরও দেখি ঋগ্‌বেদসংহিতায় ৮৯ সূক্তে—'অদিতি দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ'—অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, তিনি পিতা, তিনি পুত্র ইত্যাদি। এখানেও দেখি সেই মাতার উল্লেখ।

মুণ্ডক উপনিষদে আমরা প্রথম কালী নামের উল্লেখ পাই—

"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥" (১।২।৪)

সামবেদীয় কেনোপনিষদেও উমা হৈমবতীর কাহিনী আছে। এঁরা সকলেই পরবর্তী কালে মাতৃশক্তিরূপে পূজিত হয়েছেন।

রামায়ণে দেখি মর্যাদাপুরুষ বামচন্দ্র অমেয় শ্রদ্ধা অর্পণ করছেন মাতৃগণের উদ্দেশে। বিমাতা কৈকেয়ীর কথায় বনবাস যেমন বরণ করেছেন, তেমনি জননী কৌশল্যার জন্য অশ্রুমোচন কবে বলছেন, "অল্পভাগ্যা হি মে মাতা কৌশল্যা রহিতা ময়া" (রামায়ণ, ৫৩ সর্গ। ২৪) কৃত্তিবাসী বামায়ণে দেখি মাতৃভক্ত রামচন্দ্র দেবীর অকাল বোধন করছেন। দুর্গাপূজার মন্ত্রে 'রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী'।

আবার মহাভারতে ১৪ পর্বে মহাভীমা ও ভদ্রকালীর কথা আছে। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক দুর্গাস্তব আছে। এর প্রথম শ্লোকটি হল—

"বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ।
অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥"

আমরা মহাভারতে আরও দেখি যুদ্ধের প্রাক্‌কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—'দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়'—দুর্গা স্তব উচ্চারণ করো।

ভাগবতে দেখি গোপীরা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য মা কাত্যায়নীর পূজা করেছেন—

"কাত্যায়নী! মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে মনঃ ॥"

এই ভাগবত গ্রন্থে কৃষ্ণের রাসলীলা পাঁচটি অধ্যায়ে কীর্তিত কিন্তু মাতৃমহিমাখ্যাপক-দক্ষযজ্ঞ (চতুর্থ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত) সাতটি অধ্যায়ে কীর্তিত হয়েছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে আছে মহাশক্তি মূলপ্রকৃতি থেকে এই বিশ্বসংসার উৎপন্ন। তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরাসত্তা—এই কথা বলা হয়েছে।

বৃহন্নারদীয়পুরাণে জগজ্জননীকে বিশ্বপ্রসবিনীরূপে বর্ণনা কবা হয়েছে।

"উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথা পরে
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ ॥
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাপরে ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীকে নারায়ণীস্তুতিতে বলা হয়েছে—

"দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥" (১১।৩)

অন্যত্র আছে—

'ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।' (১১।৫) মার্কণ্ডেয়পুরাণের সপ্তশতী বা চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য—মাতৃবন্দনা আজও ভারতে নবরাত্রিতে ও বিশেষ তিথিতে নিত্য পঠিত হয়।

চামুণ্ডা তন্ত্রশাস্ত্রে আছে দশমহাবিদ্যার কথা।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতা ॥"

—এইসব বিদ্যাশক্তি মাতৃরূপিণী। এঁদের পূজা করলে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এঁরা সিদ্ধবিদ্যা।

এতক্ষণ যেসব অধ্যাত্মশাস্ত্রে মাতৃভাবের কথা বললাম সেসব শাস্ত্র বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। এখন যে মায়ের মূর্তি আমাদের হৃদয় আপ্লুত করে, বাণী কর্ণে সুধাবর্ষণ করে সেই মা-ই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি জগজ্জননী সারদা। মায়ের গুণকীর্তন করব পুষ্পদন্তের লেখা 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে'-র উক্তি স্মরণ করে—'মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথন-পুণ্যেন ভবতঃ পুণামি'। আপনার গুণবর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা নিজের বাক্যকে পবিত্র করব, এই কথাটিই চৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বড়ো মিষ্টি করে বলেছেন—'যৈছে তৈছে করি আপন পাবন'।

আমরা আরও জানি ভগবানের চরণনিঃসৃত বারি যেমন স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, তিন লোক পবিত্র করে, তেমনই ভগবানের কথা তিন পুরুষকে পবিত্র করে—'বক্তাকে, প্রশ্নকর্তাকে ও শ্রোতাকে—'বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা' (ভা. ১০।১।১৬)।

আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য শ্রীমা সারদার গুণকীর্তন করা। মা একদিকে যেমন অসুরদলনী, অপরদিকে ত্রাণকারিণী। হরিশের কুবুদ্ধি দমনের জন্য বগলামূর্তি, আবার তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত দম্পতির কাছে কালীরূপ ধারণ করেন।

বহুরূপিণী মা সারদা। তাঁর নিত্যশুদ্ধ আত্মা ভক্তদের কাছে আরাধ্য দেবীমূর্তিরূপে দেখা দিয়েছে। আমরা যে সমস্ত দেবীকে আরাধনা করি, মায়ের চরিত্রে সেইসব দেবীর প্রকাশ ঘটতে ভক্তেরা দেখেছেন।

মায়ের সরস্বতী রূপ

তাঁর এই রূপের উল্লেখ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগনে হৃদয়কে বলছেন : "ওরে ওর নাম সারদা—ও সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"

সীতা রূপ

একবার মা বিষ্ণুপুর স্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছেন, এমন সময় এক পশ্চিমা কুলি তাঁকে দেখে ছুটে এল, "তু মেরে জানকী। তুঝে ম্যায়নে কিতনা দিনো সে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কঁহা থী?"—এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

মা তাকে শান্ত করে ফুল আনতে বললেন। সে ফুল এনে মায়ের চরণে অর্পণ করল।

মা সেই পশ্চিমা কুলিকে তখনই মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।[১]

বহুভুজা মা

একদিন জয়রামবাটীতে মা অন্যমনস্কভাবে কাজ করতে করতে বললেন, 'আমি আর অনন্ত হাতে কাজ করেও শেষ করতে পারছি না।" বলেই বললেন, "দেখ তো, আমার আবার অনন্ত হাত, এ কী বলছি!"[২]

কালী রূপ

শ্রীমাকে কালীরূপে দর্শন করেছেন অনেক ভক্ত। মাও 'কালী' বলে নিজেব পরিচয় দিয়েছেন। তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত দম্পতি মাকে বলেছিলেন, "তুমি তো সাধারণ মানুষ নও। আমরা তোমাকে কালীরূপে দেখছি।"

মা উত্তর দিলেন, "কি জানি, আমি তো কিছু জানি না।"

ঠাকুর একবার বলেছিলেন, "সেই যে নহবতে আছে আর মন্দিরে ভবতারিণী—একই।"

মা কালী কিনা জানতে চাইলে মা বলেন, "লোকে বলে কালী।"

প্রশ্ন, "কালী তো? ঠিক?"

ভক্ত বলেন, "বল, তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ। আব সাক্ষাৎ মা কালী কিনা?"

মা মাথায় হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেন, "হাঁ, তাই।"[৩]

গিরিশের বাড়ি দুর্গোৎসব

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীমা ছিলেন জ্যান্ত দুর্গা। গিরিশবাবু সেই জ্যান্ত দুর্গার পূজা করে ধন্য, কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন।

গিরিশের জেদ, মা স্বয়ং না এলে পূজা করা নিরর্থক।

গিরিশের বাড়িতে পূজা। খিড়কির দরজায় গভীর রাতে করাঘাত—'আমি এসেছি'। পূজামণ্ডপে সত্যসত্যই মা অবতীর্ণা হয়েছেন।

ভক্তগণ মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।[৪]

কৃপাময়ী মা

শ্রীর আরও পরিচয় তিনি করুণাময়ী, কৃপাময়ী ও ভক্তবৎসলা। মা জানতেন, ঈশ্বরলাভের জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ করে, সে ধন্য।

কিন্তু আবার কোনও সংসারী সন্ন্যাস নিতে চাইলে মা বলতেন, "দেখ দিকিনি, কি অন্যায়। সে বেচারী এই কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে যায় কোথায়? তিনি সন্ন্যাসী হবেন! কেন সংসার করেছিলেন? যদি সংসারত্যাগই করতে চাও, আগে এদের খাওয়া থাকাব সুব্যবস্থা কর।"[৫]

একজনের পিতা মারা গেছে। পুত্র সন্ন্যাস নিতে চায়। মা আগে ভালো করে জেনে নিলেন, ছেলেটি না থাকলে বাড়িতে কোনও অসুবিধা হবে কিনা। তাদেব চলবে তো? জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে মা মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।[৬]

সদ্যপ্রসূতি একটি মেয়ে মাঠে কাজ করছে। তাই দেখে মা কাতর হয়ে পড়েন। অভিমানে মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন মনে মনে : তুমি এসব দেখতে পাচ্ছ না? মানুষের এত দুঃখদুর্দশা? একটা কোনও বিহিত করো।

জাতপাতের ঊর্ধ্বে

মা ছিলেন সামাজিক বিধিনিষেধের ওপরে। তাঁকে গণ্ডিভাঙা মা বলে ভক্তেরা অভিহিত করেছেন। আমরা জানি তিনি মুসলমান আমজাদের এঁটো পরিষ্কার করছেন আর বলছেন, "আমার শরৎ (সারদানন্দজী) যেমন ছেলে, আমজাদও তেমন ছেলে।"[৭] শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁর প্রেম ও কৃপাও আচণ্ডালকে ধন্য করে প্রবাহিত হত।

জগন্ময়ী মূর্তি

মা বলতেন, পৃথিবীর মতো সহ্যশক্তি চাই। অর্থাৎ যদি শান্তি চাও, তো শান্ত থাকো।

মায়েব যে কত রূপ। তিনি নিজেই ছিলেন ধরিত্রীকন্যা সীতার মতো আশ্চর্য সহনশীলা। একবার একজন মহিলাকে ঠাকুর মায়ের কাছে পাঠালেন। বলে দিলেন, নহবতে যিনি আছেন তিনিই তোমার দুঃখ কষ্ট দূর করবেন। যাও তাঁকে গিয়ে সব খুলে বলো।

মা তাকে বলে দিলেন, তুমি মা, ওঁর কাছেই যাবে। উনিই জানবেন। ঠাকুর আবার পাঠালেন তাঁকে : না, না, তুমি গিয়ে ভালো করে তাঁকে বলো। এইভাবে বার তিনেক ঘোরানো হল। শেষে মা তাঁর কৃপাশক্তি প্রকাশ করলেন। মহিলার হাতে একটি বিল্বপত্র দিয়ে বললেন, "এইটে নিয়ে যাও। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" তাই হয়েছিল।[৮]

সেবাপরায়ণা মা

মায়ের সেবার তুলনা মেলে না। ভক্তজননী খুব সকালবেলা, গয়লাবাড়িতে দুধ আনতে গেছেন। বাতের ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কলকাতা থেকে আমার সন্তান কজন এসেছে। তাদের সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস। তাই দুধ নিতে এসেছি।

অসুস্থ শরীরে নিজের হাতে তাদের বিছানার চাদর কাচছেন। এ কী করছেন? ময়লা বিছানাতে ছেলেরা শোবে কী করে? কষ্টকে কষ্ট বলে মানছেন না।

আব একটি ঘটনার কথা বলি। জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজার পরে ভক্ত ত্যাগী সন্তান যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ম্যালেরিয়াতে শয্যাগত হলেন। মায়ের তখন চিন্তা-উদ্বেগের

অবধি নেই। কেবল বলেন, মা গো কী হবে? ছেলেরা সকলেই পড়ে পড়ে ভুগছে। সমস্ত কাজ করছেন, আর একটু অবসর পেলেই দরজায় দাঁড়িয়ে রোগীদের দেখে যাচ্ছেন। গ্রামে দুধ দুষ্প্রাপ্য। মা তখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে এক পোয়া আধ পোয়া যা পান দুধ আনেন। পথ্যের ব্যবস্থা করেন। অন্নপথ্যের পরে মায়ের পরিশ্রম যাতে আর না বাড়ে তাই সকলে জোর করে চলে যাচ্ছেন। মা বলছেন, আর কদিন থাকো। শরীরে একটু বল পাও। তাঁরা চলে যাচ্ছেন, মা খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে অপলকে চেয়ে আছেন। চোখে তাঁর জল।...[১]

করুণাময়ী মা

মা সকলের ইহকাল ও পরকালের আশ্রয়। কেই বা তাঁর করুণায় বঞ্চিত? মুচি, বাগদি. ডোম, চণ্ডাল, মুসলমান, অন্ধ, আতুর সকলেই মায়ের কাছে অবাধ আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে।

এইভাবে নানারূপে মার আত্মপ্রকাশ বিভিন্ন দেবীর মহিমায়। ঠাকুর বলেছেন, মাতৃভাব সবচেয়ে শুদ্ধভাব। মাতৃভাব সব সাধনার শেষকথা। মাতৃরূপে আমাদের মা-কে ষোড়শীপূজার মাধ্যমে জগৎকল্যাণের জন্য পরমাশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভারতের ইতিহাসে আদর্শ নারীর অভাব নেই। কিন্তু মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশ আমরা এঁদের মধ্যে বড়ো একটা দেখতে পাই না। ভারতীয় নারীর ইতিহাসে সেই অভাব পূর্ণ করলেন শ্রীমা। প্রাচীন যুগ ও আধুনিক যুগের সংযোগ ঘটিয়েছেন তিনি, তাঁর আচরণে, কর্মে, জীবনযাপনে আর সহজ-সরল কথায়। তিনি নিবেদিতাকে গ্রহণ করেছিলেন সাদরে। শরৎ ও আমজাদের মধ্যে ফারাক রাখেননি কোনওদিন।

সর্বজনীন মাতৃত্বের আদর্শ তিনিই। স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতে 'জননী'-ই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই প্রথম ও শেষ কথা। তাই আমার মনে হয় ভারতীয় নারীর আদর্শের প্রথম ও শেষ কথা মা সারদাই।

যিনি তীর্থযাত্রী তিনিই তীর্থদেবতা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

তিনি যাত্রা করলেন

তিনি যাত্রা করলেন—দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে—দক্ষিণ ঈশ্বরের অভিমুখে। রামকৃষ্ণের অভিমুখে।

তিনি সারদা।

পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়সের সময় তাঁর বিয়ে হয়েছিল চব্বিশ বৎসরের এক 'পাগল' সাধকের সঙ্গে—ধর্ম যাঁকে পাগল করে দিয়েছিল।

বিয়ের সময় ছোট্টো মেয়েটির অতসব কথা জানার নয়। কিন্তু জানার বয়সে পৌঁছে তিনি স্থির করলেন যাবেন তাঁর পাগল স্বামীর কাছে। জানবেন তিনি—স্বামী কি সত্যই পাগল, নাকি মহেশ-পাগল?

সারদার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে। সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর অনেক ক্রোশ হাঁটা-পথ। সাধারণ অবস্থা তাঁর পিতৃকুলের। অবশ্যই চতুর্দোলা বা পালকি করে কন্যা পাঠাবার সামর্থ্য ছিল না। মাটি মাড়িয়েই তাঁকে যেতে হবে—লক্ষ্মীর পদচিহ্ন পথে আঁকতে আঁকতে।

একবার নয়, বেশ কয়েকবারই যাত্রা করতে হয়েছে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিজ গ্রাম থেকে। একটি যাত্রার উল্লেখ করা যাক।

সারদার কয়েকজন আত্মীয় ও পরিজন কলকাতা যাচ্ছেন গঙ্গাস্নানের জন্য এক পুণ্যতিথিতে। দক্ষিণেশ্বরমুখী সারদার মন তাঁদের সঙ্গী হতে চাইল। তিনি সঙ্গী হলেনও। আট মাইল পথ হেঁটে তাঁরা আরামবাগ পৌঁছালেন। পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল সেখানেই রাত কাটাবেন, কেননা সামনে দশ মাইলব্যাপী প্রান্তর—বিপজ্জনক, ভয়ানক নরঘাতক দস্যুদের আস্তানা, যাত্রীদের খুন করে সর্বস্ব লুট করে নেয়—তেলোভেলোর সেই হৃৎকম্পকারী মাঠ। যাত্রীরা দিনের আলো থাকতে থাকতেই দলবদ্ধভাবে সেই মাঠ অতিক্রম করে থাকেন। এবার ঠিক ছিল আরামবাগে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে তাঁরা মাঠ পেরোবেন। কিন্তু আরামবাগ পৌঁছে দেখেন, তখনও যথেষ্ট আলো আছে, পা চালিয়ে গেলে সন্ধ্যার আগেই অপরদিকে পৌঁছে যাবেন। সেই সিদ্ধান্তই তাঁরা করলেন।

কিন্তু সারদার কী হবে? পায়ে যন্ত্রণা, পথ চলাই তাঁর দায়। তার উপর ওই দীর্ঘপথ—এবং দ্রুতপদে হাঁটতে হবে! সঙ্গীরা সমর্থ এবং উদ্যমী, তাঁরা সঙ্গী কিন্তু চিরসঙ্গী নন। তাঁরা চলতে শুরু করে দিলেন। সারদাও বুঝলেন অপরের প্রয়োজনের কথা। সত্যই তো, কে কার দায় বহন করে। অভিমান হয়েছিল কি? কী জানি! কিন্তু নিজের প্রয়োজনের বেড়ি অপরের পায়ে জড়ানোর

মানুষ তিনি নন। বললেন, "তোমরা এগিয়ে যাও, আমি আস্তে আস্তে পিছনে পিছনে যাব।" সারদার মুখের কথাকে বহু মান দিয়ে তাঁদের চলো চলো-র গতি বাড়তে লাগল। পিছনে পড়ে রইল অসহায় একটি তরুণী বধূ—সেই নির্জন ভয়ংকর প্রান্তরে।

এবার কিছুটা স্বামী গম্ভীরানন্দের বর্ণনা অনুসরণ করা যাক :

"অস্তাচলগামী সূর্যের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন উচ্চ তালবৃক্ষের মস্তক হইতে সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়া নামিয়া আসিয়া প্রান্তরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, তখনও সেই জনবসতিহীন অচিন্ত্য বিপদের আবাসস্থল প্রান্তরের অজানা পথে একাকী চলিতে চলিতে শ্রীমা বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতেছেন কি করিবেন, এমন সময় দেখিলেন, প্রান্তরের একস্থলে এক দীর্ঘাবয়ব মূর্তি তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ওই মূর্তি নিকটে আসিতেই দেখা গেল, তাহার বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, স্কন্ধে দীর্ঘ যষ্টি, হস্তদ্বয়ে রৌপ্যবলয় এবং কেশরাশি নিবিড় ও কুঞ্চিত। শ্রীমায়ের বুঝিতে বাকি রইল না যে, সে দস্যু; সুতরাং তিনি ভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটি সম্ভবত তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আরও ভয়োৎপাদনের জন্য রুক্ষস্বরে বলিল, 'কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ? কোথা যাবে?' শ্রীমা বলিলেন, 'পুবে'। আগত ব্যক্তি তেমনই কর্কশকণ্ঠে বলিল, 'সে এপথ নয়, ঐ পথে যেতে হবে।' শ্রীমা তখনও স্থাণুবৎ অচল, আর লোকটিও খুবই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মায়ের শ্রীমুখ দেখিয়া অকস্মাৎ সেই নরঘাতকের মনে যেন কি এক পরিবর্তন আসিল, সে মায়ের দিকে তাকাইয়া নরম সুরে বলিল, 'ভয় নেই, আমার সঙ্গে মেয়েলোক আছে, সে পিছিয়ে পড়েছে।' এতক্ষণে শ্রীমায়ের দৃষ্টি সম্মুখস্থ বিপদকে ছাড়িয়া আরও দূরে ধাবিত হইলে তিনি দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক সত্যই সেদিকে আসিতেছে। তখন তিনি ভরসা পাইয়া বলিলেন, 'বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাদের কাছে পৌঁছে দাও! তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তিনি তোমায় খুব আদর করবেন।' ঐ কথা শেষ হইতে না হইতেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া পড়িল এবং শ্রীমা বিশ্বাস ও স্নেহভরে তাহার হস্ত ধারণপূর্বক বলিলেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতুম বলতে পারিনে!' "

পরের ঘটনা শ্রীমায়ের জীবনী পাঠকের জানা আছে। শ্রীমায়ের কথায় দস্যুদম্পতির হৃদয় বিগলিত হয়েছিল, তারা সে রাত্রির মতো তাঁকে সযত্নে আশ্রয় দিয়েছিল এবং পরদিন সকালে শ্রীমাকে পথে এগিয়ে দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে শ্রীমায়ের সম্পর্ক-বিবরণ আরও অগ্রসর হয়েছে, সে কাহিনীতে এখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন এই, শ্রীমায়ের কথায় দস্যুর কঠিন এবং হিংস্র হৃদয় কেন 'বিগলিত' হয়েছিল? লৌকিক এবং অলৌকিক, দুই উত্তরই শ্রীমায়ের জীবনীতে পাই। অলৌকিক অংশে আছে, দস্যু তাঁর মধ্যে সাক্ষাৎ কালী-রূপ দেখেছিল। আর, লৌকিক ব্যাখ্যা, স্বামী গম্ভীরানন্দের রচনা অনুযায়ী—'সারদামণির এইরূপ নিঃসঙ্কোচ ও সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায়' দস্যুদম্পতির প্রাণ গলে গিয়েছিল।

লৌকিক ও অলৌকিক, উভয় ব্যাখ্যা ব্যক্তিভেদে গ্রাহ্য হবে। আমি এখানে আর একটু

যোগ করতে ইচ্ছুক। সারদামণির ওই নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার ও কথাগুলির ভিতরে ছিল সত্যের জ্যোতি। সত্য যখন অবারিত আকারে আবির্ভূত হয় তখন অনস্বীকার্য তার রূপ। সেই মুহূর্তে সারদামণির অনুভূতিলোকে দস্যু তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর কন্যা। তাঁদের উভয়ের ব্যবহারিক প্রচ্ছদ খসে গিয়ে নিত্যবাৎসল্যের মধ্যে অবস্থিত তাঁরা। চিরদিনের পিতা-মাতা ও চিরদিনের কন্যা সেই প্রান্তরে তখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বিশ্বাসের দণ্ডে ভর করে, ব্যাকুলতায় তরঙ্গিত হতে-হতে সারদামণি যাত্রা করেছেন দয়িতের অভিমুখে। মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গা বয়ে চলে মহাসাগরের দিকে।

তিনি গ্রহণ করলেন

প্রথমবার সারদা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছানোর পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাদরে সস্নেহে গ্রহণ করেছেন। যে মর্যাদা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহধর্মিণীকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দিয়েছেন, তার তুল্য কিছু অবতার-কাহিনিমালায় পাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ তো নিজগুণে পত্নীকে মর্যাদাভূষিত করলেন কিন্তু কীভাবে, কোন শক্তিতে, তাঁকে গ্রহণ করলেন সারদা?

রামকৃষ্ণ-সারদার জীবন-মহাকাব্যের অপূর্ব সেই অধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীসারদা কর্তৃক গ্রহণের শিখর কাহিনিটিকে এখানে স্মরণ করা যাক।

'ধর্মসাম্রাজ্যের বিজয়ী সম্রাট' রামকৃষ্ণ তাঁর সর্বসিদ্ধিসম্পদ করপুটে নিয়ে যেন অপেক্ষা করছিলেন সর্বসিদ্ধিদাত্রীর শ্রীচরণে নিবেদন করার জন্য। সিদ্ধিদাত্রীদেবীরূপে আবাহন করেছিলেন তিনি তাঁরই উনিশ বৎসরের বনিতা শ্রীসারদাকে।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ (ইং ৫ জুন ১৮৭২) ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে দক্ষিণেশ্বরের একটি কক্ষে মহাকালবন্দিত কোন ঘটনা ঘটেছিল, তার কিছু রূপাঙ্কনে যদি কেউ সমর্থ হয়ে থাকেন তিনি রামকৃষ্ণ-শিষ্য, সারদামন্দিরের দ্বারী, স্বামী সারদানন্দ। এখানে তাঁর সুপরিচিত বর্ণনার কিছু অংশ উৎকলন না করে উপায় নেই। তাঁর সংবাদের উৎস স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবী।

স্বামী সারদানন্দের বিবরণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (১ম ভাগ) গ্রন্থে ধৃত :

> "সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের অর্ধেকের উপর গত হইয়াছে। আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপূজার পুণ্যদিবস। ...শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পন-ভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য অস্তগমন করিল, ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ...দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।
>
> "পূজাদ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ইতিপূর্বে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুতরাং কী করিতেছেন, তাহা সম্যক না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি এখন পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

" 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমন পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর'।

"অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞানতিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক—সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

"কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

" 'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিবগেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি'।

"পূজা শেষ হইল—মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেবমানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।"

ফলহারিণী কালীপূজার দিন ওই যে ঘটনা ঘটেছিল, তার তুল্য কোনও ঘটনা কি ঘটেছে পূর্বে? পণ্ডিতগণ শাস্ত্র ঘেঁটে যদি তেমন-কিছু আবিষ্কার করতে পারেন, তার দ্বারা ধর্মের ইতিহাস অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন-কিছু আবিষ্কার-কথা আমরা জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীর সাধারণ এক পাঠকরূপে আমরা জেনেছি যে, ঠাকুরের এমনই অধ্যাত্মশক্তি ছিল যাতে স্পর্শমাত্রে, এমনকি দৃষ্টিপাতমাত্রে, তিনি মানুষের সত্তায় আলোড়ন ঘটাতে পারতেন। তাঁর সে শক্তি অপ্রতিরোধ্য। যুবক নরেন্দ্রনাথের অভিমান ছিল নিজ মানসিক শক্তিমত্তা সম্বন্ধে; তাঁর দৃষ্টিতে ও ব্যক্তিত্বে ছিল সম্মোহনী শক্তি—সে-বিষয়ে দেশ-বিদেশের মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছেন। সেই তিনিও সমস্ত বিপরীত চেষ্টা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ-স্পর্শে আত্মহারা হয়ে অপরিমেয় অনুভূতি-স্রোতে উথাল-পাথাল হয়েছেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের অভিভূতকণ্ঠে বলেছিলেন, "কি অদ্ভুতশক্তি! রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন—শরীরের ভিতর যেটা আছে সেইটাকে। কত কথা, কত উপদেশের পরে ফিরতে দিলেন। সব করতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করতে পারেন।"

যে নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কেশব সেনের (তখন জগদ্‌বিখ্যাত বাগ্মী ধর্মনেতা) যেখানে একটা শক্তি আছে সেখানে নরেন্দ্রের আছে আঠারোটা—সেই নরেন্দ্রনাথকে তিনি মাটির তালের মতো করপুটে নিয়ে ভেঙেছেন গড়েছেন—

তাঁর অধ্যাত্মশক্তির প্রকার বা পরিমাণ নির্ণয় করা কি সম্ভব? কেবল নরেন্দ্রনাথ কেন, আরও কত শক্তিধর পুরুষের জীবনে তিনি ভ্রূভঙ্গে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তারও যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। সেই তিনি—তাঁর সমস্ত সাধনফল নিবেদন করলেন আপাতত এক মানবীকে—সে নারী তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করলেন—বিদীর্ণ হলেন না—অবিচলিত মহিমায় অবস্থান করলেন—তাহলে সে নারীর কোন শক্তি যা রামকৃষ্ণকে পুরোপুরি গ্রাস করতে সমর্থ? এখানে একমাত্র সমাধান—মহাশক্তির অবতারকে মহাশক্তিই ধারণ করতে পারেন।

তিনি শিক্ষা দিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণ কতভাবে শ্রীমাকে ধর্মকর্ম ও কাজকর্মের শিক্ষা দিয়েছেন তার যথেষ্ট বিবরণ উভয়ের জীবনীগ্রন্থগুলিতে মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু—তাঁর শিক্ষা পারত্রিক ও ঐহিক, উভয়ক্ষেত্রে প্রদত্ত হবে তাই স্বাভাবিক এবং তা ঘটেছিলও শ্রীমায়ের ক্ষেত্রে।

এর বিপরীত চিত্রও আছে, যেখানে শ্রীমা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদাত্রী। বিস্ময়কব মনে হলেও সত্য। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রটি সেইখানে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যেন শ্রীমায়ের আবির্ভাবের বিশেষ রূপটি ক্ষণকালের জন্য মন থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন—যদিও সেই আবির্ভাবতত্ত্বের প্রবক্তা তিনিই।

এক্ষেত্রে একাধিক ঘটনা আছে। আমি একটিকেই তুলে আনব।

ঘটনাটির বিববণ স্বামী গম্ভীরানন্দের ক্লাসিক গ্রন্থ 'শ্রীমা সারদা দেবী' থেকে উৎকলন করা যাক :

" ...তখন ভক্তসমাগমে ঠাকুরের প্রকোষ্ঠ প্রায়ই পূর্ণ থাকিত। এত লোকেব সম্মুখে লজ্জাশীলা মাতাঠাকুরাণীর যাওয়া সম্ভব হইত না বলিয়া রাত্রে আহারের সময়ে সকলকে সরাইয়া দেওয়া হইত। শ্রীমা থালা হাতে লইয়া সেই ঘরে আসিতেন এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিতেন। একদিন যথাসময় শ্রীমা ভোজ্যহস্তে আসিয়া সবে ঠাকুরের ঘরের সিঁড়ি হইতে বারান্দায় পা দিয়াছেন, এমন সময় সহসা এক মহিলা আসিয়া 'দিন মা, আমায় দিন'—এই বলিয়া মাতাঠাকুরাণীর হস্ত হইতে থালাখানি লইয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন এবং তখনই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলেন, শ্রীমাও পার্শ্বে বসিলেন। কিন্তু ঠাকুর সে অন্ন স্পর্শ করিতে পারিলেন না। শ্রীমায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? ওকে কি জানো না? ও অমুকের ভাজ, দেওরকে নিয়ে থাকে। এখন আমি ওর ছোঁয়া খাই কি করে?' শ্রীমা বলিলেন, 'তা জানি, আজ খাও।' ঠাকুর কিন্তু তখনও ছুঁইতে পারিলেন না। শ্রীমায়ের মিনতির উত্তরে অবশেষে বলিলেন, 'আর কোনও দিন কারও হাতে দেবে না বলো'।"

এর পরেই সেই সহসা প্রকাশ :

"শ্রীমা করজোড়ে বলিলেন, 'তা তো আমি মানতে পারব না ঠাকুর। তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব। কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।' "

শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি শিক্ষা পেলেন। প্রথমত, শ্রীমা যে মাতৃভাব প্রকাশের জন্য আবির্ভূতা, যেকথা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই বারবার বলেছেন, তা যেন তিনি নিজের উপর স্বেচ্ছাবরণ টেনে বিস্মৃত হয়েছিলেন। মা জানালেন, সেকথা এঁর বিস্মৃত হওয়া উচিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেব আবির্ভাবসত্যও যেন বিস্মৃত হয়েছিলেন—তিনি যে কোনও একজনের নয়, সকলের জন্যই তাঁর ভুবনপাবন রূপ—তা স্মরণ করিয়ে দিলেন মাতাঠাকুরাণী। যদিও আপাতত মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যের আলোকধারিণী চন্দ্রমাস্বরূপিণী শ্রীমা সারদা—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের ক্ষেত্রে দুই নক্ষত্রের আলোকবিনিময়। 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।'

তিনি পূজার আসনে

মা পূজার আসনে—অসামান্য সেই প্রহরগুলি—শক্তি যেখানে শান্তি এবং শান্তি যেখানে শক্তি। সে কোন শক্তির শান্তি তা কিছুটা বোঝা যাবে স্বামীজীর 'শান্তি' কবিতা থেকে,

> যে শান্তি আসে শক্তির আকারে মহাবেগে—কিন্তু তা শক্তি নয়। তা অন্ধকারের অন্তর্লীন আলোক, তীব্র জ্যোতির মাঝে ছায়ার আভাস। আনন্দ তা—অনির্বচনীয়। বেদনা তা—অননুভূত। অমর জীবন তা—অযাপিত। নিত্য মরণ তা—অশোচিত। তা সংগীতের সম, আর পবিত্র ছন্দের যতি। মুখর ভাষণের অন্তরের নৈঃশব্দ্য, বাসনার উচ্ছ্বাসের তরঙ্গমধ্যে হৃদয়ের ক্ষান্তি ও ধৃতি। নয়নের অগোচর পরম সুন্দর সে; অগীত গীত আর অজ্ঞেয় জ্ঞান; জন্মতরঙ্গের অন্তরঙ্গ মৃত্যু। ঝঞ্ঝার শিরে সে নিশ্চল নিরোধ—সৃষ্টিগর্ভ মহা নেতি। সেখানে নিত্য ঝরে হাসির কিরণ। সেই শান্তি জীবনের পবম লক্ষ্য—সেই হল ধ্রুবলোক।

এমনই শান্তি মহামাতাব—মাতাঠাকুরাণীর। বাইরে স্নিগ্ধ সুন্দর, ভিতরে শক্তির স্থির পুঞ্জ। বাইরে সুদূর দৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমুখে। অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দৃষ্টিপ্রদীপের নিত্য আরতি।

পূজার আসনে আসীন মাতাদেবী।

পূজার আসনটি পাতা হয়েছিল যেখানে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন—সেই স্থানটিতে।

পূজার আসনে মাকে দেখে মোহিত অভিভূত নিবেদিতা। "মাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায় পূজার আসনেই।"

বহু তরঙ্গের ওঠাপড়ায়, দাঁড় ও হালের সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টায় ক্লান্ত মায়ের স্নেহের খুকিটি—নিবেদিতা—পৌঁছেছেন মায়ের পূজার আসনের সন্নিধানে। তিনি নত হলেন পরমা ধৃতি ও পরমা স্থিতির প্রতিমার সামনে।

"তিনি যেন পদ্মপত্রের উপরে জলবিন্দু—পৃথিবীকে সকল বিন্দুতে স্পর্শ করে আছেন—কিন্তু তার দ্বারা পরিবর্তিত বা প্রতারিত নন।"

"মাতাদেবীর সান্নিধ্যে যেতে পেরেছি। কী অপূর্ব লাগছে কী বলব। অপূর্ব! অপূর্ব! এ জিনিস বলে বোঝাতে পারব না। এই স্থানটির একটি পরম অস্তিত্ব সত্যই বর্তমান। মানুষের অন্তর্লোকের পরিপূর্ণ একটি কল্পলোক আছে—আছেই।"

"পূর্ণ তিনি—মাতাদেবী—পূর্ণ মাধুর্যে, মৌনে। আর কী জ্যোতির্ময়। গভীরভাবে বুঝতে পারছি কত সত্যভাবে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী।"

কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্

সুব্রতা সেন

আমাদের পরমারাধ্যা জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর পুণ্যজীবন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই ভগিনী নিবেদিতার বিস্ময়-বিমূঢ় উক্তিটির উল্লেখ করে থাকি—"শ্রীশ্রীমা কি ভারতীয় নারীর প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি অথবা নবীন আদর্শের অগ্রদূত?" সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতীয় নারীর প্রাচীন আদর্শ বলতে আমরা কী বুঝব? অর্থাৎ কোন কোন গুণ থাকলে প্রাচীন ভারতে নারী আদর্শস্থানীয়া বলে বিবেচিত হতেন, এ-বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ আছে কি? বহু অন্বেষণের অহেতুক শ্রম স্বীকার না করেই বলা যায়, এই জিজ্ঞাসার উত্তর আছে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও 'মার্কণ্ডেয়চণ্ডী'-র মতো সহজলভ্য, নিত্যপাঠ্য গ্রন্থদুটিতে।

গীতার দশম অধ্যায়ের বিভূতি যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগৎপ্রপঞ্চে নিজ বিভূতির পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসঙ্গত বলেছেন—নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি বা ধৈর্য, আর ক্ষমা। 'কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।'—চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের দ্বারা নিগৃহীত দেবগণের অনবদ্য দেবীপ্রণামটিতে সর্বভূতে বিরাজিত বুদ্ধি, ক্ষান্তি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, স্মৃতি, দয়া ও তুষ্টি—এই দশটি গুণকে দেবীর বিশেষ প্রকাশরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, মুদ্গলপুরাণে এই গুণগুলির অধিকাংশই রূপায়িত হয়েছে দক্ষের কন্যা ও ধর্মের পত্নীরূপে; কেবল ব্রহ্মাতনয়ারূপে পরিচিত হয়েছেন বাক্। মুদ্গলপুরাণের দক্ষকন্যা হলেন—শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি। "প্রসূত্যাং জনয়ামাস কন্যা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।/ শ্রদ্ধা লক্ষ্মী ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা॥" বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্তিস্ত্রয়োদশ॥"—২/৬/১৩

গীতায় যা শ্রীশব্দ-বাচ্য, মুদ্গল ও চণ্ডীতে তাই কান্তি, বপু, পুষ্টি ও লক্ষ্মী শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। গীতায় বলা হয়েছে স্মৃতি ও মেধা, পুরাণ দুটিতে স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধি। এখানে বাক্ গীতায় বিশেষগুণ, দয়া চণ্ডিকায় বিশেষ, মুদ্গলে বিশেষ ক্রিয়া। গীতা ও চণ্ডী—উভয়ত্রই ক্ষমা বা ক্ষান্তির উল্লেখ আছে। লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা ও তুষ্টির নাম করা হয়েছে পুরাণ দুটিতে।

পুনরুক্তি বাদ দিয়ে গীতার শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমার সঙ্গে পুরাণোক্ত ক্রিয়া, তুষ্টি, শ্রদ্ধা, দয়া ও লজ্জাকে সংযোজিত করে প্রাচীন ভারতীয় ভাবনায় নারীর আদর্শ গুণাবলীরূপে উপস্থাপিত করা চলে।

বস্তুতপক্ষে গীতা ও চণ্ডীর মন্ত্র একই বক্তব্যের দুটি দিক। গীতায় নারীগণের মধ্যে

বিকশিত গুণাবলীতে ভগবানের বিভূতি প্রকাশিত হয়েছে আর চণ্ডীতে সর্বভূতে প্রকটিত গুণগ্রামে বহুরূপে প্রত্যক্ষ হয়েছেন দেবী স্বয়ং। মুদ্‌গলে যে এক একটি গুণ এক একটি নারীরূপ পরিগ্রহ করেছে তার দ্বারা গুণ ও গুণীর অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হয়েছে এবং এঁদের অধিকাংশকে ধর্মের পত্নী বলায় এই গুণগুলি যে ধর্মের পরিপূরক সমসত্তা—এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ত্রয়োদশ কন্যার মধ্যে স্মৃতির পতি ঋষি অঙ্গিরস, ক্ষমার পতি ঋষি পুলহ আর বাক্‌পতি স্বয়ং বিষ্ণু। ঋষিদের স্মৃতিতেই হারিয়ে যাওয়া বেদার্থ সংরক্ষিত, তাঁদের তপস্যার স্বাভাবিক ফল অহিংসা ও ক্ষমা। এজন্যই হয়তো স্মৃতি ও ক্ষমাকে ঋষিপত্নী বলা হয়েছে। 'শব্দ' হতেই এই জগতের উৎপত্তি। বাকের পিতা তাই ব্রহ্মা, আর এই বাঙ্ময়জগতের পালক হলেন বিষ্ণু তাই সঙ্গতভাবেই তিনি বাগীশ্বর। গীতা ও পুরাণ দুটিতে গুণগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ নারীরাই। সুতরাং এই বারোটি গুণকে প্রাচীন ভারতীয় নারীর আদর্শ গুণাবলীরূপে স্বীকার করতে বাধা হওয়ার কথা নয়।

তবুও মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে। যে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের মধ্যে নিজের বিভূতির পরিচয় দিতে গিয়ে নির্দ্বিধায় বলেছেন—আমি বৃষ্ণীবংশে বাসুদেব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়—'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ'—তিনি কেন বিশেষ কোনও নারীরূপে আপন বিভূতির পরিচয় দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন নানা নারীর নানা গুণরূপে? নররূপধর বাসুদেবের চতুষ্পার্শ্বে তো বৃষ্ণি ও কুরুবংশের একাধিক গুণান্বিতা ও দীপ্তিময়ী নারী ছিলেন; ছিলেন দেবকী, সত্যভামা, রুক্মিণী, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা—এঁদের কারও মধ্যেই কি তিনি তাঁর বিভূতিধারণের যোগ্য পাত্র খুঁজে পেলেন না? যে গুণসপ্তকের উল্লেখ তিনি করেছেন তার একত্র সন্নিবেশ যে একান্ত দুর্লভ তা বোঝানোর জন্যই কি মন্ত্রটিতে বহুবচনান্ত 'নারীণাম্' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে? সন্দেহ নেই, তালিকার এক বা একাধিক গুণ থাকলেই যে-কোনও মানুষ সমাজে পূজ্যরূপে বিবেচিত হতে পারেন এবং আচার্য শংকরের ভাষায় এইগুণগুলি অতিসামান্যভাবে থাকলেও যে-কোনও মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করে থাকেন। (যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে।)

গীতা ও পুবাণ দুটিতে উল্লিখিত মোট বারোটি গুণ একাধারে দুষ্প্রাপ্য হলেও আমরা আনন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি এযুগে নারীরূপে অবতীর্ণা জগন্মাতা আমাদের একান্তে আরাধনার, নিভৃতে ভালোবাসার মা শ্রীসারদা দেবীর চরিত্রে সেগুলি প্রস্ফুটিত শতদলের মতো পূর্ণ বিকশিত।

এ-মন্তব্য যে আবেগবিহ্বল সন্তানদের নিছক ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র নয় তা মায়ের চরিত্রের সঙ্গে গুণগুলির শাস্ত্রীয়লক্ষণ মিলিয়ে অনায়াসে প্রমাণ করা যেতে পারে। অধিকন্তু মায়ের তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা-মেশা সম্ভ্রম-জাগানো স্নেহকোমল ব্যক্তিত্বের বিচিত্র দিক যা কোনও শাস্ত্রবচনেই উদ্‌ঘাটিত হয়নি (হওয়া সম্ভবও নয়) তা ব্যাপক অর্থে শ্রীপর্যায়ে আলোচনা করে দেখানো যেতে পারে মায়ের অনুপম ব্যক্তিত্বের মধুরিমা বস্তুত ওই দ্বাদশগুণকে অতিক্রম করে আপন উত্তুঙ্গ মহিমায় বিরাজ করছে।

আলোচ্য শাস্ত্রোক্ত গুণগুলির মধ্যে শান্তি ও কীর্তিকে গুণ না বলে গুণের ফল বলাই ভালো। তুষ্টি বা সন্তোষের প্রত্যক্ষ ফল শান্তি আর সকল গুণের অনিবার্য ফল কীর্তি, যাকে আনন্দগিরি ব্যাখ্যা করেছেন 'ধার্মিকত্বের জন্য প্রসিদ্ধি'রূপে। ধার্মিকত্ব বলতে কর্তব্যপরায়ণতা ও ঈশ্বরানুরাগ দুই-ই বোঝাতে পারে। ধর্ম শব্দের নানা অর্থের মধ্যে এই

দুই অর্থ বহুপ্রচলিত ও বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে যে এই দ্বিবিধ ধার্মিকত্বেরই পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে এ-বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

অন্যান্য গুণগুলির মধ্যে প্রথমে আসে শ্রী। শ্রী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, কান্তি, শোভা—যা বলা বাহুল্য, অন্তরের ও বাহিরের উভয়প্রকার সৌন্দর্যকে বোঝাবে। বাংলাভাষায় সামগ্রিকভাবে একে বলা হয় 'লক্ষ্মীশ্রী।' শ্রীশ্রীমার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শ্রীর কথা বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। সন্তানদের দৃষ্টিতে মা লক্ষ্মীস্বরূপিণী, নিজমুখের সতর্ক-স্বীকৃতিতেও তিনি তাই—"মায়া বৈকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।"[১] শ্রীমায়ের পল্লীলক্ষ্মীর রূপ সারদেশানন্দ মহারাজের লেখনীতে যেমনভাবে অঙ্কিত হয়েছে অনুধ্যানের আকাঙ্ক্ষায় তার কিয়দংশের উদ্ধৃতি না দিয়ে পারা যায় না। "সতীশ বিশ্বাসের বাড়ী মা স্বয়ং উপস্থিত। গোময় লিপ্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঁচু বারান্দায় পূর্বমুখী হইয়া মা বসিয়া আছেন... নীচে পা ঝুলিতেছে। কোলের উপর হাত-দুখানি, পরিধানে লাল সরুপাড় শুভ্রবস্ত্র, ঈষৎ ঘোমটা টানা, প্রসন্ন মুখমণ্ডল, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশরাশি বক্ষের দক্ষিণ পাশ হইয়া নীচে ঝুলিতেছে। মা বসিয়াছেন এমনইভাবে, দেখিলে মনে হয় যেন মা লক্ষ্মী স্বয়ং ভাগ্যবান গৃহস্থের দরজায় উপবিষ্টা, পাশেই ধান্যপূর্ণ মরাই প্রান্তর শোভা বিস্তার করিয়া তাঁহার শুভাগমন সূচনা করিতেছে।"[২]

সহজাত শ্রী ও দিব্যসুষমায় মণ্ডিত শ্রীমায়ের মমতাভরা নয়নদুটি সর্বজীবের স্বাভাবিক আশ্রয়। সেই নিরাভরণ, অনাড়ম্বর শান্তশ্রী ভগিনী নিবেদিতার অনুভবে বাতাস, সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—ভগবানের এইসব নীরব রচনার মতো আমাদের জীবনে অজানিতে প্রবেশ করে শান্তি ও আনন্দে আমাদের ভরিয়ে তোলে। নহবতের অতিক্ষুদ্র ঘরখানিতে মা থাকছেন অথচ কেমন গুছিয়ে রাখছেন সবকিছু। সাংসারিক কাজ, তা-ও করছেন পূজাবুদ্ধিতে, শিল্পদৃষ্টিতে ও আনন্দের ছন্দে—যেভাবে সরলরেখায় সারি সারি আসন পাতছেন, সেইভাবেই নিপুণভাবে ময়দা মাখছেন, রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে মা ভবতারিণীর জন্য মালা গাঁথছেন, ঠাকুর দেখে মুগ্ধ; নিবেদিতার জন্য ছোট্টো পশমের পাখা তৈরি করেছেন, আনন্দে বিহ্বল শিল্পী-কন্যা বলে উঠেছেন, "কী সুন্দর, কী চমৎকার!"[৩]

শ্রীশ্রীমায়ের ঋজুব্যক্তিত্ব নম্রতায় অভিষিক্ত হয়ে কী মহিমোজ্জ্বল স্নিগ্ধশ্রী-ই না প্রকাশ করেছে! তাঁকে অস্বীকার করার সামর্থ্য হয়নি কারও, সন্তানদেব তো নয়ই স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণেরও নয়, যিনি একাধারে তাঁর পতি এবং গুরু। গুরুর কথা কেমনভাবে মান্য করা উচিত—পাশ্চাত্য মহিলাদের জিজ্ঞাসায় মায়ের স্বচ্ছ ও সপ্রতিভ জবাব—আধ্যাত্মিক বিষয়ে গুরুকে সম্পূর্ণ মেনে চলতে হবে। অন্য বিষয়ে নিজের বুদ্ধিমতো চলাই ভালো। বিবেকসম্মত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অনুসারে মা নিজ দায়িত্বেই আজীবন সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ছেলেদের বেশি রুটি দেওয়ার ব্যাপারে, অনুপযুক্তা নারীর হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাতের থালা তুলে দেওয়ার ঘটনায় দৃঢ় অথচ বিনম্রভাবে মা নিজের আচরণ সমর্থন করেছেন; আর প্রতিবাদের কী শক্তিময়ী নীরব বাণী! বেশি খরচের অনুযোগে ঠাকুরের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সোজা ফিরে এসেছেন নহবতের ঘরে। তাঁর শক্তিস্বরূপিণী সারদা দেবীর মহিমা বুঝেছিলেন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ, যে-কারণে ভাগিনেয় হৃদয়কে বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন তাঁর অমর্যাদা না করতে : "এর ভেতর যে আছে সে ফোঁস করলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কেউ তোকে রক্ষা করতে পারবে না।"[৪] মা নিজেও

জানতেন সেকথা, তাই সারাজীবনে কল্যাণী জননী কারও কোনও দুর্বাক্য ধরেননি, পরম ঔদাসীন্যে বলেছেন, "দুটি কথা বই তো নয়।"

মায়ের সর্বগ্রাসী মাতৃত্ব কেবল সন্ন্যাসিপ্রবর সারদানন্দ ও ডাকাত আমজাদের বৈষম্য অস্বীকার করেছে তাই নয়, ভুলেছে মনুষ্য ও ইতরপ্রাণীর, এমনকি জড় ও চেতনের পার্থক্য; মুছে দিয়েছে দেশ ও কালের সীমারেখা। সন্তানের প্রশ্নের উত্তরে মা নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন তিনি ইতর প্রাণীদেরও মা। "আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি?"[৫] অর্থাৎ তিনি সর্বজীবের অন্তঃস্থ চিরন্তন মাতৃত্ব। তাই তিনি সবযুগে সর্বজীবের মা—যারা আসেনি, যারা এসেছে, যারা আসবে, হয়তো যারা আসবে না তাদের সকলেরই মা।

আলংকারিকদের অভিমতে যে রূপ প্রতিক্ষণেই নতুন লাগে সেই নবনবরুচিরা শোভাই আমাদের রমণীয় বলে বোধহয়—'ক্ষণে ক্ষণে যা নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।' লজ্জাপটাবৃতা জগন্মাতার নারীরূপের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগায় ইন্দ্রধনুর বৈচিত্র্য—কী রমণীয় সেই রূপমাধুরী। মা কখনও হাসিখুশি শিশু, শিশুদের খেলায় বুড়ি হচ্ছেন, জগদম্বা আশ্রমে দোলনায় মনের আনন্দে দোল খাচ্ছেন, কখনও বা সঙ্গিনীদের দোল দিচ্ছেন, যোগীন-মার কাছে অসতর্কভাবে আত্মপ্রকাশ করে ফেলে আদরিণী কন্যার মতো লজ্জায় তাঁর বুকে মুখে লুকোচ্ছেন। বৃন্দাবনে চপলা বালিকার মতো এ-মন্দির থেকে ও-মন্দিরে যাচ্ছেন। অসুখের সময় ছোট্টো খুকিটির মতো আবদার করছেন, খিদের মুখে তৃপ্তি করে 'ময়না কোটা' খাচ্ছেন। কখনও বা তাঁর বেলা রুটি ফুলছে না শুনে অভিমান ভরে চাকি বেলুন সরিয়ে রাখছেন, সন্তান প্রবোধ দিলে সব ভুলে গিয়ে আবার বাচ্চা মেয়েটির মতো বেলতে বসছেন। কখনও মা যেন একেবারে অজ্ঞ, হ্যারিকেনের চিমনিতে নাকি নানা কলকব্জা তাই খুলতে পারেন না। ঘড়িতে দম দেওয়া—সেও নাকি এক মহাবুদ্ধির কাজ। "কত বয়স হয়ে গেল বল দেখি!—আমরা বাপকে দেখেছি, ভাসুরকে দেখেছি।"[৬]—কী সব মানে না হওয়া অদ্ভুত কথা।

এত নীরব, শান্ত আর লজ্জাশীলা, কিন্তু অন্যদিকে কী রসবোধ! তাঁর রঙ্গরস শুনে কোঠারে সঙ্গিনীরা অবাক—"মা তুমি এতও জানো!"

ষোড়শী পূজায় যিনি অনায়াসে সমাধিস্থা, ধ্যানমগ্নতা যাঁর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ, তিনি আবার যোগীন-মাকে দিয়ে ঠাকুরকে বলে পাঠাচ্ছেন, তাঁর যাতে একটু ভাব-টাব হয়, তাই করে দিতে। তরুণী-বধূরূপে তেলোভেলোর মাঠে অকুতোভয়ে যিনি ডাকাতের সম্মুখীন হয়েছিলেন, পরিণতবয়সে শিবুদাদার সঙ্গে জয়রামবাটী আসার পথে কী অসহায়ভাবই না দেখাচ্ছেন। জয়রামবাটীতে স্বদেশী ছেলেদের ব্যাপারে পুলিশের খোঁজখবরে মায়ের ভয় করে কিনা জানতে চাইলে সাধারণ পল্লীবালার মতো পুলিশের কর্তাকে বলছেন, "হ্যাঁ, বাবা আমার ভয় করে।" বদনগঞ্জে পিলের দাগ নেওয়ার অসহ্য কষ্ট যিনি নীরবে সহ্য করেছেন তিনিই সামান্য ফোঁড়ার অস্ত্রোপচারের খবরে কী ভয়টাই না পাচ্ছেন। আবার পরমাপ্রকৃতি মায়ের অভয়ারূপে কী তেজোদৃপ্ততা। তা প্রকাশ পেয়েছে সিন্ধুবালাদের ঘটনায়, উদ্বোধনের বাড়ির সামনের বস্তিতে স্ত্রীকে প্রহাররত স্বামীকে উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনায়, সর্বোপরি অসুরদলনী মহাশক্তিরূপে হরিশের দণ্ডবিধানে। একদিকে সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় গভীর বাৎসল্যে নয়ন অশ্রুপূর্ণ—অন্যদিকে আদর্শভ্রষ্ট হওয়ায় সেই সন্তানকেই মঠত্যাগের আদেশ দিতে অকুণ্ঠিতচিত্ত। সকল বৈপরীত্যের স্বাভাবিক সমন্বয় একমাত্র আদ্যাশক্তি মহামায়ার মধ্যেই

সম্ভব, অন্যত্র নয়। এজন্যই বোধহয় ভগবান কোনও মানবীরূপের মধ্যে তাঁর বিভূতিধারণের যোগ্যপাত্র পাননি।

গীতায় দ্বিতীয় নারীগুণ বাক্। বাক্ শব্দের সাধারণ অর্থ কথা, বাক্যব্যবহার। আমাদের দেশে প্রশংসনীয় বাক্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে 'সুনৃতা গিরঃ' সত্য 'অথচ মধুর বচন, যা একাধারে একান্তই দুর্লভ। তাই শাস্ত্রের উপদেশ—'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।' সত্য বলবে প্রিয় অর্থাৎ মধুরবাক্য বলবে, অপ্রিয় সত্য বলে লোকের মনে ব্যথা দেবে না। শ্রীশ্রীমা যিনি ঠাকুরের ভাষায় 'সারদা, সরস্বতী' তিনিও বলছেন—'অপ্রিয় সত্যবচন কদাপি না কয়।' দুঃখিতচিত্তে বলছেন, "সত্য বলতে বলতে গোলাপের চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেছে।"[৭] এর তাৎপর্য, মানুষকে রূঢ় সত্য বলে আঘাত দিতে যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ থাকে, উগ্র সত্যনিষ্ঠায় তা যেন উপেক্ষিত না হয়। অসুস্থ শরীরেও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লক্ষ্য করে বলছেন—'মিষ্টি কথা বল রাধি, মিষ্টি কথা বল।' নিজে কেমন মিষ্টি কথায় অপ্রিয় কাজ করছেন তার একটি উদাহরণই যথেষ্ট। চন্দ্রবাবুকে মা রাধুর জন্য যে ট্রাঙ্ক কিনতে দিয়েছিলেন, চন্দ্রবাবু তার হিসেব দেননি, হিসেবটা চাইতে হবে। মা বলছেন—"চন্দ্র, রাধুর ট্রাঙ্কটা খুব পছন্দ হয়েছে, তা তোমাকে যে টাকা দিয়েছিলাম তাতে কুলিয়েছে না আরও লাগবে?" চন্দ্রবাবু ভুলে গিয়েছিলেন, লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ হিসেব দিলেন।

মায়ের কবিতার মতো কথাগুলি এখন ভক্তদের মুখে মুখে ফেরে। 'যে সয়, সে রয়', 'সত্যের সমান গুণ নাই, সন্তোষের সমান ধন নাই।' 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যার সঙ্গে যেমন তার সঙ্গে তেমন'—অর্থাৎ মায়ের উপদেশ হল, স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী লোকব্যবহার করতে হবে। আর কী সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর মায়ের বাণী। উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। "ফুল নাড়তে চাড়তে যেমন ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে যেমন গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পারে, এক্ষুণি হয়।"[৮]

গীতার তৃতীয় নারীগুণ—স্মৃতি, যা আনন্দগিরির ভাষায় চিরানুভূত স্মরণশক্তি অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে মনে রাখার ক্ষমতা। শ্রীমায়ের কৈশোরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাংসারিক কর্তব্য থেকে শুরু করে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। মা তাঁর সূক্ষ্ম, সুন্দর, একাগ্র মন দিয়ে সমস্ত শিখেছেন এবং অপূর্ব স্মরণশক্তিবলে সবই সারাজীবন মনে রেখেছেন। কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসিসন্তানকে মা বলেছেন, অধিকারিভেদে কতরকমের মন্ত্র ঠাকুর মাকে শিখিয়েছিলেন। সন্তানবৎসলা জননীরূপে বিভিন্ন ভক্তসন্তানদের অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। ফলে শ্রীমায়ের কাছে সবাই পরিতৃপ্ত, চরিতার্থ। ভক্তদের নানা আবদার মাকে মনে রেখে মেটাতে হয়। প্রসাদ নিয়ে যাবেন বলে ভুলে গিয়ে ভক্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছেন, মা জেগে বসে প্রসাদ শুকিয়ে রাখছেন পাছে কাকে মুখে দেয়। এ ঘটনা বিরল নয়। কোনও সন্তানের আসার কথা, মা মনে রেখে দিনের পর দিন তার প্রাপ্য 'পিঠে' ভেজে ভেজে তুলে রাখছেন—এরকম বহুবার ঘটেছে। 'ভুলে থাকি তবুও দেখি ভোলে না মা একটিবার'—এ কেবল গানের কথা নয়, ভক্তসন্তানদের উপলব্ধ সত্য।

গীতার চতুর্থ নারীগুণ মেধা যাকে আনন্দগিরি বলেছেন, গ্রন্থধারণক্ষমতা। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে-কোনও বিষয়ের সূক্ষ্ম অর্থ উপলব্ধির সামর্থ্য এবং এমন এক গ্রহিষ্ণুতা যার বলে অনায়াসে নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের আত্মীকরণ সম্ভব। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষা তাঁর সরস্বতী-

মেধার আলোকে উজ্জ্বল করে মা একাধারে বিভিন্ন ও বিচিত্র চরিত্রের মানুষ নিয়ে সুবৃহৎ সংসার ও সদ্যগঠিত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের পরিচালনা করেছেন এবং অগণিত সাধু, ভক্তের আধ্যাত্মিক জীবন সংগঠিত করেছেন নির্ভুল লক্ষ্যে; দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়া দূরে থাক একবার দ্বিধাগ্রস্ত পর্যন্ত হননি। মায়ের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতে গিয়ে মনস্বিনী নিবেদিতা জানিয়েছেন, কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে মাকে কখনও একমুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করতে দেখা যায়নি। পাশ্চাত্য বিবাহসংগীত শুনে মার অপূর্ব গ্রহিষ্ণু মনের স্বতঃস্ফূর্ত সমাদর স্বভাবতই তাঁর বিদেশিনী কন্যাদের বিস্ময়ে বিহ্বল করেছে। মা তাঁর সহজপ্রজ্ঞা ও অপূর্ব মেধাবলে সন্তানদের যে-কোনও সমস্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন চূড়ান্ত সমাধান। স্বামীজীর কথায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় সারদানন্দ মহারাজকে যোগানন্দ মহারাজ পরামর্শ দিয়েছিলেন, "শরৎ, তুই মাকে ধর।" ফলত সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত শরণাগত হয়েই সারাটা জীবন কাটিয়েছেন।

প্লেগের সময় সেবাকাজেব জন্য যথেষ্ট টাকা না পাওয়ায় মঠের জমি বিক্রি করতে উদ্যত স্বামীজীকে মা তাঁর অকাট্য যুক্তিবলে নিরস্ত করেছেন। একমাত্র মায়ের অভিমতের উপর নির্ভর করে মাস্টারমহাশয় সঙ্ঘের সেবাকাজকে ঠাকুরের কাজ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরের পটপূজার প্রেক্ষিতে অদ্বৈতবাদের সমর্থনের মায়ের পত্রটি তো এক ঐতিহাসিক দলিলরূপ চিরস্মরণীয়। কোনও শাস্ত্র না পড়েও একজন অজাতবাদিরূপেই যেন মা জাগ্রত অবস্থাকেও স্বপ্ন বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, কোনও সন্তানের প্রশ্নের উত্তরে মা সন্দেহাতীতভাবে জানিয়েছেন, পৃথিবী ছাড়া আর কোনও গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। এখনও পর্যন্ত গ্রহ-বিজ্ঞান বিপরীতধর্মী কোনও তথ্য দিতে পারেনি। গুরুরূপে মা বিরজানন্দ মহারাজের দীর্ঘদিনের অসুস্থতা, ধ্যানপদ্ধতি বদল করেই নিরাময় করেছেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দীর্ঘসময়ব্যাপী সমাধি ভঙ্গ করে ব্যুত্থান ঘটাতেও প্রয়োজন হয়েছে মায়েরই হস্তক্ষেপ। আবার কী প্রখর বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মা জয়রামবাটীর ট্যাক্সের টাকা মকুব করিয়েছেন, কামারপুকুরে ঠাকুরের বাড়ির বন্দোবস্তে মঠ ও পরিবারের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিকূলতায় মঠ ও মিশনের বিপন্ন অবস্থা দেখা দিলে সারদানন্দ মহারাজকে লর্ড কারমাইকেলের কাছে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

গীতায় উল্লিখিত পরবর্তী গুণ দুটি ধৃতি ও ক্ষমা। ধৃতি অর্থ ধৈর্য, বেঙ্কটের মতে এর মানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ্য করার শক্তি, পুরুষোত্তমজীর মতে বিপদে নিজ ধর্মে অটল থাকা। অপরিসীম ধৈর্যে মা শৈশব থেকে প্রায় আজীবন দারিদ্র্যের ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর অর্থকষ্ট যখন চরমে উঠেছে, নুনটুকুও জোটেনি তখনও কারও কাছে চিৎ হাত না করার নিজ আদর্শ বজায় রেখে পরম ঔদাসীন্যে বলেছেন, "অমন ঠাকুরই চলে গেলেন, আমি টাকা নিয়ে কি করব?"[১] তরুণী বধূটি স্বামীর উন্মাদ অবস্থার প্রচারে একদিকে যেমন সমাজের উপেক্ষা ও গঞ্জনা সহ্য করেছেন অন্যদিকে স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বিধির বিধানে এই অনভিপ্রেত ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তাহলে পত্নী হিসেবে তাঁর একান্ত কর্তব্য স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করা। কাশীপুরে ঠাকুরের শরীরত্যাগের প্রাক্‌কালে বিমর্ষ সন্তানদের সান্ত্বনা দিয়ে নিজ সেবাধর্মে অটল থেকেছেন। উত্তরকালে আত্মীয়স্বজনদের দুর্ব্যবহার ও উপদ্রব, অজস্র ভক্তের বিচিত্র আবদার, শারীরিক

ক্লেশ, অর্থকষ্ট—সবই তিনি নীরবে সহ্য করে গেছেন। মা যে বলতেন, "পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই।"[১০]—তার সার্থক রূপায়ণ তাঁর নিজেরই জীবন।

ক্ষমা শব্দের অর্থ আনন্দগিরি করেছেন মান ও অপমানে নির্বিকার থাকা। বেঙ্কট আত্মার পরিচয় দিয়েছেন সুন্দর একটি লক্ষণ উদ্ধৃত করে—"আক্রুষ্টোঽভিহিতো বাপি নাক্রোশেন্ন চ তাড়য়েৎ। অদুষ্টো বাঙ্মনঃ কায়ৈঃ সা ক্ষমা পরিকীর্তিতা॥"—অর্থাৎ কুবাক্য বললেও বা আঘাত করলেও যা (যে শক্তি) কুবাক্য বলে না বা প্রত্যাঘাত করে না, যা কায়মনোবাক্যে নিষ্কলুষ, তাই ক্ষমা। শ্রীশ্রীমায়ের সমগ্র জীবনই ক্ষমামণ্ডিত। শাস্ত্র বলেন শক্তিহীনদের ক্ষমা গুণ, কিন্তু যাঁর শক্তি আছে ক্ষমা তাঁর ভূষণ—'ক্ষমা গুণো হ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।' শক্তিস্বরূপিণী মা আজীবন নানাজনের নানা অপরাধ অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করে গেছেন। পাগলিমামী ও রাধুর অবুঝ অত্যাচারে অস্থির হয়েও কিছু বলেননি। রাধু পা দিয়ে ঠেললে তাড়াতাড়ি নিজের পায়ের ধুলো রাধুর মাথায় দিয়ে হাতজোড় করে বলছেন, "ঠাকুর ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ!"[১১] কত উদাহরণই না আছে। ভক্তপ্রবর বলরামবাবু তাই এককথায় মায়ের পরিচয় দিয়েছেন 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী' বলে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে গীতার গুণগুলির পরিচয় দেওয়ার পর পুরাণ দুটি থেকে সংগৃহীত গুণাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। সেখানে আমরা প্রথম উল্লেখ করেছি ক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতার কথা। ক্রিয়াশীলতার তাৎপর্য হল অনলসভাবে কর্মরতি বা ভালোবেসে কাজ করা। শ্রীশ্রীমায়ের যে-কোনও জীবনীগ্রন্থেই ভোর তিনটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর নিরলস ক্রিয়াশীলতার পরিচয় মেলে। আশৈশব মা দরিদ্র পরিবারের শ্রমসাধ্য কর্ম, দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব সেবা, আত্মীয়স্বজন ও ভক্তমণ্ডলীর জন্য অশেষ ক্লেশস্বীকার—সবই হাসিমুখে করে গেছেন। পরিণত বয়সে যখন সামর্থ্য কমে গেছে তখনও কর্মভারাক্রান্ত মায়ের সখেদ উক্তি—"আজও দিনটা বৃথাই গেল। একজনও তো এল না।"[১২] কর্মরতির প্রশংসা করে মা বলেছেন, "কাজ করতে হয়, কাজে মন ভাল থাকে।"[১৩] শ্রীশ্রীমায়ের কর্মরতির অনুপ্রেরণা সর্বভূতে ঈশ্বরানুভব। জীবসেবা তাই ইষ্টসেবা। এত কর্মের মধ্যেও মা দিনে লক্ষজপ করেছেন। ইষ্টে মন নিবিষ্ট রেখে শ্রীমায়ের নিরলস কর্ম তাই কর্মযোগে পরিণত হয়েছে, পক্ষান্তরে বাসনাতাড়িত সাধারণ মানুষের অসাধারণ কর্মব্যস্ততা নিছক কর্মভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা কেবল অশান্তিই ডেকে আনে।

পুরাণোক্ত আর একটি গুণ তুষ্টি, যার অর্থ সন্তোষ—যা পেয়েছি অনেক পেয়েছি, এইরকমের বোধ—'পর্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু।' সন্তোষামৃত-তৃপ্তা নির্বাসনা মায়ের হৃদয়ে শান্তিঘট নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। সারাজীবন এত কষ্ট সহ্য করেও মা অনায়াসে বলতে পারছেন—"অশান্তি কাকে বলে কোনদিন তা জানলুম না।"[১৪] যে-কোনও অবস্থায় যে-কোনও স্থানে মা সমান সন্তুষ্ট। নহবতে ছোটো ঘরখানির জীবনচর্যার কথা মনে করে উত্তরকালে মা বলছেন, "তখন পটপটে মাদুরে ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিয়ে যেমন ঘুম হত এখন খাট বিছানায় তেমনই ঘুম হয়, কোন তফাৎ বোধ হয়না।" নহবতে সারাদিন পরিশ্রমের পর ও দীর্ঘকাল ঠাকুরের দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েও মা ভক্তদের সঙ্গে ভগবদানন্দে ঠাকুরের নৃত্যগীতের ধ্বনি শুনেই তৃপ্ত, কোনও ক্ষোভ নেই, অনুযোগ নেই। হৃদয়ের তীব্র কটূক্তির পর মা কালীর সামনে শ্রীমায়ের প্রতিক্রিয়া—"মা যদি আনাও তো আসব।" লোকব্যবহারে মা

যে অতুলনীয়া—কী তার রহস্য? মা নিজেই বলেছেন—"যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে; কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া কাউকে বেসো না।"[১৫] ভগবানকে ভালো না বেসে সরাসরি মানুষকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসলেই যত বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়, প্রত্যাশা জন্মায়, প্রত্যাশা পূরণ না হলেই জাগে ক্ষোভ, অসন্তোষ। ঐহিক বাসনারাহিত্যে ও ঈশ্বরানুরাগ যা এককথায় ঠাকুরের সংজ্ঞায় বৈরাগ্য তার বলেই মায়ের এত সন্তোষ এবং সর্বশোভন আচরণ।

নিরুক্তকার যাস্কের মতে সত্যে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার নাম শ্রদ্ধা।—'শ্রৎ সত্যং তস্মিন্ ঋধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা।' পরবর্তী কালে তা বিশ্বাসের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্যে তো বটেই আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও শ্রদ্ধাপদবাচ্য। শ্রীমায়ের পারমার্থিক দৃষ্টিতে নিজের, সকল জীবের, এমনকি সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ যে ব্রাহ্মী সত্তা তা অপরোক্ষরূপে অনুভূত। কাজেই ঐহিকদৃষ্টিতে যোগ্যাযোগ্য বিচারের প্রক্রিয়ার কোনও অপেক্ষা না রেখেই সর্বভূতে অসীম শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা গিয়েছে মায়ের জীবনে। মা বলছেন, "যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।"[১৬] মা তাই সন্ন্যাসিসন্তানের আসন পায়ে ঠেকলেও মাথা ঠেকাচ্ছেন, পুরোহিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করছেন। বর্ণভেদ অস্বীকার করে মানী ব্যক্তিকে মান দিচ্ছেন। পাগলিমামীর গহনাপ্রসঙ্গে তাঁর প্রলুব্ধ পিতার অসম্মান আশঙ্কায় ব্যাকুল হচ্ছেন, পাদস্পর্শ করে তাঁকে অনুকূল করতে চেষ্টা করছেন। এমনকি বেড়ালের মাথায় পা দিতে নিষেধ করছেন, ঝাঁটাটিকেও মর্যাদা সহকারে যথাস্থানে রাখতে বলছেন।

পুরাণে আর একটি গুণ দয়া, যার অর্থ করুণা—সর্বজীবে কোমল মনোভাব। শ্রীশ্রীমায়ের দয়ার পরিমাপ করে এমন সাধ্য কার? তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার দয়া যে কার উপর নেই তা বুঝি না, প্রাণীটা পর্যন্ত।" 'করুণা-পাথার জননী আমার এসেছ করুণা করিতে।' তাঁর অপার করুণার কথা স্মরণ করে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নট অপরেশচন্দ্র লিখছেন, "মানুষ খোলটা দেখে ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই... ভক্তজননী মা.. রঙ্গালয়ের কোনো পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না সে দয়ার পাত্রাপাত্র নাই,... ব্যবহারিক জগতের কোন বিধিনিষেধ মানে না; সে কেবল জাতি-নির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।"[১৭]

এই সকল দুর্লভ-গুণান্বিতা শ্রীশ্রীমা তাঁর মহিমা ঢেকে রেখেছেন লজ্জাপটের আবরণ টেনে। বিদ্যুদ্‌বাহী মহাশক্তিশালী তার যেমন দেখতে অন্য সাধারণ তারের মতোই অকিঞ্চিৎকর, শক্তিস্বরূপিণী মা তেমনই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলকে ভুলিয়ে এক সাধারণ পল্লীবালাব ছদ্মবেশে জীবনটি কাটিয়ে গেলেন। গিরিশচন্দ্রের ভাষায়, "তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শস্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।"[১৮]

অবতারকে কে চিনতে পারে? তার ওপর যদি তাঁর কোনও ঐশ্বর্য না থাকে! জগতে বেগুনওয়ালা, কাপড়ওয়ালার সংখ্যাই তো বেশি। পৃথিবীর সকল মেয়ের মধ্যে মাতৃভাবের বিকাশ ঘটানোর জন্যই এবার মায়ের আবির্ভাব। আধুনিক নারী নানা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি অর্জন

করে নিজেদের যোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছে সন্দেহ নেই; কিন্তু অহংকার আর ঔদ্ধত্য দিয়ে নয়, বিনম্র দৃঢ়তা দিয়েই যে নারীকে অন্তঃশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে— এ সত্য বোঝানোর জন্যই আদ্যাশক্তি মহামায়ার লজ্জাপটাবৃত অকিঞ্চিৎকর নারীবেশ।

যদিও মায়ের চরিত্রে শাস্ত্রোক্ত গুণাবলীর পূর্ণ প্রকাশের একটা রেখাচিত্র তুলে ধরাই এ-নিবন্ধের উদ্দেশ্য তবু পরিশিষ্টে কিছু নিবেদন আছে। শ্রীপর্যায়ে আলোচনাকালে মায়ের দৃঢ়চিত্ততা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অন্যায়ের প্রতিবাদ, বিশ্বাত্মবোধ, সৌন্দর্যচেতনা প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণগুলি একটু একটু ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে—এই গুণগুলি আধুনিক নারীর আদর্শ বলে পাশ্চাত্যদৃষ্টিতে স্বীকৃত। কাজেই শ্রীশ্রীমাকে কেবল ভারতীয় নারীর প্রাচীন ও নবীন আদর্শরূপে সীমাবদ্ধ না করে আধুনিক আন্তর্জাতিক নারীর আদর্শরূপে উপস্থাপিত কবাই সমীচীন। বস্তুতপক্ষে চিরন্তন নারীগুণের আকররূপে শ্রীশ্রীমা সর্বযুগের, সর্বদেশের নারীর আদর্শরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। তাই মনস্বিনী ভগিনী নিবেদিতার সিদ্ধান্ত— শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র শ্রীশ্রীমা, নারীর আদর্শ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।

'তাঁর সংসার ভালোবাসায় গড়ে উঠেছে'

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

তাঁর সংসার ভালোবাসায় গড়ে উঠেছে—মাত্র এই একটি কথার মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীমা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা কবলে দেখা যায়, সংগঠিত ধর্ম হিসেবে দুটি ধর্মের প্রসিদ্ধি লোকবিশ্রুত। একটি বৌদ্ধধর্ম, অন্যটি খ্রিষ্টধর্ম। ধর্মের ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধই সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারের অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে গড়ে তোলেন বৌদ্ধ সঙ্ঘ। পববর্তী কালে সেই একই কারণে যিশুখ্রিষ্টের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে খ্রিষ্টান সঙ্ঘ। সনাতন হিন্দুধর্ম কখনও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস করেনি। এখানে ধর্ম চিরকালই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ যে সন্ন্যাস আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা চিরদিনই সকল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে এক বন্ধনহীন মুক্তজীবন। আবহমান কাল ধরে এই-ই ছিল সন্ন্যাসের চিরাচরিত অনুসৃত পন্থা। কিন্তু উনিশ শতকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাবেব পরই এসেছে এক নতুন যুগ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ।"[১] এই নতুন যুগে সন্ন্যাস-জীবনেও নব অধ্যাযের সূচনা হয়েছে। তাই গিরিগুহায় বসে আত্মমুক্তির সাধনা ছেড়ে এযুগের সন্ন্যাসীর ব্রত হল, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। আপন মুক্তিসাধনের সঙ্গে যন্ত্রণাকাতর জীবের অশ্রুমোচনই এই যুগে সন্ন্যাসের মূলমন্ত্র।

এই নতুন যুগের ধর্ম কিন্তু পুরোনোকে বিসর্জন দিয়ে কেবল নতুন সৃষ্টিব প্রেরণায় মেতে উঠে প্রসারিত হয়নি। এ সনাতন ভারতের সঙ্গে আধুনিকতার সংযোগ ঘটিয়েছে। আর উভয় ধারার সম্মিলনে যে ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে, তা একদিকে যেমন আর্য-ঋষির প্রজ্ঞাপ্রসূত, অপরদিকে তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা-সঞ্জাত, সর্বসংস্কারমুক্ত এক উজ্জ্বল মানসিকতার পরিচায়ক! এই দুটি ধারার মিলনভূমিই শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি তাই তাঁর পূর্ববর্তী অবতার সকলেব পুনরাবৃত্তিমাত্র নন। নিজজীবনে সকল সাধনার ধারাকে একীভূত করে যিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, 'যত মত তত পথ'—তাঁর জীবন থেকে উৎসারিত ধর্ম মানবের অন্তরদেবতাকে জাগ্রত করে, সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বিশ্বমানবতাবোধের উন্মেষ ঘটাবে। তাই এই ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে, শ্রেয়ের পথে নিয়ে যাবেই।

অনেকে মনে করেন এই সঙ্ঘ গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা। কিন্তু সে ধারণা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত। এই সঙ্ঘ গড়ে ওঠার মূলে রয়েছেন ভারতের অধ্যাত্মসাধনার সকল পথ ও মতের পুঞ্জীভূত বিগ্রহস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। ভারতের সুপ্ত অধ্যাত্মচেতনাকে জাগ্রত করে যুগধর্ম

প্রবর্তনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। আর সেই আবির্ভাবের ফলে উত্থিত মহাশক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাকে সার্থক করতেই এই সঙ্ঘের স্থাপনা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্ঘ অভিন্ন। তিনি সঙ্ঘমূর্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাংগঠনিক শক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর শেষ অসুখের সময় কাশীপুরে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের একত্রিত করে ভ্রাতৃত্বের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের বীজটি বপন করে যান। এ সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ বলেছেন : কাশীপুর বাগানে... আমাদের সকলকে একত্রিত করে ভাবী সঙ্ঘের সৃষ্টি করবেন বলেই যেন ঠাকুরের ওই অসুখ। অবতারের লীলার গূঢ় রহস্য সাধারণ মানুষ কী করে বুঝবে?

সেদিনের রোপিত সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত। যে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর এই বিশাল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত তা ভালোবাসার, প্রেমের। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যে কী এক অহৈতুকী ভালোবাসা ছিল, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলেছেন, "একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে, এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল।"[২] বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দিব্য ভালোবাসার আধার। তাঁকে কেন্দ্র করে চারিদিকে সমুপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রবাহিত হত প্রেমের অবিরল ধারা। ভগবৎপ্রেমিকের সেই অপূর্ব ভাগবতী প্রেমধারার তরঙ্গস্পর্শ সকলেই অনুভব করে ধন্য হয়েছেন। শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য, "তিনি বলেছিলেন তাঁর (ঠাকুরের) ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে অনায়াসে দেহ ছাড়তে পারতেন। বলতেন, 'আহা, ওদের (ছেলেদের) একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম!' এতদিন তো এ বলেছে, 'নরেনবাবু কেমন আছেন?' ও বলছে, 'রাখালবাবু কেমন আছেন?'—এ রকম ছিল। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েননি।"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে সংহতিশক্তিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে জীবদ্দশাতেই এগারো জনকে গেরুয়াবস্ত্র দান করলেন। শুধু তাই নয়, ওইসকল ভদ্রসন্তানদের বৈরাগ্য উদ্দীপিত করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষে করতেও অনুপ্রাণিত করেছেন। কেননা ভিক্ষান্ন জাগতিক মলিনতা থেকে মুক্ত শুদ্ধান্ন। আবার নিজেও সেই পবিত্র ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে তাদের উৎসাহিত করেছেন। আবার দেখি, কাশীপুরে ঠাকুর যেদিন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হয়ে সকল ভক্তবৃন্দকে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করছেন, সেদিন কোনও ত্যাগী ভক্তই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকজন বসতবাড়ির ওপর থেকে সেই মাতামাতি লক্ষ্য করলেও তখনই সেখানে উপস্থিত হওয়ার কোনও আন্তরিক টান অনুভব করেননি। কারণ তাঁরা জানতেন, ঠাকুর তাঁদেরই একান্ত আপনার। তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ সন্তানদের কাছে এতটাই আপনার, এতটাই প্রিয় যে তাঁর সেই 'কল্পতরু'রূপে আত্মপ্রকাশের দিব্যমুহূর্তেও তাঁরা নতুন করে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ছুটে আসেননি।

বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠার মূলেও তিনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্তলীলা সাঙ্গ হলে কাশীপুরের উদ্যানবাটীটি ছেড়ে দিতে হল। ফলে কোনও সঠিক আস্তানার অভাবে তাঁর যুবক ত্যাগী সন্তানেরা একত্রিত হতে পারছিলেন না। ওইসময় ঠাকুরের রসদদার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র একদিন

সন্ধ্যায় পূজান্তে ধ্যানমগ্ন। হঠাৎ ঠাকুর তাকে দর্শন দিয়ে বলেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।"[৪] একাধিকবার এইপ্রকার দর্শন ও নির্দেশ পেয়ে তিনি উন্মাদের মতো ছুটে এসে প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে বললেন, "ভাই, একটা আস্তানা করো, যেখানে ঠাকুরের ছবি, তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি রেখে রীতিমত পূজার্চনা চলতে পারে, সেখানে তোমরা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা সেখানে গিয়ে জুড়োতে পারব।"[৫] সেকথা শুনে নরেন্দ্রের কী আনন্দ! সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনে তারকনাথকে প্রস্তুত হতে বলে পত্র লিখলেন। নতুন উদ্যমে বাড়ি খোঁজার কাজে নেমে পড়লেন। অবশেষে বন্ধু ভবনাথের সাহায্যে বরানগরের জীর্ণ বাড়িটি মাসে এগারো টাকায় ভাড়া পাওয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ যুবকভক্তদের ঘরে ঘরে গিয়ে ঠাকুরের ত্যাগবৈরাগ্যের কথা শুনিয়ে তাদের একত্রিত করলেন। অবশেষে নবেন্দ্রের অপূর্ব ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায়ে বরানগরের ওই জীর্ণ ভাড়াবাড়িতেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম মঠের সূচনা হল।

ধ্যান-ধারণা-সমাধি লাভের প্রবল প্রেরণায় বরানগরের ওই মঠে যে কয়জন যুবক তাপস একত্রিত হয়েছিলেন, তৎকালীন সমাজের কেউই তাঁদের সুনজরে দেখেননি। উপরন্তু তাঁদের সঙ্গী ছিল অভাবনীয় দারিদ্র্য। কিন্তু সেই কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল ধ্যান-ভজন, তপস্যার নিরন্তর স্রোত। এই দুঃসময়ে অসহায় যুবকদের একমাত্র সহায় ছিলেন শ্রীশ্রীমা। তাঁর স্নেহে প্রেমে তাঁরা আশার আলোক দেখেছিলেন। সে সময়কার স্মৃতিমন্থন করে স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী কালে বলেছিলেন : "আমাদের গুরুদেবের দেহান্তের পর দুঃখময় দিন এসে উপস্থিত হল। আমাদের জীবনের এক চরম দুঃসময় সেটা। সেদিন আমাদের সহানুভূতি দেখানোর কেউ ছিল না। শুধু একজন ছাড়া। সেই একজনের সহানুভূতিই আশীর্বাদ ও আশা বহন করে আনল। তিনি একজন নারী... আমাদের গুরুদেবের সহধর্মিণী। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসহায়, আমাদের চেয়েও তিনি ছিলেন দরিদ্র।"[৬]

অবতারপুরুষ যখন পৃথিবীতে আসেন, তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁর শক্তিকে। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতোই অভিন্ন অবতার ও তাঁর শক্তি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবীও তেমনি অভেদ। শ্রীমা সম্বন্ধে ঠাকুর নিজে বলেছেন, "ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!"[৭] শক্তিস্বরূপিণী শ্রীমা এসেছেন তাঁকে জীবোদ্ধারের কাজে সাহায্য করবেন বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অধ্যাত্মসাধনাময় জীবন দিয়ে যে সঙ্ঘকে জগতের হিতের জন্য সৃষ্টি করে গেলেন, তাকে অপার মাতৃস্নেহ ও ভালোবাসায় সিক্ত করে সযত্নে রক্ষার দায়িত্ব দিলেন তাঁরই সহধর্মিণী শ্রীসারদা দেবীর হাতে। নিঃসন্দেহে কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সারদা দেবী সেই প্রারব্ধ কাজটি অশেষ যত্নে, সুচারু নিষ্ঠায়, অনুপম স্নেহে ও প্রেমে শুধু নিষ্পন্নই করেননি, তাকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও শ্রীমণ্ডিত করেছিলেন। মাতৃশরীরে ভালোবাসা গুণ স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। কিন্তু শ্রীমার মধ্যে যে মাতৃসুলভ ভালোবাসা ও স্নেহের স্ফুরণ দেখি, তা অসাধারণ। একমাত্র জগজ্জননীর পক্ষেই তা সম্ভব। শ্রীমায়ের এই জগন্মাতৃশক্তিকে, স্বয়ং ঠাকুর ফলহারিণী কালীপুজোর দিন ষোড়শী পুজোর মাধ্যমে জাগ্রত কবেছিলেন। তাঁকে উপলক্ষ করে সমগ্র পৃথিবীর মাতৃশক্তিকে তিনি প্রবুদ্ধ করেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজে বলেছেন, "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"[৮]

উক্ত গুরুদায়িত্বটি সম্বন্ধে শ্রীসারদা দেবীও প্রথম থেকেই বেশ সচেতন ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসার কয়েকদিন পরেই ঠাকুর একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, " 'কি গো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?' শ্রীমা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, 'না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।' "[৯] শ্রীশ্রীমায়ের জীবন যত অনুধ্যান করি, তত বিস্মিত হয়ে দেখি, আক্ষরিক অর্থেই তিনি যুগাবতারের যথার্থ সহধর্মিণী। অশেষ স্নেহ, প্রেম ও করুণার আকব বিশ্বজননী মূর্তিটি তাঁর মানবীমূর্তির আবরণ ভেদ করে প্রায়শই আত্মপ্রকাশ করে আমাদের স্তম্ভিত, বিমুগ্ধ করেছে। তাঁর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু যে-সকল তরুণ তাপস শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে এসে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁর কী অপরিসীম স্নেহ! শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অমান্য করেও তিনি তাঁদের রাতে বেশি করে আহার্য দিয়েছেন। এতে তাঁদের সাধনার ব্যাঘাত হবে মনে করে ঠাকুর কখনও রুষ্ট হলে দৃঢ়-বিনম্রকণ্ঠে মা উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ তিনিই দেখবেন।

পরবর্তী কালে দেখি শ্রীশ্রীমা তাঁর মাতৃত্বের শক্তিতে, ভালোবাসার শক্তিতে প্রেমস্বরূপিণী হয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে কীভাবে তার অঙ্কুর অবস্থা থেকে রক্ষা, পালন ও পুষ্টিবিধান করে এসেছেন! শ্রীশ্রীমাকে সঙ্ঘজননীরূপে গড়ে তোলার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল শ্যামপুকুর থেকে। সর্বদা লজ্জাপটাবৃতা মা এখানে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার জন্য পথ্য প্রস্তুত করতে। অতঃপর সেই একই কারণে শ্যামপুকুর থেকে কাশীপুরে তাঁর অবস্থান। এখানেই ঠাকুরের দুরারোগ্য কণ্ঠরোগকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যে সঙ্ঘের সূত্রপাত হল, তার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে মা সারদাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তুতিপর্বও শুরু হল। ঠাকুরের সকল সন্তান তাদের সকল কাজের প্রারম্ভে মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। মাধুকরীর জন্য ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা যখন প্রথম পথে বেরিয়েছেন তখন শ্রীশ্রীমার কাছ থেকেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার শ্রীসারদা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি কিছুই করবে না? (নিজের দেহ দেখিয়ে) এই-ই সব করবে?" উত্তরে মা 'আমি মেয়ে মানুষ' বলে দায়িত্ব এড়াতে চাইলেও কিন্তু নিষ্কৃতি পাননি। ঠাকুর তাঁকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "তোমাকে ঢের বেশী করতে হবে... শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।"[১০]—এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণই শ্রীমা সারদা দেবীকে সঙ্ঘজননীর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। আর শ্রীমাও স্বীয় অনুপম ভালোবাসা ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হয়ে উঠেছিলেন সেইসকল ত্যাগী সন্তানের অতি আপনার মা, জগজ্জননী। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বামীজী বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর? তিনি শুধু তা নয় ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।"[১১]

ঠাকুরের শরীর অপ্রকট হওয়ার পর যখন ত্যাগী সন্তানদের কোথাও কোনও স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, তখন সেই সঙ্কটের সময় সারদা দেবীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহানুভূতিই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। এই ভবঘুরে সন্তানদের দেখে শ্রীশ্রীমার অন্তর কেঁদে উঠেছিল। তিনি মনে প্রাণে চাইতেন, ঠাকুরের সন্তানরা একত্রে থেকে তাঁর ভাব অনুযায়ী তাদের জীবন গড়ে তুলবে এবং সংসার-তাপদগ্ধ মানুষের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করবে।

তাই ঠাকুরের কাছে তাঁর সকরুণ আর্তি, "ঠাকুর তুমি এলে, এই কয়জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।... তোমার নাম করে, সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা আমি দেখতে পারবো না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়...।"[১২]

শ্রীশ্রীমায়ের সাংগঠনিক শক্তির কেন্দ্রে ছিল তাঁর মাতৃশক্তিসম্ভূত অপার ভালোবাসা। সেকথা স্মরণ করে লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "এমন ভালোবাসা দিয়ে মা হামাদের সব বেঁধে রেখেছেন।"[১৩] মায়ের সেই অপার্থিব প্রেম সম্পর্কে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজও তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মাও বাসতে পারেন? বাড়ির মাকে তো খুব ভালোবাসতুম। তিনিও কত ভালোবাসতেন! কিন্তু এ যে জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা। মায়ের কথা যা সামান্য শুনেছিলাম তাতে কে জানতো যে মা এ রকম মা—এ রকম ক'রে মনঃপ্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার হ'তেও আপনার ক'রে নেবেন। ... সন্তানের প্রতি তাঁর কী অহৈতুকী কৃপা, অহৈতুকী ভালবাসা! যে না পেয়েছে, যে মাকে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না।"[১৪]

সঙ্ঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলেই স্বামীজী, রাখাল মহারাজ ও অন্যান্যরা বারে বারে ছুটে এসেছেন মায়ের কাছে সুসমাধানের আশায়। শ্রীশ্রীমাও তাঁর স্নেহপূর্ণ, সহানুভূতিপূর্ণ ভালোবাসায় সকল সমস্যাব সরল মীমাংসা করে দিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম এক সন্ন্যাসী সঙ্ঘ, যার কেন্দ্রস্থলে নেত্রীরূপে রয়েছেন এক নারী; যাঁর প্রতিটি কথা স্বামীজী থেকে শুরু করে সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। বাস্তবিকই, এ নজিরবিহীন। স্বামী গম্ভীরানন্দ এ-প্রসঙ্গে 'History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission' গ্রন্থে লিখেছেন, "She was not a member of the Ramakrishna Monastery; she was no committee; she had no constitutional voice anywhere. Still... her word was a command, her wishes imperative and her judgement unquestionable—be the person concerned a Swami Vivekananda or Swami Brahmananda."[১৫]—তবে কোন শক্তি দিয়ে তিনি এই সঙ্ঘ পরিচালনা করেছেন! সেই শক্তি হল তাঁর মাতৃশক্তি। সঙ্ঘ যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয়, সেজন্য সারদা দেবীর চিন্তার অন্ত ছিল না। ক্ষুদ্র একটি চারাগাছের মতো সঙ্ঘকে শ্রীশ্রীমা তাঁর মাতৃস্নেহের আঁচল দিয়ে সযত্নে রক্ষা ও প্রতিপালন করেছেন, তাকে সার্বিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

সাধারণ মানুষ জ্ঞান-গরিমা, উচ্চতত্ত্ব বোঝে না। তারা বোঝে ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি। মানুষের মানসচারিণী শ্রীশ্রীমা সেই ভাষায় তাদের হৃদয় পূর্ণ করে দিয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করেছেন। তাই পাপী, তাপী, তথা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে আপন করে নিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত সেই দৈবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেজন্য সন্ন্যাসী সন্তান শরৎ ও ডাকাত আমজাদ দুজনেই তাঁর কাছে সমান আদরের। সাধু দুরাচারীর ভেদ তাঁর কাছে মুছে গেছে। কেননা, তিনি যে মা। জগজ্জননী। সকলেই তাঁর সন্তান। ভগিনী নিবেদিতা একটি চিঠিতে যথার্থই লিখেছেন, "সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি,

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ যারা নিঃসহায়।"[১৬]

স্বামী তেজসানন্দ 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ : আদর্শ ও ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "সঙ্ঘ সৃজন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং, উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন জননী সারদামণি ও নরেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত হয় পরিবর্ধনের গুরুদায়িত্ব। সমগ্র মানবজাতির কোন বিশেষ প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য একই মহাশক্তির এই ত্রিধা প্রকাশ।"[১৭] প্রথম থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্ঘনায়করূপে চিহ্নিত। কাশীপুরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তাঁর প্রাণের ইচ্ছা শুকদেবের মতো আত্মানন্দে বিভোর হয়ে একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকবেন। সাধারণভাবে শিষ্যের এই উন্নত আকাঙ্ক্ষা দেখে গুরুর আনন্দিত হওয়ার কথা। কিন্তু যিনি জগদ্‌গুরু তাঁর মোক্ষের ধারণা এই আত্মতৃপ্তিবোধেই সীমিত নয়। তাই শিষ্যের মুখে একথা শুনে তাকে তিরস্কার করে বললেন, "ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস।"[১৮] শিষ্যকে এই তীব্র তিরস্কারের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বের দরবারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তবুও স্বামীজী সমাধির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকার প্রবল প্রেরণায় বারংবার ছুটে গেছেন হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে। কিন্তু বিধির অলঙ্ঘ্য বিধানে গুরুভাইদের প্রতি তাঁর প্রাণ উজাড় করা ভালোবাসা আর জনসাধারণের জন্য নিয়ত কল্যাণচিন্তাই তাঁকে শেষপর্যন্ত সেভাবে থাকতে দেয়নি। বারবার গিরিগুহার নিশ্চিন্ত ধ্যানতন্ময়তা ছিন্ন করে তাঁকে টেনে এনেছে আর্ত-জিজ্ঞাসু মানুষের জগতে।. জীবকল্যাণের জন্যই তো শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ধ্যানলোক থেকে স্বয়ং আবাহন করে নিয়ে এসেছেন পৃথিবীতে! তাই মূর্তিমান প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছুরিত যে বিশ্বপ্রেমের প্রভায় সমগ্র জগৎ আজ উদ্ভাসিত, তার যথার্থ বাণীমূর্তি হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। পৃথিবীর মানুষের আত্মোন্নতি বিধানের জন্য দেব-চিহ্নিত এই পুরুষপ্রবর নিজের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত এই ব্রত উদ্‌যাপনে উৎসর্গ করেছেন। তাঁরই বলদৃপ্ত কণ্ঠের ঘোষণা, "যতদিন পর্যন্ত না সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছে ততদিন আমি মানুষের মনে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাব।"[১৯]—কথাটি যে কত সত্য, কত বাস্তব তা এই নিয়ত হিংসাপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে থেকেও বিবেকী, বিচারশীল মানুষ সহজেই অনুধাবন করতে পারেন।

কাশীপুরে স্বামীজীকেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়েছিলেন সঙ্ঘস্থাপনের উদ্দেশ্যে। এমনকি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নেতা হিসেবে ঠাকুরই স্বামীজীকে মনোনীত করে সেই কাজের চাপরাশ দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে।" মহাসমাধির আগে ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিলেন, "দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন ভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।"[২০] ঠাকুরের এই নির্দেশকে তাঁর গুরুভাইরা যে কী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিচয় পাই স্বামী অভেদানন্দের এক স্মৃতিচারণে : "আমাদের সকলেরই মনে ছিল যে, মহাসমাধির পূর্বে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন : 'তুই ছেলেদের একত্রে রাখিস ও দেখাশোনা করিস।' আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ

স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথই ছিল আমাদের সকল সময়ের আশা-ভরসা ও সুখ-সান্ত্বনার স্থল।''[২১] সঙ্ঘনায়ক স্বামীজীও সকলকে অপরিসীম প্রেম-প্রীতির দ্বারা ভালোবেসে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শ্রীগুরু প্রদত্ত এই দায়ভার সুচারুভাবে নিষ্পন্ন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত এক চিঠি থেকে তাঁর এসময়কার মনোভাব জানা যায়। এ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, ''...আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না।...

''আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগীমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব। ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক লইতে রাজী আছি।

''তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।''[২২]

ঠাকুরের দেহাবসানের পর তরুণ ভক্তরা বেশির ভাগই নিজের গৃহে ফিরে অসমাপ্ত পাঠ সমাপ্ত করতে মনোযোগী হলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং যাঁর হাতে সকলকে একত্র করে সঙ্ঘস্থাপনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশ মতো চলতে পারছেন না ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি প্রায়ই সেই যুবক ভক্তদের ঘরে গিয়ে দ্বারে করাঘাত করে দরজা খুলিয়ে তাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অলৌকিক প্রেমের কথায় উজ্জীবিত করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নবযুগে যে নবধর্ম স্থাপনের জন্য এসেছেন, বিশ্বে তার প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব যে তাদেরই সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতেন। এ-প্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গকাব লিখেছেন, ''নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্বোচ্চ কর্তব্যপথে কখনই যে অচল অটল হইয়া থাকিতে পারিত না, একথা বলাবাহুল্য।''[২৩]

অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বদান্যতায় বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। ঠাকুরের ত্যাগী যুবকরা সেখানে একত্রিত হয়ে সাধন-ভজন, জপ-ধ্যান, ত্যাগ-তপস্যাদিতে পরিপূর্ণ এক অনন্যসাধারণ জীবনযাপন করতে লাগলেন। স্বামীজীর নিজের মুখের স্মৃতিচারণ : ''ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপধ্যান করতুম।... তখন আমাদের ভেতর কি বৈরাগ্যের ভাব! দুনিয়াটা আছে কি নেই, তার হুঁশই ছিল না।... এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা চারটা-পাঁচটা পর্যন্ত জপ-ধ্যান চলেছে।''[২৪] নিবিষ্টমনে ঈশ্বরোপলব্ধির নিরবচ্ছিন্ন সাধনা! অথচ সকলের খাওয়া-দাওয়ার কোনও প্রকার ব্যবস্থাই তখন ছিল না। কোনও কোনও দিন ভিক্ষে করতে গিয়ে কিছুই পাননি। উপবাসে দিন কেটেছে। আবার কোনও দিন চাল সামান্য জুটেছে তো তার উপর নুন জোটেনি। কোনও কোনও দিন সকলে মিলে তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ করে নুন দিয়ে ভাত খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। আবার তাও অনেকসময় জুটত না। আহার-সংস্থানের এত অভাব, তবু জপ-ধ্যান, ত্যাগ-তপস্যার ভাব কোনওদিন এতটুকু কমেনি বরং বর্ধিত হয়েছে।

বরানগর মঠে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথ সকলের সবরকম কাজে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বাড়ির মামলা-মোকদ্দমাদির জন্য অনেকসময় বাইরে যেতে হলেও রাত্রিবাস মঠে

করতেই সচেষ্ট থাকতেন। সকল গুরুভ্রাতার সঙ্গে পড়াশোনা, ধ্যান-ভজন ও নানা কাজকর্মের ভিতর দিয়ে বরানগর মঠের দিনগুলো এক দিব্য আনন্দে অতিবাহিত হত। স্বামীজীর মধ্যে তখন অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা। সেই উদ্যমে তিনি সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। কোনও এক গুরুভ্রাতার কাজের চেয়ে পড়াশোনার দিকেই তীব্র ঝোঁক। ফলে লেখাপড়া নিয়েই তার দিন কাটে। কাজকর্মে তার অনীহার দিকে কেউ অঙ্গুলি নির্দেশ করলে বিবেকানন্দ অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ নিয়ে বলেছেন, "তোদের একটা ভাই যদি পড়াশুনা নিয়েই থাকে তো এত গাত্রদাহ কেন? নিয়ে আয় তোদের কত হান্ডা বাসন আছে; আমি একাই মেজে দেব।"[২৫] শুধু কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কাজেও নেমে পড়াতে এ-জাতীয় সমালোচনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্ঘজীবন যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে ছিল তাঁর সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি। গুরুভ্রাতাদের মন যাতে সর্বদা উঁচুসুরে বাঁধা থাকে, সেজন্য মঠে নিত্য শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা, তর্ক ইত্যাদি চলত। এককথায় জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ে পরবর্তী কালে যে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে ওঠে, তারই ভিত পাকা করার কাজ শুরু হয়েছিল বরানগর মঠে। এ সবকিছুরই কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুরের ভাবাদর্শ তাঁদের সামনে তিনি এমন উজ্জ্বলরূপে উপস্থাপিত করতেন যে তা সকলকে উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে রাখত।

বরানগর মঠে অবস্থানকালেই বাবুরাম মহারাজের মা মাতঙ্গিনী দেবী একবার স্বগৃহে তাঁদের আমন্ত্রণ জানান। সে সাদর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বরানগর মঠ থেকে নয়-দশজন গুরুভ্রাতা-সহ স্বামীজী সেখানে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের এত জন ত্যাগী যুবকভক্তকে একত্রে পেয়ে মাতঙ্গিনী দেবীর আনন্দের সীমা রইল না। তাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। আঁটপুরের সেই শান্তপল্লীতে বসে বেশ কয়েকদিন নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ধ্যান-জপ, ভজন-কীর্তনের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলল। একদিন রাতের আঁধারে ধুনি প্রজ্বলিত হল। সেই প্রদীপ্ত হুতাশনের চারিদিকে অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন রইলেন তাঁরা। ধ্যানভঙ্গে দিব্যভাবে ভাবিত নরেন্দ্রনাথ যিশুখ্রিষ্টের ত্যাগতপস্যাপূত অপূর্ব জীবনকথা ও তাঁর অনুগামীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস এবং সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্যময় জীবন ও উপদেশ এমন জ্বলন্তভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বর্ণনা করলেন যে গুরুভাইদের প্রাণও এক নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হল। অবশেষে সেই পবিত্র ধুনির সামনে অগ্নিসাক্ষী করে তাঁরা সংকল্প গ্রহণ করলেন যে সংসার ত্যাগ করে ত্যাগ-বৈরাগ্যের জীবন অবলম্বন করবেন। পরে জানা যায়, সেদিন ছিল ২৪ ডিসেম্বর, যিশুখ্রিষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা। আঁটপুরের অবদানের কথা স্মরণ করে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ পরবর্তী কালে বলেছিলেন, "আঁটপুরেই আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সঙ্কল্প দৃঢ় হল। ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করে দিয়েছিলেনই—ঐ ভাব আরও পাকা হল আঁটপুরে।"[২৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূলনীতি হল : আদর্শ ও সঙ্ঘের প্রতি অনুরাগ। আদর্শের প্রতি আনুগত্য স্বাভাবিক, কেননা তা স্বত উৎসারিত। কিন্তু স্বামীজী বামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্যকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অঙ্গস্বরূপ মনে করে এতটাই ভালোবাসতেন যে বাস্তবিকই তা তুলনাহীন। গুরুভাইদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তিনি কত ব্যস্ত থাকতেন, কিছু ঘটনা থেকে তা জানতে পারি। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ একবার বরানগর মঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। মঠে এসে সেকথা জানতে পেরে স্বামীজী যারপরনাই বিচলিত হয়েছেন। মাস্টারমশাইকেও বলেছেন তাঁর চিন্তার কথা, "দেখুন আমার বিষম মুশকিল। এখানেও এক মায়ার সংসারে

পড়েছি। আবার ছোঁড়াটা কোথায় গেল।"[২৭] স্বামীজীর এই প্রগাঢ় ভালোবাসা গুরুভাইরাও প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছেন। এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছেন তাঁর প্রতি। আরও দেখি, কোথাও কোনও গুরুভ্রাতা অসুস্থ হয়ে পড়লে স্বামীজীর কত চিন্তা! পরিব্রাজক অবস্থায়, বিশেষ করে হিমালয়ে যখন তিনি তপস্যারত তখন বহুস্থানে বহুবার অসুস্থ গুরুভাইদের শয্যাপার্শ্বে ছুটে এসেছেন খবর পেয়ে। নানাভাবে তাঁদের সেবার বন্দোবস্ত করে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। স্বামীজীর এই গুরুভাইদের প্রতি প্রীতি লক্ষ্য করে একবার প্রমদাদাস মিত্র 'এই ভালোবাসাও মায়ার বন্ধন' বলে কটাক্ষ করলে তার উত্তরে বিবেকানন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁকে স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন ভালোবাসার ওপরেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত।

মঠের গোড়াপত্তনে ঠাকুরের ছেলেদের অবদানও কিছু কম নয়। এই নতুন যুগে নতুন ভাব দিয়ে স্বামীজী যে বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেন, তাকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে প্রথমদিকে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি অনেকে প্রকাশ্যে প্রতিবাদও করেন। স্বামী যোগানন্দ তো স্বামীজীর মুখের ওপরেই বলে দিয়েছিলেন, "তোমার এইসব বিদেশী ভাবে কার্য করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এরূপ ছিল?"[২৮] ঠাকুরের অদ্ভুত সৃষ্টি লাটু মহারাজও বিভ্রান্ত হয়ে স্বামীজীকে বলেছিলেন, "ভাই, এত ঝঞ্ঝাট কেন আনছ? এতে যে ধ্যানধারণা সব গুলিয়ে যাবে।"[২৯]

গতানুগতিক ধ্যান-তপস্যার ধারায় অভ্যস্ত জীবন তাঁদের। তাই নবযুগের বার্তাবহের এই নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শকে সহসা হৃদয়ঙ্গম করা তাঁদের সাধ্য ছিল না। কিন্তু স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্মযোগের প্রতি সমর্থন না থাকলেও তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে, পরস্পরের প্রতি অনুপম ভালোবাসায় সে বিভেদ দূরীভূত হল। রামকৃষ্ণ ভাবধারার সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও পুষ্টিসাধনে এঁদের প্রত্যেকের অবদান অমূল্য। ভগিনী নিবেদিতা ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন, "...meaningless as would have been the Order of Ramakrishna without Vivekananda, even so futile would have been the life and labours of Vivekananda, without behind him, his brothers of the Order of Ramakrishna."[৩০]—স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যেমন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াত, স্বামীজীর পশ্চাতে এই গুরুভ্রাতারা না থাকলে তাঁর জীবন ও পরিশ্রম তেমনি বিফল হয়ে যেত।

স্বামীজীর প্রতি অগাধপ্রেমেই তাঁর গুরুভাইরা এককথায় তাঁর পরিকল্পিত কর্মযজ্ঞ রূপায়ণের পথে নেমে পড়েছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহুলায় ছুটে গেছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্ত নরনারায়ণের সেবায়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রাণ দিয়ে আগলে ঠাকুরের আত্মারামের কৌটোকে স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানে আন্তরিকভাবে সেবাপূজাদি করছিলেন। এই ঠাকুরসেবা ছেড়ে যিনি কাশী পর্যন্ত যাননি, তিনিও স্বামীজীর নির্দেশে দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন দক্ষিণভারতের মাদ্রাজে ভাবপ্রচারের কাজে। এভাবেই ঠাকুরের সন্তানরা ঠাকুরের ভাবরাজি নানাভাবে দেশের সর্বত্র প্রচার করে কর্মযজ্ঞের সামিল হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের প্রত্যেকেই এক একটি দিকপাল, মহাশক্তিধর পুরুষ ছিলেন। স্বামীজী নিজেই তাঁর গুরুভাইদের প্রসঙ্গে বলেছেন, "এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো।" আরও বলেছেন, "আমাদের centre তো ঠাকুরই। আমরা এক

একজন সেই জ্যোতিঃকেন্দ্রের এক একটি Ray."[৩১] এদের এক একজনের জীবনে ঠাকুরের এক-একটি ভাবেরই বিশেষ স্ফুরণ দেখি। তাই প্রত্যেককেই স্বামীজী অশেষ প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চোখে দেখতেন। খুবই উচ্চস্থান দিতেন তাঁদের। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুগুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এঁদের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে স্বামীজী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, "এইসব ঠাকুরের সন্তান দেখছিস, এরা সব অদ্ভুত ত্যাগী, এদের সেবা ক'রে লোকের চিত্তশুদ্ধি হবে—আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হবে।... এদের সেবা করবি, তাহলে সব হয়ে যাবে।"[৩২] গুরুভাইদের প্রতি শুধু যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদাই দিতেন তা নয়, তারও ওপরে ছিল বিবেকানন্দের সর্বগ্রাসী প্রেম। সকলেরই প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে বলেছেন, "ঐ যে রাখাল রয়েছে, ওর মতো spirituality (ধর্মভাব) আমারও নেই। ... ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা। ঐ বাবুরাম, হরি, সারদা, গঙ্গাধর, শরৎ, শশী, সুবোধ প্রভৃতির মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পাবি কি না সন্দেহ। এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ হবে।"[৩৩]

রাখাল মহারাজ সম্বন্ধে ঠাকুর একবার বলেছিলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।"[৩৪] তাঁকে স্বামীজী যে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, তার নজির একটি ঘটনা অবলম্বনে আমরা পাই। প্রাণপাতী প্রচেষ্টায় বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর দলিল দস্তাবেজ সবকিছু গুরুভাইদের হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বামীজী বলেছিলেন, "এতদিন যার জিনিস বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।... রাখাল, আজ হতে সব তোর, আমি কেউ নই।"[৩৫] এতটাই গভীর বিশ্বাস তাঁর রাখালের প্রতি। পরবর্তী কালে দেখি, নিজে সভাপতির পদ ত্যাগ করে সেখানে রাখাল মহারাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আরও একটি ঘটনা। বিদেশ-প্রত্যাগত বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ একদিন হঠাৎ অতর্কিতে অপ্রস্তুত রাখাল মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলে ওঠেন—'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'। প্রত্যুত্তরে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে রাখাল মহারাজও প্রতিপ্রণাম করে বলেন, 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।' শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ—উভয়ের মধ্যে যে কী শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, এই ঘটনাই তা প্রমাণ করে। রাখালই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ। শেষ অসুখেব সময় স্বামীজী দেখছেন তাঁর সময় কম অথচ অভীপ্সিত কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন কিছুতেই হচ্ছে না। ফলস্বরূপ অধৈর্য হয়ে প্রায়ই খুব বকাবকি, রাগারাগি করতেন। বলা বাহুল্য তার বেশির ভাগই বর্ষিত হত স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওপর। তাতে কখনও রাখালের মন খারাপ হয়েছে বুঝতে পেরে নিজেই চোখের জলে ভাসতেন। আদরের রাজাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুসজল চোখে বারংবার ক্ষমা চাইতেন। রাখাল মহারাজও স্বামীজীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছেন, "তাতে কি হয়েছে? ভালোবাস বলেই তো বকেছ।" এতটাই মধুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

অপর এক গুরুভাই স্বামী যোগানন্দ তখন অসুস্থ। তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্য স্বামীজীর কী আন্তরিক প্রচেষ্টা! উদ্বিগ্ন স্বামীজী চিঠিতে লিখেছেন, "যোগেনের চিকিৎসার যেন কোনও ত্রুটি না হয়—আসল ভেঙেও টাকা খরচ করবে।"[৩৬]

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বা শশী সম্বন্ধে স্বামীজী বলেছিলেন, "শশী ছিল মঠের প্রধান খুঁটি। সে না থাকলে আমাদের মঠবাস অসম্ভব হ'ত।"[৩৭] বাস্তবিকই বরানগর মঠে প্রচণ্ড অভাবের সময় যখন সকলে প্রায় উপবাসী থেকে ধ্যান-ধারণা, সাধন-ভজনে মত্ত হয়ে কালাতিপাত

করছিলেন তখন এঁদের দেহরক্ষার ভার শশী মহারাজ নিজের হাতে তুলে নেন। সকলকে ডেকে নিয়ে এসে আহার করাতেন, কখনও বা ধ্যান-ভজনে মত্ত গুরুভাইদের মুখে জোর করে ভাতের মণ্ড পুরে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন মঠের মায়ের মতো।

সঙ্ঘজীবনে এই পারস্পরিক প্রীতির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দ এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "আজ যদি আমি মদ্যপ, অসচ্চরিত্র হয়ে যাই, আমার শিষ্যেরা আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু এমন গুরুভাই আছে, যাদের কাছে আমি সেই একই নরেন থাকব। যখন এমন ভালোবাসা দেখা দেয়, তখনই জন্ম নেয় নূতন ধর্ম। যথার্থই এমন ভালোবাসা থেকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিস্তৃতি। এই ভালোবাসাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাণশক্তি।"[৩৮]

এঁদের পারস্পরিক প্রেমসম্পর্ক যে কতটা অতলস্পর্শী ছিল, তার কিছুটা আঁচ পাই স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তের পর। স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরদিনই তাঁর ছবি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতির পাশে রেখে পুজো করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ঘটনা নজিরবিহীন। স্বীয় গুরুভ্রাতাকে এতটা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বাস্তবিকই অভিনব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাশীতে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমেও স্বামী শিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে স্বামীজীর পটস্থাপন করেন।

ভারতের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য মানুষের সর্বতোমুখী কল্যাণসাধন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে স্বামী প্রভানন্দের মন্তব্য : "বর্তমান উত্থানের শীর্ষে বিরাজ করছেন ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সাধনায় জাগরিত হয়েছে ব্রহ্মকুণ্ডলিনী শক্তি, প্রবর্তিত হয়েছে এক নবযুগচক্র, যাকে অবলম্বন করে বিকাশমান রামকৃষ্ণ আন্দোলন। আন্দোলনের নিয়ামক শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকল্পিত। এর রূপকার শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাচিত নরেন্দ্রনাথ। সহায়ক হয়েছিলেন তাঁর গুরুভাইগণ।"[৩৯]

মানবপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সৃষ্ট এই সঙ্ঘ তাঁর উদার আদর্শ 'যত মত তত পথ'কে রূপদান করাব জন্যই যে সৃষ্টি হয় তা নয়, তাঁর প্রগাঢ় মানবপ্রেমের সার্বজনীনতাকে বাস্তবায়িত করতেই এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি নিজেই ছিলেন 'Love Personified' বা মূর্তিমান প্রেম, তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও প্রেমস্বরূপের স্বার্থগন্ধমাত্রহীন অপার ভালোবাসা সঞ্জীবিত থেকে তাঁদের শরীর ও মনকে ঐক্যবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই এই সন্ন্যাসী গোষ্ঠীকে দেখে মনে হত, তাঁরা এক শরীর, এক মন। মহেন্দ্রনাথ দত্ত এর এক জীবন্ত চিত্ররূপ এঁকেছেন, "এইরূপ জমাট ভালোবাসা কখনো দেখি নাই। একজনের গায়ে চিমটি কাটলে অপরজনে উঁহু করিয়া উঠে।... ইহা এক জীবন্ত ভালোবাসা। মুঠো করা যাইতে পারে, ছোঁয়া যাইতে পারে, গায়ে মাখা যাইতে পারে। ইহা বরানগর মঠেতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত।"[৪০]

মঠের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দেখলে একথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারা যায়। তাঁদের জীবনচর্যা দেখলে বোঝা যেত, কী সীমাহীন ভালোবাসায় তাঁরা মেতে আছেন। প্রত্যেকেই নিজেকে ঠাকুরের বিশেষ ভালোবাসার পাত্র বলে মনে করতেন। লাটু মহারাজ সুন্দর বলেছেন, "হামেশা ঠাকুরের ভালোবাসা নিয়ে কথা উঠত। কেউ বলতো, ঠাকুর হামায় বেশী ভালোবাসেন। আর একজন অমনি বলতো—'না হামায় বেশী।' এইরকম করতে করতে

শেষে তক্‌রার হতে থাকত। ঠাকুর সকলকে এমনি ভালোবাসতেন যে, সবাই মনে করত যে, তাকেই বুঝি তিনি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন। একদিন এমনি তক্‌রার করতে দেখে বললুম—'তিনি কুছু রেখে যাননি, তাতেও তোমাদের সব ঝগড়া হচ্ছে। আর যদি কুছু রেখে যেতেন, তাহলে তো কোর্টে মোকর্দমা করতে যেতে।' হামার কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।"[৪১]

জগতের দুঃখে কাতর হয়ে তার প্রতি প্রেমে, করুণায় শ্রীভগবান নরশরীর ধারণ করে অবতাররূপে অবতরণ করেন পৃথিবীতে। এযুগে তাই ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির চরম অবমাননার সময় শ্রীভগবানের রামকৃষ্ণাবতারে পৃথিবীতে আগমন। যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ, তাই তাঁর অপূর্ব প্রেমের পূর্ণ বিকাশ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘেও দেখা যায়। তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মানুষের প্রতিই অবারিত ধারায় বর্ষিত। কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রভাব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন : "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল। আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের-ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর ক'রে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদের লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।"[৪২]

প্রেমস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমকে কার্যকরী করেন শ্রীশ্রীমা। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে মানবজীবনে এর পূর্ণপ্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্য যাতে সেই প্রেমের সুযোগ্য প্রতিনিধি হতে পারে, সেজন্য তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ একদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে অভিযোগ জানান, তাঁর আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা আশ্রমের কাজ ফেলে রেখে জয়রামবাটীতে এসে মায়ের কাছে থাকতেই ভালোবাসে। কাজেই, মা যেন তাদের আশ্রয় না দেন। কথাটি শোনামাত্র শ্রীশ্রীমা উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "সে কি গো? ওসব কি কথা বলছ? ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।"[৪৩] একথারই পুনরুক্তি স্বামীজীর বহু চিঠিতেও পাই। মূল ভাবটি সকলের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ রেখে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিতকে সুদৃঢ় করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সকল গুরুভাইদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালোবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালোবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালোবাস দেখি।"[৪৪] এই ভালোবাসাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রধান সুর।

সঙ্ঘের মূলভাবকে রক্ষার দায় শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ওই সকল সন্তানদের মধ্যেই সীমিত নয়। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষ তার সেই ভাবসংরক্ষণে দায়বদ্ধ। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় তা অনুসরণের মধ্যেই আছে এর সার্থকতা।

উনিশ শতকের কলকাতায় শ্রীশ্রীমা

চিত্রা দেব

"কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল বিল করছে। তুমি তাদের দেখো!"[১]—ঠাকুর বলেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। নিজেকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।"[২] মর্তলীলাবসানের পূর্বে তখন তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন ভবিষ্যৎকর্মের গুরুদায়িত্ব যোগ্য পাত্রে সমর্পণের জন্য। অন্তরঙ্গ পার্ষদদের চিনিয়ে দিচ্ছেন ভাবী কালের সঙ্ঘজননী কে, বলতে চাইছেন—আমার কাজ অর্ধেক করা হয়েছে, জগতের কল্যাণের জন্য বাকি কাজ ও করবে। নারী হিসেবে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা মা তাঁকে মনে করিয়ে দিলে তিনি বলেছিলেন, "শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।"[৩] কিন্তু এ কিসের দায়, কিসের দায়িত্ব?

উনিশ শতকের নবজাগরণের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। গ্রাম তখন শহরের রূপ নিচ্ছে। আভিজাত্য আর বর্ণশ্রেষ্ঠদের হাত ধরে নেই। বিদ্যা নয়, বিত্তই গরিমার প্রতীক তখন। হিন্দুসমাজ কোণঠাসা ব্যক্তিদের আপনগড়া হৃদয়হীন স্বার্থপর বিধি-নিষেধের পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভুলে যেতে বসেছে সহজ, সরল ও সুস্থ জীবনযাপনের স্বাদ। নতুন শহরে এসেছেন বিদেশিরাও, বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে। তাঁদের সঙ্গেই পশ্চিম দিগন্তের একটুখানি আলো এসে পড়েছিল পুবের আকাশে। বাঙালির চিত্তলোকে সেই আলো প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবসংঘর্ষ ও সমন্বয়কেই আমরা নাম দিয়েছি নবজাগরণ। এসময়ই যুগপুরুষের আবির্ভাব হয়। এবারেও হল। একে একে এলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো মনীষীরা। তাঁরা অনুভব করলেন এই জাগরণ শুধু ভাবের আদান-প্রদান নয়, সার্বিক অর্থে মুক্তির আকাশে বিচরণ। একই সঙ্গে বুঝতে পারলেন, তাঁরা কত অসহায়।

মুক্তিপ্রয়াস যতই আন্তরিক হোক, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়, এদেশের নারী খাঁচায়-বন্দি পাখির মতোই নিরুপায়। সেইজন্য উনিশ শতকের মনীষীদের যাবতীয় ভাবনাচিন্তাতেই ছিল নারীর মঙ্গলকামনা। বাস্তবিকই হিন্দু সমাজপতিদের দাপট এবং কুলগৌরব যত খর্ব হচ্ছিল ততই তাঁরা রুষ্ট হচ্ছিলেন নারীদের প্রতি। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে নারীর দেহ ও মনকে শৃঙ্খলিত করে তাঁরা এক ধরনের বিকৃত আনন্দ লাভ করতেন। পশমের আসনের উলটো পিঠের মতো কুশ্রী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে নারী ভুলতে বসেছিল স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ। যাদের ব্যবস্থাপনায় নারী বন্দীজীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল, তারা এবং পরনির্ভর, শিক্ষাবঞ্চিত সেকালের কলকাতার নারী—অন্ধকারে থাকা এই নরনারীকেই কী শ্রীরামকৃষ্ণ কীটের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন?

উনিশ শতকের মনীষীরাও সমাজ-সংস্কারের কাজে হাত দিয়েই নারীদের অসহায় অবস্থাটি লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তাদের জন্য বা তাদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতির জন্য কী করা উচিত তা তাঁরা নির্ণয় করতে পারলেন না। হিন্দুসমাজকে বদলানোর ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে রাজা রামমোহন রায় চেষ্টা করলেন সতীদাহ বন্ধ করতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চেষ্টা করলেন বালবিধবার পুনর্বিবাহ দিতে। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার প্রয়াস অসফল হলেও সচেতনতা নিয়ে এল। শিক্ষিত মানুষেরা পশ্চিমের নারীদের জীবন লক্ষ্য করছিলেন। ইউরোপে নারী শিক্ষিত এবং গৃহবন্দী নন। বিদেশিনীদের আদর্শেই এদেশের নারীকে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহও অনেকের ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন সুগৃহিণী হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে নারীদের এবং নিজেদের জীবনেও সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে। কিন্তু বাইরে থেকে হিন্দুসমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। অতিরিক্ত রক্ষণশীল হয়ে সমাজপতিরা নব্যশিক্ষিতদের দূরে সরিয়ে দিতে শুরু করলেন। বহু যুবক ধর্মান্তরিত হলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের আশ্রয় নিয়ে আবার অনেকে রক্ষাও পেলেন। কিন্তু মূল স্রোতের মানসিক মানচিত্র বদলানো না। রিক্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, অপমানিত নারীরাও পশ্চিমী শিক্ষার আলোয় নিজেদের মনের অন্ধকার দূর করতে পারলেন না। তাহলে কি মনীষীদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল? না, তা হয়নি। বরং তাঁদের আন্তরিক প্রয়াস সার্থক হল যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনাকে আশ্রয় করে।

অনেকটা দৈবনির্দিষ্ট ঘটনার মতোই ঠাকুর এই কলকাতা শহরের এক ভক্তিমতী নারীর প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে মৃন্ময়ী দেবীকে মাতৃভাবে সাধনা করে চিন্ময়ী ভবতারিণীরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। গুরুরূপে গ্রহণ করলেন ভৈরবী যোগেশ্বরীকে। সাধনার শেষপর্বে দেখি তিনি সহধর্মিণী সারদা দেবীকে দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে পুজো করছেন, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবতারিণীর সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখছেন এবং পরম স্নেহ ও সমাদরে পত্নীরূপে গ্রহণ করে দেহসম্পর্কহীন অপূর্ব দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছেন। অপমানের অন্ধকার থেকে নারীকে সসম্মানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই উদাহরণের প্রয়োজন ছিল। ইতিপূর্বে অপর কোনও সাধক এভাবে আমাদের অন্তরে নারী সম্পর্কিত শ্রদ্ধার বীজ বপন করার চেষ্টা করেননি। পশ্চিমী আদর্শে নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার কথা থাকলেও তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের জগতে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। আত্মপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সেখানেও নারীকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু এদেশে সূচনাপর্বে নারীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে মানসিক শক্তি অর্জন করার জন্য। উনিশ শতকের মনীষীরা 'নারীর অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপণে' আগ্রহ প্রকাশ করলেও ভেবেছেন, 'এখন তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে অবশ্যই তাহাতে বিষময় ফল ফলিবে।' যাঁদের নিজেদের মধ্যেই সংশয় ও পরিচালনাশক্তির অভাব, তাঁরা কীভাবে নেতৃত্ব দেবেন ভেবে পাননি। সেইসময় ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা তাঁদের সামনে নিজেদের অলৌকিক জীবনচর্যার চিত্র অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থিত করলেন।

প্রকাশ্য উদাহরণ হিসেবে আমরা ঠাকুরের কথাই জানি। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কথা ভুলে গেলে চলবে না। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে তিনি প্রথম এই শহরে আসেন। তখন অবশ্য দক্ষিণেশ্বর ছিল কলকাতা-সংলগ্ন গ্রাম। এই শহরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল নারীজাগরণের। নানা কারণে এই দশকটি আধুনিক নারীর কাছে স্মরণীয়, কেননা এ সময়েই চন্দ্রমুখী-কাদম্বিনী প্রবেশিকা স্তরে উন্নীত হচ্ছেন। রাসসুন্দরী-স্বর্ণকুমারী-

ফয়জুন্নেসার গ্রন্থপ্রকাশ হচ্ছে। নীলকমল মিত্র দৌহিত্রী বিরাজমোহিনীকে চিকিৎসাবিদ্যা শেখাতে চাইছেন। নারীর আত্মবিকাশের এই পর্বে সারদা দেবী উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" সারদা দেবী নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।"[৪] এখানেই তিনি আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা কিন্তু আত্মসচেতন। প্রথম থেকেই তিনি "স্বেচ্ছায় স্বামীর ব্রতসাধনের ক্ষেত্রে নিজেকেও পূর্ণভাবে অংশীদার করে সন্ন্যাসিনীর জীবনকে বরণ করে নিয়েছিলেন।" এই নারী অপমানের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া নারীদের একজন নন বরং তাঁদের উদ্ধারকারিণী দলের নেত্রী। শুধু অপমানিত, লাঞ্ছিত নারীদের নয়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, সুখী-দুঃখী সব নারীকেই তিনি কূপমণ্ডুকের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন নিজের আসক্তিবিহীন জীবনাচরণের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দিয়ে। ঠাকুর সেকথা ভালোভাবেই জানতেন বলে যাবতীয় গুরুদায়িত্ব অর্থাৎ শুধু নারীদের ভার নয়, যাবতীয় পুত্র-কন্যা-গৃহী-সন্ন্যাসী-মুমুক্ষু-দিগ্ভ্রান্ত মানবসন্তানের দাযদায়িত্ব শ্রীমায়ের হাতে সমর্পণ করলেন। শ্রীমাও দায়িত্ব এড়াতে পারলেন না। নিজে ভক্তদের শোনালেন অপূর্ব আশ্বাসবাণী, "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"[৫] সন্তানদের জন্যও তাঁর অভয়বাণী, "তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।"[৬] না দেখে তাঁর উপায়ই কী, "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।"[৭]

ঠাকুরের লীলাবসানের পরে দুটি দায়িত্ব মাকে নিতে হয়েছিল। ঠাকুর যে ভাবান্দোলনের সূচনা কবেছিলেন তাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাঁব ভাব সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন যে সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁদের মাতৃস্নেহ দিয়ে একসুরে বেঁধে রাখা। তখনও তাঁরা গৈরিকধারী সন্ন্যাসী নন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সুস্পষ্ট সূচনা হয়নি, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির হয়নি, অর্থের সংস্থান নেই, গৃহী ভক্তদের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ—এই সঙ্কটপর্বে শ্রীমা নিঃশব্দে সন্ন্যাসী সন্তানদের পাশে ছিলেন। মায়ের নীরব সমর্থন মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। স্বামীজী পরে এক বক্তৃতায় সেই চরম দুঃসময়ের কথা স্মরণ কবে বলেছিলেন, "একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না। সেই একজনের সহানুভূতিই আশা ও আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিল। তিনি এক নারী।"[৮] অথচ এই শতকেই আমরা নারীর নিরুপায় ম্লানমুখ প্রত্যক্ষ করেছি। দয়ার পাত্রী যে কোন মুহূর্তে প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠলেন কেউ তা বুঝতে পারল না। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পুষ্টিসাধনে শ্রীমায়ের ভালোবাসাই ছিল প্রধান শক্তি। স্বামীজী বলেছিলেন, "আমাদের সকলের তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। তিনি কখনও আমাদের উপর হুকুম চালান না।"[৯] যদিও শ্রীমায়ের ইচ্ছা এবং নির্দেশই ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শেষ কথা। বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোয় স্বামীজী চেয়েছিলেন 'বলি' হবে। শ্রীমা বলেছিলেন, "মঠে দুর্গাপুজো করে শক্তির আরাধনা করবে বইকি। শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোনও কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বাবা, বলি দিয়ো না, প্রাণিহত্যা কোরো না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়দানই তোমাদের ব্রত।"[১০] স্বামীজী নির্দ্বিধায় এ আদেশ মেনে নেন। প্লেগ যখন কলকাতায় মহামারীর রূপ নিয়েছিল, সেবাকর্মে অর্থের অভাব দেখা দিলে স্বামীজী বেলুড় মঠ বিক্রি করে দিতে চাইলেন। সেবাকর্মে অকুণ্ঠ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও

শ্রীমা স্বামীজীর প্রস্তাবে সম্মত হননি। বলেছিলেন, "মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সংকল্প করেছ, তোমার ওসব বিক্রির অধিকারই বা কোথায়? বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে?"[১১] সঙ্ঘজননীর কথায় স্বামীজী নিজের ভুল বুঝতে পারেন। পরবর্তী কালেও শ্রীমাকে বহু জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে বিশুদ্ধ অদ্বৈতের সাধনা হত স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে কিন্তু তাঁর দু-একজন সন্ন্যাসী-শিষ্য একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা করতেন। স্বামীজী সেকথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁর সম্মানে পুজো বন্ধ করে দেওয়া হলেও সন্তানদের মনে সংশয়ের অবসান হয়নি। তাঁরা শ্রীমাকে একটি পত্র লিখলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অদ্বৈতবাদী।"[১২] সঙ্ঘজননী হিসেবে মায়ের দৃঢ়তা এবং গুরুত্ব এই পত্রটির প্রতি ছত্রে লুকিয়ে আছে। দৈনন্দিন জীবনে তাঁকে আমরা দেখতে পাই দ্বৈতবাদিরূপে। পটপূজা, ভোগরাগ, আরতি সবেতেই তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখা গেলেও অতি সহজে তিনি পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃত সত্য ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে শ্রীমা তাঁর দৈনন্দিন আচরণে কিংবা বলা যায় ব্যবহারিক জীবনে কেন অদ্বৈতবাদকে প্রাধান্য দেননি?

কারণ সঙ্ঘজননী হওয়া ছাড়াও তাঁর আরও কিছু দায় ছিল। বহু সন্তানের জননী তিনি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন দৃঢ়চেতা ত্যাগী সন্ন্যাসিসন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার নয়, তাঁর সংসার আরও বড়ো। সেখানে রয়েছে কামনাবাসনাতাড়িত, আকণ্ঠ সংসারপঙ্কে নিমজ্জিত অসংখ্য ধূলিধূসরিত মানুষ। ধুলো ঝেড়ে তাদের কোলে নিতে হবে, বোঝাতে হবে, ঈশ্বরলাভই জীবনের শেষ কথা। সকল সন্তানই তাঁর, শিশু মাতৃক্রোড়েই সেরা শিক্ষা পায়। মা তাকে স্নেহে-শাসনে, আদরে, ভালোবাসায়, ভুলিয়ে, বুঝিয়ে নানাভাবে শিক্ষা দেয়। শ্রীমাও তাঁর সন্তানদের মধ্যে জ্ঞান-ভক্তি সঞ্চারের চেষ্টা শুরু করলেন। প্রথমদিকে তিনি পুরুষভক্তদের সামনে বেরোতেন না বা কথা বলতেন না তবে প্রয়োজনে দীক্ষা দিতেন, কোনও সংশয় বা প্রশ্ন থাকলেও উত্তর দিতেন। তবে মায়ের সঙ্গে নারী ভক্তদের যোগ সবসময়ই ছিল।

দক্ষিণেশ্বরে থাকতেই পেয়েছিলেন দুই কলকাতাবাসিনীর সান্নিধ্য, এঁরা হলেন যোগীন-মা ও গোলাপ-মা। ব্যক্তিগত জীবনে আরও অগণিত কলকাতাবাসিনীর মতোই তাঁদের দুঃখের জীবন। যোগীন্দ্রমোহিনীর স্বামী অম্বিকাচরণ বিশ্বাস ছিলেন অমিতব্যয়ী, অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। উপায়ান্তর না থাকায় তিনি উত্তর কলকাতায় পিত্রালয়েই ফিরে আসেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে পৌঁছে শান্তির আশ্রয় পান। তাঁর নির্দেশেই তিনি শ্রীমায়ের সেবিকা ও সঙ্গিনী। গোলাপ-মা বাগবাজারে বাস করতেন। তাঁর স্বামী কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণীর জীবন শুরু হয়। পুত্রটিও শৈশবে মারা যায়। একমাত্র কন্যাকে গোলাপসুন্দরী যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখেন। আর্থিক অনটনে কৌলীন্যপ্রথা অগ্রাহ্য করে কন্যা চণ্ডীকুমারীর বিয়ে পাথুরিয়াঘাটার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুটি শিশুপুত্র রেখে চণ্ডীকুমারী মারা গেলে গোলাপসুন্দরী শোকে-দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। পূর্বপরিচিতা যোগেন্দ্রমোহিনী তাঁকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রয়ে নিয়ে আসেন। নহবতে তিনিও মায়ের সঙ্গিনীরূপে গৃহীত হন। পরবর্তী জীবনে শ্রীমায়ের সর্বকালের সঙ্গিনীরূপে আমরা এঁদের দেখছি। শ্রীমা তাঁদের বলতেন জয়া-বিজয়া।

যাই হোক, উনিশ শতকের কলকাতার সঙ্গে শ্রীমায়ের যোগ এঁরাই ঘটালেন। মা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন এই শতকের অধঃপতিত নারীদের আলোয় ফিরিয়ে আনার কাজ। ঠাকুর ও শ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ জানা সত্ত্বেও গোলাপ-মা তৎকালীন সংস্কারবশত মাঝে মাঝে বলে ফেলতেন, "...উনি অত বড়ো ত্যাগী, আর মা এত মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ ভালো দেখায় কি?"[১৩] বুদ্ধিমতী মা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেন এ কথা শুধু মনোমোহনের মায়ের নয় গোলাপ-মায়েরও। তিনি সোনার বালা হাতে রেখে সব গয়না খুলে ফেললেন। কারণটা তাঁর মুখেই অন্য প্রসঙ্গ শুনেছিলেন এক সেবক, "গোলাপ কি কম গা? দক্ষিণেশ্বরে আমি ঠাকুরের কাছে যেতুম বলে ওর হিংসে হত। একদিন বলেই ফেললে, তুমি ঠাকুরের কাছে যাও কেন? আমি কারুর কথা সইতে পারিনে। কথা শোনবার মতো কাজ তো করিই না, তবে শুনব কেন? আমি যাওয়া বন্ধ করে দিলুম।"[১৪] অথচ মা ভালো করেই জানতেন, তাঁর গয়না পরা বা ঠাকুরের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া কোনওটাই দোষের নয় তবু ভক্তদের চোখে ঠাকুরের ত্যাগের আদর্শ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশ তিনি রাখেননি। তার অপরূপ সংলাপটিও উনিশ শতকের নারীকে দিয়েছে অন্য একটি শক্তি, তা হল কথা শোনার মতো কাজ না করা। একেবারে নিরাভরণভাবেই নিজের পবিত্র জীবনটিকেই শুধু তুলে ধরলেন তা নয়, অন্য নারীদেরও বুঝিয়ে দিলেন পবিত্র ও গ্লানিহীন জীবনযাপনের মর্যাদা কতখানি। বস্তুত, যে-সময়ের কথা বলছি, সেসময় কলকাতা শহরের অধিকাংশ অন্দরমহলে সীতা-সাবিত্রীর পাতিব্রত্য, বীবজননীর আত্মত্যাগ, দ্রৌপদীর মর্যাদাবোধ গল্পকথায় পর্যবসিত হয়েছিল। গার্গী-মৈত্রেয়ী স্মৃতিতেও ছিলেন না। অবশ্য সহস্র বন্ধনের মধ্যেও দু-চারজন নারী যে মুক্তির কথা ভাবেননি তা নয়। মানুষমাত্রেই একটা শান্তির আশ্রয় খোঁজে, উনিশ শতকে কিংবা তার আগেও নারী সে আশ্রয় খুঁজেছিল ধর্মের কাছে, ঠাকুরঘরে। দু-চারজন সংসারবন্ধন কেটে বেরিয়েছিলেন মুক্তির সন্ধানে। কিন্তু সকলের জন্য শান্তির সন্ধান দিলেন শ্রীমা। তার সঙ্গে যুগোপযোগী এগিয়ে যাওয়ার পথ।

প্রথমেই তিনি নারীকে শেখালেন অতিরিক্ত আসক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে। তিনি জানতেন অধিকাংশ নারীই নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে আবদ্ধ করে রাখে। বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবনে কোনওরকম সম্মান না পেলেও ভোগের মোহিনী-মায়া তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ঠাকুর এবং শ্রীমার বিবাহের আদর্শটি সেজন্যই এত মূল্যবান। তাঁরা নতুন করে শেখালেন ভারতীয় আদর্শের পুরানো কথা, বিবাহ শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নয়, শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া নারীজীবনের শেষ কথা নয়। গৃহী ভক্তদের জন্য এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। মায়ের দায়িত্ব ছিল আর একটু বেশি। বাৎসল্য নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু সে কি কেবল তার নাড়ী-ছেঁড়া ধনের সঙ্গেই রক্ত মাংসের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে? শ্রীমা তাদের সামনে তুলে ধরলেন বিশুদ্ধ মাতৃত্বের আদর্শ। তিনি গর্ভধারিণী নন কিন্তু 'সত্যজননী'। সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া বড়ো শক্ত। শুধু উপদেশে কোনও কাজ হয় না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মা এমন কোনও উপদেশ সন্তানদের দেননি, যা তিনি আচরণের দ্বারা প্রমাণ করে দেখাননি। সর্বত্র তিনি বাস করতেন অতি সাধারণ পল্লীবধূর মতো। তাঁকে ঘিরে যাঁরা থাকতেন আপাতদৃষ্টিতে তাঁরাও অতি সাধারণ মানুষ। শ্রীমায়ের সংস্পর্শে এসে কি তাঁদের মন বদলাত না? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, "ভ্রাতাদের স্বার্থবুদ্ধি, ভ্রাতুষ্পুত্রীদের পরস্পর হিংসা, নলিনীদিদির শুচিবায়ু, রাধুর বাতুলসদৃশ আবদার এবং

ছোটোমামীর পাগলামী—এই সকল মিলিয়া যে অবর্ণনীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইত তাহাতে একমাত্র ধৈর্যময়ী শ্রীমায়ের পক্ষেই সংসারের কাজ করা সম্ভব ছিল।"[১৫]

আসলে এঁরা সকলেই ছিলেন মায়ের লীলাসঙ্গী। লোকলোচনের সামনে এটি তাঁর পঞ্চতপার সাধনা। বিড়ম্বিত নারীদের তিনি শিখিয়েছিলেন অশান্তির নিত্যদহনের মধ্য দিয়ে কীভাবে সাধনা করতে হবে।

ঠাকুর পেয়েছিলেন একটি সুস্থ পরিবেশ, সাধনার উপযুক্ত স্থান, বাছা বাছা কয়েকটি সন্তান। শ্রীমা তা পাননি। তাঁকে সংসারে থেকেই শেখাতে হল, সংসারে কোনও শান্তি নেই। এক সন্তানহীনা বিধবা একটি শিশুকে মানুষ করতে চাইছেন। বেঁচে থাকার জন্য অবলম্বন তো চাই। মা তাঁকে বললেন, "অমন কাজও কোরো না। যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভালো এক ভগবানকে ছাড়া কাউকে বেসো না। ভালোবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।"[১৬] এর পরেই উদাহরণের প্রয়োজন। মা নিজের জীবন থেকেই দৃষ্টান্ত দিলেন, "দেখো না, আমি রাধুকে নিয়ে কত মায়ায় ভুগছি।"[১৭] মহামায়া নিজের মায়ার কথা শোনাচ্ছেন অপরকে। নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরকে বোঝাচ্ছেন, ভগবান ছাড়া কেউ আপন নন, অপরকে ভালোবেসে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে না পড়াই ভালো। শুধু কর্তব্য করে যেতে হবে। কর্তব্য বা সেবায় বন্ধন নেই। তিনি অবশ্য প্রকৃত ভালোবাসাকে ছোটো করেননি, এমনকি তা জাগতিক এবং মানবিক হলেও। কিন্তু আসক্তির প্রতি তাঁর তীব্র বিরক্তি। এক বিধবা নারীকে তিনি সংসারে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন, "সংসার কি তিনি ছাড়া? তিনি সবখানেই আছেন। বিশেষ, মেয়েমানুষ কোথায় যাবে মা? তিনি যেখানে যেভাবে রাখেন সেখানেই সন্তুষ্ট থেকো।"[১৮] এই সংসারে থাকার উপদেশের মধ্যে কোথাও অবলম্বন হিসেবে সংসারকে আঁকড়ে ধরে আপন করে নেওয়ার ব্যাপার নেই। রাধু যখন স্বামীর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, তখন মা বিরক্ত হয়ে বলেছেন, "ওই বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে কখন স্বামী ফিরবে... কি আসক্তি মা।"[১৯] সবই উদাহরণের জন্য। কেননা, মায়ের লীলাসহচরী রাধুর অনাসক্তির পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি।

ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা নবযুগের মানুষের প্রাণে একটি স্থান করে নিয়েছিল। যখন হিন্দুধর্মের সর্বত্র শুধু 'গেল গেল' রব আর ভেদাভেদ নিয়ে বিচার-বিতর্ক চলছিল, তখন ঠাকুর 'যত মত তত পথে'র সন্ধান দিয়েছিলেন। ঈশ্বরলাভই যেখানে শেষ কথা সেখানে ভেদবুদ্ধির বালাই নিয়ে সময় নষ্ট করা কেন? কিন্তু সহজে কি একথা আমরা স্বীকার করতে পারতাম? কলকাতাবাসী নিবেদিতার প্রকৃত পরিচয় পেয়েও তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল দীর্ঘদিন! একমাত্র মা তাঁকে এবং ইউরোপ থেকে আসা বিদেশিনীদের অসংকোচে গ্রহণ করলেন। অন্য মহিলারা দেখলেন, নিষ্ঠাবতী বিধবা হয়েও মা বিনা দ্বিধায় বিদেশিনীদের সঙ্গে আহার করছেন। এই অসম্ভব ঘটনা নীরবে বিপ্লব ঘটাল অন্যদের মনে। অথচ ইতিপূর্বে সংস্কার দূর করার জন্য ডিরোজিওর শিষ্যদের কত হাস্যকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেই ঘটনার জেরে কেউ গৃহত্যাগী, কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন। অথচ মা জয়রামবাটীর মতো গ্রামে বসে অনায়াসে শরৎ ও আমজাদকে এক বললেন, মুসলমান ডাকাতকে খাবার পরিবেশন করলেন, তার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করলেন।

একটিও উপদেশ না দিয়ে ভালোবাসা এবং আচরণই যে সংস্কারের মূলে আঘাত করতে

পারে, সে শিক্ষাও তিনি দিয়েছিলেন। মানুষের মনই আসল। কোঠারের পোস্টমাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক খ্রিষ্টান মহিলাকে ভালোবেসে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তাঁকে বিবাহ করেন কিন্তু সে বিবাহ স্থায়ী হয়নি, স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। পরে ধর্মত্যাগের জন্য তাঁর মনে প্রচণ্ড অনুশোচনা হয়। তিনি যখন ঘোর অনুতপ্ত, সেইসময় মায়ের শিষ্যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শ্রীমা তখন তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার যজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রী-গ্রহণে অনুমতি দিয়ে স্বধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং দীক্ষা দেন। এত বড়ো ঘটনাটির এত সহজে সমাধান হতে পারে তা ভাবাই যায় না।

মা কিন্তু অন্যের ধর্মকে কোনওদিন হেয় করেননি। এক ব্রাহ্ম মহিলা-চিকিৎসক এসেছিলেন মায়ের কাছে। মা যখন সকলকে প্রসাদ দিলেন তখন তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, মা তাঁকে প্রসাদ দিলেন না। অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলে মা বললেন, "তুমি না চাইলে আমি কি করে দিই।"[২০] কারণ তিনি ব্রাহ্ম। তিনি প্রসাদ চাইলেন এবং বিস্মিত হয়ে দেখলেন মাত্র একটি রসগোল্লাই মায়ের পাত্রে রয়েছে। অর্থাৎ প্রার্থনা না করলেও মা তাঁকে ভাগ বা ভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেননি—আবার তাঁর ধর্মের অসম্মানও করেননি।

আরও একটি কাজ করেছিলেন মা। সেটিও যুগোপযোগী এবং দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি শিখিয়েছিলেন পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। খ্রিষ্ট কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণও সেকথা বলেছেন। ঠাকুর বলতেন, কাজলের ঘরে কাজ করলে কালি লাগবেই। তিনি এবং মা দুজনেই জানতেন, এই সংসারই কাজলের ঘর। কিন্তু কজন আর সেকথা জানে? পাপীকে ঘৃণা করতেই আমরা অভ্যস্ত। তার মুখের ওপর সব দরজা বন্ধ করে দিয়েই নিশ্চিন্ত। উনিশ শতকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ নারীকে সহ্য করতে হয়েছে তথাকথিত পাপের জন্য। মা পাপী-তাপী সকলকেই আশ্রয় দিয়েছিলেন। এক অনুতপ্ত নারীকে তিনি বলেছিলেন, "পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্তা হয়েছ। এসো আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।"[২১] করুণাধারায় ধুয়ে মুছে মা সেই নারীকে বুকে তুলে নিলেন অথচ আমাদের হিন্দুসমাজে পদস্খলিতা নারীর জন্য কোনও ক্ষমার আশ্রয় ছিল না। অনেক নারীকেই ভাগ্যবিপর্যয় এবং সাময়িক ভুলের জন্য সারাজীবন সামাজিক-দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য কোনও সুস্থ পথ তাদের জন্য খোলা ছিল না। মা কিন্তু অনুতপ্তকে চরণে আশ্রয় দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করেছেন। একটি ডোমের মেয়ে যখন তাঁর কাছে উপপতির বিরুদ্ধে নালিশ জানায় তখনও দেখি মা সেই ব্যক্তিকে ডেকে ভর্ৎসনা করছেন, "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে, এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে মহা অধর্ম হবে।"[২২] অবশ্য এ-ঘটনা কলকাতায় নয়। তবে বাগবাজারে মায়ের বাড়ির কাছে এক অসুস্থ নারীকে তার উপপতি অক্লান্ত সেবা করলে মা তার প্রশংসা করেছিলেন।

অভিনেত্রী তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী মায়ের কাছে আসতেন। মা তাঁদের স্বহস্তে পান দিতেন। স্পর্শ বাঁচিয়ে তাঁরা মাকে প্রণাম করতেন। একদিন মা তাঁদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "এদেরই ঠিক ঠিক ভক্তি। যেটুকু ভগবানকে ডাকে, সেটুকু একমনে ডাকে।"[২৩] অথচ মা জানতেন, হিন্দুসমাজে বা কোনও পরিবারে এদের কোনও স্থান নেই। তিনি দেখতেন এদের মন। ভালো-মন্দ সকলেই মায়ের স্নেহলাভ করত। মা বলতেন, "আমার কাছে আসবে না তো কার কাছে যাবে? আমি কি খালি ভালোরই মা... মন্দের নই?"[২৪]

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছিলেন, তিনি (শ্রীমা) ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের

চরম বাণী। কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি অথবা নতুন আদর্শের অগ্রদূত? এই প্রশ্ন বহুদিন আমাদের সংশয়ের মধ্যে রেখেছে ও রাখবে। কেন-না, মার মধ্যে দুটি আদর্শের সুচারু মিল ঘটেছে। উনিশ শতকের নারীর মধ্যে এই রূপই সকলে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। বিবিধ বিপরীতগুণের সমাবেশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে মা প্রাচীনপন্থী হলেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যা নিরর্থক তা তিনি অনায়াসে বর্জন করতে পারতেন। বালবিধবা নারী নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখে তিনি বলেছেন, "আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি তুই জল খা।" কিংবা "বাছা অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর কোরো না।" আর একজনকে বলেছেন, "আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়, সে কাঁদে আমাকে দিলে না বলে।" এই তিনটি উক্তির কোনওটি কি অনাধুনিক? আমরা হয়তো পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে আত্মা না বলে 'শরীর' শব্দটি ব্যবহার করব। কিন্তু মা নশ্বর শরীরের পরিবর্তে অবিনশ্বর আত্মার কথা বলেছেন।

সংসারে থাকতে হলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কিছু খর্ব করতে হয়। মা নিজের প্রাত্যহিক আচরণে সে শিক্ষাই দিয়েছিলেন। বলতেন, "সহ্যের সমান গুণ নাই আর সন্তোষের সমান ধন নাই।" এ যেন সনাতন শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার আশ্চর্য সমন্বয়। বলতেন, "মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় কথা বলতে নেই।... মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে মুখে কিছু আটকায় না।" কথাগুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আজও সমান উপযোগী।

নারীশিক্ষার প্রতি মায়ের আগ্রহ ছিল। উনিশ শতকের কলকাতা বিশেষ করে বাগবাজার তখনও অনেকখানি অনুদার। মা কিন্তু নারীশিক্ষায় বরাবর নিবেদিতাকে সমর্থন করেছেন। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীদের লেখাপড়া শিখতে পাঠশালায় পাঠিয়েছেন। রাধু মিশনারি স্কুলে পড়েছে, মায়ের আপত্তি ছিল না। সকলেই লেখাপড়া শিখবে এ বাসনা তাঁর ছিল। তাদের কী শেখাতে হবে তা তিনি বলেননি তবে তাঁর আচরণ বুঝিয়ে দেয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিককে অবজ্ঞা না করে তার শরিক হতে শেখা প্রয়োজন। আবার নিবেদিতা স্কুলের এক ছাত্রীকে তিনি বলেছিলেন, "যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।" এও কি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম শর্ত নয়? আজকের দিনে সমাজসেবাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে ধরা হয়। আত্মসর্বস্ব মানুষ একদিকে যেমন নিজের এবং নিজের ছোটো পরিবারটির কথা ভাবেন তেমনই দেখা যাবে, এঁদের অনেকে সেবামূলক নানা কাজের সঙ্গে কোনওভাবে জড়িয়ে পড়লে জীবনের আনন্দ নতুনভাবে খুঁজে পান। মা খুব সহজে সেই কথাটিই বলেছেন, "যে রাস্তায় তুমি চলছ, যদি দেখো সেই রাস্তায় কেউ পড়ে গিয়েছে, তাকে তুমি তুলে দেবে। পথে পড়ে থাকা কাউকে কখনও ফেলে যেতে নেই।" একথা মনে রাখলে হঠাৎ সেবামূলক কাজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে হয় না, প্রথম থেকেই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা আসে, সেইসঙ্গে মানসিক তৃপ্তি। আধুনিক স্কুলেও দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি ছাত্রকে বলা হচ্ছে একজন নিরক্ষরকে কিছু শেখাতে। নিজের অন্তর থেকে প্রেরণা এলে এই কাজ আরও সহজ হয়।

শুধু লেখাপড়া শেখা নয়, মা চেয়েছিলেন নারী নিজের পায়ে দাঁড়াবে অর্থাৎ স্বাবলম্বী হবে। শিল্পশিক্ষা, সংগীতশিক্ষা কিংবা নার্সিং ট্রেনিং সম্বন্ধেও তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। সুধীরা দেবী পুজোর সময় স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন। তাঁদের নিজেদের কাজ

নিজে করে নেওয়া অর্থাৎ টিকিট কাটা, গাড়িতে ওঠা, স্কুলের খরচ চালানোর জন্য ধনী কন্যাদের গান শিখিয়ে উপার্জন করা, স্বোপার্জনের জন্য ছাত্রীদের সেলাই শেখানো—কোনওটিকেই মা অবজ্ঞা করেননি। নারীর পরনির্ভরতা দূর করতে চেয়েছেন নানাভাবে। একজনকে বলেছেন "পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে?" যেসময় বলছেন, তখন ভদ্রপরিবারের মেয়েরা একা পায়ে হেঁটে বেরোতেন না। অল্পবয়সে এবং জোর করে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও মায়ের ঘোর আপত্তি ছিল। এ-ব্যাপারে নারীর কষ্টই তুলনামূলকভাবে বেশি। মা বলতেন, "সারাজীবন পরের দাসত্ব করা, পরের মন যোগানো, এ কি কম কষ্টের কথা।" চন্দ্রমোহন দত্তকে বলেছিলেন, "বড়ো খুকির বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখাও। ও যেমন নিবেদিতা স্কুলে পড়ছে তেমনি পড়ুক।" কিন্তু সমাজের অহেতুক ভয়ে, আত্মীয়স্বজনের চাপে পড়ে চন্দ্রমোহন মায়ের কথা রাখেননি। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাঁরা মেয়ের জীবনে দুঃখই টেনে এনেছিলেন। মুকুন্দবিহারী সাহাকেও মা বলেছিলেন, "সৎপথে থাকবে। বিয়ে কোরো না। মাস্টারি করবে। ছেলে মানুষ করবে।" মুকুন্দবিহারী প্রশ্ন করলেন, "যদি কখনও মনে দুর্বলতা আসে?" মা বলেছিলেন, "ওর জন্য তুমি ভেবো না। কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। যখনই দুর্বলতা আসবে ঠাকুরকে স্মরণ করবে, আমাকে ভাববে।" অকৃতদার মুকুন্দবিহারী ভালোভাবেই জীবন অতিবাহিত করেন।

দুটি উদাহরণই অবশ্য ভবিষ্যৎ-দর্শনে মায়ের দৈবশক্তির পরিচয় দিয়েছিল। অন্যদের পক্ষে এভাবে ভবিষ্যতের কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মা শিখিয়েছিলেন গতানুগতিক জীবনকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আত্মবিকাশের অজস্র পথ সামনে রয়েছে। শিক্ষার প্রতি মায়ের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জাগ্রত এবং স্বাধীনচেতা। নবজাগ্রত স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে মা মূল্য দিতেন, সেইসঙ্গে চাইতেন হৃদয়ের প্রসারতা—যার দৈন্য আধুনিক যুগে মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে ওঠে। মানুষের দোষ দেখতে নিষেধ করতেন মা। বলতেন, "দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়।" ভবিষ্যতের প্রতিবাদী নারীকেও মা দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এর জন্য দায়ী করেছিলেন তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গিকেই। 'গেল গেল সব গেল' বলে সদ্য জাগ্রত নারীকে নিন্দা না করে বলেছিলেন, "সন্তানদের অনেককে তো দেখি নিজেদের ভুলত্রুটি অপরাধের ইয়ত্তা নেই, তবু তারা চায় বউ-ঝিরা তাদের কাছে নত হয়ে থাকুক। এই অন্যায়ের ফলে যে দিন আসছে, (তখন)মেয়েরা আর পৃথিবীর মতো সইবে না।"

উনিশ শতকের নবজাগরণের সঙ্গে যদি আমরা সমুদ্রমন্থনের তুলনা করি তাহলে অনায়াসে বলা যায়, অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে যিনি সেদিন আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন তিনি স্বর্গের লক্ষ্মী নিশ্চয়, তবে মর্তকায়ায় তিনি জননী সারদা দেবী ছাড়া আর কেউ নন। আমাদের সকলের কাছে তাঁর একটাই পরিচয়, তিনি 'মা'। কথাপ্রসঙ্গে মা বলেছিলেন, "ঠাকুরই তো মা বুলি শিখিয়েছেন। মা বলা কি ছিল আর?" বাস্তবিকই উনিশ শতকের কলকাতা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে এক বিষময় এবং বিষম পরিস্থিতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাদের সমাজ, শিল্প, সাহিত্য সবই এঁদের আবির্ভাবের পরে রূপ-পরিবর্তন করেছে। আসলে পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির। দেশকে 'মা' বলে ডাকতে শিখল অগণিত নরনারী। বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন

স্বামীজীর বাণী পাঠ করে। আবার অনেকে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। মায়ের সান্নিধ্যে এসে দেশজননীকে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও বাংলা সাহিত্যে এলেন একাধিক মাতৃমূর্তি,—গোরার আনন্দময়ী, 'ধাত্রীদেবতা'র শৈলজা ঠাকরুন, আর শরৎসাহিত্যে তো অসংখ্য মাতৃমূর্তি, যারা কেউ গর্ভধারিণী নয় কিন্তু অপরূপ মাতৃস্নেহের অধিকারী। শিল্পীরাও নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন মায়ের রূপ। এই অপূর্ব মাতৃমূর্তি শ্রীমায়ের প্রভাবে এবং প্রচেষ্টায় আমরা নতুন করে ফিরে পেলাম উনিশ শতকের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে।

নারীজাগরণ ও শ্রীশ্রীমা

প্রব্রাজিকা নির্ভীকপ্রাণা

অনন্তকালসমুদ্রে উনবিংশ শতাব্দী নতুন সূর্য ওঠার দিন। পৃথিবীব্যাপী ঘুম ভাঙার ক্ষণ। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিত্র-ভাস্কর্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব বিষয়ে আধুনিকতার জোয়ার একদিকে যেমন মানুষকে উদ্বেল করেছিল, অপরদিকে করেছিল চিন্তাশীল।

নতুন দিনের নতুন চিন্তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল ভারতবর্ষের সমাজে। সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরকেই সেই জাগরণ নাড়া দিয়েছিল। আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার বিরোধে জন্ম নেয় এক নবীন যুক্তিবাদী চিন্তাধারা। কিন্তু ভারতবর্ষের পটভূমিতে আধ্যাত্মিকতাকে উপেক্ষা করে কোনও দীর্ঘস্থায়ী স্রোতস্বিনীর প্রবাহ অসম্ভব।

আধ্যাত্মিকতা ভারতের প্রাণস্বরূপ—ত্যাগ, সেবা, প্রেম, ক্ষমা, সত্য ও সংযমের নিরলস চর্চা ভারতের মৌলিক আদর্শ। ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস করে এগুলির অভ্যাস অধ্যাত্মজগতের দ্বার উন্মোচিত করে। অন্তরের দেবত্বকে জাগ্রত করে মানুষকে তার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করে। আদর্শ নারী অথবা পুরুষ তারাই—মনুষ্যত্বই যাদের প্রথম পরিচয়। উনবিংশ শতাব্দী আদর্শ দৈবী-মানবের জন্মকাল, সামগ্রিক জাগরণের শুভ আরম্ভ।

বিতর্কের পথ বেয়ে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সামাজিক জাগরণ বহুবার ঘটেছে কিন্তু তার প্রভাব ছিল খণ্ডিত বা আংশিক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্রান্ত দিঙ্‌নির্দেশনা, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথার্থ ও অক্লান্ত আহ্বান এবং শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর নিরলস জীবনচর্যা এক নতুন দিগন্তের সামনে আমাদের উপস্থিত করে। এই নবীন যুগ জীবনে আত্মপরিচয়ই একমাত্র পরিচয়—স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সামগ্রিক ও সর্বস্তরের জাগরণই কাঙ্ক্ষিত—সম্মানিত।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই জাগরণ নবীন হলেও প্রথম নয়। পশ্চাদ্‌-দৃষ্টিপাতে দেখা যায়, প্রাচীন বৈদিক সমাজে নারী এবং পুরুষের পৃথক মূল্যায়ন হয়নি। নারীর যে কেবল বেদপাঠে অধিকার ছিল তাই নয়, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মধ্যেও তাঁরা স্থান করে নিয়েছিলেন। সন্ন্যাসের আদর্শকে গুরুত্ব না দিলেও বিবাহ-সংস্কার নারীজীবনে বাধ্যতামূলক ছিল না। কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের ক্ষেত্রে বিবাহ ছিল আবশ্যিক এবং একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন কর্তব্য সম্পাদন করতে পারতেন। নারীরা পুরুষদের সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিলেন বলে পরিবারে উভয়ের মর্যাদার মধ্যে প্রায় কোনও ভেদ ছিল না; সামাজিক মর্যাদাও নারী-পুরুষের প্রায় এক ছিল। নারীরা ছিলেন উদারভাবসম্পন্ন, যথার্থ শিক্ষিত এবং বিচারবোধসম্পন্ন।

ব্রাহ্মণ-উপনিষদ যুগের প্রাথমিক পর্যায়েও সামাজিক অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল।

তাদের উপনয়ন সংস্কারও হত বৈদিক যুগেরই মতো। স্ত্রীরা নিত্য বেদপাঠ ও বৈদিক প্রার্থনায় অংশ নিতেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দেখি আর্যরা অনার্যদের উপর ক্রমে প্রভাব বিস্তার করে। আর্য-অনার্যের বিবাহ সংমিশ্রণের ফলে সমাজে আসে পরিবর্তন। আর্যকন্যাদের বৈদিক শিক্ষার সুযোগ কমে যায় এবং সেইসঙ্গে অল্পবয়সেই তারা বিবাহিত জীবন শুরু করে।

স্মৃতি ও পুরাণের যুগে মেয়েদের বিবাহের সময়সীমা আরও হ্রাস পায় এবং বালিকাদের উপনয়ন একটি অনুষ্ঠানমাত্রে পর্যবসিত হয়। পরবর্তী কালে উপনয়ন সংস্কারকে বিবাহ সংস্কারের তুল্য জ্ঞান করে নারীদের বৈদিক সান্ধ্যবন্দনা ও যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীদের স্থান অত্যন্ত হীন পর্যায়ে নেমে আসে। সমাজে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা ক্রমশ কমে যায়। উপনয়ন সংস্কার থেকে বঞ্চিত নারীরা শূদ্রের সমান বিবেচিত হতে থাকে এবং কতগুলি লোকাচার এবং ব্রত উপবাস ইত্যাদিই সেসময় নারীদের মধ্যে অধিক প্রচলিত হয়ে পড়ে। বিবাহের বয়ঃসীমা কমে আট-নয় বৎসরে দাঁড়ায় এবং অধিকাংশ নারী থেকে যায় অশিক্ষিত। পরে মুসলমান প্রভাবের ফলে নারী হয় গৃহবন্দী—সংসারে একান্ত অবহেলিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর 'নবজাগরণ' পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষদের একাংশের ওপর প্রভাব ফেললেও, নারীরা অধিকাংশই থেকে যান এই প্রভাবের বাইরে।

সমাজে হিন্দু পুরোহিতশ্রেণীর অত্যাচার এবং ধর্মের নামে আচার অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দেওয়ায় সেযুগে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষ হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। হিন্দুধর্মের পরিবর্তে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তাও তাদের ছিল না। ফলে জন্ম নেয় আধুনিক মনোভাবাপন্ন নিরাকারবাদী বেদান্তাশ্রয়ী ব্রাহ্মসমাজ। এই সমাজে ক্ষেত্রবিশেষে পর্দার প্রচলন থাকলেও, শিক্ষাক্ষেত্রে বা সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এঁরা নারী এবং পুরুষে কোনও ভেদ রাখতেন না। বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের এই সমাজভুক্ত করে গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু নিরাকার উপাসনা সাধারণ মানুষের বোধের নাগালের বাইরে থেকে যাওয়ায়—এই সমাজ ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। নারীসমাজকে জাগরণের অংশীদার করতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অপরিসীম।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় প্রগতিশীলতায় অন্যতম ভূমিকা ছিল ঠাকুর পরিবারের। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং নারী-প্রগতির ক্ষেত্রে সম্ভবত ঠাকুর পরিবারই পশ্চিমী বাতাসকে বহন করে আনে। পড়াশোনা ছাড়া গান-বাজনা, শিল্পকলা, সাহিত্যসৃষ্টি থেকে শুরু করে ঘোড়ায় চড়া, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করা ইত্যাদিতে ঠাকুরবাড়ির মহিলারা ছিলেন পুরুষদের সমকক্ষ। কিন্তু তাঁদের প্রগতিশীলতার বাতাস একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের মধ্যে এই প্রগতিশীলতাকে তাঁরা প্রসারিত করতে পারেননি। ফলে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির প্রভাব ক্রমশ সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে আসে।

এই অস্থিরতা ও আধ্যাত্মিক টানাপোড়েনের দিনে কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে নতুন আঙ্গিকের ভাবনা-চিন্তা নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মসমাজের পুরোধারা শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মানসিকতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে সমবেত হয়েছেন,

তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছেন—তাঁকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে গিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার উপাসনা শ্রীরামকৃষ্ণের শুক্‌নো লেগেছে, প্রাণহীন মনে হয়েছে। মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্পর্শী সন্তান-ভাব, মায়ের জন্য ব্যাকুলতা প্রতিক্ষেত্রে তখন সজীব ও প্রাণবন্ত। ঈশ্বরসান্নিধ্যের জন্য তাঁর সাধনার নানা পটপরিবর্তন—সবই ছিল মাতৃকেন্দ্রিক।

নারীজাতিকে বিশেষ সম্মান-প্রদর্শন করেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তান্ত্রিক সাধনার গুরু নির্বাচন করলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে। যে-কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে করামলকবৎ—কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তিনি চৌষট্টি তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল আরও বৈপ্লবিক! অষ্টাদশী সহধর্মিণী সারদাকে ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজ প্রকোষ্ঠে বিধিবৎ পূজা করার মানসে আবাহন জানালেন—প্রার্থনা করলেন—"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরি, সিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার শরীর মনকে পবিত্র করিয়া, ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"[১] পূজান্তে তাঁর বহু সাধনার সাক্ষী জপমালা সমর্পণ করে প্রণাম জানালেন, 'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"[২] নারীজাতির প্রাপ্য সম্মানের যে অবমাননা সেযুগে প্রত্যক্ষ করা যেত—এ-ঘটনা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় তারই প্রায়শ্চিত্ত। অন্যভাবে বলা যায়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন যে মাতৃজাতিকে এক বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করবে, ভেদাভেদ তিরোহিত করে সকল মানুষকে যে মাতৃবেদীতলে সমবেত করে সমস্নেহদৃষ্টিতে গ্রথিত করবে, আপাতমানবী সারদার দেবীত্বে স্বীকৃতি তার প্রথম পদক্ষেপমাত্র।

বস্তুতপক্ষে সারদা দেবী ছিলেন সর্বসাধারণের জন্য সেই প্রতিমা যার ভিতর দিয়ে সেযুগের মেয়েরা ভাবী কালের নারী-প্রগতির আভাস দেখতে শুরু করেছিলেন। সংকীর্ণতায় আকীর্ণ হিন্দুধর্মের মধ্যে এল উদার আধ্যাত্মিকচেতনা যেখানে পুরুষ এবং নারীর অধিকারের প্রভেদ ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছিল।

যে-কোনও বৃহৎ যুগান্তকারী ঘটনার পটভূমি ঈশ্বর আপন খেয়ালে তৈরি করেন। কুশীলবেরা সেখানে নিমিত্তমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে নির্দ্বিধায় সেকথা বলা যায়। সেযুগে প্রভূত সম্পত্তির মালিক রানী রাসমণি বিষয়কর্মে দক্ষতার জন্য যশোলাভ করেন। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস, মানসিক দৃঢ়তা, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি, অজস্র দান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা তাঁকে সমাজে সকলের বিশেষ প্রিয় করেছিল, 'রানী' নামের যোগ্য করেছিল। দৈবী আদেশে দক্ষিণেশ্বরে তিনি 'ভবতারিণী'র মন্দির স্থাপন করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে পূজকের পদে বৃত হন। এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণ একদিকে যেমন যুগাবতারের সিদ্ধিক্ষেত্র, অপরদিকে শ্রীমা সারদা দেবীর নিভৃত-সাধনার অঙ্গন, আগত সকল ভক্তের জন্য নিজেকে নিবেদনের স্থল, নারী জাগরণের প্রথম স্বীকৃত মঞ্চ। ভাবলে অবাক লাগে, এই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুতের দায়িত্বও অর্পিত হয়েছিল এক নারীর উপর, জগন্মাতার আদেশে, ভাবী কালের এক দেবীশক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে অন্যান্য যে সকল মহীয়সী নারী এসেছেন, তাঁরা কেবল বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্যই ছিলেন না, ছিলেন নারী জাগরণের সূচনাকালে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। অপূর্ব দিঙ্‌নির্দেশ তাঁদের জীবনে পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে বালবিধবা অঘোরমণি দেবী বা গোপালের মায়ের কথা—যিনি দারিদ্র্য এবং কঠোরতার মধ্যে গোপাল-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্নেহ করতেন গোপালবৎ—শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেন গোপালকে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত—উনবিংশ শতাব্দীর পর্দাপ্রথাকে অবহেলা করে। গোপালের-মা ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় নারীর আদর্শে পরিচালিত, প্রার্থনাপর ভক্তিমতী ঈশ্বরনির্ভর এক অপূর্ব মাতৃমূর্তি। তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ করে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্যদের। গোপালের-মার শেষ অসুস্থতার সময় ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে কাছে এনে রাখেন এবং যারপরনাই সেবা-শুশ্রূষা করেন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীও তাঁকে দর্শন করে যেতেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে শ্রীসারদা দেবীর মধ্যে তাঁর গোপাল-দর্শন হয় এবং তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে গোপালের মা শান্ত হন।

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস বা যোগীন-মা ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের বৈদিক নারীদের মতোই আধ্যাত্মিকগুণসম্পন্না। সংসার-জীবনের ভীষণ আঘাত তাঁকে আধ্যাত্মিকতার পথে নিয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে ছিল অক্লান্ত সেবাপরায়ণতা। কিন্তু কোনওকিছুই তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক আভিজাত্যপূর্ণ মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "যোগীন একটি সাধারণ ফুলের কুঁড়ি নয় যে চট করে তা ফুটে যাবে। যোগীন হলো সহস্রদল পদ্ম—ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে।" বাস্তবিক, পরবর্তী জীবনে যোগীন-মা অতুলনীয় আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। ইষ্টদর্শন, সমাধি তাঁর জীবনে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু জীবনটি আবর্তিত হত নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যকর্ম এবং সেবা-পরায়ণতা নিয়ে। ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় : "তাঁর এই কর্মের মূল কেন্দ্রে ছিল তাঁর ইষ্টের প্রতি, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অগাধ ভক্তি এবং ঠাকুরের সন্তানদের প্রতি তাঁর সেবা ও স্নেহবুদ্ধি। তাঁর বাহ্যপ্রকাশ ছিল অতি সামান্যই কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল আধ্যাত্মিক ভাবের আলোকে প্রদীপ্ত।"

গোলাপসুন্দরী দেবী বা গোলাপ-মা ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। স্বামী-পুত্র-কন্যা হারিয়ে বিপর্যস্ত গোলাপ-মা শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ঔষধ তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত করে এবং তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম লীলাসঙ্গিনীরূপে পরিগণিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমার সেবাযত্ন ও পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন জপে সিদ্ধ। তাঁর সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা বলতেন—গোলাপের শেষ জন্ম। এছাড়াও শৃঙ্খলাবোধ, দানশীলতা, স্পষ্টবাদিতা, নিন্দা-প্রশংসায় সমদর্শন ও উদারতা ছিল গোলাপ-মার চরিত্রগুণ যা দিয়ে তিনি সকলের মনকে জয় করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানেরা ছিলেন তাঁর একান্ত স্নেহের পাত্র।

গৌরদাসী বা গৌরী-মা ছিলেন আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে নারীজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। ছোটোবেলার ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। পাশাপাশি সংস্কৃত স্তবস্তোত্রাদির প্রতি তাঁর ভালোবাসা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ তাঁকে ঘরছাড়া করে। অসম সাহসিকতায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন হিমালয়ের সাধনক্ষেত্র থেকে ভারতের বিভিন্ন তীর্থে। প্রত্যক্ষ করেছেন তৎকালীন নারীর দুর্দশা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আরব্ধ কাজের জন্য গৌরী-মাকে আকর্ষণ করে এনে উপস্থিত করেছিলেন শ্রীমায়ের কাছে। গৌরী-মা ছিলেন মার সঙ্গিনী, সখী। মা তাঁকে সন্তানবৎ স্নেহও করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ

বলতেন, "ও মহাতপস্বিনী এবং মহাভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী।" সেযুগে মেয়েদের দুঃখদুর্দশা শ্রীরামকৃষ্ণকে খুবই ব্যথিত করেছিল। সেই প্রসঙ্গে একবার তিনি গৌরী-মাকে বলছিলেন, "এদেশের মায়েদের কত দুঃখ, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।" বলেছেন, "আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরী-মাকে উপলক্ষ করে স্ত্রীজাতির সম্মুখে এক নতুন জগতের সন্ধান তুলে দিতে চেয়েছেন। গৌরী-মাও অক্লান্ত কর্মশক্তির সঙ্গে ঈশ্বরনির্ভরতা, ধৈর্য ও ত্যাগের দ্বারা যে আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন, নারীশিক্ষা ও মুক্তির ক্ষেত্রে সেটি ছিল প্রথম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। স্বামীজী গৌরী-মার প্রাণশক্তির উপর অগাধ আস্থা রেখে চিঠিতে লিখেছিলেন, "গৌর মা কোথা? এক হাজার গৌর মার দরকার—ঐ noble stirring spirit."[৪] তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটির নাম হল শ্রীশ্রীমায়ের নামে—'সারদেশ্বরী আশ্রম'। আশীর্বাদ করে গৌরী-মাকে মা বলেছিলেন, "আরম্ভ কর মা, আশ্রমের অশেষ কল্যাণ হবে।"

ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে নারীজাতির অসম্মান, অবমাননা, পুরুষ-নির্ভরশীলতা, উদ্যমহীনতা স্বামীজীর চেতনার সমুদ্রে ঝড় তুলেছিল। ভারতবর্ষে জননীর আদর্শে যে নারীর সর্বাধিক প্রকাশ, সেই নারীশক্তির সার্বিক জাগরণ ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন। "এদেশে পুরুষ মেয়েতে এতটা তফাৎ কেন যে করেছে"[৫] তা তাঁর বোধগম্য হত না। তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মাতে লিঙ্গভেদ নেই। তাই সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য পুরুষ এবং নারীর একই স্তরে অবস্থানের গুরুত্ব স্বামীজী অনুভব করেছেন। স্বামীজীর ভাষায় : "কোনও জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব"[৬] "যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের, সে দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই। এজন্য এদের আগে তুলতে হয়।"[৭] এছাড়া গৃহকোণে অবরুদ্ধ থেকে মেয়েরা তাদের শক্তি, অমিত বল ও বীর্য, তৎপরবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতা হারিয়েছিল। ফলে সেযুগের এই 'প্যানপেনে ভাব', 'কিছু হলেই কাঁদতে মজবুত' নারীদের মধ্যে তিনি আনতে চেয়েছেন বীরত্ব, দিতে চেয়েছেন আত্মরক্ষার শিক্ষা। ঝাঁসীর রানী ছিলেন এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ উদাহরণ। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল মানসিক দারিদ্র্য ত্যাগ করে মেয়েরা নির্ভীক হোক, ফিরে আসুক আত্মবিশ্বাস, জাগুক উন্নতির তৃষ্ণা এবং সর্বোপরি হৃত আত্মসম্মানবোধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকার মহিলারা স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। জগদম্বার কৃপাপাত্রী এইসকল মহিলারা ধরা পড়েছিল তাঁর দৃষ্টিতে 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতীরূপে'। "এদেশের স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই।... এদের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কাজ এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলিবার জো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হবো না।"[৮] স্বামীজীর আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল ভারতবর্ষের উন্নতি, বিশেষত মহিলাদের। তাই লিখছেন, "এইরকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরী করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।"[৯]

তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন মেয়েদের অনেক সমস্যা—যেগুলি বাস্তবিক গুরুতর। কিন্তু এটিও বিশ্বাস করতেন—শিক্ষার দ্বারা, যথার্থ শিক্ষার দ্বারা সকল সমস্যার সমাধান

সম্ভব। শিক্ষা তাঁর মতে 'শুধু শব্দ শেখা নয়'—মনের বৃত্তিগুলিকে সদ্ভাবে, সদ্বিষয়ে পরিচালনা করা, যা এনে দেবে সামগ্রিক সাফল্য, সাহায্য করবে ভারতের কল্যাণসাধনে। শুধু তাই নয়, ভারতের এই শিক্ষা হবে ধর্মভিত্তিক কারণ ধর্মই ভারতের প্রাণস্বরূপ এবং ধর্মহীন কোনও কর্মই ভারতে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সমর্থ নয়।

বিদেশের রমণীয় উদ্যান থেকে চয়ন করে এনেছিলেন 'সিংহিনী' মার্গারেট নোবলকে ভারতে নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে। অনুপ্রাণিত করেছেন মার্গারেটকে তাঁর শিক্ষাকে সার্থক করতে, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আত্মবিসর্জন করতে। বুদ্ধের হৃদয়বত্তার সঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে মার্গারেটকে দিয়ে ভারতবর্ষের অন্ধকার নারীসমাজের নিদ্রিত অন্তর-দেবতাকে জাগাতে চেয়েছেন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করার মানসে তাঁকে নিবেদন করেছেন ভারতমাতৃকার চরণে। জন্ম নিয়েছেন ভারতকন্যা নিবেদিতা।

মার্গারেটকে স্বামীজী পূর্বে সচেতন করেছিলেন যে ভারতের দারিদ্র্য ও কুসংস্কার সম্পর্কে একটি সমালোচনাও শুনতে তিনি প্রস্তুত নন। তবুও মার্গারেট এলেন এবং ভারতের সমাজকে বোঝার জন্য স্বামীজীর ইচ্ছায় উপস্থিত হলেন শ্রীমা সারদা দেবীর পদপ্রান্তে। মিলন হল উজ্জ্বল পাশ্চাত্য-কিরণে অভ্যস্তকর্মী মার্গারেট এবং শান্ত, পবিত্র, স্নিগ্ধ, স্নেহশীল প্রাচ্যের মাতৃমূর্তি সারদার। শ্রীমায়ের বজ্রকঠিন চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে কোমলতা ও ভালোবাসার নিবিড়তায় নিবেদিতা কেবল মুগ্ধ হননি, প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন শুধু নিবেদিতা নন, সমগ্র নারীজাতি জাগ্রত হোক শ্রীমা সারদা দেবীকে কেন্দ্র করে।

'অভীঃ' মন্ত্রে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের দীক্ষিত হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন স্বামীজী। যে অসীম শক্তির অনুসন্ধান বিবেকানন্দ করেছেন, তার প্রকাশ নির্ভীক ও তেজস্বী হলেই—বিবেকানন্দের আরব্ধ কাজে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। "হাজার হাজার পুরুষ চাই—স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।... কুঁড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও, আগুনের মতো যাও সব জায়গায়।"[১০] স্ত্রীজাতির জন্য শক্তির উৎস নির্দেশিত করে গেছেন শ্রীশ্রীমাকে—যে উৎসের শক্তি কখনও নিঃশেষিত হয় না। সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এক 'কেন্দ্রাভিগ' (Centripetal) শক্তিপ্রবাহ—দেশ, কালের সীমাকে অতিক্রম করে সমগ্র নারীসমাজকে তরঙ্গায়িত করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীভক্তেরা, যাঁদের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি—তাঁরা তাঁদের ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির অন্তঃপুরে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য অবুঝ আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করেও, এইসকল সঙ্গিনীদের তৎকালীন সামাজিক প্রথাবহির্ভূত অনেক আচরণই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এইসকল বিষয়ে তাঁদের আদর্শ ছিলেন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। ব্রাহ্মণ বিধবাদের উপর যে সকল অসার আচার-অনুষ্ঠানের বোঝা সমাজের কর্ণধারগণ চাপিয়ে দিতেন, সেসবের বিরুদ্ধে ছিল শ্রীশ্রীমায়ের নীরব প্রতিবাদ। নিবেদিতার ভাষায়—'ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হলেও, তিনি প্রতিক্ষেত্রে নিজেকে পরিবেশের উপরে উন্নীত করতে পারেন।"[১১]

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে লাল সরু পাড় কাপড় তিনি পরেছেন, হাতের বালাও খোলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগিসন্তানদের তত্ত্বাবধানে

কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে, যখন যেখানে সুবিধা হয়েছে ভাড়াবাড়িতে তিনি সঙ্গিনীদের নিয়ে থেকেছেন। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর। স্বামী সারদানন্দের অপরিসীম চেষ্টায় শ্রীশ্রীমায়ের 'উদ্বোধনে'র বাড়ি হওয়ার পর কলকাতায় তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিল ওই বাড়ির দোতলাটি। একতলায় থাকতেন সাধু এবং ব্রহ্মচারীরা। সেযুগে এই প্রগতিশীলতা ছিল অকল্পনীয়।

শ্রীশ্রীমায়ের মুখখানি সর্বদাই থাকত ঘোমটার আড়ালে। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগিসন্তানরা, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও শ্রীশ্রীমায়ের মুখ-দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মহিলা-ভক্তদের কাছে মা ছিলেন সহজ, অনাড়ম্বর, আপনজন। আরও বিস্মিত হই যখন দেখি সেই রক্ষণশীলতার দিনে স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাদের শ্রীমা সারদা দেবী সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সঙ্গে বসে ফলের টুকরো এক পাত্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতার লেখায় পাই, "(তিনি) আচার-বিচারে বরাবরই রক্ষণশীল—সবকিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশী মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে এলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি খেলেন পর্যন্ত।"[১২]

শ্রীশ্রীমায়ের যে-ছবিটি আজ পূজিত হচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক ছবিটিই মিসেস বুলের ব্যবস্থাপনায় ফোটোগ্রাফারের তোলা প্রথম দুটি ছবির একটি। শ্রীমতী বুলের আগ্রহাতিশয্যে তিনি অপরিচিত ফটোগ্রাফারের সামনে মুখখানি খুলে বসতে রাজি হন। লজ্জাপটাবৃতা সারদার যুগপ্রয়োজনে অসামান্য আত্মপ্রকাশ। নিবেদিতা নেল হ্যামন্ডকে ৩ মার্চ, ১৮৯৯ লিখছেন, "... জেনে রেখো, তাঁর ঐ ফটো তোলার অর্থ—এক্ষেত্রে তিনি জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিকে সরাসরি তাকালেন, বা তেমন কেউ তার মুখ দেখলেন।" ঘটনাগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে মনে হয় নারীজাগরণের ক্ষেত্রে এগুলি একেকটি পদক্ষেপ—যার মূল্য হয়তো আজ আর নেই কিন্তু সেদিনের প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ঘটনাই এক একটি নীরব বিপ্লব।

বিবেকানন্দ-কন্যা নিবেদিতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগাবতাররূপে আবির্ভাবের তাৎপর্য কতখানি স্বচ্ছ ছিল, তা তাঁর 'The Master' প্রবন্ধে আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীগুরু-গ্রহণ এবং নারীভাব-সাধন যে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে আধুনিক যুগের সিংহদরজায় এনে দাঁড় করিয়েছিল, মনস্বিনী নিবেদিতার সেটি বুঝতে অসুবিধা হয়নি। নিবেদিতার ভাষায় : "সারদা দেবী ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী—এই কথাই সর্ব সময় আমার মনে হয়েছে। কিন্তু তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ কথা, না, নূতন আদর্শের প্রথম প্রকাশ? প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয় সরলতম নারীজীবনেও কীভাবে করা সম্ভবপর, তাঁকে দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আমার কাছে তাঁর অধ্যাত্ম মহিমার মতই অপূর্ব ঠেকেছিল তাঁর সম্ভ্রান্ত সৌজন্যের সৌন্দর্য, তাঁর উদার-মুক্ত মনের মহিমা। যত নতুন বা জটিল সমস্যাই তাঁর কাছে উপস্থিত করা হোক, আমি কখনো তাঁকে উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনে কুণ্ঠিত দেখিনি। এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনার মত তাঁর সমগ্র জীবন।"[১৩]

নিবেদিতা আরও প্রত্যক্ষ করেছেন, "তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।" "সহজ বুদ্ধি ও বাস্তববোধ এঁর চূড়ান্ত, প্রতিক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে।"[১৪]

মাতৃসকাশে নিবেদিতা

নিবেদিতার ভারতীয়-আদর্শে শিক্ষাচিন্তা, তাঁর বিদ্যালয় ও শ্রীশ্রীমা

আমরা দেখেছি স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতকন্যায় রূপান্তরিত করার জন্য আদর্শ হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। আর নিবেদিতাও বুঝেছিলেন তাঁর পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার বোঝা ভারতীয় সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, আধুনিক শিক্ষার প্রণালী প্রস্তুত করতে হবে ভারতীয় রীতিতে। তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাভাবনা। নিবেদিতা লিখছেন, "প্রথম থেকেই স্থির ছিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব সুবিধামতো আমি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলে দেব।"[১৫] ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর বাগবাজারের ১৬ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে সেই বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা। এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা হয়েছিল—উপস্থিত ছিলেন গোলাপ-মা, যোগীন-মা-সহ শ্রীশ্রীমা। ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ। সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের এক অমোঘ আশীর্বাদ নিবেদিতার এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবধারায় পরিচালিত সকল বিদ্যার্থিনীর উপর বর্ষিত হয়েছিল—"আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"[১৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভগিনী নিবেদিতার প্রতিক্রিয়াও গভীর তাৎপর্যবাহী—"ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনও মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।"[১৭]

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শে বিদ্যালয়টি গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন নিবেদিতা। প্রথম বছর প্রায় পঞ্চাশটি ছাত্রী ভর্তি করেছিলেন, যদিও বছরের শেষে অবশিষ্ট ছিল উনিশ জন। পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজ, সেলাই ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। সেসব কাঁচা হাতের ছোট্টো প্রদর্শনীটি প্রথম বছর উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। সেযুগের ব্রাহ্ম মহিলারাও নিবেদিতাকে এ-বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ধর্মশিক্ষা দিতেন যোগীন-মা। সরলাবালা সরকার লিখছেন, "নিবেদিতা বলিতেন, 'বিদ্যালয়ের উপর স্বামীজীর নিঃশ্বাস রহিয়াছে, ইহা ভারতের নব জাগরণের উদ্বোধন-মন্ত্র স্বরূপ হইবে।' আমরা আশা করিব না এবং নিরাশ হইব না, আমরা দৃঢ়নিশ্চয়—আমরা অগ্রগামী-নিরাশা-দল। আমরা নিজের শরীর দিয়া সেতু প্রস্তুত করিব, পরবর্তী সৈন্যদল সেই সেতুর উপর দিয়া সেতু পার হইয়া যাইবে।"[১৮]

১৯১১ সালে নিবেদিতার আকস্মিক মৃত্যুতে স্কুলটি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ভগিনী কৃস্টিন ও ভগিনী সুধীরার একান্ত উৎসাহে সেদিন স্কুলটিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। আবাসিক ছাত্রী এবং সেবাব্রতী কন্যাদের থাকার আশ্রমটির নাম দেওয়া হয় 'মাতৃমন্দির'। ভবিষ্যতে এই 'মাতৃমন্দির'ই 'সারদা মন্দিরে' রূপায়িত হল। 'মাতৃমন্দিরে' শ্রীমা সারদা দেবী একদিন স্বয়ং ঠাকুরের পূজা করেন। ভগিনী সুধীরার আদর্শ এবং সকল উদ্যমের প্রেরণা ছিলেন শ্রীশ্রীমা।

নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি জাতীয়ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। বাগবাজারের পল্লী অঞ্চলে নিবেদিতা ঘুরে ঘুরে ছাত্রী-ভিক্ষা করেছেন। অভিভাবকেরা অনেক দ্বিধার পর হিন্দুরীতিতে শিক্ষাদান দেখে অবশেষে নিঃসংশয়ে কন্যা পাঠাতে সম্মত

হন। নিবেদিতা ভারতীয় মেয়েদের উন্নতির জন্য জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখেছেন। সচিত্র 'এমপ্রেস' পত্রিকায় মেয়েদের ছবি প্রকাশিত হওয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। শ্রীমা সারদা দেবী নিবেদিতাকে রক্ষা করতে স্বয়ং এগিয়ে আসেন এবং ঘটনাটিকে সমর্থন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সরলা দেবীর (প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভগিনী সুধীরা যখন সরলা দেবীর জন্য লেডি ডাফরিন হাসপাতালে মিডওয়াইফারি ও নার্সিং শেখার ব্যবস্থা করেন তখন গোলাপ-মা বলেছিলেন, "ব্রাহ্মণের মেয়েকে হাসপাতালে কাজ করতে দিচ্ছে! সে আবার কি গো? যত অনাসৃষ্টি! ওর হাতে আর কে খাবে?" শ্রীশ্রীমা সব শুনে শান্তভাবে বলেন, "সে কি গোলাপ, শিখে এসে ও আমাদেরই সেবা করবে।"[১৯] মার সেদিনের সমর্থনে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়।

শুধু তাই নয়, বিবাহের বদলে মার ইচ্ছা থাকত মেয়েরা নিবেদিতার স্কুলে পড়ুক।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, আধুনিক নারীর প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় নারীর শ্রেষ্ঠ গুণগুলি পরিস্ফুট হোক। মেয়েদের স্বাধীন কল্পনাশক্তি ও অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলি একই সঙ্গে জেগে উঠে যথার্থ নারীশক্তির বিকাশ ঘটুক। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং হন আদর্শ। সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ, তপস্যা, নিঃস্বার্থপরতা, আপামর ভালোবাসা ও নিরলস কর্মের সাধনা মেয়েদের সম্মানিত করুক, জাগুক অন্তরে প্রজ্ঞার আলো। জাগৃতি আসুক আধ্যাত্মিকতার হাত ধরে। নারী জাগরণ ঘটুক শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে।

স্বামীজীর এই অভিনব পরিকল্পনা ও তার বাস্তব রূপায়ণ আজও চিন্তাশীল মানব সমাজের গবেষণার বিষয়। আজ 'শ্রীশ্রীমা'-ই সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষিতে সর্বাধিক আলোচিতা প্রাচ্যের নারী। শ্রীমা সারদা দেবীকে যে অকল্পনীয় মর্যাদার আসনে বিবেকানন্দ অধিষ্ঠিত করে গেছেন—তা আজকের নারী-প্রগতির ও নারী স্বাধীনতার মহান প্রবক্তাদের ধ্যান-ধারণার অতীত। আজকের মেয়েরা সম্পদের এবং পুরুষের ইচ্ছার দাসত্ব করছে—শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ছিল অন্যরূপ। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক নয়। বিশ্বব্যাপী প্রসারিত জগৎ-আলোড়নকারী সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা, তিনি সঙ্ঘনেত্রীও। সঙ্ঘে তাঁর কথা, তাঁর ইচ্ছাই শেষ কথা ছিল। পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসে, সামাজিক ইতিহাসে, রাজনৈতিক ইতিহাসে কোনও নারীকে এই সম্মান দেওয়া হয়নি। এই অনন্য মর্যাদার আসনটিতে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা তাঁর অসীম যোগ্যতার বলে।

পাশ্চাত্যবিজয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন, যে-কোনও বড়ো কাজ একক শক্তিতে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই organization বা সঙ্ঘ। চাই Division of Labour. আর তাই সমাজকে উন্নত করতে পুরুষসঙ্ঘের আগে মহিলাসঙ্ঘের পরিকল্পনা করেছেন। "ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রীমঠ start করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁদের central figure হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্যারা ওখানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রীমঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায় হবে।"[২০]

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে মাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'শ্রীসারদা মঠ'—স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী। 'শ্রীসারদা মঠ' পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে সন্ন্যাসিনী-

পরিচালিত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। স্বামীজীর সযত্ন-লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। আধুনিক শিক্ষা এবং চিন্তাভাবনার সঙ্গে ধর্মের অনুশীলনে সঙ্ঘবদ্ধ এই স্ত্রীমঠ পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করল।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সার্ধ শতবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে নতুন করে নারীজাতির ভাবার সময় এসেছে। সীতা-সাবিত্রীর রূপের ঔজ্জ্বল্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁদের আন্তর-সৌন্দর্য, আত্মমর্যাদাবোধ। বর্তমান যুগের মেয়েদের সেই আত্মমর্যাদাবোধের নতুন করে অনুসন্ধান প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের গঠনমূলক শিক্ষাভাবনা অতিক্রম করে আজ আমরা বাণিজ্যিক শিক্ষা, ভোগবাদী শিক্ষার মুখোমুখী। ভোগ-বিলাসের স্রোতে শিক্ষার সংযমের দিক—ইতিবাচক দিকটি অপসৃত—নারীরা ভেসে যাচ্ছে ভোগবিলাসের স্রোতে। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জাগ্রত নারীরা কার অনুসরণ করবে—রূপোপজীবিনী বিশ্বসুন্দরীদের, না শান্ত, কোমল, দৃঢ়চিত্ত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে, এটাই বোধহয় সমগ্র নারীজাতির সম্মুখে সুস্থ পৃথিবীর জিজ্ঞাসা। উত্তর দেবেন মহাকাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমার প্রভাব

দীপালি রায়

আন্দোলন, আন্দোলন, আন্দোলন। সমগ্র জগৎ জুড়ে আজ একটিই ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছে আন্দোলন—ইংরেজিতে যাকে বলে movement। ইংরেজিতে যা movement, বাংলায় তার প্রতিশব্দ 'আন্দোলন' হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলন কিন্তু সে অর্থে আন্দোলন নয়। এ হচ্ছে ভাবান্দোলন—সমগ্র সত্তার জাগরণ। শান্তি-সম্প্রীতি-সমন্বয় তার মর্মকথা। চিত্তপ্রসারী তার গতি। আধ্যাত্মিক উর্ধ্বায়ন তার মূল লক্ষ্য। এই ভাবান্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণ দুজনকে নিজস্ব আয়ুধরূপে ব্যবহার করেছেন। এক, তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, অন্য, তাঁরই অর্ধাঙ্গিনী শ্রীসারদা দেবী। 'শ্রীসারদা দেবী'—ছয় অক্ষর সমন্বিত এই ক্ষুদ্র শব্দটি এক আবহমান ঐতিহ্যের ঘনীভূত স্বাদু নির্যাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ যুগপ্রয়োজনেই স্বামীজী ও জননী সারদাকে ধরাধামে অবতীর্ণ করিয়েছেন। তাছাড়া রয়েছে উচ্চ ভাবালোকসম্পন্ন, ধীমান সন্ন্যাসিসম্প্রদায় এবং অনুরাগী গৃহী ভক্তকুল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন অনুরাগী গৃহী ভক্ত সম্প্রদায়—উভয়ের আনুকূল্যে মা ভবতারিণীর নির্দেশেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাবান্দোলনের সূচনা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় যা ছিল সদ্য অঙ্কুরিত, যুগজননী সারদা তাকেই শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত দীর্ঘ মহীরুহরূপে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। লোকলোচনের অন্তরালবর্তিনী শ্রীমাকে নিবেদিতা ভারি সুন্দর একটি উপমায় ভূষিত করেছিলেন—তা হল 'ভোরের শিশির বিন্দু'। রাতের গভীর আস্তরণে শিশির কখন নিঃশব্দ পদসঞ্চার করে তা কেউ দেখেনি। সকলের দৃষ্টির অগোচরে. শ্রুতির অগোচরে শিশির পড়ে। রসসিক্ত করে তোলে রুক্ষ কঠিন পৃথিবীকে। এই অগোচর দানের এতখানিই ধীরসঞ্চারী শক্তি যে তা আমাদের পৃথিবীকে বাসযোগ্যতা দিচ্ছে। সজল স্নিগ্ধতায় ভূগর্ভে প্রাণসঞ্চার করছে। নইলে খর মরুভূমির ভয়াবহ রুদ্রতায় জীবন নিষ্করুণ হয়ে উঠত। শ্রীশ্রীমায়ের নিঃশব্দ চরণপাত শিশিরের মতোই অনিবার্য, শিশিরের মতোই শান্তিপ্রলেপী। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে যে আন্তর্জাতিক শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে তারও কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন মা। তিনি লোকলোচনের অন্তরালে বিন্দুবাসিনী হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ গৃহী-পার্ষদ বলরাম বসুকে লিখছেন : "বলরামবাবু, মাতাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।"[১]

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের যেসব উক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে

কালগতভাবে এটিই প্রথম। স্বামীজীর অন্তরে শ্রীমায়ের স্থান সম্পর্কে এ মন্তব্য উজ্জ্বল আলোকপাত করেছে। গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে স্বামীজী লিখছেন : "তাঁহার আশীর্বাদে আমার সর্বতোমঙ্গল।" শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'। সে কবিতার প্রথম স্তবকেই তিনি লিখছেন : দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধির জন্য স্বামীজীকে দীর্ঘকাল বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল কিন্তু মায়ের মহিমা উপলব্ধির জন্য তাঁকে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয়নি। অথচ দু-তিনজন ত্যাগী ভক্ত ছাড়া অন্যসকলের মতো নরেন্দ্রের কাছেও তিনি অন্তরালবর্তিনী ছিলেন। মায়ের মুখের অনুচ্চস্বরে উচ্চারিত কথাগুলি গোলাপ-মা বা অন্য কেউ স্পষ্ট করে স্বামীজীকে শুনিয়ে দিতেন।[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমাকে স্বামীজী যে অভেদ জ্ঞান করতেন তার প্রমাণ স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পূর্বাহ্ণে মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনার ব্যাকুল সংকল্পে। মায়ের আশীর্বাদেই স্বামীজী তাঁর ঐতিহাসিক অভিযান সফল করেছিলেন, এ সত্য তিনি বারবার উচ্চারণ করেছেন। স্বামী সারদেশানন্দ বলছেন, তিনি মায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর মুখে শুনেছেন যে বিশ্বজয় করে ফেরার পর স্বামীজী যেদিন প্রথম শ্রীমায়ের চরণবন্দনা করলেন, সেদিন, ছোটো মামীর ভাষায় : রাজার মতো চেহারা, ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে পড়ল; জোড়হাতে বলল—"মা সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি, তোমার কৃপায়!"[৩]

স্বামীজী বলতেন, (মা) সকলের মনের কথা জানেন—'তিনি অন্তর্যামিনী'। তিনি মায়ের সম্পর্কে বলতেন, 'জ্যান্ত দুর্গা।' স্বামী শিবানন্দকে এক পত্রে লিখেছিলেন : "বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। ... গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য।"[৪]

শ্রীমাকে দেখলে মনে পড়ে এক বিশাল অনন্ত শান্ত আকাশ। অথচ প্রয়োজনে এই শান্ত আকাশের আড়ালে যে বিদ্যুদ্‌বাহী ভয়ংকর বজ্র লুকানো আছে হঠাৎ তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগ্নে হৃদয়কে বারংবার এবিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ঠাকুর যখন দেহ রাখেন, সঙ্ঘ তখন কোথায়! শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের শিক্ষাকে স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন। জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়. মুক্তি বড়ো কিন্তু সে মুক্তি আসবে লোককল্যাণব্রতে—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। দক্ষিণেশ্বর বাসের প্রথম কয়েক বছর গভীর কঠোর-কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মানুসন্ধান ও ঈশ্বরসাধনায় রত ছিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে ঈশ্বর-উন্মাদ এই যোগী তাপসের দিকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। এ-সম্পর্কে শ্রীম লিখছেন : ঠাকুরের ভক্তরা অসংখ্য—তাঁহারা কেহ প্রকাশিত আছেন, কেহ বা গুপ্ত আছেন—সকলের নাম করা অসম্ভব।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপূর্ব এক প্রেমের সূত্রে তাঁদের গেঁথেছিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তাঁর ভূমিকা লোকশিক্ষকরূপে। অগণিত নরনারী ধর্মপিপাসায় তাঁকে ঘিরে থাকত। কেউ কেউ অবতারজ্ঞানে পুজোও নিবেদন করত। কিন্তু দুরারোগ্য ক্যানসারে ঠাকুর যখন আক্রান্ত হলেন তখন অনেকে আবার ভয় পেয়ে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। শুধু যাঁরা

তাঁর অন্তরঙ্গ জন তাঁরা আরও নিবিড় করে তাঁকে ঘিরে রইলেন। এই তরুণ ভক্তদল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'সূর্যোদয়ের পূর্বে তোলা মাখন' অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত বালযোগী। এঁরা দিনরাত ঠাকুরের পরিচর্যায় ব্যাপৃত থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মর্তলীলার অবসান আসন্ন বুঝে আধ্যাত্মিক সম্পদ যাঁকে যা দেবার একে একে আলাদা আলাদা ভাবে তাঁদের পূর্ণকাম করতে লাগলেন। এ-সময় দেখা যায় ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে প্রায়ই আলাদা ডেকে উপদেশ দিচ্ছেন। মহাপ্রয়াণের দুদিন আগে রুদ্ধ ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঠাকুর তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে সর্বস্ব অর্পণ করে যান। ২৬ মে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা এক পত্রে স্বামীজী বলছেন : "আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগী মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।"[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ যা চেয়েছিলেন তাই পরে হল। এই ছেলেরাই সন্ন্যাস নিয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়লেন। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখটা যেন উপলক্ষ। "এ সুবাদেই অন্তরঙ্গ ভক্তেরা একত্র হলেন, পরস্পরকে চিনলেন, তাঁদের মধ্যে সমপ্রাণতা জন্মাল"[৬] শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি প্রেমই তাঁদের মধ্যে সমপ্রাণতা আনতে সহায়ক হয়েছিল। 'তাঁদের লক্ষ্য এক, পথ এক, এবং দৃঢ়তাও এক।'[৭] শ্রীরামকৃষ্ণ এই সঙ্ঘের দেহ এবং আত্মা।

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে লীন হলেন। তাঁর শেষ মুহূর্ত অবধি সেবা করেছিল অন্তরঙ্গ ভক্তজন। এই সম্মিলিত সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মা সারদার সেবা। এ শুধু সেবা নয় সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। কিন্তু সেই অন্তরালবর্তিনীকে চাক্ষুষ অনেকেই দেখেননি। অন্তরাল থেকেই তিনি ভক্তদের উৎসাহ দিতেন। নিজে থাকতেন অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অবলুপ্ত। নিশ্চয়ই এই অলোকসামান্যাকে তাঁরা মনে মনে শ্রদ্ধা করেছেন, সবিস্ময়ে সম্ভ্রমে তাকিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজমুখের উক্তি : ও (সারদা দেবী) আমার শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। দুই দেহ, এক আত্মা। সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণেরই ভিন্নরূপ।

যুগান্তরের সেতু অতিক্রম করে অতীতের পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখতে পারি কবি কালিদাসকে। পার্বতী-পরমেশ্বরের অভিন্নতা বুঝিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি উচ্চারণ করেছিলেন :

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥"

হরপার্বতীরূপেই বন্দিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠসান্নিধ্যে মা সারদা সমস্ত শিক্ষালাভ করে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও তপস্যার মাধ্যমে ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁর ভাবস্বপ্ন, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে দৃঢ় নেতৃত্ব দান করেন এবং সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে সমস্ত ঝড় ঝাপ্টা, তীব্র সংকট থেকে তাকে রক্ষা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যাশক্তি ভবতারিণীর পূজা এভাবে সার্থক হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগিসন্তানেরাও তাঁরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিন্তু শ্রীমা তাঁর অখণ্ডরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদীপ্ত সূর্য। সে জ্বলন্ত অগ্নিতে আমাদের দৃষ্টি ঝলসে যায়। চন্দ্রকিরণ স্নিগ্ধ। শান্ত তার মহিমা। তা আমাদের দৃষ্টিকে শীতল করে, স্নিগ্ধ করে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুসারে চন্দ্রের কিরণ প্রকৃতপক্ষে সূর্যকিরণই। "মা চন্দ্রমার মতো আমাদের অন্তরকে প্রফুল্ল, স্নিগ্ধ

করেছেন। রাত্রি যখন আসে, তখন সূর্য নয়, স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণই আমাদের কাম্য। তার অর্থ এই নয় যে, ঠাকুরের স্নেহ মায়ের স্নেহের থেকে কম। কিন্তু বিরল সেই অধিকারী, যিনি ঠাকুরের স্নেহ অনুভব করতে পারেন। ঠাকুর নিজেই বলেছেন, অবতার যখন আসেন তখন কজন তাঁকে ধারণা করতে পারে? রামচন্দ্র যখন এসেছিলেন, তখন বারোজন ঋষি তাঁকে অবতাররূপে গ্রহণ করেছিলেন।"[৮] কিন্তু মায়ের কাছে কারও কোনও বাধা ছিল না। গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রত্যেকে নিজজীবনকে প্রসারিত করতে পেরেছিল মাতৃসান্নিধ্যে এসে। মায়ের কাছে সব সন্তানের সমান আবদার। কিন্তু ঠাকুরের কি মায়ের মতো সহন শক্তি ছিল? ঠাকুর বলতেন : খতিয়ে দেখলুম কজন আমার অন্তরঙ্গ। আর মা? তিনি তাঁর স্নেহের পরিধির বাইরে কাউকে রাখেননি। এই উদার অনন্ত মাতৃশক্তিতে সমস্ত জগৎ পরিপ্লাবিত। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে ইংরেজদের পদানত হয়ে যখন আমরা অসীম যন্ত্রণায় দগ্ধ এবং বিরূপ, তখন উদার, ব্যাপ্তমনা মা বলছেন, ইংরেজরাও তো তাঁরই সন্তান। বহুমানিত সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মঠ-রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ অধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের ভাষায় : "দুষ্ট হোক, ভাল হোক, আমজাদ হোক, শরৎ হোক, বেশ্যা হোক অথবা সৎ ব্রাহ্মণ হোক—তাঁর স্নেহের পরিধির বাইরে কেউ নয়, কেউ তাঁর করুণা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়।"[৯] তিনি মা। তাই সন্তানের দোষগুণ তিনি বিচার করছেন না। উদার মাতৃসত্রের আশ্রয়ে পাপী-পুণ্যবান, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, সৎ-অসৎ সকলের ঠাঁই হয়েছিল।

মায়ের অবদান শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। স্বামীজী বলেছেন—'সঙ্ঘ হচ্ছে ঠাকুরের স্থূল দেহ।' শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন যুগের আদর্শ—এই সত্য মা সঙ্ঘের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের আলোকে জগৎকল্যাণে সঙ্ঘের উন্নতিসাধন ও প্রসারই লক্ষ্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগসম্রাট, সারদাদেবী ত্যাগসম্রাজ্ঞী।"[১০] মায়ের এই ত্যাগ-ঐশ্বর্য সন্ন্যাসিসন্তানদের সুবিদিত ছিল। তাই কাশীপুরে একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে ঠাকুরের ছেলেরা প্রথমেই গেলেন শ্রীমার কাছে। শ্রীমা একটি টাকা দিয়ে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। এক টাকা ষোলো আনা, ষোলো কলা অর্থাৎ পূর্ণ। তাঁদের ত্যাগসাধনা সার্থক হোক, তাঁরা পূর্ণকাম হোন—এই ছিল শ্রীমায়ের আশীর্বাদ।

যুগজননী সারদা নিজ মহিমায় মহিমান্বিতা। নিজেকে অবগুণ্ঠিতা রাখতেই তিনি চাইতেন। তবু তাঁব শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আমাদের অতর্কিতে চমকে দেয়। সে তাঁর মাতৃত্বের অমোঘ মহিমা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বামী, গুরু, ইষ্ট সবই। যে মা ছিলেন 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়া', প্রয়োজনবোধে মাতৃত্বের অমোঘ দাবিতে সেই স্বামীর কথাও তিনি মেনে চলেননি। বোধহয় এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগীসন্তানদের রক্ষাকর্ত্রী ও পালয়িত্রীরূপে শ্রীমা লোকলোচনের অন্তরালে গড়ে ওঠেন। ভগিনী নিবেদিতা মনে করতেন নারীর আদর্শ সম্পর্কে সারদা দেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপ্রতিমার মুখ্য কুম্ভকার হলেও সারদা দেবীর চরিত্রে আরও কিছু নিজস্ব উপাদান ছিল যা তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দান করে। শৈশবে মা জয়রামবাটীর মুখুজ্জে পরিবার সামলেছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের পাতের গরম গরম খিচুড়ি জুড়োবার জন্য বালিকা সারদা দুহাতে পাখার বাতাস করতেন।

'এই কর্ম-পরিণত ধর্মের কথা' স্বামীজী পরবর্তী কালে বারবার উল্লেখ করেছেন।

সঙ্ঘজননীরূপে শ্রীমার দায়িত্বসচেতনতার প্রথম প্রকাশ পাই ত্যাগী সন্তানদের খাওয়া

নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মতদ্বৈধতার মধ্যে। সন্তানদের রাতের খাওয়া নিয়ে ঠাকুর প্রতিবাদ জানাতে গেলে শ্রীমা তার উত্তরে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন : "তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব" এই আত্মপ্রত্যয় সমন্বিত উক্তির পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননীর 'নেতৃত্ব' বিষয়ে স্থিরপ্রত্যয়ী হয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে শ্রীমার আবির্ভাবের তাৎপর্য গভীর। কারও স্তুতিতে তিনি বড়ো নন, তাঁর মহিমা স্বোপার্জিত। শ্রীরামকৃষ্ণ লোককল্যাণব্রতে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। এক প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী বলেন—ঠাকুরের সব কাজের জন্য তাঁর পূর্বনির্ধারিত ধারক থাকেন। শ্রীমা ঠাকুরের ভাবাদর্শ রূপায়ণে মূর্ত ধারিকা। তিনি আরও বলেন তিনটি সংজ্ঞায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ঠাকুরকে আমরা Inspiration—মূর্তিময় প্রেরণারূপে দেখতে পারি। ঈশ্বর অবতাররূপে যখন আসেন তখন প্রয়োজন হয় তাঁর ধারিকাশক্তির, প্রকাশশক্তির। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি মূর্ত প্রেরণা হন স্বামী বিবেকানন্দ যেন তার Interpretation—স্বরূপ বিশ্লেষক এবং প্রতিনিয়ত লোকজীবনে তাঁর ব্যবহারিকা শক্তি হলেন শ্রীমা—যাঁকে বলা যেতে পারে Implementation। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি মূল বৃক্ষ। তার একটি প্রকাশ বিবেকানন্দ, অপর একটি প্রকাশ সারদা। বহুমানিত সন্ন্যাসী ভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ যদি হন শুদ্ধ রাগ বা শুদ্ধ রাগিণী, তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ তার বিজ্ঞানসম্মত স্বরলিপি এবং মূল সংগীত পরিবেশিকা হচ্ছেন যুগধাত্রী শ্রীমা।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শপ্রতিমা শ্রীমা জগতের মানুষের সামনে একটি মহৎ জীবনদর্শনকে তুলে ধরেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ তাঁর জীবনাচরণ, অতিসাধারণ তাঁর জীবনদর্শন। অতিসাধারণের অন্তরালে রয়েছে এক গভীর স্থির জীবনপ্রজ্ঞা যার অসাধারণত্ব দেখলে চমকে উঠতে হয়। আজ বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষমাত্রই অনুভব করছেন, আধুনিক ভারতবর্ষে এবং আধুনিক পৃথিবীতে শ্রীমায়ের জীবনাদর্শ অনুধ্যান কত প্রয়োজন। তিনি শুধু সঙ্ঘজননী নন, তিনি যুগধাত্রী, যুগজননী।

মা তাঁর সুষম ব্যবহারে মিলিয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে, করেছিলেন নতুন নজির স্থাপন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ। স্বামীজী স্বয়ং মিস নোবেল, মিসেস সারা বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে সঙ্গে নিয়ে উপনীত হন মাতৃসান্নিধ্যে। এঁরাই প্রথম তিন বিদেশিনী, যাঁরা শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ করেন। প্রথম দর্শনেই মা তাঁদের আপন করে নিলেন। এই ঘটনায় পরবর্তী কালে একটি পত্রে স্বামীজী তাঁর বিস্ময় ব্যক্ত করেছিলেন : 'ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পারো, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন!... ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়।"[১১] সেদিন সম্পর্কে ডায়েরিতে নিবেদিতার মন্তব্য : 'একটি সেরা দিন' (a day of days)।

বাগবাজারে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়টি স্বামীজীর নারীশিক্ষা বিষয়ক ইচ্ছামূর্তি। এই মূর্তির বোধন দিবসে ১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যালয়গৃহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা। শ্রীমা সেদিন স্বামীজীর স্বপ্ন-রূপায়ণকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগদম্বার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।"[১২] এদিন কোন বিরাট আনন্দের তুফান উঠেছিল নিবেদিতার হৃদয়ে তা সহজেই অনুমেয়।

"একবার নিবেদিতা ভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন।

শ্রীমা পরম আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। এর ফলে গোঁড়া মেয়েমহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায় এবং তাঁরা শ্রীমার কঠোর নিন্দা করেন। বিরক্ত ও ব্যস্ত হয়ে শ্রীমা বলেন, 'নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ রেঁধে নিবেদন করার অধিকার তার আছে; তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে, কোনো দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি কারো তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।"[১৩]

শ্রীমা সমস্ত সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। কুসংস্কারের দুর্গে অবস্থিত জয়রামবাটীর সমাজপতিদের রোষচক্ষু তিনি হেলায় অতিক্রম করেছিলেন, অতিক্রম করেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণ বাধাগুলো। চেতনার সন্তোষপ্রতিমা সীতা সাবিত্রী সমতুল্য তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা। বুদ্ধিমত্তায় তিনি ছিলেন নারীপুরুষের সম্মিলিত রূপ।

মিসেস সারা বুল মাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "গুরুর প্রতি আনুগত্য বলতে কি বোঝায়?" প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না শ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তরে যা বললেন—পরবর্তী কালে মিসেস বুল সেই তথ্য ম্যাক্সমূলারকে এক পত্রে জানান—কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে। কিন্তু ঐহিক বা বাস্তব জীবনে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে কাজ করলে কোনও দোষ হবে না।[১৪]

সারা বুল এই পত্রটি লেখেন ১১ জুলাই ১৮৯৮। ম্যাক্সমূলার সাদরে তা নিজের 'Ramakrishna and His sayings' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। শ্রীমায়ের এই উত্তর তাঁর সহজ বাস্তববুদ্ধি ও চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচায়ক।

নিবেদিতা প্রতিদিনের ছোটোখাটো ঘটনায় শ্রীমায়ের প্রজ্ঞামহিমা দেখেছেন, বড়ো ঘটনাতেও দেখেছেন। তেমনি একটি ঘটনার সূচনা স্বামীজীর জীবনকালেই, সমাপ্তি স্বামীজীর দেহান্তের অল্প পরে। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল বিশুদ্ধ অদ্বৈতের সাধনা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দু-একজন সন্ন্যাসী একটি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা করছিলেন। অদ্বৈত আশ্রমের নীতিলঙ্ঘনে স্বামীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলে তাঁর ইচ্ছার সম্মানে পটপূজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত সন্ন্যাসীদের মনের সংশয় এত গভীর যে, তাঁরা শ্রীমাকে পত্র দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার প্রত্যুত্তর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসে অমূল্য দলিল! শ্রীশ্রীমা বলেন : আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য—তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করে বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।

জগতে ধর্মীয় সঙ্ঘের নেতৃত্ব এবং লোককল্যাণব্রতে পুরোধা জননীরূপে শ্রীমার ভূমিকা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর শ্রীসারদামণি দেবী অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সকল শিষ্যের প্রেরণাদাত্রী।... যে কেহই তাঁহার দর্শনলাভের সুযোগ পাইতেন তিনিই ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন—শ্রীসারদা দেবী মৃদুতা, পবিত্রতা, মাধুর্য ও জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। তাঁহার মুখ হইতে কখনও একটিমাত্র কর্কশ বাক্য নির্গত হইত না। কখন তিনি কঠোর ছিলেন না, যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তা।"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন তিনি ও সারদা দেবী অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে শ্রীমার অবদান ঠাকুরেরই অবদান। শ্রীঠাকুরই ইচ্ছাপ্রতিমা হয়ে মায়ের মধ্যে সঙ্ঘজননীর শক্তি সঞ্চারিত করেন। তবে মায়ের উদার ব্যাপ্ত ভালোবাসা সৎ অসৎ-নির্বিশেষে আপামর ভক্তজনকে দিয়েছে বাঁচার মন্ত্র, দিয়েছে আত্ম-উত্তরণের অগ্নিদীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের এই

ব্যবহারিক প্রকাশশক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বারংবার বলেছেন : ওঁকে আমাকে এক জানবে। তিনি জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেকের মূর্ত রাগিণীস্বরূপ। ঠাকুর বলতেন : এবার রূপ ঢেকে এসেছে।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরবর্তী কালে মন্তব্য করেছিলেন, তাহলে শ্রীশ্রীমাকে (ঠাকুর) কোন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন? তাঁর মনে হয়েছিল তিনভাবে—শিষ্যারূপে উপদেশ দিয়েছিলেন, পতিব্রতারূপে পদসেবার অধিকার দিয়েছেন এবং সাক্ষাৎ জগদীশ্বরীরূপে পূজা করেছেন।

সব মিলিয়ে শ্রীমা মানব ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিরল দৃষ্টান্ত নারীপ্রতিমা—যুগসঙ্কটে অবতীর্ণা সিংহবাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রস্থানের আগে মাকে বলেছিলেন : এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।

ঠাকুর দেহ রাখার পর শ্রীমা অকপটে স্বীকার করলেন : যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল আমিও চলে যাই। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখা দিয়ে বললেন : না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে। শেষে দেখলুম, তাই তো অনেক কাজ বাকি আছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনরহস্যটি শ্রীঠাকুর সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। শ্রীমাকে তাঁর আত্মস্বরূপ অবগত করিয়ে যোগ্য সঙ্গিনীরূপে সমগ্র কর্মভার সমর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্তে নরলীলা সংবরণ করেছিলেন।

স্বামীজী যখন বিদেশে তখন একমুহূর্তের জন্যও সঙ্ঘের প্রয়োজনের কথা বিস্মৃত হননি। একটি ভাব বা আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে সঙ্ঘের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর মা নিরাশ্রয়, নিঃস্ব, অসহায়। শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ সন্ন্যাসিসন্তানেরাও দরিদ্র, নিরাশ্রয়। কেউ কেউ বৈরাগ্যের প্রবল প্রেরণায় পরিব্রাজকরূপে পথে পথে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যেন অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায়। এই সঙ্কট সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয় সঙ্ঘজননীকে। সঙ্ঘের ত্যাগী সন্তানদের রক্ষার দায়িত্ব যেন তাঁর। মা চেয়েছিলেন তাঁর সন্ন্যাসিসন্তানেরা একত্র থাকবে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবানুসারে জীবন গড়ে তুলবে এবং লোকল্যাণ ব্রতে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করবে। এরই জন্য কেঁদে কেঁদে তিনি কত প্রার্থনা করেছিলেন!

শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌বাণী : নরেন (লোক) শিক্ষে দিবে। শ্রীশ্রীমাও জানতেন সেকথা। জানতেন ভবিষ্যতের লোকগুরু তাঁর এই প্রিয় সন্তান। তাই তাঁর জন্য মায়ের ছিল গভীর চিন্তা। বিশেষত সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এঁর ওপর। শ্রীমার আশীর্বাদ অহর্নিশ বর্ষিত হত স্বামীজীর প্রতি। সঙ্ঘের জমি হওয়াতে শ্রীমায়ের কী আনন্দ! বললেন : এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজার জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। সঙ্ঘের সূচনায় কাজের পন্থা নিয়ে মতপার্থক্য হলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন। যে-কোনও সমস্যার সমাধান মা সঙ্গে সঙ্গে করে দিতেন এবং সব সন্ন্যাসী সে সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নিতেন। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে স্বামীজী বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা করতে চাইলে মা সঙ্গে সঙ্গে তাতে মত দেন। তবে বলি দিতে স্বামীজীকে নিষেধ করেন। মা বলেন : "হ্যাঁ বাবা, মঠে দুর্গাপূজা করে শক্তির আরাধনা করবে বইকি। শক্তির আরাধনা না করলে জগতে কোন কাজ কি সিদ্ধ হয়? তবে বাবা, বলি দিও না, প্রাণী হত্যা কোরো না। তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়প্রদানই তোমাদের ব্রত।"[১৬]

শ্রীমা সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের রূপরেখা। তাই প্লেগের সময় স্বামীজীর মঠ বিক্রি করে সেবাকাজের সংকল্পকে তিনিই বাধা দেন। বেলুড় মঠ একটা ছোটো

সেবাকাজেই নিঃশেষ হবে না। এ তাঁর প্রজ্ঞায় ধরা পড়েছিল। ১২ নভেম্বর ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বেলুড়ে শ্রীমা ঠাকুরের পুজো করেন। মা জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন জগতে একটা নতুন ভাব, নতুন আদর্শ নিয়ে। সেই ভাব, সেই আদর্শ জগতে প্রচারের প্রয়োজন আছে। কারণ তাতে জগতের অশেষ কল্যাণ হবে। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এর বিচিত্র বিহাব। সন্ন্যাসীদের মতো সন্ন্যাসিনীদের জন্যও অনুরূপ এক মঠ স্থাপনের চিন্তা স্বামীজীর মনে প্রথম থেকেই_অঙ্কুরিত ছিল। সে মঠের কেন্দ্রে·থাকবেন শ্রীশ্রীমা। তবে স্বামীজীর জীবৎকালে সে পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপ পায়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর অনলস পরিশ্রমে শ্রীমা যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে দুর্দিনে আশা জাগিয়েছেন, দিয়েছেন আত্মপ্রতিষ্ঠার বীজমন্ত্র—আজ সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে তার কর্মকাণ্ড। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমার সাধনার যুগ্ম ধারা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে প্রাণিত করবে। যন্ত্রণা-দগ্ধ মানুষ পাবে আত্মার আরাম, অন্ধকারে ধ্রুবলোক। এই লোকোত্তর পুণ্যস্রোত ভারতবর্ষের আবহমান সংস্কৃতি- স্রোতধারাকে পরিপুষ্ট করবে।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের 'মাতৃমন্দির' ও শ্রীশ্রীমা

প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে মিসেস বুলকে লেখেন : "সন্ন্যাসীদের জন্য একটি এবং মেয়েদের জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই আমার মৃত্যু হলে আমার জীবনব্রত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।"

মেয়েদের ভাবী মঠ বিষয়ে ১৯০১ সালে তিনি তাঁর সুপরিকল্পিত চিন্তাধারা প্রকাশ করেন—"মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্ব তটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব তৈরি হবে, ওপারে মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী—সব তৈরি হবে।"[১]

স্বামীজী আরও বলেছেন, "...পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে তো মেয়েরা তা হ'তে পারবে না কেন? তাই বলছিলুম—মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞ হন, তবে তাঁর প্রতিভায় হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।"[২]

স্বামীজী 'বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নিয়মাবলীতে' স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন—১) শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ওইপ্রকার আরও একটি মঠ স্থাপিত হইবে।

২) যেভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে, স্ত্রীলোকদিগের মঠও ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে।

স্ত্রীমঠ সম্বন্ধে স্বামীজীর পরিকল্পনা পূর্ণ রূপ নিতে বেশ সময় লেগেছিল। মানুষমাত্রেরই যে দুটি বিষয়ে জন্মগত অধিকার থাকার কথা, সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ তখন আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে খোলা ছিল না। তাই স্বামীজী চেয়েছিলেন আগে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করতে হবে; আর সে ভার মেয়েদেরই নিতে হবে।

আমাদের দেশে তখন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা খুব কমই ছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা ঘোষালকে স্বামীজী ১৮৯৭ সালের ৬ এপ্রিল, লেখেন—"প্রভু করুন, যেন আপনার মতো অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।" কিন্তু স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্বামীজীর শিষ্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, পরবর্তী কালে যিনি সিস্টার নিবেদিতা হন, স্বামীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে এই কাজের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৯৭ সালের ২৯ জুলাই স্বামীজী তাঁকে লিখেছিলেন : "তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।" শতমুখে মিস

নোবলের প্রশংসা করে স্বামীজী বলেছিলেন, "বিলেতের ভেতর এমন পূতচরিতা, মহানুভবা নারী খুব কম। আমি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখবে।"[৩]

স্বামীজীর চোখ দিয়েই নিবেদিতা ভারতের অন্তরাত্মাকে দেখতে শেখেন এবং ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে নবীনভাবে উদ্বুদ্ধ করার সংকল্প নেন। ২৪ জুলাই কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর প্রস্তাবিত মেয়েদের বিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিজের পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করে নিবেদিতা স্বামীজীকে বিষয়টি সমালোচনা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বামীজী বিষয়টি সমালোচনা করতে সম্মত না হয়ে বলেছিলেন, "...আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত—আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অনুপ্রাণিত বলে মনে করি।... আবার তোমার পরে তোমার বালিকারা এবং তাহাদের শিষ্যাগণও সেইরূপ হবে। সুতরাং তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহাই করিতে আমি তোমাকে সাহায্য করিব।"[৪]

শ্রীশ্রীমা নিবেদিতাকে সাদরে গ্রহণ করায় নিবেদিতার পক্ষে বাগবাজার পল্লীতে বাস করা সহজ হয়েছিল। এরপর ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর শ্রীশ্রীকালী পূজার দিন ১৬ নং বোসপাড়া লেনে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন—"এই বিদ্যালয়ের উপর যেন জগজ্জননীর আশীর্বাদ থাকে এবং যে সকল বালিকা এখানে শিক্ষালাভ করবে তারা যেন দেশের আদর্শ কন্যা হয়।"

এই আশীর্বাণী শুনে নিবেদিতার হৃদয়-মন ভরে ওঠে; তিনি বলেন—ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনও মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।

কয়েকমাস বিদ্যালয় পরিচালনার পর কাজের সফলতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিতা ১৮৯৯ সালে স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে যাত্রা করেন।

১৯০২ সালে জানুয়ারি মাসের শেষে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরলেন। সেই বছরই ১২ ফেব্রুয়ারি কাশী থেকে স্বামীজী তাঁকে লেখেন : "সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহুতে অধিষ্ঠিত হোন। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক।... যদি শ্রীরামকৃষ্ণ সত্য হন, তবে যেমনভাবে তিনি আমাকে জীবনে পথ দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে কিংবা তার চেয়ে সহস্রগুণ স্পষ্ট ভাবে তোমাকেও যেন তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।"

১৯০২ সালের ৪ জুলাই স্বামীজীর মহাসমাধি হয়। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে নিবেদিতার মনের অবস্থা অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; তবে আমরা জানি সাধনার পথ সহজ নয়, তা দুর্গম, সংগ্রামপূর্ণ। ১৯০২ সালে স্বামীজীর মার্কিন শিষ্যা কৃস্টিন ভারতে আসেন। ১৯০৩ সালে তিনি নিবেদিতার সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশ নেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা করে নিবেদিতা বলেছেন, "১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের শরৎকালে সিস্টার কৃস্টিন নামে স্বামীজীর জনৈকা আমেরিকান-শিষ্যা ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা কার্যের সমস্ত ভার গ্রহণপূর্বক প্রণালীবদ্ধভাবে উহার পরিচালনা করেন। একমাত্র তাঁহার চরিত্র, একনিষ্ঠতা ও উদ্যম আজ ইহার উন্নতির কারণ।"[৫]

ওই বিদ্যালয় সম্বন্ধে সরলাবালা সরকার লিখেছেন : "বোসপাড়ার একটি ছোটো বাড়ীতে নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা একত্রে থাকিতেন, ওই বাড়ীতেই মেয়েদের পাঠশালাও বসিত;

সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয় বলিতে যাহা বোঝায় এই বিদ্যালয়টি সেরূপ নহে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারিণীগণের জন্য মঠপ্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়াছিলেন, সেই সংকল্পকে ভিত্তি করিয়াই নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন।... এবং বিদ্যালয়ের কার্যেই তাঁহার জীবনদানও করিয়া গিয়াছেন।"[৬]

স্বামীজী চেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের মঠ গড়ে উঠবে। নিবেদিতা পাশ্চাত্যে বিদ্যালয়ের অর্থসংগ্রহের জন্য যে পরিকল্পনাটি (Prospectus) প্রকাশ করেন, তাতে উল্লেখ করা হয় : সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি শ্রীসারদা দেবীর তত্ত্বাবধানে না হলেও প্রথম থেকেই শ্রীমাই ছিলেন প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র ও প্রাণস্বরূপ। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাঁর স্নেহচ্ছায়ায়, তাঁরই অনুপ্রেরণায় কাজ করতেন।

বাগবাজার পল্লীতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নিবেদিতা অভিভাবকদের কাছে হাতজোড় করে তাঁদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতেন। তখনকার কালে মিশনারি বিদ্যালয়গুলিতে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিত হত, অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতেও দেশীয় ভাব বিশেষ বজায় না থাকায় মেয়েদের স্কুলে পাঠালে তারা বিদেশি ভাবাপন্ন হয়ে যাবে আশঙ্কায় অভিভাবকরা কন্যাদের স্কুলে পাঠাতে চাইতেন না। কিন্তু নিবেদিতার আন্তরিক আগ্রহে সব বাধা দূর হয়েছিল, গাড়ির ব্যবস্থা থাকায় পর্দাপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকত। তাছাড়া নিবেদিতা ও কৃস্টিনের হিন্দুনারীর মতো জীবনযাপন দেখে সকলে মুগ্ধ হতেন। ক্রমে সকলে বুঝেছিলেন যে ওই বিদ্যালয়ে হিন্দু সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি মেনে সম্পূর্ণ দেশীয় ধরনে জাতীয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বিদ্যালয়ের সুনাম হয়; গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরাও শিক্ষার জন্য আসতে থাকেন। ১৯০৪ সালে অন্তঃপুরিকা ও বয়স্কাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুরস্ত্রী বিভাগ খোলা হয়।

নিবেদিতা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতির জন্য ছাত্রীদের মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, বোটানিকাল গার্ডেনে নিয়ে যেতেন। আবার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, মায়ের বাড়ি নিয়ে যেতেন। নিবেদিতা মনে করতেন চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনকেই শিক্ষা বলা যায়। লেখাপড়ার সঙ্গে তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। ১৯০৫ সাল থেকে সেলাই ও অঙ্কনের সঙ্গে মাদুর বোনা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শেখানো হত। এই বিদ্যালয় কেবল শিক্ষার কেন্দ্রই ছিল না, এখানেই স্বামীজীর পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল। নিবেদিতা বলতেন—শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে—শুধু নিজের কল্যাণ নয়, জন-দেশ-ধর্মের উন্নতি ও কল্যাণের কথাও ভাবতে হবে।

খুব বেশি পরিশ্রম ও এদেশের গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুতে নিবেদিতার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ড. জগদীশ চন্দ্র বসু ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দার্জিলিঙে যান, সেখানেই ১৩ অক্টোবর তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়।

ভগিনী নিবেদিতার পর ভগিনী কৃস্টিন বিদ্যালয়ের ভার নিলেন, তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন ভগিনী সুধীরা।

স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯০২ সালে কৃস্টিন ভারতে আসেন ও ১৯০৩ সালে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। ১৯০৭-১৯০৯ এই দুই বছর নিবেদিতা যখন পাশ্চাত্যে ছিলেন, সুধীরার সাহায্যে কৃস্টিন সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা করেন। নিবেদিতার দেহত্যাগের পর ১৯১১ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সমস্ত

দায়িত্ব বহন করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙে যায় এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ১৯১৪ সালে কৃস্টিন আমেরিকা যান। ১৯১৪ সালে তাঁর ভারত-ত্যাগের পরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯২৪ সালের আগে আর তিনি ভারতে ফিরতে পারেননি। ১৯১৪ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত ভগিনী সুধীরা দক্ষতার সঙ্গে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রাহ্মভাবাপন্ন পরিবারে জন্ম হওয়ায় সুধীরা ছোটোবেলা থেকেই লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান ও ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। পরবর্তী কালে তিনি কৃস্টিনের কাছে ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তাঁর বড়ো দাদা দেবব্রত বসু ছিলেন নামকরা বিপ্লবী; যিনি পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেন ও সন্ন্যাস নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতসন্তান ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। বড়ো দাদার প্রভাবে শ্রীমতী সুধীরাও স্বাধীনচেতা, নির্ভীক, স্বাবলম্বী ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন। ঐশ্বর্য ও বিলাসময় জীবন তাঁর ভালো লাগত না, সন্ন্যাসিনীর অবাধ মুক্ত জীবন তাঁকে আকর্ষণ করত। তাই তাঁর বিবাহের চেষ্টা না করে যাতে একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে জীবন কাটাতে পারেন তার জন্য বড়ো দাদা সুধীরার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগদানের ব্যবস্থা করে দেন। ১৯০৬ সালে শ্রীমতী সুধীরা নিবেদিতা বিদ্যালয়ে আসেন। তিনি সেবার আদর্শে বিনা পারিশ্রমিকে প্রতিষ্ঠানের পুরস্ত্রী বিভাগে বাংলা সাহিত্য ও সপ্তাহে দুদিন করে গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনাতেন। নিবেদিতা ও কৃস্টিনের পবিত্র আদর্শ জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করে, স্বামীজীর আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ১৯১০ সালে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

এদেশের মেয়ের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করার মহান প্রেরণা সুধীরাকে পাকাপাকিভাবে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে। ১৯১২ সাল থেকে সুধীরাদি বিদ্যালয়েরই আবাসিক কর্মী হয়ে যান। ছাত্রীরা অনেকেই তাঁর জীবন দেখে অনুপ্রাণিত হতেন ও প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর এক ছাত্রী স্মৃতিচারণ করেছেন—"স্কুলকে ভালবাসতুম আর সুধীরাদিকে ভালবাসতুম। সুধীরাদি যেন জাদু জানতেন। যে একবার ওঁর সংস্পর্শে এসেছে সেই তাঁকে ভাল না বেসে পারেনি। তাঁর ভালবাসার আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত। আমাদের মনে হত তাঁর কথায় আমরা বাঘের মুখে যেতে পারতুম। চেহারা তো কিছু ভাল ছিল না। কিন্তু ঐ যেন তাঁর পরম আশীর্বাদ ছিল। দুনিয়াকে গ্রাহ্য করতেন না। সময়-অসময়, রাত-বিরেত, সুবিধা-অসুবিধা কিছুই তাঁকে কাবু করতে পারত না। কোনও সঙ্কল্প নিলেন তো আপ্রাণ চেষ্টায় তা পালন করবেন। তাঁর ত্যাগের আদর্শ, ভালবাসা, উৎসাহ ও দরদ আমাদের জীবনকে পালটে দিল।"[৭] এই ছাত্রীই পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমার অন্তরঙ্গ সেবিকা সরলা দেবী এবং আরও পরে শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী।

বয়স্কা ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই সুধীরাদির মতো সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক হন। সুধীরাদিরও একান্ত ইচ্ছা ছিল এঁদের নিয়ে স্বামীজীর আদর্শ অনুযায়ী একটি আলাদা আশ্রম বিভাগ খুলবেন। কিন্তু তখনকার সামাজিক অবস্থা এর প্রতিকূল ছিল বলে ভগিনী নিবেদিতা ও কৃস্টিন ওই বিষয়ে আপত্তি করেছিলেন। ভগিনী কৃস্টিন আমেরিকা গেলে সুধীরাদি ১৯১৪ সালে 'মাতৃমন্দির' নাম দিয়ে তাঁর কাঙ্ক্ষিত আশ্রম বিভাগটি খোলেন। আশ্রমের অন্তর্গত একটি ছাত্রীনিবাসও খোলা হয়। কারণ বহুদিন থেকেই

তাঁরা ছাত্রীনিবাসে বালিকাদের রেখে পড়ানোর জন্য আবেদন পাচ্ছিলেন। আশ্রম ও ছাত্রীনিবাস স্থাপনের ব্যাপারে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সুধীরাদিকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন, শ্রীমায়ের অনুমোদনও ছিল। সুধীরাদির অনুরোধে শ্রীমা একদিন মাতৃমন্দিরে এসে নিজে শ্রীঠাকুরের পূজা করেন। পরবর্তী কালে অসুস্থ রাধুকে নিয়ে প্রায় একমাস নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এ অর্থাৎ মাতৃমন্দিরে বাসও করেন।

স্বামী সারদানন্দ প্রকাশিত ১৯১৬-১৮ সালের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়—প্রথম থেকেই নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী বিভাগ ও মাতৃমন্দিরের চারটি উদ্দেশ্য ছিল—

১। শিক্ষা ও সেবাব্রতে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করতে চান মাতৃমন্দির তাঁদের আশ্রমরূপে পরিগণিত হবে। ২। পূর্বোক্ত ব্রতদুটি পালনে আগ্রহী হয়ে যেসব হিন্দুমেয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে চান, আশ্রম তাঁদের আশ্রয় দিয়ে ওই উচ্চাদর্শে জীবন গঠন করবার এবং সেইসঙ্গে প্রচলিত উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষকতা ও সেবা-কাজ শিখবার সুবিধা দেবে। ৩। কলকাতার দূরবর্তী স্থানের মেয়েরা যারা ওই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চায়, মাসিক খরচা নিয়ে আশ্রম তাদের সেই সুযোগ দেবে। ৪। সেলাই, সূচীশিল্প প্রভৃতি শিখিয়ে এবং লেখাপড়া জানলে ভদ্রপরিবারে পড়াবার বন্দোবস্ত করে আশ্রম অসহায় দরিদ্র মেয়েদের জীবিকানির্বাহে সহায়তা করবে।

খুব কম ছাত্রীই মাসিক খরচা দিয়ে ছাত্রীনিবাসে থাকত। সুধীরাদি ও তাঁর সহকর্মীরা সূচীশিল্প এবং ভদ্রপরিবারে শিক্ষকতা প্রভৃতি নানা উপায়ে দরিদ্র ছাত্রীদের খরচ চালাতেন। নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে সরলা দেবী তাঁর সমস্ত উপার্জন বিদ্যালয়েই দিতেন। এছাড়া প্রতিবছর কোম্পানির কাগজের সুদের নির্দিষ্ট আয় ছিল। ভগিনী নিবেদিতার উইল অনুযায়ী তাঁর সংগৃহীত এবং মিসেস বুল প্রদত্ত অর্থ ও নিবেদিতার স্বরচিত বইয়ের বিক্রয়লব্ধ আয় এই শর্তে বেলুড়মঠের ট্রাস্টিদের নামে ছিল যে, তা ভারতীয় নারীদের জাতীয়ভাবে শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে (ভগিনী কৃস্টিনের পরামর্শ অনুসারে)। এছাড়াও শ্রী অরবিন্দ ঘোষের স্ত্রী মৃণালিনী ঘোষের নামে তাঁর পিতা শ্রীভূপাল চন্দ্র বসু নগদ ২০০০ হাজার টাকার মৃণালিনী স্মৃতি ফান্ড এবং শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর স্বর্গীয় জননী ও পত্নীর স্মৃতিরক্ষার জন্য দুহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ মাতৃমন্দিরে দান করেন।

মাতৃমন্দিরের সুনাম ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর মহীশূর থেকে বিশ-বাইশ বছরের দুটি দক্ষিণদেশীয় মেয়ে শিক্ষার জন্য মাতৃমন্দিরে আসেন। শ্রীশ্রীমা দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, "আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে, পরগোত্র ক'রে দাও, পরগোত্র ক'রে দাও। আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হ'ত তাহলে কি অত দুঃখ-দুর্দশা হ'ত?"[৮]

১৯১৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন কাশীধামে লাক্ষা পল্লীতে একটি বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার তত্ত্বাবধানের ভার মাতৃমন্দিরের পরিচালিকাদের হাতে দেন।

১৯১৯ সালে সুধীরাদি পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আর একটি শাখা স্থাপন করেন। এর আগে ১৯১২ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সাহায্যে কলকাতার হাতিবাগানে ও বালিতে গঙ্গাতীরে দুটি শাখা খোলা হয়েছিল কিন্তু দুঃখের কথা অর্থাভাবে বিদ্যালয় দুটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে বালির বিদ্যালয়টি আবার খোলা হয় ও ১৯২৯

২২শে চৈত্র ১৩১১ নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমা

সাল পর্যন্ত সেটি চলে।

শ্রীমায়ের বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। মাতৃমন্দিরের কর্মীরাও শ্রীমায়ের কাছে যাওয়া-আসা করে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা পেতেন। একজন স্ত্রীভক্তের পাঁচটি অবিবাহিত কন্যার জন্য দুশ্চিন্তার কথা শুনে শ্রীমা বলেছিলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা ক'রে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"[৯]

কখনও কখনও এমনও হয়েছে—কোনও বিবাহিত সন্তানকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে অর্পণ করে শ্রীমা বলেছেন, "ঠাকুর তোমার ইহকাল, পরকাল রক্ষা করুন।" বিবাহিত জীবনে সন্ন্যাস কি করে রক্ষা পাবে?—এই ভেবে ভয় পেলে মা সন্তানকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, "বাবা, তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি ঠাকুরের কাজ করবে।" স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "ও আমার কাজ করবে। ও নিবেদিতা স্কুলে থাকবে।"[১০] সত্যই মা সেইমতো ব্যবস্থাই করেছেন।

প্রয়োজন হলে শ্রীমা স্কুলের মেয়েদের শিক্ষাও দিয়েছেন। একবার নিবেদিতা স্কুল বোর্ডিং থেকে একটি মেয়ে শ্রীমায়ের কাছে যায়। শ্রীমা তাকে বোর্ডিং-এর মেয়েদের কথা ও যে রাস্তা দিয়ে মেয়েটি আসে তার আশেপাশে কী দেখল না দেখল, এইসব নানা কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু মেয়েটি সব উত্তর ঠিকমতো দিতে পারেনি দেখে শ্রীমা তাকে বলেন, "দেখ, মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে; আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।"[১১]

নিবেদিতা স্কুলের সঙ্গে বরাবর শ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ভগিনী নিবেদিতা থাকতে শ্রীমা একাধিকবার বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে একটি ছাত্রীর স্মৃতিচারণা পাই . "সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মার গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুর-দালানে বসাইলেন। মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ তো শিখেছে মেয়েরা।'...

"যেবার সিস্টার নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়, সেবার সুধীরাদিদির খুব অসুখ হয়। তাঁহার জন্য মার কী ভাবনা! বলেন, 'ও ঠাকুর, সুধীরা যাবে কি? তার যে কত কাজ বাকী?' বলেন আর কাঁদেন।"[১২]

শ্রীমা সুধীরাদির জন্য শ্রীঠাকুরের কাছে তুলসী দেন। আরোগ্যলাভ করে সুধীরাদি শ্রীমায়ের কাছে এলে মা বলেন, "তোমার জন্য বড়ো ভাবনা হয়েছিল। যা হোক, ঠাকুরের কৃপায় সেরেছ, মা। এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার অসুখ—শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চালাবে কে?"[১৩]

"একবার একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েদের কি হবে? এদের কি নিবেদিতাতেই শেষ হয়ে গেল?'

"মা বললেন, 'তা কেন হবে মা? তারাও মুক্ত হবে। ঠাকুর কি শুধু পুরুষদের জন্য

এসেছেন? মেয়েদের জন্যও এসেছেন। তারা কেউ কেউ তাঁর সঙ্গেই, তাঁর কাছ থেকেই এসেছে, কেউ কেউ মুক্ত হওয়ার জন্য এসেছে, পরেও অনেকে আসবে।... কাকেও কাকেও তাঁর কাজের জন্য নিয়ে এসেছেন।'

"গোলাপ-মা বললেন, 'শরতের কাছে শুনো, সুধীরা একদিন স্বপ্নে দেখলে, ঠাকুর একঘরে সভা করে বসে আছেন, নানান লোকজন—স্ত্রী-পুরুষ। সুধীরাকে বললেন, 'আমার একটু কাজ কোরে আসবি?' সে বললে, 'দরজা খুলে যেতেই দেখি এই সংসার।' ."[১৪]

সুধীরাদি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। ১৯১৬-১৮ সালের ত্রিবার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়—তখন পর্যন্ত সাতশোর উপর বালিকা এবং আন্দাজ তিনশো অন্তঃপুরের মহিলা ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতেন। দুশো দরিদ্র মহিলা সেলাই প্রভৃতি হাতের কাজ শিখে নিজেদের জীবিকা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় বাড়িতে জায়গার অভাব হয়। বাড়িটি জীর্ণও হয়েছিল। বেলুড় মঠের ট্রাস্টিরা নূতন জমি কিনে বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯১৭ সালের ৫ নভেম্বর বোসপাড়া লেনে একখণ্ড জমি কেনা হয়। ওই ঋণ শোধ ও বিদ্যালয়ের বাড়ি নির্মাণের জন্য বেলুড় মঠের তখনকার অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একটি আবেদন পত্র প্রকাশ করেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই অর্থ দান করেন। অবশ্য বাড়ি করা শুরু হয় আরও চার বছর পরে—১৯২১ সালে।

১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মিশনের একটি শাখাকেন্দ্ররূপে গণ্য হয়। এতদিন বিদ্যালয়টিকে কেউ নিবেদিতা স্কুল, কেউ বা বিবেকানন্দ স্কুল বলতেন। এখন একটি নির্দিষ্ট নাম হয়—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল।

১৯২০ সালে শ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ হলে মাতৃমন্দিরের নাম পরিবর্তন করে 'সারদামন্দির' রাখা হয়। শ্রীমায়ের মহাসমাধির পর সুধীরাদির শরীর ও মন ভেঙে পড়েছিল। ওই বছর পূজার ছুটিতে বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের নিয়ে তিনি হরিদ্বার, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থদর্শন করে ফেরার পথে ২৩ নভেম্বর কাশীর কাছে হঠাৎ চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে, পরদিন দেহত্যাগ করেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সব শুনে বলেছিলেন, "হঠাৎ ইষ্ট দর্শন হওয়াতে এরূপ হয়েছিল সামলাতে পারেনি।"

সুধীরাদির এই অকাল মৃত্যুতে মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য স্বামীজীর যে পরিকল্পনা তা বাস্তবরূপ নিতে বেশ কিছু বছর দেরি হয়ে যায়। ১৯২১ সালে নূতন বাড়ি নির্মাণ শুরু হয়। ১৯২২ সালের নভেম্বরে আংশিকভাবে বাড়ি তৈরি হওয়ায় জগদ্ধাত্রী পূজার দিন গৃহপ্রবেশ হয়, বিদ্যালয় নতুন বাড়িতে উঠে আসে। ১৯২৩ সালের প্রথম দিকে আশ্রম বিভাগও ভাড়া বাড়ি থেকে নিজস্ব ভবনে আসে। একতলায় স্কুল ও দোতলায় সারদামন্দির চলতে থাকে। ১৯২৭ সালে তিনতলা সম্পূর্ণ হয় কিন্তু চারতলা হয় ১৯৫০ সালে। একতলা ও দোতলা স্কুলের, তিনতলা ও চারতলা সারদামন্দির ও ছাত্রীনিবাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়; রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা একতলায় একপাশে থাকে।

মাতৃমন্দির তথা সারদামন্দির তার সূচনাপর্বেই সুধীরাদির পরিচালনায় 'আশ্রম'-এর রূপ নিয়েছিল। শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদে এবং ভগিনী সুধীরার সমনস্ক তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মীরা পবিত্র সংযত আশ্রমোচিত বাতাবরণে বাস করতেন—বলা যায় এটিই ভবিষ্যৎ স্ত্রীমঠের আদিপর্ব।

শ্রীশ্রীমা ও সেবিকা সরলা

প্রব্রাজিকা ধ্যানপ্রাণা

যুগপ্রয়োজন সাধনের জন্য যখন ঈশ্বর মর্তধামে অবতীর্ণ হন তখন তাঁর সঙ্গে আসতে হয় তাঁর শক্তিকেও। কারণ অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতোই তাঁরা অচ্ছেদ্য, অভিন্ন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহায়িকা হয়ে এসেছিলেন শ্রীসারদা দেবী। তিনি তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন ভগবতীভাবের পূর্ণবিকাশ। তাই তাঁর মহিমার প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়,/ কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।"

জগতে মাতৃভাব বিকাশের ভার অর্পণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব শক্তিস্বরূপিণী শ্রীসারদা দেবীর ওপর। তাই দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজকর্ম, সামাজিক রীতিনীতি থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি ধৈর্য ও যত্নের সঙ্গে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের কাছে রেখে গেলেন নিরুপমা এক মাতৃমূর্তি—যাঁর মধ্যে আমরা দেখি বিশ্বপ্লাবী মাতৃত্বের এক অপূর্ব প্রকাশ। ভগিনী নিবেদিতা যথার্থই বলেছেন—"শ্রীশ্রীমা হলেন নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।"

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা আর একদিন বলেছিলেন, "যখন ঠাকুর চলে গেলেন আমারও ইচ্ছা হল, আমিও যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না, তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।"[১] শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরের অর্পিত দায় সঙ্ঘজননী তথা লোকজননীরূপে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা কীভাবে তাঁর অন্তরঙ্গ সেবিকা সরলাকে আপন আরব্ধ কার্যসাধনের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন, কীভাবে শ্রীশ্রীমার দিব্যসান্নিধ্যে এসে সরলা দেবী উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারিণী হয়েছিলেন, কীভাবে শ্রীশ্রীমার উত্তরসাধিকারূপে তাঁরই কাজে নিজেকে শেষদিন পর্যন্ত দিয়ে গেলেন তা এক আশ্চর্য ঘটনা।

শ্রীশ্রীমার শেষ অসুখের সময় একদিন সেবিকা সরলা দেবী তাঁকে কাতর হয়ে বলেছিলেন, "মা, আপনি আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমাকে ফেলে যাবেন না।" উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "তোমাকে যে মা, আমার অনেক কাজ করতে হবে, কাজ শেষ হলে তো আমার কাছেই যাবে।"[২] বিস্ময় জাগে মায়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ভেবে! কী গভীর ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি!

সরলা দেবীর পিতৃদত্ত নাম ছিল পারুল মুখোপাধ্যায়। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পড়তেন। সুধীরা দেবী তখন ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁর সুগভীর ব্যক্তিত্ব, ধর্মভাব, ত্যাগ ও ভালোবাসা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ছাত্রী পারুলকে। তাই সংসার তাঁকে বাঁধতে পারেনি। ১৯১১ সালে সতেরো বছর বয়সে সুধীরা দেবীর সহযোগিতায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে

আসেন উচ্চতর জীবনের টানে। আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল বেশ কয়েক বছর। তাই সুধীরা দেবী তাঁর নাম পারুলের পরিবর্তে সরলা করে দিলেন, যাতে জানাজানি না হয়ে যায়। সেই যুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সতেরো বছরের মেয়ে কিসের টানে আত্মীয়-পরিজনকে চিরতরে ত্যাগ করে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

সুধীরা দেবীর শ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ওপর একান্ত নির্ভরতা সরলাকেও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সুধীরা দেবী তাঁকে প্রায়ই লিখতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমার একমাত্র আপনার। কেবলমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করবে—আর কোন কিছু অবলম্বন কোরো না।"[৩] এই ঈশ্বরনির্ভরতা সরলা দেবীকে জীবনের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লক্ষ্যে অবিচল থাকার শক্তি দিয়েছিল। সরলার নিজের ভাষায় : "আমার বেরিয়ে যাবার কথা সুধীরাদির মুখে শুনে মা প্রথমে বলেছিলেন, 'তাই তো সুধীরা, একটি মেয়ের সারাজীবনের দায়িত্ব, কাজটা কি ভাল করলে?' সুধীরাদি বলেছিলেন, 'মা, করে তো ফেলেছি, কি আর করা যায়?'[৪] এরপর কিন্তু আমার ওপর মার একটা বিশেষ সহানুভূতি পড়ে গেল। আমার কথা খুব চিন্তা করতেন। সুধীরাদি যখন আমাকে নিয়ে একবার এখানে, একবার ওখানে টানাপোড়েন করছেন তখন মা আমাকে বলতেন, 'তাই তো মা আর কতদিন তোমাকে এভাবে থাকতে হবে!' "[৫]

নিবেদিতা বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সরলা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে গিয়ে সারদা দেবীকে সরলা প্রথম দর্শন করেন। তারপর আত্মগোপন করে থাকার সময় প্রায়ই সুধীরা দেবী বা অন্যান্য ভক্তমহিলাদের সঙ্গে যেতেন মাতৃসকাশে। সেইসময় শ্রীশ্রীমার দিব্যসান্নিধ্য, নানা সৎপ্রসঙ্গ ও উপদেশ সরলা দেবীর জীবনের অমূল্য পাথেয় হয়েছিল যা তাঁর ভাবী জীবনকে অধ্যাত্মভাবে ঋদ্ধ করে।

একদিন মাতৃসমীপে গেছেন সুধীরাদির সঙ্গে সরলা এবং তাঁর সঙ্গিনীরা। নানা প্রসঙ্গ করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেছে। মাতৃহৃদয় শঙ্কিত, পাছে তাঁর মেয়েরা বাড়িতে তিরস্কৃত হয়। সুধীরা শ্রীশ্রীমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "এইটুকু যদি সহ্য না করতে পারে তাহলে ওরা করবে কি? আপনার আশীর্বাদে ওদের ভয় থাকবে না।"[৬] অভয় দিলেন অভয়দাত্রী। বললেন, "ঠাকুরের কৃপায় সব সোজা হয়ে যাবে। যদি বকে, কোন কথাটি বলো না। সংসারে কতরকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স—তিনটে স। যে সয় সেই রয়।' "[৭] শুধু উপদেশই দিলেন না। করুণারূপিণী শ্রীশ্রীমা শ্রীঠাকুরের কাছে ওদের জন্য প্রার্থনা জানালেন হাতজোড় করে, "ঠাকুর রক্ষা কর।"[৮]

'সব সহ্য করে থাকতে হয়'—শ্রীশ্রীমার এই উপদেশ জীবনের প্রতিপদক্ষেপে পালন করেছিলেন সরলা। তাই দেখি ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি অবিচল থেকেছেন।

১৯১১ সালে শুভ বুদ্ধপূর্ণিমার দিন সরলা দেবী শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভে ধন্য হন। দীক্ষাপর্ব শেষ হলে শ্রীশ্রীমা কিছু ফুল সরলার হাতে দিয়ে তাঁর পায়ে নিবেদন করতে বলেন। সরলা দেবী ভাবছেন কী বলে নিবেদন করবেন! শ্রীশ্রীমা অন্তর্যামিনী। সরলা দেবীর মনের ভাব বুঝে শ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি দেখিয়ে বললেন—"ইনিই তোমার সর্বস্ব। এঁকে ডেকো, তাহলেই তোমার সব হবে।"[৯]

শ্রীশ্রীমাকে সরলা একদিন কীভাবে জপ করবেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন : "যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্বদাই আপনার ভাববে!"[১১] পরে শ্রীশ্রীমা করে জপ করার নিয়ম দেখিয়ে দিলেন।

সরলা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন যা শ্রীশ্রীমায়ের স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, অপূর্ব দূরদর্শিতা ও বাস্তববোধের পরিচায়ক। একদিন কোনও এক ভক্তের আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করে যোগেন-মা ওই ভক্তকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য শ্রীশ্রীমাকে অনুরোধ করেন। শ্রীশ্রীমার সুচিন্তিত প্রত্যুত্তর : "আমার বলা চলবে না, যোগেন। আমি যদি ওকে কিছু বলি, ও শুনতে পারবে না। আমি ওর গুরু; ও যদি আমার কথা না রাখতে পারে, তাহলে ওর অকল্যাণ হবে।"[১১] সন্তান যেমনই হোক না কেন সন্তানের প্রতি অহেতুক করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের কল্যাণচিন্তা কখনও ব্যাহত হয়নি।

১৯১১ সালে ১৩ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার আকস্মিক প্রয়াণে সুধীরা দেবী ও সরলা দেবী উভয়েই মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত ভেঙে পড়েন। হৃদয়ের এই শোকাগ্নি প্রশমনের জন্য সুধীরা দেবী সরলা দেবীকে নিয়ে কাশী যান। তারপর কিছুদিন কাশীতে থেকে বৃন্দাবন ও সিমলা হয়ে কলকাতায় ফেরেন। তখনও সরলা দেবীকে আত্মগোপন করে চলতে হচ্ছে। সরলা দেবী যাতে আরও পড়াশোনা শিখে স্বাবলম্বী হতে পারেন তাই সুধীরা দেবী তাঁকে এক আত্মীয়া শ্রীমতী অনসূয়া সিংহের চেষ্টায় ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করেন। ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে তখন মেট্রনের পদ খালি থাকায় সরলা দেবী সেই পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ওই কাজে থাকাকালীন তাঁর পড়াশোনা করা সম্ভব হচ্ছে না দেখে সুধীরা দেবী সরলা দেবীকে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল থেকে নিয়ে আসেন।

সরলা দেবী তারপর কিছুদিন সুধীরাদিব ব্যবস্থাপনায় 'বরেনের পিসি' বলে পরিচিত এক ভক্তমহিলার বাড়িতে শ্যামপুকুরে থাকেন । এই বরেনের পিসির ব্যড়িতে থাকাকালীন প্রায়ই ওই পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে সরলাকে শ্রীশ্রীমার কাছে উদ্বোধনে যেতেন। এইসময় একদিন সরলা দেবী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে গেলে তিনি বলেন, "তুমি কিছুদিন আমার কাছে থাক না। বৌমাটি (মণীন্দ্রের মা) চলে গেছে, বড় অসুবিধে হচ্ছে।" শ্রীশ্রীমা নিজের অসুবিধের কথা চিন্তা করে সরলা দেবীকে আসতে বললেন ঠিকই কিন্তু ওই বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত নিলেন না। তৎক্ষণাৎ বললেন, "দাঁড়াও মা, যোগেন এসেছে, তাকে একবার বলি।"[১২] আশ্চর্য হতে হয় না কী যখন দেখি স্বয়ং জগজ্জননী যাঁর ইচ্ছামাত্রে জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাঁর অন্যের সঙ্গে লোকব্যবহারে কত সৌজন্যবোধ! যোগীন-মা সাগ্রহে সম্মতি জানালেন। অপ্রত্যাশিতভাবে সরলা দেবী শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়ে আনন্দে বিহ্বল কিন্তু অসময়ের আশ্রয়দাত্রী বরেনের পিসির সম্মতি না পেলে তিনি কি করে আসবেন। তাঁর কাছে শ্রীশ্রীমার কথা জানালে তিনি শুধু সানন্দে সম্মতিই দিলেন না স্বয়ং পরের দিনই সরলা দেবীকে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার কাছে রেখে গেলেন। সেইবার একটানা তিন মাস সরলা মাতৃসান্নিধ্যে ছিলেন। ঠাকুরঘরের কাজ ও অন্যান্য কাজে শ্রীশ্রীমাকে সাহায্য করা, বিশেষ করে রাধুকে গল্প শোনানো ও সঙ্গ দেওয়া তাঁর প্রধান কাজ ছিল। কোনও কোনও দিন শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে তেল মালিশ করে দিতেন বা পদসেবা করতেন। এক একদিন রাধু গল্প শোনাতে বললে, তাঁকে তাই করতে হত। শ্রীশ্রীমাও সরল বালিকার মতো গল্প শুনতে শুনতে আনন্দপ্রকাশ করতেন। মাঝে মাঝে

গোলাপ-মা

যোগীন-মা

সুধীরাদি

সেবিকা সরলা

সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীমার কাছে সকলে মিলে বসতেন। মা-ও তাঁদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ করতেন। একদিন সরলা দেবী শ্রীশ্রীমার পদসেবা করছেন। যোগীন-মা মাদুর পেতে কাছেই শুয়ে আছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বললেন, "কত সৌভাগ্যে মা এই মনুষ্যজন্ম, খুব ক'রে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কিছু হয় না। তবে ভগবানকে কি সহজে কেউ ডাকতে চায় মা? চড় না খেয়ে কেউ রাম নাম বলে না।"[১৩] মানবজন্ম সার্থক করতে, শ্রীশ্রীমার জীবন-ছাঁচে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে সরলা দেবীও সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

অনেক সময় শ্রীশ্রীমার শিশুসুলভ সরল আচরণও সরলা দেবীকে মুগ্ধ করত। জয়রামবাটীতে মা তখন রয়েছেন। একদিন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। সরলা দেবীরা অনেকে মিলে শিল কুড়িয়ে খাচ্ছেন। শ্রীশ্রীমাও ওদের কাছ থেকে শিল চেয়ে নিয়ে বালিকার মতো আনন্দ করে খেতে লাগলেন। শিল খেয়ে সরলা দেবীর জ্বর হল। জ্বরে প্রায় অচৈতন্য। শ্রীশ্রীমা তখন কত স্নেহ-যত্ন করেছিলেন সেবিকা সরলাকে! কয়েক দিন পর শ্রীশ্রীমাও জ্বরে অসুস্থ হলেন। তিনি একটু সুস্থ হতেই কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে ফিরে এলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজের অনুরোধে।

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে উদ্বোধনে ফিরে আসার পর সুধীরা দেবী শ্রীশ্রীমার অনুমতি নিয়ে সরলা দেবীকে নিবেদিতা স্কুলে নিয়ে গেলেন। সেইসময় কাশী সেবাশ্রমে মেয়েদের সেবা ছেলেরা করত। এটি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মনঃপূত ছিল না। নার্সিং ট্রেনিংপ্রাপ্ত মহিলা নার্স সেই যুগে বিরল ছিল। একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সুধীরা দেবীকে জিজ্ঞেস করেন সেবা কাজের জন্য কোনও মেয়ে তিনি দিতে পারেন কিনা। তখনও তেমন কেউ ছিল না। তাই সুধীরাদি লেডি ডাফরিন হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্য সরলা দেবীকে পাঠাবেন স্থির করেন। সরলা দেবী যাতে কোনও অর্থকরী বিদ্যা অর্জন করে স্বাবলম্বী হতে পারেন সেকথা সিস্টার কৃস্টিনও চিন্তা করছিলেন। ভর্তির সব ব্যবস্থা যখন স্থির হল তখন সুধীরাদি উদ্বোধনে এসে সে-সংবাদ দিতেই গোলাপ-মা অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ সেযুগে ব্রাহ্মণ-কুলজাত কোনও কন্যা এই ধরনের কাজ করবে তা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু শ্রীশ্রীমা শুনে শান্তভাবে বললেন, "সে কি গোলাপ, শিখে এসে ও আমাদেরই সেবা করবে।"[১৪] শ্রীশ্রীমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হল। পরবর্তী কালে সরলা দেবী শ্রীশ্রীমা, গোলাপ-মা, যোগেন-মার সেবা করে ধন্য হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার আধুনিক মানসিকতা, প্রগতিশীল সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি সরলা দেবীকে এই সেবা কাজ করতে যে শুধু উৎসাহিত করেছিল তাই নয়, তিনি স্বয়ং তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই, মা।" শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদ তাঁকে রক্ষাকবচের মতো জীবনের প্রতি পদক্ষেপে রক্ষা করেছে, দিয়েছে অনুপ্রেরণা।

একবার সরলা দেবীর সুনিপুণ সেবায় প্রসন্ন হয়ে শ্রীশ্রীমা যোগীন-মাকে বলেছিলেন— "ও যোগীন, সরলা কি কাজই শিখেছে, প্রাণ বাঁচানো কাজ শিখেছে।"[১৫] সরলা দেবী যখন ডাফরিন হাসপাতালে সেবাকাজ শিখছেন তখন সিমলা থেকে সুধীরা দেবী নানাভাবে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে পত্রাদি লিখতেন। তাঁরা যে দৈবনির্দিষ্ট, ঈশ্বরের কাজের জন্যই পৃথিবীতে এসেছেন সেই ভাব সরলা দেবীর মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করার চেষ্টা করতেন। একটি পত্রে সরলা দেবীকে লিখেছিলেন : "তুমি নিজেই জান না চারদিকে কত কাজ তোমার জন্য

অপেক্ষা করছে। যা শিখেছ তা যদি ৪ জনকে শেখাতে পার তোমার শেখা সার্থক হবে। আমরা শুধু করতে আসি নাই শেখাতে এসেছি। কাজেই আমাদের দায়িত্ব বড়। শেখাতে হলে নিজেদের কোন্ শ্রেষ্ঠ শিখরে দাঁড়াতে হবে তা জান কি? কেহ যেন আমাদের এক তিল দোষ না দেখতে পায় আর তাই কেবল আমরা চাইব। আমাদের তো নিজস্ব কিছুই নাই সবই ঠাকুরের। তবে আমরা যেন তাঁরই যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তাঁরই সেবা করতে পারি।"

সরলা দেবীর সেবা সত্যিই দেখার মতো ছিল—যেন একটা সাধনা। প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিতে সরলা দেবীর অনুপম সেবার বিবরণ : "যখন উদ্বোধনে সরলাদি শ্রীশ্রীমার সেবা করতেন, সে সেবা-ভাবটি দেখবার মতো ছিল—অনলস, কোন ত্রুটি নেই, যেন একটা সাধনা। শ্রীমার কাছে কতজনকেই দেখলুম, কিন্তু ঐ-রকম কাউকে দেখিনি। কারও সঙ্গে একটা কথা নেই। একমনে একটা ভাবের সঙ্গে সব করে যেতেন। তাই তো শরৎ মহারাজ অত দায়িত্ব নিয়ে বড় বড় পরিবারে সেবার জন্য তাঁকে পাঠাতে পেরেছিলেন।"[১৬]

১৯১৮ থেকে শ্রীশ্রীমার মহাসমাধি পর্যন্ত সরলা দেবী অধিকাংশ সময় কখনও উদ্বোধনে কখনও জয়রামবাটীতে, কখনও বা কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমার সেবায় নিযুক্ত থাকতেন।

১৯১৮ সালের মাঘ মাস। সরলা দেবী তখন স্কুলের বোর্ডিং-এ আছেন। শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ জয়রামবাটীতে যাচ্ছেন। সুধীরা দেবীকে তিনি সংবাদ পাঠালেন—"সরলাও আমার সঙ্গে চলুক। শ্রীমার সেবা করবে।"[১৭] সরলা দেবী আবার শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করার সুযোগ পেলেন। শ্রীশ্রীমা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁরা বৈশাখ মাসে আবার উদ্বোধনে ফিরে এলেন। সেইবার রাধুদি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আসেননি। শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে অসুস্থ তিনি তখন শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন এই বলে যে, "তুই তো চললি, তা বলে আমি শ্বশুরঘর করবনি?" রাধুদির কথায় মা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে যোগীন-মাকে জানালে যোগীন-মা একটু রহস্য করে বললেন, "তা যাবে না মা. ওর এখন ঐ ঘর করবার সময় হয়েছে। তুমি যে মা ঐ বয়সে দক্ষিণেশ্বরে হেঁটে গিয়ে ঠাকুরের কাছে উঠেছিলে, সেকথা কি মনে নাই।" শ্রীশ্রীমা স্মিতহেসে সম্মতি জানালেন। পরে একদিন শ্রীশ্রীমা সরলা দেবীকে বলেছিলেন, "মা, রাধু মায়া কাটিয়ে চলে গেল, তখন মনে হ'ল যে ঠাকুর বোধহয় আর রাখবেন না। এখন দেখছি, ঠাকুরের আরও কাজ বাকী আছে।"[১৮]

আলাপচারিতায় কখনও কখনও ব্যক্ত হত শ্রীশ্রীমার রসবোধ। শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়ায় আছেন। দশহরার দিন মনসাপূজারও চল আছে গ্রামের দিকে। ভক্তরা শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে পদ্ম দিয়ে প্রণাম করলে শ্রীশ্রীমা সরলা দেবীকে ওইরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সরলা দেবী জানালেন, "আজ দশহরা তাই।" শ্রীশ্রীমা শুনেই একটু হেসে বললেন, "ওমা, আমি মনসা নাকি?"[১৯]

১৯১৯ সাল। রাধুদি সন্তানসম্ভবা। গোলমাল সহ্য করতে পারেন না। নিরিবিলি হবে বলে শ্রীশ্রীমা ওকে নিয়ে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং বাড়িতে আছেন। সরলা দেবীও শ্রীশ্রীমার সেবার জন্য তাঁর সঙ্গে আছেন। একদিন শ্রীশ্রীমা সরলা দেবীকে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করতে বললেন। কীভাবে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করতে হয় তা সরলা দেবীর জানা না থাকায় শ্রীশ্রীমাকে জানালে শ্রীশ্রীমার সহজ, সরল আন্তরিক নির্দেশ : "দেখ মা, ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এস, বস, নাও, খাও।' আর ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন,

খাচ্ছেন; আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্রতন্ত্র লাগে? ওসব হচ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদরযত্ন করতে হয়, সেইরকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে, তেমনি ভাবেই নেবেন।"[২০] তারপর তিনি সরলা দেবীকে ভোগ নিবেদনের একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। এভাবে নানা উপদেশ ও শিক্ষার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা তাঁর উত্তরসাধিকাকে গড়ে তোলেন।

রাধুদি স্কুলের বোর্ডিং বাড়িতে বেশি দিন থাকতে পারলেন না। বোর্ডিং-এর পাশেই একটি গালার কল ছিল। সেই কলের শব্দ সহ্য করতে পারছিলেন না বলে শ্রীশ্রীমা রাধুকে নিয়ে জয়রামবাটীতে ফিরে যাবেন স্থির করলেন। সরলা দেবীকেও রাধুদির সেবার জন্য শ্রীশ্রীমা সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুধীরাদি বললেন, "ওর তো ছেলে হতে এখনও দেরি আছে, সরলা কিছুদিন পরে যাবে।"[২১]

সুধীরা দেবী কাশী সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষকে কথা দিয়েছিলেন ওখানে মহিলা রোগীদের সেবার জন্য মহিলা সেবিকার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করবেন। তাই তিনি সরলা দেবীকে নিয়ে কাশী গেলেন। কাশীতে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পত্র পেলেন। তিনি লিখেছেন, "মা রাধুর জন্য খুব চিন্তা করছেন, সরলা যেন চিঠি পেয়েই চলে আসে, জয়রামবাটী যেতে হবে।"[২২]

স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ তখন কাশীতে। কলকাতা রওনা হওয়ার আগে সরলা দেবী তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "মার কাছে যাচ্ছ। মা স্বয়ং মহামায়া! কি শক্তিই জগতে এসেছেন! তোমার কি ভাগ্য, স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তোমাকে ডেকেছেন!"[২৩] পরদিনই সরলা দেবী কলকাতায় ফিরে এলেন। একদিন কলকাতায় থেকে কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমার কাছে উপস্থিত হলেন। সরলা দেবীকে দেখে শ্রীশ্রীমা খুব খুশি। তখন শ্রীশ্রীমা জ্বরে শয্যাশায়ী। তিনি সরলা দেবীকে দেখে ছোটো মেয়ের মতো বলতে লাগলেন, "দেখ মা, জ্বর হয়ে পড়ে আছি। মাকু পোয়াতি, রাধু পোয়াতি, কি যে হবে!"[২৪]

সরলা দেবী রাধুদির সেবার ভার নিলেন। শ্রীশ্রীমার সংসারের নানারকম ঝামেলাও তাঁকে সামলাতে হত। কিন্তু তবুও শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে সর্বদাই যেন একটা আনন্দের স্রোত বইত।

শ্রীশ্রীমাকে রাধুদির নানাপ্রকার অত্যাচার সমানে সহ্য করতে হত। বায়ুরোগে অনেক সময় তিনি প্রায় উন্মাদের মতো ব্যবহার করতেন। একদিন শ্রীশ্রীমা ওঁকে খাইয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ রাধুর উচ্ছিষ্ট অন্ন মুখ থেকে ছিটিয়ে শ্রীশ্রীমার অঙ্গে পড়ল। মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সর্বদা আত্মগোপন করে থাকতেন বলে কেউ তাঁর প্রকৃতস্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। তাই সেদিন রাধুদি ওইরকম আচরণ করায় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। শ্রীশ্রীমা বিরক্ত হয়ে সম্মুখে উপস্থিত সরলা দেবীকে বলেছিলেন, "দেখ, মা, এ শরীর (নিজের শরীর দেখিয়ে) দেবশরীর জেনো। এতে কত অত্যাচার সহ্য হবে? ভগবান নাহলে কি মানুষে এত সহ্য করতে পারে?"[২৫]

রাধুদির ছেলে যখন তিন মাসের সেসময় একদিন সরলা দেবীর কাছে সুধীরাদির পত্র এল। সুধীরা দেবী তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে লিখেছেন। শ্রীশ্রীমাকে তা জানালে তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু স্নেহের সেবিকাকে বিদায় দিতে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমার মাতৃহৃদয় কিরূপ কাতর হয়েছিল তার বর্ণনা পাই সরলা দেবীর নিজের কথায় : "সেবার আমাদের আসবার

সময় শ্রীমা এত কেঁদেছিলেন—মনে হলে এখনও যেন মনটা কিরকম করে ওঠে।"[২৬]

সেসময় নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এর আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। সরলা দেবীরা অনেকেই মেশিনে জামা সেলাই করতেন। একজন ঝি বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলি বিক্রি করে আসত। এভাবে কিছু অর্থাগম হত। তাছাড়া সরলা দেবী সেবাকাজ শিখেছিলেন। তাই পরিচিতমহলে প্রয়োজনমতো সেবার জন্য যেতেন। ওই সব বাড়ির লোকেরা ওঁর প্রাপ্য টাকা সুধীরা দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

সরলা দেবী তখন বেনেটোলায় এক বাড়িতে সেবার জন্য আছেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লোক পাঠিয়ে শ্রীশ্রীমাকে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য উদ্বোধনে নিয়ে এলেন। শ্রীশ্রীমার সেবার জন্য সরলা দেবীকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীশ্রীমা কালাজ্বরে ভুগছেন। ক্রমশ শরীর দুর্বল ও ক্ষীণ হতে লাগল। শরীর এত অসুস্থ, কিন্তু তারমধ্যেই একদিন সেবিকা সরলা দেবীর হাতের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "সুধীরা কি সরু সরু তিনগাছা চুড়ি করে দিয়েছে! ভাল লাগছে না। আমি ভাল হয়ে তোমার হাতে চারগাছা করে মোটা চুড়ি গড়িয়ে দেব।"[২৭] নিজের শরীর এত দুর্বল কিন্তু সেবিকার প্রতি কী অহৈতুকী করুণা ও ভালোবাসা!

শ্রীশ্রীমা তখন শয্যাশায়ী। একজন সাধু তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। সেসময় শ্রীশ্রীমার মাথার অবগুণ্ঠন অনবধানবশত সরে গিয়েছিল। সম্মুখে উপস্থিত সেবিকা সরলা দেবী সেটি লক্ষ্য করেননি। শ্রীশ্রীমা তাঁকে সেই বিষয়ে সচেতন করার জন্য এবং সেবা করার সময় কত সমনস্ক থাকা উচিত সে সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই একটু অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, "আমার মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাওনি কেন? আমি কি মরে গেছি? এখনই এই করছ!"[২৮] কত শালীনতাবোধ!

একদিনের কথা। শ্রীশ্রীমা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। স্বভাবটিও ছোটো বালিকার মতো হয়ে গেছে। একদিন রাত্রিবেলা সরলা দেবী শ্রীশ্রীমাকে দুধ খাওয়াতে গেলে তিনি কিছুতেই খেতে চাইছেন না। তিনি খেতে চাইছেন না দেখে স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে ডাকা হল। তাঁকে দেখে মা বললেন, " ..দেখ তো বাবা, এতো রাতে তোমাকে ডেকে তুলে কষ্ট দিলে!" মহারাজ বললেন, "মা এবার একটু খাবেন?" মা "খাব" বলাতে বললেন, "সরলা তবে খাইয়ে দিক একটু?" বালিকার মতো অনুযোগের সুরে মা বললেন, "না, ও খাওয়াবে না। ও খালি রাতদিন বলবে 'মা খাও' 'মা খাও' আর বগলে কাঠি দাও। ঐ দুটোই শিখেছে। আমি ওর হাতে খাব না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও।" স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে প্রবোধ দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে স্বহস্তে ফিডিং কাপে একটু একটু করে দুধ খাওয়াতে লাগলেন এবং বললেন, "মা, একটু জিরিয়ে খান।" তাঁর এই আন্তরিক অনুনয় শ্রীশ্রীমার মনকে বড়ো স্পর্শ করল। প্রসন্ন হয়ে শ্রীশ্রীমা বললেন, "দেখ দিকিনি কি সুন্দর কথা! একটু জিরিয়ে খান। ... এ কথাটি আর ওরা বলতে জানে না।"

লজ্জাশীলা মা আগে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সামনে ঘোমটা টেনে থাকতেন, সরাসরি কোনও কথা বলতেন না। তাই মহারাজের মনে একটু দুঃখ ছিল। শ্রীশ্রীমা স্বামী সারদানন্দ মহারাজের হাতে সেদিন দুধ খাওয়ায় তিনি বলেছিলেন, "মা আমার মনের ঐ ক্ষোভটুকু মুছে দেবার জন্য আমার হাতে এভাবে সেবা নিলেন।"[২৯]

সেদিন শ্রীশ্রীমা সরলা দেবীর হাতে দুধ খেতে না চাওয়ায় সরলা দেবী ভাবলেন—তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি একটু আড়ালে থেকে শ্রীশ্রীমার অন্যান্য কাজ করে যেতে লাগলেন কিন্তু দুধ খাওয়ানো ও থার্মোমিটার দেওয়া এই কাজ দুটি নিজে না করে অন্যদের দিয়ে করালেন। কিন্তু সেবিকার মনের ব্যথা অন্তর্যামিনী শ্রীশ্রীমার বুঝতে দেরি হল না। তিনি সরলা দেবীকে কাছে ডেকে বললেন, "...আমি মা, অসুখে ভুগে ভুগে কেমন হয়ে গেছি, কখন কি বলে ফেলি ঠিক নেই। আমার কথায় রাগ করো না, মা।"[৩০] সেবিকার প্রতি কী স্নেহ, কত কৃপা, কী নিরভিমানিতা; অকপটে নিজের ত্রুটি স্বীকার করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "দেখ, সব বলে কি না, আমি 'রাধু বাধু' করেই অস্থির, তার উপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধু রাধু' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে তখন আর এ দেহ থাকবে না।"[৩১] সত্যসংকল্প শ্রীশ্রীমার সেই কথা একদিন সত্য হল।

মহাসমাধির কিছুদিন আগে একদিন শ্রীশ্রীমা রাধুকে বললেন, "দেখ, তুই জয়রামবাটী চলে যা, আর এখানে থাকিস নে।"[৩২] সরলা দেবীকে ডেকে বললেন, স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে বলে যেন রাধুদিদের জয়রামবাটীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেই কথা শুনেই মহারাজ বুঝতে পারলেন শ্রীশ্রীমার মহাসমাধির দিন আসন্ন। তাঁরা অনেক চেষ্টা করলেন যাতে শ্রীশ্রীমার মন রাধুদির ওপর একটু ফিরে আসে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা বিফল হল। শ্রীশ্রীমা দৃঢ়ভাবে বললেন, "যে মন তুলে নিয়েছি তা আর নামবে না জেনো।"[৩৩]

দেহত্যাগের দু-তিন দিন আগে শ্রীশ্রীমা স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে ডেকে বললেন, "শরৎ, আমি চললুম। যোগেন, গোলাপ এরা সব রইল।"

মহাসমাধিলাভের পর শ্রীশ্রীমার পূতদেহ যখন উদ্বোধন থেকে বেলুড় মঠে আনা হল তখন সরলা দেবী বেলুড় মঠে যেতে চাননি। সুধীরা দেবী ও যোগীন-মার আদেশে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বেলুড় মঠ থেকে ফিরে এসে সরলা দেবী যোগীন-মাকে বলেছিলেন, "ভাগ্যিস্ আপনি পাঠিয়েছিলেন, আমি যেন আমাকেও মার পায়ে আহুতি দিয়ে এলাম। মাকে নাইয়ে যখন চিতাগ্নি জ্বালা হল, নিজেকেও আহুতি দিলাম মনে মনে।"[৩৪] 'আত্মবিস্মৃতিই শ্রেষ্ঠপূজা'—মাতৃসেবায় নিবেদিতপ্রাণ সরলা দেবী নিজেকে নিঃশেষে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করেছিলেন বলেই তাঁর অন্তর মায়ের আশিসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশ্রীমা চলে যাওয়ার পর সুধীরা দেবীর মনও খুব ভেঙে পড়ে। পুজোর ছুটিতে তিনি সরলা দেবী এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বের হলেন। এলাহাবাদ থেকে কাশী যাওয়ার পথে ট্রেনের কামরা থেকে পড়ে যাওয়ায় সুধীরা দেবী গুরুতর আহত হন। কাশী সেবাশ্রমে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীশ্রীমার মহাপ্রয়াণের পর আবার কিছুদিনের মধ্যেই সুধীরা দেবীর আকস্মিক তিরোধানে সরলা দেবীর হৃদয় যে কতখানি শোকাহত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। সেইসময় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের আন্তরিক সহানুভূতি, স্নেহ, সহৃদয় উপদেশ তাঁকে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তিনি একদিন সরলা দেবীকে বলেছিলেন, "এতদিন মাকে

মানবীরূপে সেবা করেছ, এখন তাঁর স্বরূপ জানবার চেষ্টা কর। মানবজন্ম লাভ করেছ, শেয়াল কুকুরের মত না মরে এমন মরা মরবে যে, জগতে একটা দাগ রেখে যাবে। ভগবানলাভ করে তারপর যাবে।"[৩৫] তাঁর আদেশ যে যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছিল সরলা দেবীর পরবর্তী জীবনই তার যথার্থ প্রমাণ।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নির্দেশে সরলা দেবী প্রায় দুই বছর কুমিল্লায় নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পড়িয়েছিলেন। তাঁর তখনকার মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই, তাঁকে লেখা স্বামী সারদানন্দ মহারাজের একটি স্নেহপূর্ণ পত্রে : "শ্রীশ্রীমার কৃপায় তুমি আনন্দে আছ এবং যাঁহাকে ধরিলেই কেবল শান্তি পাওয়া যায় তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছ, তোমার পত্রে ঐ কথা জানিয়া যোগীন-মার ও আমার প্রাণে যে কত আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিবাব নহে। যোগীন-মা বললেন—'আমার ইষ্টলাভ হইলেও এত আনন্দ হইত কি না জানি না। এক মনে এক প্রাণে মার সেবা করিয়াছিল বলিয়াই মার কৃপায় সরলার এই অবস্থা হইয়াছে। আশীর্বাদ করি মার পাদপদ্মে তার মন দিন দিন ডুবে যাক্।' আমিও যোগীন-মার সহিত তোমাকে ঐ আশীর্বাদ করি।"[৩৬]

যোগীন-মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নির্দেশে সরলা দেবীকে যোগীন-মার সেবার জন্য কুমিল্লা থেকে উদ্বোধনে চলে আসতে হল।

সেবার দোল পূর্ণিমার দিন গ্রহণ ছিল। ধ্যানসিদ্ধা যোগীন-মার আদেশে সেদিন সরলা দেবী উপবাস করে সারা দিন গঙ্গাতীরে পুরশ্চরণ করেন। যোগীন-মার বিশেষ আগ্রহে এবং অনুরোধে পরের দিন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ সরলা দেবীকে কৌল সন্ন্যাসব্রতে (তান্ত্রিক মতে) দীক্ষিত করেন। নাম দিয়েছিলেন প্রথমে 'সারদা'। নাম শুনে যোগীন-মা, "আমরা ঐ নামে কি করে ডাকব?" বলায় মহারাজ সারদার পরিবর্তে নাম দিলেন 'শ্রীভারতী'। সরলা দেবী তখন থেকে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করবেন কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, "না এখন থাক। দরকার নেই, সাদাই পরুক। পরে সময়মত পরবে এখন।"[৩৭]

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের দিন স্বামী শিবানন্দ মহারাজ তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পান যেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁকে বলছেন—"এরা সব রইল। আমি কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের কাছে চললুম।"[৩৮] ওই কথা শোনার পর সরলা দেবীর দৃঢ় ধারণা হল স্বামী সারদানন্দ মহারাজ নিশ্চয়ই তবে কাশীধামে আছেন। তাই তিনিও বাকি জীবন কাশীতে অতিবাহিত করবেন স্থির করলেন। স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে নিজের ইচ্ছার কথা জানালে তিনি সরলা দেবীর মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতে পেরে সম্মতি জানিয়ে সরলা দেবীকে পত্রে লেখেন—"মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, শরৎ মহারাজ—এঁদের সেবা করে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন যে ক'টা দিন থাক, তাঁদের নাম করে কাটিয়ে দাও।"[৩৯]

একবার সরলা দেবী স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে প্রণাম করতে গেলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "তোমার ঐ হাত আমার পায়ে দেবে কি, মাথায় দাও। তোমার হাত দুটি সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখব। ঐ হাতে তুমি জগজ্জননীর সেবা করেছ।"[৪০] ধন্য শ্রীশ্রীমার সেবিকা সরলা দেবীর জীবন!

কাশীবাসের অধিকাংশ কালই সরলা দেবী কাটান লাক্ষা অঞ্চলের একটি অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠে তপস্যা ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে। নিজের চাহিদা কিছু ছিল না। অপরের সুযোগ-

সুবিধার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বদা সজাগ। প্রয়োজনমতো কাশীতে অল্পবয়স্কা বিধবা বা দুঃস্থ মহিলাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাধুদির শেষ অসুখের সময় চিকিৎসার জন্য স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ তাঁকে কাশীতে পাঠান। সেসময় সরলা দেবী রাধুদির খুব সেবা করেছিলেন। রাধুদি কিন্তু তখন জয়রামবাটীতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। বলতেন—"আমি কাশীতে মরে নির্বাণ হবোনি, আমি মার কাছে যাব।" সরলা দেবী তাঁকে কাশীতে থাকার জন্য বোঝালেও তিনি থাকলেন না। জয়রামবাটীতে ফিরে এলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীমার স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যভূমি জয়রামবাটীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শ্রীশ্রীমার ভবিষ্যদ্বাণী—"আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।"—বর্ণে বর্ণে সত্য হল। সরলা দেবীর এক সঙ্গিনী উষারাণী দেবী রাধুদির এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্ময়প্রকাশ করলে সরলা দেবী বলেছিলেন, "তা বদলাবে না গো, মাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য রাধুর আসা। সে খেলার জন্য তাকে পাগলামি খেলা খেলতে হল। এখন কাজ হয়ে গেছে, এখন 'মা, মা' করবে না তো কি করবে।"[৪১]

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সরলা দেবী কাশী থেকে জয়রামবাটী এসেছেন। বেলুড় মঠে তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজও তখন জয়রামবাটীতে। একদিন সরলা দেবীকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বললেন, "মেয়েদের মঠ হলে তোমাকে যেতে হবে।" সরলা দেবী নিজের অক্ষমতা জানালে মহারাজ বলেছিলেন, "আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তোমার দ্বারাও হবে। শ্রীশ্রীমার উপর নির্ভর করে থাকবে, তা হলেই হবে। তুমি যেরকম শ্রীমার কাছে ছিলে, শ্রীমার সেই ট্রেনিংটা তুমি এই মেয়েদের দেবে।"[৪২]

ত্যাগ ও বৈরাগ্যদীপ্ত, অধ্যাত্মবিভায় উজ্জ্বল সরলা দেবীর সুদীর্ঘ সাতাশ বছরের কাশীবাস সমাপ্ত হল। ১৯৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির অদূরবর্তী গঙ্গাতীরে শ্রীসারদা দেবীর পুণ্য নামাঙ্কিত, স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত স্ত্রীমঠের উদ্বোধন হল। শ্রীশ্রীমার একান্ত স্নেহধন্যা সেবিকা সরলা দেবী হলেন শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা। সন্ন্যাসদীক্ষার পর নাম হল প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে উন্মোচিত হল নারীজাতির জন্য অধ্যাত্মজগতের এক নতুন দিগন্ত।

শ্রীশ্রীমার হাতে গড়া সরলা দেবী নিজ জীবন ও সাধনার দ্বারা রেখে গেলেন অনুপম দৃষ্টান্ত। শ্রীশ্রীমার দৈনন্দিন জীবনচর্যা, ঈশ্বরনির্ভরতা, সকল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার অসাধারণ ক্ষমতা, ভগবান ও ভক্তসেবা তাঁর জীবনকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কর্মকুশলতা ও নিপুণতার প্রশংসা করলে মাতৃগতপ্রাণা সরলা দেবী অতি সহজভাবে বলতেন, "হবে না, গুছুনীর কাছে ছিলুম যে!"[৪৩]

কথাপ্রসঙ্গে পরবর্তী জীবনে সরলা দেবী শ্রীশ্রীমার অনাড়ম্বর, সহজ জীবনকথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, "উদ্বোধনে একটা ভাঙা চিরুনি দিয়ে মা থেকে শুরু করে রাধু, মাকু আমরা সবাই চুল আঁচড়াতাম। নলিনীদি বা কেউ যদি বলতেন, 'তোমাকে তো কত ভক্ত জিজ্ঞেস করে, কি চাই—তখন একটা চিরুনির কথা বলতে পার না?' শুনে মা হেসে বলতেন, 'কাজ তো চলে যাচ্ছে।' "[৪৪] সরলা দেবীর জীবনও ছিল তেমনই আড়ম্বরহীন, বৈরাগ্যদীপ্ত, প্রচারবিমুখ। যখন তিনি উদ্বোধনে বা জয়রামবাটীতে মাতৃসান্নিধ্যে তখনও

যেমন সাধারণভাবে জীবনযাপন করেছেন তেমনই অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়ে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষ্যারূপে। শ্রীশ্রীমার অমূল্যবাণী—"যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন"—সরলা দেবীর জীবনের প্রতিপদক্ষেপে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

তিনি তখন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা। কন্যাকুমারী তীর্থদর্শনে গেছেন। সঙ্গে শ্রীসারদা মঠের বর্তমান অধ্যক্ষা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী ও আরও কয়েকজন সন্ন্যাসিনী। থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল একটি অতিথিশালায়। সাধারণের জন্য ব্যবহৃত ক্যান্টিনের একটি হলঘরে দুপুরে আহারের ব্যবস্থা। সেটি আগে তাঁদের ঠিক জানা ছিল না। গাড়ি থেকে সরলা দেবী (ভারতীপ্রাণামাতাজী) নামলেন শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর হাত ধরে। হলঘরে ঢুকেই লক্ষ্য করলেন মহিলা ও পুরুষ অনেকেই ইতস্তত টেবিলে খাচ্ছেন। হোটেল, রেস্টুরেন্টে সকলের সঙ্গে বসে খেতে অনভ্যস্ত সরলা দেবী এক সেকেন্ডের জন্য যেন একটু থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে খুব সহজভাবে শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর হাতটা টেনে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসলেন। নিজের অসুবিধের কথা কাউকে বুঝতে দিলেন না। যে-কোনও পরিবেশে নানারকম অসুবিধের মধ্যেও অবিচলিত থেকে সহজভাবে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াব অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তুচ্ছ আচার-বিচারগুলোকে অতিক্রম করে যুক্তিপূর্ণ সহজ মীমাংসায় উপনীত হতে পারতেন। এই অসাধারণ গুণটি তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে। 'যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়'—সরলা দেবীর জীবনও ছিল সারদাময়।

অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত ছিল শ্রীসারদা দেবীর জীবন। মহাসমাধির কদিন আগে জনৈকা ভক্তমহিলার প্রতি তাঁর শেষ উপদেশ—'...কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার!' 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—সর্বভূতে আত্মদর্শন—এ তো অদ্বৈতবাদেরই শেষ কথা। শ্রীশ্রীমার উত্তরসাধিকা সেবিকা সরলা দেবীর জীবনও ছিল অদ্বৈতমনন-ঋদ্ধ। মহাপ্রয়াণের শেষ মুহূর্তে জগতের সকলের জন্য তাঁর শ্রীমুখনিসৃত কল্যাণ প্রার্থনা—"সকলের মঙ্গল হোক, সকলের অবিদ্যা দূর হোক, অহং ব্রহ্মাস্মি, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।"—এও তো সেই অদ্বৈতবাদেরই প্রতিধ্বনি।

শ্রীসারদা দেবীর স্নেহধন্যা অন্তরঙ্গ সেবিকা সরলা দেবী রেখে গেলেন আমাদের সম্মুখে আদর্শনিষ্ঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদার একান্ত শরণাগত, বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত, তপোময় মহিমময় জীবন যা রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ও শ্রীমা

স্বামী প্রভানন্দ

কবি বনফুল শ্রীমা সারদা বন্দনাতে লিখেছেন—

"নেমে এসেছ তুমি/ ধরণীর ধূলিধূসরিত উষর প্রাঙ্গণে/
শ্যাম সম্পদে ঘুচিয়েছ তার দৈন্য।"

জগজ্জননী মা সারদার কথা যখন ভাবি তখন মনে পড়ে সেই দক্ষিণেশ্বরের ছোটো নহবতখানা, উদ্বোধনের ছোটো বাড়ি, জয়রামবাটীতে মায়ের ছোটো নতুন বাড়ি, বেলুড়ে মায়ের ছোটো মন্দির। আর শতবর্ষ জয়ন্তীর পরে সারা দুনিয়াব্যাপী মা কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছেন! দেখেছি কোয়ালালামপুরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার ভিলে, জয়রামবাটীতে, মুম্বাইয়ে, সালেমে শ্রীশ্রীমায়ের শ্বেতপাথরের মূর্তি ও সুন্দর সব মন্দির। সেদিন আর এদিনে অনেক তফাত। তিনি যখন স্থূলশরীরে ছিলেন, আর যেসময় তাঁর শুভ আবির্ভাবের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছিল তার মধ্যেও ছিল অনেক তফাত। স্থূলশরীরে মা সারদা জয়রামবাটীর মুখোপাধ্যায় পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব সামলেছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সমস্যার মোকাবিলা করেছেন এবং বহুসংখ্যক কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু এখন তাঁর যে ভূমিকা তা আগের চাইতে বৃহত্তর এবং অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। দুনিয়া জুড়ে যে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে সেই আন্দোলনের অগণিত শরিকদের তিনিই হচ্ছেন পালনকর্ত্রী। তিনি তাঁর জগৎজোড়া সন্তানদের বিপত্তারিণী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির আশ্রয়দায়িনী।

মনে পড়ছে একটি ভাবচিত্র—একবার শ্রীমা স্বপ্নে দেখেছিলেন—"একটি মেয়ে একটি কলসী ও ঝাঁটা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে গো?" "সে বললে—আমি সব ঝেঁটিয়ে যাব।" মা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর কি হবে?" "সে বললে—অমৃতের কলসী ছড়িয়ে যাব।"[১] এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের যে ভূমিকা তার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত। সমাজে যে আবর্জনা জমেছে সব পরিষ্কার করে তারপর রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে এবং তাতে মায়ের ভূমিকা কী সে বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এই ভাবান্দোলনের উৎস এবং বিস্তারে আমরা দেখব শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘ বারো বছরের সাধনার অন্তে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শ্রীশ্রীজগদম্বার হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁর নিজের জীবনে প্রকাশিত উদার মতে বিশেষভাবে অধিকারী নতুন এক সম্প্রদায় তাঁকে প্রবর্তন করতে হবে। ১৮৭৫-এ কেশব সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয়লাভের পর তাঁর কাছে শিক্ষিত যুবকরা যাতায়াত আরম্ভ করে এবং লক্ষ্য করা যায় সেসময় থেকেই তিনি কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তদের বাড়িতে

যাওয়া-আসা আরম্ভ করেছেন। সেখানে কী হত? সংক্ষেপে বলি—কথামৃত থেকে উল্লেখ করে ছোট্টো একটি বর্ণনা—একটি বাড়ি যেখানে তিনি বহুবার গিয়েছেন, সেটি হচ্ছে বলরামভবন। সে সম্বন্ধে শ্রীম লিখছেন, "ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!"[২] দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে বসে বসে কাঁদেন; নিজের অন্তরঙ্গদের দেখবেন বলে ব্যাকুল। রাত্রে ঘুম নেই। মাকে বলেন : মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা, ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে, তাহলে মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।"[২ক] তাই তিনি বিভিন্ন ভক্তের বাড়ি যেতেন। ক্রমে বাগবাজার, শিমুলিয়া, শ্যামবাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তগোষ্ঠী গড়ে উঠতে আরম্ভ করল। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের একদিনের কথা। ঠাকুর বলেছিলেন, "এখানে সব আসছে—যেন কলমির দল,—এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয়—যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল, হরিশ-টরিশ গিয়েছে, আর তুমিও গিয়েছ—তা কি আলাদা বাসা হবে?"[৩] ইতিমধ্যে স্বাভাবিকভাবে কিছুসংখ্যক মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে ভাবের দানা বাঁধতে থাকে। এভাবে অঙ্কুরিত হয় ভাবান্দোলন। একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এই আলোড়ন। এর আগে মথুরামোহন বিশ্বাসকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আসবে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবেন, অনেকের উপকার করবেন, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙে দেননি—রেখেছেন। তুমি কি বল? এসব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি, বল দেখি?"[৪] স্বভাবতই মথুর এর উত্তর দিতে পারেননি। আমরা বুঝতে পারি যে জগন্মাতার নির্দেশেই ঠাকুর সমস্ত কিছু করে গেছেন এবং ভাবান্দোলনের প্রবর্তন তিনি জগন্মাতার নির্দেশেই করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাঙ্গনে একে একে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ। তেমনি উপস্থিত হয়েছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ গৃহী ভক্তগণ। তাঁদের সমবেত পরিচর্যায় পরিপুষ্টিলাভ করেছে ভাবান্দোলন। ক্রমে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে ভাবান্দোলনে শ্রীমা সারদা দেবীর ভূমিকা। বাহ্য ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে তা ১৯২০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কালের সীমানায় নির্দিষ্ট। ভাবের ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে এর কাল সীমাহীন। শ্রীমায়ের জীবনকাব্য উদ্‌ঘাটন করে মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত সুন্দর করে লিখেছেন, "একটি ক্ষুদ্র কুঁড়ি জয়রামবাটীর প্রান্তরে জন্মিয়াছিল। দৈবক্রমে তাহা দক্ষিণেশ্বরের নহবত ঘরে আসিয়া পড়িল। সেখানে এক যাদুকরের স্পর্শে তাহা দলের পর দল মেলিয়া এক বিশালায়তন প্রস্ফুটিত সহস্রদল কমলে পরিণত হইল। অপূর্ব তাহার রূপ, রস, গন্ধ।... যাদুকর অদৃশ্য হইলেন—কুসুমটি জগতকে দান করিয়া। কুসুমের কাজ আরম্ভ হইল। তাহার রূপ, রস, গন্ধ বিতরণের কাজ।"[৫] শ্রীরামকৃষ্ণ যাদুকরের যাদুতে সারদা-পদ্ম বিকশিত হয়েছিল, যেমন সূর্যকিরণের যাদুতে শতদল পদ্ম বিকশিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু বুঝতে হবে যে, শ্রীসারদা

দেবীর অন্তর্নিহিত শক্তিই উদ্বোধিত হয়েছিল এবং তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শ্রীসারদা-বপুতে শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজা ধর্মের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই ঘটনার তাৎপর্য নানান জনে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মনে হয়, জগদম্বার ভাবশক্তি জাগ্রত করে ঠাকুর শ্রীমায়ের মাতৃভাব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য দ্বার উন্মোচিত করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দসূত্রে জানা যায় যে সেসময় পূজক এবং পূজিতা দুজনেই সমাধিযোগে একাত্মতা উপলব্ধি করেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তার সঙ্গে শ্রীসারদার একাত্মতা অর্থাৎ যিনিই মা তিনিই ঠাকুর, যিনিই ঠাকুর তিনিই মা। উপরন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের ভাষায় : "শ্রীমা ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের পূজা ও তৎসহ তাঁহার সাধনালব্ধ সমস্ত ফল গ্রহণ করিলেন।... অধিকন্তু ব্যুত্থিত অবস্থায়ও তিনি সর্বজীবে ব্রহ্মবুদ্ধি রাখিতে শিখিলেন।"[৬] ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সুলেখক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "চন্দ্রমা ছাড়া চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমনি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।" এসবের চাইতেও বড়ো কথা আমার মনে হয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীভগবান নরদেহ ধারণ করেছিলেন এবং যে বিষয়ে তিনি জগন্মাতার কাছ থেকে বিশেষ নির্দেশ পেয়েছিলেন—তাঁর সেই মিশন সম্পাদনের জন্য পূর্ণ সহযোগিরূপে শ্রীসারদাকে পেয়েছিলেন সেইদিনই। আমরা লক্ষ্য করেছি, পূর্ণ সহযোগিতাই শ্রীমা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভিতর আদৌ অহংকার ছিল না। 'ভক্তিমতী সরযূবালা শ্রীমায়ের সম্মুখেই বলেছিলেন, 'জীবমাত্রই অহং-এ ভরা; এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে; মানুষ হলে মা অহংকারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি।"[৬ক]

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মর্তধাম ত্যাগের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে শ্রীমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবন-ব্রত সাধনে শ্রীমায়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে এক বিরাট ভূমিকা। শ্রীমা বলেছেন, "যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হলো আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো অনেক কাজ বাকি।"[৭] এ-ঘটনার অনেক আগে শ্রীমা ঠাকুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ঠাকুরের ইষ্টপথে অর্থাৎ ঠাকুরের অভীষ্ট পথে তাঁকে সাহায্য করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছিলেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য শ্রীমায়ের সাতষট্টি বছরের জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখব। প্রথম পর্ব ঠাকুরের মহাসমাধিকাল পর্যন্ত। এই পর্বে শ্রীমা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের অধিকাংশের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কাশীপুর-অধ্যায়ে শ্রীমায়ের উপস্থিতি অন্তরঙ্গগণের প্রত্যেকে অনুভব করেছেন। তিনি রান্না-বান্না করে তাঁদের খাইয়েছেন। অসুস্থ বলরাম গৃহিণীকে দেখতে গেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে, এবং পরে আবার শ্যামপুকুর থেকে। দ্বিতীয় পর্বের চোদ্দোটি বছর, প্রধানত মহাব্রত-পালনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। বিরহকাতর শ্রীমা তখন গভীর ও ব্যাপক সাধনভজনে ডুব দিয়েছিলেন। সেসময়ে তাঁর অন্তর্মুখীন অবস্থা। প্রত্যক্ষদর্শী বলছেন, ধ্যানস্থ মায়ের জড়বৎ মূর্তিকে গোলাপ-মা, যোগীন-মা তুলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বসাতেন। দেহের হুঁশ থাকত না। প্রায় এভাবেই কেটেছিল চোদ্দোটি বছর। নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি নেই। আশপাশের লোকজন—কোনও কিছুর প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ নেই। নেহাৎ কর্তব্যের খাতিরে তিনি গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের সেবাযত্ন করেছেন। শ্রীম-র স্ত্রী, মেয়ে প্রভৃতি সামান্য কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়েছেন।

তীর্থদর্শনে গিয়েছেন। নিজ জননী ও পিতৃব্যের দেখাশোনা করেছেন।

১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় পর্বের শুভারম্ভ। তখন রাধুদির জন্ম হয়েছে—মায়ের মন নেমে এসেছে। তিনি পিতৃকুলের বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব ও আশ্রিত ভক্তজনদের দেখাশোনার ভার স্বেচ্ছায় নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জননীরূপে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ভবিষ্যতের গর্ভে তখন যে মঠ ও মিশন সেই ভাবী সংগঠনকে, তার সম্ভাবনাকে মনে রেখে, তিনি সেই সম্ভাবনার সমর্থন জানালেন। তারপর ক্রমে ক্রমে কীভাবে তিনি রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সর্বাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন, তাই আমরা আলোচনা করব এবং দেখব। প্রথমপর্বে তাঁর স্নেহ-বাৎসল্যের, মাতৃভাবের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। সেটি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল তৃতীয় পর্বে। সেখানে আমরা দেখি প্রীতি, শান্তি, মুক্তি ও অভয় বিতরণের সমারোহ। দয়া, ক্ষমা ও করুণার মূর্তিতে আবির্ভূত শ্রীমা রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের স্বর্ণসম্ভব ভবিষ্যতকে সূচিত করেছিলেন।

এই ভাবান্দোলন কী করে দানা বাঁধল তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। কলকাতার উত্তরে কাশীপুরে একটা ভাড়া করা বাগানবাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে এক-নাগাড়ে দুশো আটচল্লিশ দিন বাস করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর মানবলীলা সংবরণ। বাগানটিকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—আমাদের প্রথম মঠ। এই প্রথম মঠে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী ভক্তদের বিশেষ কৃপা বিতরণ করেছিলেন, ১ জানুয়ারি। ত্যাগী যুবকভক্তদের প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ দিয়ে নরেন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নরেন্দ্রকে চাপরাশ দিয়ে লিখেছিলেন—"জয় রাধে পৃমমোহি (প্রেমময়ী) নরেন সিক্ষে (শিক্ষে) দিবে, জখন (যখন) ঘরে বাহিরে/ হাঁক দিবে/ জয় রাধে।"[৮] লীলা সংবরণের পূর্বেই নরেন্দ্রের ভিতর তিনি অলৌকিক উপায়ে শক্তিসঞ্চার করে দিয়েছিলেন। তাঁর 'মিশন'-এর দায়দায়িত্ব শ্রীমায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন পাকা সংগঠক। প্রথম মঠ গড়ে উঠেছিল এবং একই সঙ্গে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন দানা বেঁধেছিল এই শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে যা পাওয়া যায়, সে কথাই স্বামী বিবেকানন্দ হাঁক-ডাক করে বলেছিলেন যে, "যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেদিন থেকেই modern India অর্থাৎ সত্যযুগের আবির্ভাব। এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।"[৯] বলা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভাবাদর্শকে আশ্রয় করেই সত্যযুগের বাস্তবায়ন। এই হচ্ছে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের উদ্দেশ্য। আরও আগে ৫ অক্টোবর ১৮৮৪, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করেছিলেন, "এখান থেকে একটা স্রোত যদি বয়, তাহলে বেশ হয়। সে স্রোতের টানেতে সব ভেসে যাবে। এখান থেকে যা হবে সে তো আর একঘেয়ে হবে না।"[১০] শ্রীম নতুন এক যুগের ইঙ্গিত করেছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, নতুন যুগ শুরু হয়ে গেছে। তিনি একদিন একজন স্ত্রীভক্তকে (সম্ভবত যোগীন-মাকে) বলছেন, "ও গো এই যে সব দেখছ, এত হরিসভা-টরিসভা এসব জানবে (নিজের শরীর দেখিয়ে বলছেন) এইটের জন্য। এ-সব কি ছিল? কেমন একরকম সব হয়ে গিয়েছিল।"[১০ক] পুনরায় নিজের শরীর দেখিয়ে বলছেন—"এইটে আসার পর থেকে এসব এত হয়েছে। ভেতরে ভেতরে একটা ধর্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।"

সাতবছর পর ঠাকুরের ইঙ্গিতে শ্রীমায়ের অনুমতি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সেখানে তাঁর গুরুর ভাবাদর্শকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করেন। এর কয়েক মাস পর স্বামী বিবেকানন্দ ২০ জুন ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি

চিঠিতে লিখছেন, "প্রত্যেক নূতন ধর্ম-তরঙ্গেরই একটি নূতন কেন্দ্র প্রয়োজন।... একটি খাঁটি চরিত্র, একটি সত্যিকার জীবন, একটি শক্তির কেন্দ্র—একজন দেবমানবই পথ দেখাইবেন। এই কেন্দ্রেই বিভিন্ন উপাদান একত্র হইবে এবং প্রচণ্ড তরঙ্গের মতো সমাজের উপর পতিত হইয়া সবকিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সমস্ত অপবিত্রতা মুছিয়া দিবে।... হিন্দুধর্মের দ্বারাই প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে হইবে,... সেই শক্তিকেন্দ্র—সেই পথপ্রদর্শক (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস)।... তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যুবকগণ ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাহারাই এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবে।"[১১] ইতিহাসবেত্তা স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন যে সঙ্ঘ বা organization-এ দোষত্রুটি থাকে কিন্তু সঙ্ঘ ছাড়া বড়ো কিছু হওয়ার জো নেই। সব জেনেশুনেই তিনি শেষ পর্যন্ত মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিপূর্বে শ্রীমা কামারপুকুরে একদিন দেখেছিলেন যে তাঁর সম্মুখের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আর পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল প্রভৃতি। আরও দেখেছিলেন ঠাকুরের পাদপদ্ম থেকে জলস্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে তরঙ্গাকারে সামনে প্রবাহিত হচ্ছে। শ্রীমা রঘুবীরের ঘরের সামনে যে জবাফুলের গাছ তার থেকে ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই গঙ্গায় ফেললেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—এর তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

এরপর আর একটি দর্শন ঘটল। তিনি তখন নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়িতে আছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা স্নানের যে ঘাট সেখানে তিনি বসে আছেন। চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যা। হঠাৎ দেখছেন, কোথা থেকে ঠাকুর এসে তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লেন গঙ্গায়। সেখানে গঙ্গা-জলে তাঁর সমস্ত দেহ গলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে কোথা থেকে নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়ে জলে নেমে গেলেন, আর সেই জল চতুর্দিকে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। পিছন ফিরে মা দেখেন হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেই জলের ছিটে পেয়ে তাঁরা সব মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এই দিব্যদর্শনের পর শ্রীমা যেন ঠাকুর যে ভাবান্দোলনের দায়িত্ব তাঁর উপর দিয়ে গিয়েছিলেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বুঝতে পারলেন। এভাবেই শ্রীমা বুঝতে পেরেছিলেন ভাবান্দোলনের রূপরেখা এবং সেইসঙ্গে তাঁর ভূমিকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ভরকেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও তপস্যালব্ধ সত্য। তাঁকে ঘিরে অবস্থান করেছেন ত্যাগব্রতধারিগণ। তাঁদের ঘিরে রয়েছেন গৃহী ভক্ত, অনুরাগিবৃন্দ। রয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীসারদা মঠ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন এবং তাদের অনুমোদিত এবং অননুমোদিত নানান কেন্দ্র। অন্যভাবে বলা চলে এসব কিছু নিয়েই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। স্বামীজী বলেছেন সঙ্ঘ হচ্ছে ঠাকুরের স্থূলদেহ এবং এর প্রাণ হচ্ছে ভাবসংশুদ্ধ আদর্শের নিষ্ঠাপূর্ণ পালন। এর বাঁধন হচ্ছে প্রেম। শ্রীমা বলতেন, "ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।"[১২] পিছনের দিকে তাকালে নজরে পড়ে এক ক্ষীণধারা দক্ষিণেশ্বর থেকে যাত্রা করে কাশীপুর, বরানগর, আলমবাজার হয়ে গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড়ে একটা বৃহৎ আবর্ত সৃষ্টি করেছে। এই ভাবধারা তার শাখার মাধ্যমে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করি, গঙ্গার পূর্বকূলে যে দক্ষিণেশ্বর সেখানে শক্তিকে জাগরিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তেমনি শ্রীসারদা দেবী বারাণসী সমতুল্য গঙ্গার পশ্চিমকূলে যে বেলুড় গ্রাম, সেখানে শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে দেড় বছরেরও বেশি সময় শ্রীমা তপস্যা করেছিলেন এবং মহাশক্তিকে জাগ্রতা করেছিলেন। শ্রীমায়ের নিজের মুখের কথা, "আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম! কি শান্ত জায়গাটি! ধ্যান

লেগেই থাকত। তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল।"[১৩]

১ মে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বলরাম ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী এবং গৃহী ভক্তদের আহ্বান করে 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দু-সপ্তাহের মধ্যে সংগঠিত ত্রাণকার্য আরম্ভ হয়েছিল। মাদ্রাজ, সারগাছি, মায়াবতী, কনখল, কাশী এবং আমেরিকায় নিউইয়র্ক ও সানফ্রান্সিস্কোতে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল স্বামীজী স্থূলশরীরে থাকার মধ্যেই। মিশন আইনভুক্ত হয় ৫ মে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে। মঠের রেজিস্ট্রি হয় ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি। মঠের প্রধান কাজ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা, নবাগত ব্রহ্মচারীদের প্রশিক্ষণ, সন্ন্যাসীদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বোপরি রামকৃষ্ণ-বেদান্ত প্রচার। আর মিশনের প্রধান কাজ হয় জনসাধারণে শিক্ষাদান, পীড়িতদের সেবাশুশ্রূষা, গরিবদের অর্থনৈতিক মান-উন্নয়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। মঠ ও মিশন এই দুইটি ডানাতে ভর করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘরূপী পক্ষী কালের বাতাসে ভেসে এগিয়ে চলেছে। তার ঠোঁটে ধরা রয়েছে নতুন যুগের ধর্মসূত্র। তাতে লেখা রয়েছে, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'।

এই মঠের নাম রামকৃষ্ণ মঠ হয় অনেক পরে। বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষ ভাগে এই নামটি হয়। ১৯০৯-এ মিশন যখন আইনভুক্ত হয় সেসময় বেলুড়ের কেন্দ্রটি ছিল একমাত্র মঠ। বাকি সব কেন্দ্রগুলো ছিল মিশনের অন্তর্গত। কেবল মায়াবতী কেন্দ্রটি ছিল ভিন্ন একটি ট্রাস্টের অধীনে। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে কেন্দ্রগুলোকে ভাগ করে দেওয়া হয়। মাদ্রাজ, কাশী অদ্বৈতাশ্রম, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ প্রভৃতি মঠকেন্দ্র এবং সারগাছি, কাশী সেবাশ্রম, কনখল সেবাশ্রম, নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রভৃতি মিশনের কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে মঠ এবং মিশনের কেন্দ্র সংখ্যা মোট ১৭৮টি। এর মধ্যে মঠের সংখ্যা ৮৫ এবং মিশনের সংখ্যা ৯৩।

বেলুড় মঠে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সাধু সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় স্ত্রীমঠ স্থাপন করতে হবে। মঠ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য এগিয়ে যান। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে, ২৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজার দিন সপ্তম সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ সাতজন ব্রতধারিণীকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেন। ২ ডিসেম্বর ১৯৫৪ গঙ্গার পূর্বতীরে সুরধুনী কাননে স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ স্থাপিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল : "স্ত্রীলোকদিগের জন্য ঐ প্রকার অর্থাৎ পুরুষদের মতো আর একটি মঠ স্থাপন করিতে হইবে। বিশেষ এই যে স্ত্রীলোকদিগের মঠে পুরুষদিগের কোন সংশ্রব থাকিবে না।" পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে এটি একটি অসাধারণ ঘটনা। আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ ভাব অনুযায়ী যে স্ত্রীমঠ গড়ে উঠেছে সেখানে ছাড়া কোথাও নারীরা পুরুষ-শাসনের বাইরে যেতে পারেনি। শ্রীমা বরানগর বা আলমবাজার মঠে কখনও পদার্পণ করেননি। মঠ যখন নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে সেসময় তিনি ২৮ মার্চ ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম পদার্পণ করেন। সেদিন সকলের কী আনন্দ! শ্রীমাকে গঙ্গার ঘাটে আরতি করে বরণ করা হয়েছিল। তাঁকে এনে ঠাকুরঘরের সামনে বসানো হল। সকলেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মা নিজে পুজো করলেন। সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে মঠবাড়ি যখন তৈরি হল—যেটা বর্তমানে স্বামীজীর বাড়ি বলে পরিচিত, সেই বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো করে মা সেটি উৎসর্গ করেন। সেই দিনটি ছিল ১২ নভেম্বর ১৮৯৮। মায়ের সেদিন কী আনন্দ! কারণ ছেলেদের মাথা গোঁজবার একটা জায়গা হয়েছে। সেদিন মায়ের চরণধূলি সংগ্রহ করে একটি কৌটোতে রাখা হয়েছিল। সেটি এখনও বেলুড় মঠের মূল মন্দিরের কুলুঙ্গিতে রাখা আছে,

নিত্যপূজা হয়। আবার বেলুড় মঠের স্থায়ী বাড়ি প্রতিষ্ঠা হলে শ্রীমা সেখানে কয়েকবার পদার্পণ করেছেন। কখনও ভাড়া করা নীলাম্বরবাবুর বাগানে, কখনও কয়েকদিন করে লেগেট হাউসে বাসও করেছেন। এক কথায় বেলুড় মঠ ও বেলুড় গ্রাম শ্রীমায়ের স্মৃতিসৌরভে ভরপুর। তেমনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মায়ের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। মঠ-মিশনের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র যেমন মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, কাশী অদ্বৈত আশ্রম, কাশী সেবাশ্রম, বাগবাজার, কাঁকুড়গাছি শ্রীমায়ের পদস্পর্শে ধন্য। শ্রীমায়ের লীলাসংবরণের পর যেসব নতুন নতুন আশ্রম গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে বলরাম মন্দির, শ্যামপুকুর বাটী—এসবও শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

শ্রীমায়ের সঙ্গে সঙ্ঘের যাঁরা অঙ্গ ছিলেন তাঁদের সম্পর্কটা কী রকম ছিল?—ক্যানসার রোগাক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাযত্ন উপলক্ষে ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে সমপ্রাণতা জন্মেছিল। তা পরিপুষ্ট হয়েছিল শ্রীমায়ের স্নেহদৃষ্টিতে। ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে আমরা দেখতে পাই, রাতে জপ-ধ্যানের সুবিধা হবে বলে ঠাকুর চাইতেন যে তাঁর ত্যাগী সন্তানেরা পরিমিত আহার করবেন। মা রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, "ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।"[১৪] ঠাকুর এই ছেলেদের লক্ষ্য করেই মাকে বলেছিলেন যে, তাঁর জন্য এমন সব রত্ন ছেলে তিনি দিয়ে যাবেন বহু জন্ম তপস্যা করেও লোকে যাদের পায় না। কাশীপুরে শ্রীমা ও ত্যাগী ভক্তগণ একসঙ্গে এক উদ্দেশ্যে ঠাকুরের সেবায় নিরত থেকে পরস্পরের মধ্যে চির আপনভাব গড়ে তুলেছিলেন। পরে সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই অসম্ভবটি সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক বছরে শ্রীমায়ের নীরব ভূমিকা উল্লেখ করে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় একটি ভাষণে বলেছিলেন—একজনেরই আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম যাঁর সহানুভূতি আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিল। তিনি একজন নারী। একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। যদিও তিনি নিজে ছিলেন অসহায়, আমাদের চেয়েও দরিদ্র। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন শ্রীমায়ের আশীর্বাদেই তাঁর বিশ্ববিজয় সম্ভব হয়েছিল। এই তেজী সন্তানের মধ্যেই যে কেবল এই আপনভাব দেখতে পাই তা নয়, ঠাকুরের সব সন্তানের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে এই ভাব আমরা দেখতে পাই। লাটু রেগে গিয়ে একদিন বলছেন, "মাকে বলে দিব।" যোগানন্দ স্বামীর কাছে উপস্থিত হয়েছেন সারদানন্দ মহারাজ। বিদেশ থেকে লেখা স্বামীজীর চিঠিপত্র পড়ে তাঁর মাথা গুলিয়ে গেছে যে, কী চায় নরেন? তখন যোগানন্দ স্বামী বললেন, "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর; তিনি যা বলবেন, তাই ঠিক।"[১৫] মার কাছে গিয়ে মার কথা শুনে তিনি শান্ত হলেন। পরবর্তী কালে তিনি কি অসাধারণ কাজ-কর্ম করেছেন তা আমরা সকলেই জানি। এ-ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে। এছাড়া যোগানন্দ মহারাজ, ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ মায়ের মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজ মায়ের অনুমতি নিয়ে মালদাতে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। ত্যাগী সন্তানদের মনোভাব প্রকটিত হয়েছে প্রেমানন্দ মহারাজের একটি চিঠিতে : শ্রীশ্রীমার আদেশ পালনই আমাদের ধর্মকর্ম। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। যাকে যা বলবেন সে তা করতে বাধ্য। ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে যেমন দেখতে পাই এইভাব, পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রেও শ্রীমা তাঁদের স্নেহময়ী মা। কারও মা মন্ত্রগুরু, কারও বা সন্ন্যাস-গুরু। কিন্তু সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছে যে বাপের চেয়ে মা দয়াল। শ্রীমার চোখে

এই ত্যাগব্রতিগণ ছিলেন দেবশিশু। সংক্ষেপে বলতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের পরে এই চৌত্রিশ বছর যখন শ্রীমা স্থূল দেহে ছিলেন সেসময় তাঁর যে রূপ সেটা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্প্রসারিত রূপ। সঙ্ঘ-জননীরূপে তিনি ত্যাগী সন্তানদের এবং বৃহত্তর রামকৃষ্ণগোষ্ঠীর লালন-পালন করেছিলেন। দিবারাত্র কী কঠোর পরিশ্রমই না মা করেছেন! আবার দু-একটি সন্তানের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর দিতে হত। শ্রীমা বলতেন, ঠাকুর নানান জনকে নানান ভাবে খেলাচ্ছেন, টাল সামলাতে হয় আমাকে।

ভাবান্দোলনের শরিকদের মধ্যে ভাবুকমাত্রই অনুভব করেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ মানেই সততা। তিনি মাকে বলেছিলেন, "আমি তোমার ভিতর সূক্ষ্মদেহে থাকবো।" তিনি একটি সন্তানকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "যেই ঠাকুর সেই আমি।" এধরণের অভেদদৃষ্টিই কিন্তু সব কথা নয়। এক বিষয়ে শ্রীমা ঠাকুরকেও অতিক্রম করেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন মায়ের আসনে। যেমন শিবানন্দ মহারাজ ঠাকুরকে মায়ের মতো দেখতেন। তিনি ঠাকুরের দেহে দেখতে পেতেন তাঁর গর্ভধারিণী মাকে। তিনি খুব অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছেন। আর শ্রীমা—তিনি ভাবে, বাস্তবে সর্বপ্রকারে ছিলেন পরিপূর্ণ মা। সত্যিকারের মা। সঙ্ঘের সকল সন্তান তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত। শ্রীমা ও স্ত্রীমঠ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য যাঁরা পড়েন তাঁরা দেখবেন কোথাও কোথাও একটা উল্লেখ রয়েছে যে শ্রীমা স্ত্রীমঠের বিরোধী ছিলেন। তার থেকে একটা ভুল ধারণা হয়েছে কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। গৌরী-মার নির্ভীকতা ও দুর্জয় সাহস দেখে শ্রীমা বলেছিলেন, "গৌরী মেয়ে নাকি?" দক্ষিণদেশীয় ডাঃ বেঙ্কটরমণের কুড়ি-বাইশ বছরের দুটি অবিবাহিতা মেয়ে ছিল। নিবেদিতা স্কুলের মাতৃমন্দিরে ছিলেন দুবছর। তারপর মা তাঁদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে অন্যতম সুনন্দাদেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে স্বাস্থ্যের কারণে সারদানন্দ মহারাজ তাঁদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য কোনও কারণে নয়। অপরপক্ষে শ্রীমা বিশেষ আগ্রহী ছিলেন যাতে স্ত্রীমঠ হয়। তার দু-একটি ঘটনা আমি বলি। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল শ্রীমায়ের নামে একটা স্ত্রীমঠ গড়ে উঠবে এবং সেখানে গার্গী-মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের উদ্ভব হবে। মায়ের স্থূলদেহে লীলাকালে এটি সম্ভব না হলেও গৌরী-মা যে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন সারদেশ্বরী আশ্রম। শ্রীমা সেটি দেখে গিয়েছিলেন এবং প্রভূত আশীর্বাদ করেছিলেন। "শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তি সাধন কবা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হবার জন্য" একটি স্ত্রীমঠ স্থাপন ছিল স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা। স্বামীজীর জীবৎকালে যা সম্ভব হয়নি, তাঁর মহাসমাধির পর তাঁর গুরুভাইয়েরা বিশেষত সারদানন্দ মহারাজ বারংবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে দেখতে পাই ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে বেলুড় মঠের কাছে শ্রীমায়ের জন্য একটি জমি কিনেছিলেন। শ্মশান ঘাটের পাশে জমি হওয়ায় মা সেটি অনুমোদন করেননি। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ একটি চিঠিতে লিখছেন : "মাতাঠাকুরাণীর একটি স্থান এবং একটা women's work centre গড়ে তুলতে হবে।"[১৬] নিবেদিতা বিদ্যালয়ে কৃস্টিনের সহায়তায় পুরস্ত্রীবিভাগ গড়ে তুলেছিলেন। এর কিছুদিন পরে দেখতে পাই সামান্য যে জমি পেয়েছিলেন তার উপর উদ্বোধনের বাড়ি এবং মায়ের বাড়ি তিনি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মে মাসে মা সেখানে প্রবেশ করেন। এরপর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ মিসেস বুলকে একটি চিঠিতে লিখছেন—"ভগিনী নিবেদিতা এবং আমি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে

কথা বলে দেখেছি তাঁর ইচ্ছা বেলুড় মঠের মতো মেয়েদের একটি মঠ গড়ে ওঠে। ...(দেবমাতা) কলকাতা এসেছিলেন মায়ের পূত সঙ্গ করবার জন্য। তিনিও এবিষয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন। দেবমাতা স্ত্রীমঠ সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী। এসব কথা লিখলাম যাতে বিষয়টি আপনি আপনার মাথায় রাখেন। আর অর্থ সম্বন্ধে কতদূর কী করা যায় তা-ও ভেবে দেখবেন।"[১৭] কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি কেন না এর কিছুদিন পরই মিসেস বুল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর দেহত্যাগ হয়।

রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে প্রকৃতপক্ষে মায়ের অবদান কী? সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় বলি। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের শিকড়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে প্রাণরস সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে তা শ্রীমায়ের কৃপাসম্ভূত এবং তার স্নিগ্ধ আলোকে সমগ্র পরিমণ্ডল উদ্ভাসিত। চারিদিকে তাকালে কয়েকটি বিষয় আমাদের চোখে পড়ে—প্রথম, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনযাত্রায় দেখতে পাই তিনি ছিলেন জগন্মাতার স্নেহের পুত্র। তিনি যেন মায়ের ভয়কাতুরে ছেলে। জগন্মাতা যেন 'মা-বিড়াল' আর তিনি যেন 'বিড়াল ছানা'। এরকমই ছিল তাঁদের সম্পর্ক। ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা যন্ত্রী, আর তাঁর হাতের যন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ। জগন্মাতাই সবকিছু—এই সত্যটি সংসারের মানুষের কাছে বারবার তুলে ধরেছেন ঠাকুর। ঠিক একই ভাবে শ্রীমা সকলের সামনে তুলে ধরেছেন একটি কথা—ঠাকুরই সব। তিনি নিজে কিছু নন। ঠাকুরই সব এবং ঠাকুরকেই সকলের ধরে চলতে হবে এইটের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনও কখনও তিনি একথাও বলেছেন যে তিনি এবং ঠাকুর অভিন্ন। আবার বলেছেন কারও যদি তাঁর (মায়ের) ওপর বিশেষ আকর্ষণ বোধ হয় বা থাকে, তবে তাঁর (মায়ের) কথাও চিন্তা করতে পারেন কেননা তিনি এবং ঠাকুর এক। এই ভাবটি প্রচার করে ভাবান্দোলনে সকলের কাছে শ্রীমা ঠাকুরের জীবন এবং আদর্শকে শীর্ষে তুলে ধরেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণই নতুন যুগের আদর্শ।

দ্বিতীয়—বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান অবদান ধর্মসমন্বয়। কিন্তু শ্রীমা এর ভিতর তলিয়ে দেখে বলেছেন, এটাই কি প্রধান কথা? শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর সহজাত ত্যাগ। এরকম ত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় না। ত্যাগের আদর্শ তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর জীবন ও বাণী দিয়ে। আরও একটি কথা--'সত্য' ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের খুঁটি। শ্রীমা বলতেন, "যে সত্য ধরে আছে, সে তো ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।"

তৃতীয়, হিন্দুশাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলেছে। গৃহস্থাশ্রম সুস্থ-সবল এবং উচ্চ-আদর্শসম্পন্ন হলেই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ এবং স্বামীজী উচ্চারিত যে সত্যযুগ, তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শের আলোকে সমাজের সার্বিক কল্যাণ করাই রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের বিষয়ে শ্রীমায়ের ভূমিকা অভূতপূর্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা বড়োলোকের বাড়ির দাসীর মতো থাকতে হবে। এই ভাবটি আশ্রয় করে নিরাসক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মা আজীবন গৃহীর ন্যায় আত্মীয়স্বজন, শিষ্যভক্ত, পরিচিত জনদের মধ্যে বিশেষত রাধুদির সঙ্গে আসক্তির সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছিলেন। সংসারে চাল ডাল থেকে তরিতরকারির খবরও রেখেছেন। সোনাদানাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। সংসার সামলাবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছেন। তাঁকে দেখে কেউ বা মন্তব্য করেছেন—বাঃ মা তো বেশ চুটিয়ে সংসার করছেন। কিন্তু মা কীভাবে নিরাসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংসার করেছিলেন সেকথা বুঝতে হবে। জটিল সংসারের পরিমণ্ডলে থেকেও যে

শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ অনুযায়ী গৃহস্থ জীবনকে ঈশ্বর-অভিমুখীন করে তোলা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শ্রীমা। তাঁর অতুলনীয় জীবন ও ছোটো ছোটো কথার উপদেশ এর সাক্ষ্য বহন করছে। এভাবে শ্রীমা গৃহস্থাশ্রমকে আবার পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চতুর্থ—শ্রীমা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পালনকর্ত্রী, রক্ষাকর্ত্রী, সর্বোপরি তিনি সর্ব কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জননী। বিস্মিত হয়ে আমরা দেখতে পাই, সন্ধিপূজার সময় মা যেচে পূজা নিচ্ছেন সন্তানদের কল্যাণকামনায়। তিনি বলছেন, রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ এদের সব নাম করে করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকলের হয়ে ফুল দাও। সঙ্ঘের অঙ্গগণ এবং রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী মাত্রই ছিলেন তাঁর কৃপালাভের অধিকারী। কারণ, তিনি সকলের মা। স্মরণ করি তাঁর সেই অক্ষয় আশীর্বাদ, "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে।" শ্রীমায়ের আকূতি বারবার উচ্চারিত হয়েছে, জগতের কল্যাণ হোক। এই ভাবান্দোলনকে জগতের কল্যাণের জন্য তিনি পরিচালিত করেছিলেন।

পঞ্চম—শ্রীমায়ের কথার মধ্যে আমরা দেখতে পাই তাঁর বিশেষ ভূমিকাটি কী ছিল। শ্রীমা বলেছিলেন, "বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতে প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"[১৮] এই বিশুদ্ধ মাতৃভাবের স্ফুরণ শ্রীমায়ের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব, বিশেষত তৃতীয় পর্বকে আলোকিত করে রেখেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষের মধ্যে জগন্মাতাকে দেখতে পেতেন। বলতেন সকলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেই মা-ই উঁকিঝুঁকি মারছেন। আমরা যদি বিচার করে দেখি, তবে বোধ হবে এটা বেদান্তভাবনার কথা। ঠিক অনুরূপভাবে শ্রীমা সকলের মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পেতেন। কিন্তু বিশেষ এই যে, তিনি আবার স্বয়ং জগন্মাতার ভাবে ভাবিত হয়ে সকলকে, এমনকি তাঁর নরদেহধারী যে স্বামী তাঁকেও, সন্তানজ্ঞান করতেন। তদনুযায়ী ব্যবহার করতেন। আমার কিন্তু একটা কথা মনে হয়—শ্রীশ্রীচণ্ডীর সেই বিখ্যাত কথা, সব মানুষ—স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে জগন্মাতা 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত গুপ্ত হয়ে আছে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-করুণার ভাব। সেটি বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। বুদ্ধির দাপটে খিন্ন মানবসমাজ রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের শরিকদের কাছে প্রত্যাশা করে এই হৃদয়বৃত্তির বিকাশ। মা বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর সেই করুণাঘন মাতৃমূর্তি। ঠাকুরের মধ্যেও সেই করুণার ধারা বা প্রস্রবণ ছিল বৈকি। কিন্তু সে করুণাধারা অকাতরে নির্বিচারে বিতরণের গৌরব এবং বিশেষত্ব ওই মায়েরই প্রাপ্য। এই সূত্র ধরেই আমাদের প্রত্যেককে হৃদয়বৃত্তির বিকাশ করতে হবে। জাত-পাত-মতবাদ ইত্যাদি সংকীর্ণতার গণ্ডি ভেদ করে সকলকে কাছে টেনে নিতে হবে।

ছয়—সঙ্ঘ বা আন্দোলনের অঙ্গদের প্রতি শ্রীমায়ের যে অযাচিত অফুরন্ত করুণা তা সহজবোধ্য সত্য। তেমনি সঙ্ঘজীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মানদণ্ডের তিনি ছিলেন নিয়ামক। সঙ্ঘের অঙ্গগণের এবং পরিচালকবর্গের যাতে চ্যুতি না হয় অর্থাৎ তার ভাবসংশুদ্ধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন মা। দু-চারটে ঘটনার কথা উল্লেখ করি—সন্ন্যাসীর ধর্ম অভয়দান। যখন পাঁঠাবলির প্রশ্ন উঠল মা আপত্তি জানালেন। জীবহিংসা চলবে না। সকলেই মাথা পেতে নিলেন। ত্যাগী ভক্ত স্বামী শান্তানন্দ এক ভক্ত-পরিবারের সঙ্গে তীর্থদর্শনে যাবেন। শ্রীমা অনুমোদন করলেন না। এক ব্রতভঙ্গকারী ত্যাগী সন্তান মায়ের কাছে এসেছেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সঙ্ঘ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। মা সমর্থন করলেন, কিন্তু হাজার হলেও

তিনি মা—সন্তানজ্ঞানে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, ভরসা দিলেন। সন্ন্যাসজীবনের যোগ্যতার প্রশ্নে শ্রীমা একটি অসাধারণ চিঠি লিখেছিলেন। একজন সঙ্ঘে যোগদান করতে চান। গৃহত্যাগ করতে চান। মা তাঁকে লিখছেন—ত্যাগ করতে হলে প্রথম ভগবানের প্রতি কত ব্যাকুলতা আছে সেইটি দেখতে হবে। সে যদি নিজে মনে করে যে তার মন ভগবান ব্যতীত আর কিছু চায় না তবেই ত্যাগ করা উচিত। নতুবা পরে বৈরাগ্য থাকে না। চিরাচরিত সাধনভজনের আগ্রহ অনেক সাধুদের মধ্যেই রয়েছে। এ-ধরণের এক ত্যাগী সন্তানকে মা বলছেন, "...আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুনতে কোথায় যাবে?"[১৯] আসল ভাবটি ঠিকমতো যাতে ধরা যায় সেইজন্যই মা এই কথা বলেছেন। আবার সব সন্দেহবাদীদের মনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল যখন কাশী সেবাশ্রম ঘুরে ফিরে দেখে এসে মা সার্টিফিকেট দিলেন যে ঠাকুর স্বয়ং সেখানে বিরাজ করছেন। কথামৃতকার শ্রীম যিনি এ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেন তিনিও মেনে নিলেন। শ্রীমা সেখানকার সাধুকর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য সেবাশ্রম ভাণ্ডারে দশটি টাকা দিয়েছিলেন। আজও সেটি সুরক্ষিত আছে। মায়াবতী আশ্রমে একজন লুকিয়ে ঠাকুরের পূজা আরম্ভ করেছিলেন। স্বামীজী দেখে বিরক্ত বোধ করেন। তাঁরা ঠাকুরের ছবি সরিয়ে ফেলেন। কিন্তু স্বামীজীর মহাসমাধির পর শ্রীমাকে লিখে তাঁদের সংশয় জানালেন। মা তার উত্তরে লিখছেন, "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য তোমরাও তখন অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।"[২০]—সেইসময় থেকেই অদ্বৈতবাদের সাধন স্বামীজী যা চেয়েছিলেন, তা মায়াবতীতে অপরিবর্তিত থাকে। আবার দেখতে পাই তখন সহিংস রাজনীতি চলছে। সরকার সেদিকে সবসময় লক্ষ্য রাখছে। বেশ কয়েকজন সেসময় রাজনীতি ত্যাগ করে সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। রাজরোষ পড়ল তাদের উপর। সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মা জানতে পারলেন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিলেন। মা বললেন, "ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ-মিশন হয়েছে; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম।" কেননা প্রশ্ন উঠেছিল ওঁদের সঙ্ঘত্যাগ করতে বলা হবে কিনা! মায়ের আপত্তি। মা বলছেন, "ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা সবাই মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।"[২১] সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সন্ন্যাসীদের হয়ে কখনও তিনি দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি। এভাবে নানা বিচিত্র পরিস্থিতিতে শ্রীমা সঙ্ঘ পরিচালনের দিঙ্‌নির্দেশ করেছিলেন।

সপ্তম—স্বল্প আলোচিত একটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বামী তপস্যানন্দ (অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন যিনি)। যে কোনও ধর্মান্দোলনের পিছনে যে চিন্তাভাবনা থাকে, তার মধ্যে দু-ধরনের ভাব কাজ করে। একটিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে cult অর্থাৎ প্রশ্নাতীত ভক্তিবিশ্বাস—যা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না এবং তা সাধারণত ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়টি আশ্রয় করে দার্শনিক দিক, তাত্ত্বিক দিক। আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিক। এ দুটি ভাবের সামঞ্জস্যের উপরই নির্ভর করে আন্দোলনের স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াশক্তি। এর তাত্ত্বিক দিকটি ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু cult অনুসরণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে নিছক ভাবালুতা বা উন্মাদনা বেড়ে উঠছে। আর cult ভিন্ন শুধু ভাবাদর্শ বা তত্ত্ব আশ্রয় করলে দেখতে পাব সেটি দুর্বল বৌদ্ধিক চর্চায় পরিণত হচ্ছে। এ-বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকা দরকার। স্বামীজীর জীবন এবং বাণীর মধ্যে দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক দিকটির উপর বিশেষ জোর রয়েছে, যদিও তিনিই ঠাকুরের আরাত্রিক গান রচনা করেছেন, স্তব, প্রণাম মন্ত্র

রচনা করেছেন। অন্যদিকে cult-এর যে সার বস্তু, তার যে নীতিগুচ্ছ, সেটা দেখতে পাই শ্রীমায়ের জীবন এবং বাণীতে। এর মধ্যেই কিন্তু ভাবান্দোলনের প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন শ্রীমা। এই অর্থেই শ্রীমা রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের প্রাণশক্তি বা power। যে অর্থে ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্ম ও তার শক্তি, সেই শক্তির অর্থেই ভাবান্দোলনের যে power বা শক্তি তাই হচ্ছেন শ্রীমা। কেননা দক্ষিণেশ্বরে, কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দেহে আছেন, তাঁর সাক্ষাৎ সেবা-পরিচর্যা এবং পরে তাঁর ছবিতে সেবাপূজা করে, তাঁর আধ্যাত্মিক যে ভাবধারা তা নিত্য আচরণ করে ধর্মজীবনের একটা নতুন পথ তিনি উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। সর্বক্ষণ তিনি ঠাকুরের জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করতেন। বিপদে-আপদে যখনই স্মরণ করেছেন ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন। তাঁর উপদেশ-নির্দেশ পেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে। শ্রীমা সকলকে শিখিয়েছেন এই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাপূজা, তাঁর প্রীত্যর্থে যাবতীয় কাজ-কর্ম ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে করলে, শুধুমাত্র এই পথ ধরেই সাধন-ভজনের সিঁড়ি বেয়ে, ভক্ত জীবনের শীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হবে। শুধুমাত্র cult নয়। শ্রীমার জীবন ও বাণীতেও দেখতে পাই কিছু তত্ত্ব কথা যার কিছু কিছু পূর্বে আলোচনা করেছি। সমাজতত্ত্বের ছাত্র জানেন routinisation of cult এবং routinisation of ideal কী করে হয়ে থাকে—এ-প্রক্রিয়ার আলোকে শ্রীমায়ের বিরাট ভূমিকা বিশেষ করে ভেবে দেখার।

অষ্টম—স্বামীজী লিখেছিলেন যে মা-ঠাকুরানী ভারতে মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী-মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব ঘটবে। অলৌকিক মায়ের জীবন। সেখানে নানান ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। ভারতের পরিবারভিত্তিক সমাজে মা জননী হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু। সে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, শ্রীমায়ের চরিত্রে সুসমন্বিত হয়েছে সহধর্মিণী, সন্ন্যাসিনী ও জননী। এই তিন ভাবের মিলনে তিনি এক অসাধারণ মা। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন নারীজাতির জন্য নতুন এক মহৎ আদর্শ। যে সামান্যসংখ্যক নারী ভগবদ্‌ভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত, তাদেরও মা উৎসাহিত করেছেন সরাসরি ত্যাগব্রত গ্রহণ করার জন্য। দুজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত নারী জাগরণে মায়ের ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। রাশিয়ার বিখ্যাত অধ্যাপক রিবাকভ নারী জাগরণের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান সম্পর্কে বলছেন—পুরুষশাসিত সমাজের এক গণ্ডগ্রামের একটি মেয়েকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলে এক মহিমময় আসনে যাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি হচ্ছেন শ্রীমা। এই আদর্শটি স্থাপন করে শ্রীরামকৃষ্ণ নারী জাগরণের পথকে উন্মোচিত করেছিলেন। আর একজন বিদেশি লেখক রিচার্ড শিফম্যান। তিনি দাবি করেছেন—লুপ্তপ্রায় এক মহান ভারতীয় আদর্শকে পুনরাবিষ্কার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পুনরুদ্ধার করে ভারতে নারী জাগরণের উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি লিখছেন—The Master revived a largely forgotten tradition, and in the process elevated his wife and, symbolically, all of Indian womanhood to the pedestal of their former glory. বলা বাহুল্য, এই দুজন বিদ্বান ব্যক্তি ভারতীয় নারী জাগরণে শ্রীমায়ের ভূমিকা বোঝার চেষ্টা করেছেন।

নবম—শ্রীমায়ের অন্তিম উপদেশ বলে প্রচারিত বাণীর মধ্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সামাজিক লক্ষ্য। "জগতকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগত তোমার।"[২২] এই বাণীর মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে শ্রীমায়ের প্রজ্ঞা-দৃষ্টি ও গভীর সমাজ চেতনা। তিনি নিজের আচরণ দিয়ে স্বামী সারদানন্দ ও আমজাদকে আপনার করে

নিয়েছিলেন। ভিন্নধর্মের ও জাতপাতের নিবেদিতা, সারাবুল, কৃস্টিন, ম্যাকলাউড—এদেরকে এবং স্বদেশীয় হিন্দুনারীদের আপনার করে নিয়েছিলেন। জয়রামবাটীতে তাঁর শিষ্য স্বামী গিরিজানন্দকে শ্রীমা একদিন বলেছিলেন, "ঠাকুরের... একদিন অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাঙলে পর তিনি বললেন, 'দেখ গা, আমি এক দেশে গেছলুম—সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কি ভক্তি![২৩] ঠাকুরের দেখা সেইসব সাদা-সাদা ধোবো-ধোবো ভক্তরাই ক্রমে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শ্রীমা যিনি কখনও এধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসেননি, তাদের সকলকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আজ বিশ্বায়ন (globalisation) নিয়ে হৈ চৈ চলছে। শ্রীমা তাঁর সহজ সূত্র—তাঁর নিজ জীবন ও বাণী দিয়ে আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন বিশ্বায়নের পথ এবং ভাবান্দোলনকে সেইপথে চালিত করেছেন। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শ্রীমা সম্বন্ধে অসাধারণ একটি লেখা লিখেছেন—মায়ের যে-সমস্ত চরিত্রগুণ, তার মধ্যে অন্যতম মৃদুতা। মৃদুতার যে অমোঘ শক্তি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন। শ্রীমায়ের চরিত্র বা আচরণে অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা, অশোভনতা কখনও দেখা যেত না। অথচ তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন তাঁর চতুর্দিকে বিরাজ করত সুরুচি ও সুশৃঙ্খলার একটা অঘোষিত শাসন। সেই পরিমণ্ডলে সকলেই আপনা থেকে শ্রদ্ধাবিমণ্ডিত শিষ্টাচারপূর্ণ ব্যবহার করত। কারও সাহস ছিল না সেটা ভাঙার। তাঁর মুখের বোল ছিল, "যেখানে যেমন সেখানে তেমন। যখন যেমন তখন তেমন।" অবিরোধ ও অদোষদর্শন এবং সকলকে নিয়ে সর্বাবস্থায় সামঞ্জস্যসাধন শ্রীমায়ের অসাধারণ সামাজিক কুশলতার পরিচায়ক। স্বামী প্রেমেশানন্দ যথার্থই বলেছেন, শ্রীমাই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহার-আদর্শ। তাঁর অনুকরণে বলি, শ্রীমা-ই হলেন রামকৃষ্ণ আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার-আদর্শ। বাস্তবজীবনে, ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শকে বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে শ্রীমায়ের অনুপম ও মাধুর্যমণ্ডিত চরিত্রের দিকে, আমাদের অনুধ্যান করতে হবে তার ভাবব্যঞ্জনা।

দশম—শ্রীমায়ের মহাসমাধির পর সেবিকা ভারতীপ্রাণাকে (তখন তিনি সরলা দেবী), স্বামী সারদানন্দ নির্দেশ দিয়েছিলেন, "এতদিন মাকে মানবীরূপে সেবা করেছ, এখন তাঁর স্বরূপ জানবার চেষ্টা কর।"[২৪] রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের শরিকমাত্রের সাধনা হবে শ্রীমায়ের জীবন এবং বাণীর আলোকে, কায়মনোবাক্যে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সেবা করা। তাঁদের কার্য হবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি শ্রীমার তাঁদের স্বরূপ-সন্ধান করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিখ্যাত উক্তি শ্রীমা সম্বন্ধে : "ও আমার শক্তি।" এর দার্শনিক ব্যাখ্যা অনেকে অনেকরকম করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত এই যে ভাবান্দোলন শ্রীমাই যে এর শক্তি, এর প্রাণশক্তি, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা—"মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মত থাকেন অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা।"[২৫] এর পাশাপাশি স্মরণ করতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের লেখা—"রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি ভীত নই। মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে?"[২৬] এই জাগরিত শক্তিকে আশ্রয় করেই রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে ৫ আগস্ট ২০০৩ তারিখে প্রদত্ত স্বামী বিরজানন্দ স্মারক বক্তৃতা।

এক বাউলের দল এসেছিল

প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা

গৌরচন্দ্রিকা

মহাকালের ক্যানভাসে মানুষী লীলা আর দৈবী লীলা মিলেমিশে তৈরি করে রামধনুর মতো মর্ত ও অমর্তের সেতুবন্ধ সাতরঙা তোরণ। এর মধ্য দিয়ে চলে যায় দিব্যলীলার জয়যাত্রা—সৃষ্টি হয় মহাকাব্য। ঠাকুর যখন চলে গেলেন, কামারপুকুরে স্বামীর ভিটাতে একা একা বসে সারদা দেবী ভাবতেন, 'ছেলে নেই কিছু নেই, কি হবে?' বিশ্বজননীর অবিকল মানুষী-লীলা একেবারেই যেন নিঃসহায়, অবলা নারীর হা হুতাশ। কিন্তু পরমুহূর্তেই অমানুষী দৈবী লীলা। ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, "ভাবছো কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এইসব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলুম।" "যে সব ছেলেদের মাথাকাটা তপিস্যে করেও মানুষ পায় না।" ঠাকুরের দেওয়া এই রত্ন ছেলেদের ও মায়ের অভূতপূর্ব লোকাতীত সম্পর্ক, খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর অন্তরালে যে অবিচ্ছিন্ন একটি কাব্যময়-ধারা প্রবহমান, তা সৃষ্টি কবেছে এক মধুর সংগীত, অমর কাব্য—যার মূল সুর বাঁধা রয়েছে 'শুদ্ধ মা'তে।

চেনা-পরিচয়

অলৌকিক সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আর থাকতে না পেরে দক্ষিণেশ্বরের কুঠির ছাদ থেকে আকুল হয়ে ডাক দিলেন, "তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে?"—একে একে ষোলো জন ছেলে এসে জড়ো হলেন ঠাকুরের চরণতলে। "ঠাকুরের ভাষায় এঁরা ছিলেন সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন অথবা সংসারের খোলা থেকে ছিটকে আসা দাগহীন মল্লিকা ফুলের মতো শুভ্র খই।" হোমাপাখির এই শাবকরা যেন জন্মেই চোঁ চাঁ দৌড় দিলেন মায়ের দিকে, যাদের দলপতি নরেন্দ্রনাথ। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ছোট্টো ঘরটির শক্তিপীঠে মা সারদা তখন ঘোমটার আড়ালে সাধনায় ও সেবায় রত। এরই মধ্যে ঠাকুর সেরে ফেলেছেন নজিরবিহীন সৃষ্টি-ছাড়া কাজটি—তাঁর ইষ্ট পথের সহায়িকা মায়ের পদতলে জপমালার সঙ্গে সারাজীবনের 'সাধনফল' সঁপে দিয়েছেন। জাগ্রতা জগন্মাতা তখন সশরীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে যবনিকার ঘেরাটোপে নহবতে বাস করছেন। সবাই জানে মা আছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে পায় না—চেনা তো দূরের কথা। এই ছেলেদের কার সঙ্গে কখন প্রথম পরিচয় ও কোন পুণ্যক্ষণে তারা মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যেটুকু ঘটনা পাওয়া যায় তাও মহিমায় উদ্ভাসিত। একদিকে যেমন ছেলেদের আগমনের প্রায় প্রথম দিন থেকেই মায়ের অদৃশ্য স্নেহধারা অজান্তেই

তাঁদের ঘিরে রেখেছিল, তেমনই ক্রমে ক্রমে ছেলেরাও মনে প্রাণে বুঝেছিলেন তাঁদের এই মা, (স্বরূপত)—'প্রতিদিনের মা' আর 'চিরদিনের মা'র সংগমস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন 'সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী জগজ্জননী' হয়ে।

নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) : ঠাকুরের কাছে ছেলেরা আসেন, মা জানতে পেরে রান্না চাপিয়ে দেন। নরেন এলে আগে থেকে তাঁর পছন্দমতন মোটা রুটি আর ছোলার ডাল তৈরি হয়। কারণ মুগ ডাল ও ময়দার পাতলা রুটি খেয়ে নরেন বলে, "ভাল খেলুম, তবে রোগীর পথ্য।" ঠাকুরের কাছে নরেন হল 'মাছের মধ্যে রাঙাচক্ষু রুই', 'সহস্রদল পদ্ম' 'ধ্যান-সিদ্ধ', যে-ই আসে তার কাছেই নরেনের প্রশংসা করেন। একদিন শ্রীমায়ের কাছে বললেন—দেখেছ নরেনের কত বড়ো চোখ। মা বললেন—আমি কেমন করে দেখব। তারপর ঠাকুর একদিন নরেনকে কিছু জিনিস আনতে নহবতে পাঠিয়েছিলেন, ঘোমটার আড়াল রেখেই সেই মা-ছেলের প্রথম পরিচয়। কী দেখেছিলেন নরেন সেদিন, যাতে পরবর্তী কালে অকুণ্ঠ-কণ্ঠে মাকে বলতেন 'জ্যান্তদুর্গা'! অখণ্ডের ঘরের ঋষি নরেনকে কালী মানাতে ঠাকুরকে বেগ পেতে হয়েছিল কিন্তু মায়ের প্রতি নরেনের প্রথম থেকে অগাধ সম্ভ্রমমিশ্রিত ভক্তি। প্রথম দিকের একটা ছোট্টো ঘটনা, কিন্তু ব্যঞ্জনায় গভীর। ভবতারিণী দেবী (বসুমতী মা বলে পরিচিত) সম্পর্কে মায়ের মাসতুতো বোন। ছোট্টো স্নেহের বোনটি তখন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের কাছে আছেন। মা তাঁকে একদিন ঠাকুরের ঘরটি পরিষ্কার করে আসতে বললেন। সে একটু পরেই ফিরে এলে পরিষ্কার হয়েছে কিনা মা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, "না, নরেনদা এসেছেন, ঠাকুর ঘরে নেই, আমাকে তামাক সাজতে বললেন, আমি কি তামাক সাজতে জানি?" "নে, জানতে হবে না তোকে, দে আমাকে কলকেটা।" বলে মা নিজে সাজিয়ে দিলেন। এমন পরিপাটি দেখে নরেনদা বললেন, "কে এমন করে সাজিয়ে দিলে?" আমি বললাম, "কেন? মা"। অমনি নরেনদা মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠলেন : "ওরে শাঁকচুন্নী (ঠাট্টা করে ডাকতেন) করেছিস কি? সর্বনাশ, আমি এখন ঐ কলকেতে তামাক খাই কি করে?" দাদা কলকে নিয়ে একবার মাথায় ছোঁয়ালে তারপর নিজেই উঠে তামাক সেজে খেলেন। প্রথম থেকেই যেন তাঁর কাছে কালী এবং শ্রীশ্রীমা অভেদ। ঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুর তাঁকে মায়ের সম্বন্ধে কখনও কিছু বলেননি। ঠাকুর জানতেন নরেন নিজের প্রজ্ঞাতে আপনভাবে চিনে নেবে মাকে। মাকে চিনতে ও চেনাতে দলপতি নরেন অগ্রণী। তিনি গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে আমেরিকা থেকে লিখেছেন, "মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেউ পারে না, ক্রমে পারবে।" নরেন বলেছেন, 'ক্রমে পারবে' তাই মাকে চেনানো ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। তিনি আরও বললেন, "মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।" তেমনি মায়ের কাছেও নরেন ছিল 'যথাসর্বস্ব'।

রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) : এই 'রাঙাচক্ষু রুই' নরেনের আগেই দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল। মা ভবতারিণী আগে থেকে ত্যাগী মানসপুত্র রাখালের আগমনের সংবাদটি ঠাকুরকে দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি যেদিন ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, ঠাকুর সেদিন নিজে তাঁকে সঙ্গে করে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'রাখাল যে ছেলে' তাঁকে মাকে না

চেনালে হয়? তাই তো পরে রাখাল মহারাজ বলেছেন, "মাকে চেনা বড় শক্ত, ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মতন থাকেন। অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা, ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি চিনতে পারতুম?" এরপর যখন রাখালের স্ত্রী দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন ঠাকুর নহবতে পাঠিয়ে মাকে বলে পাঠান টাকা দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখতে। মাও টাকা দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখলেন, যেমন সংসারে অন্যসব মায়েরা দেখেন। এই ঘটনা যেন বলে দেয় শুধু ঠাকুর নয় মাও তাঁকে নিজের সন্তান বলেই প্রথম দিন থেকেই জেনে নিয়েছিলেন। তাই রাখালের প্রতি ছিল মায়ের সবসময়ের জন্য সজাগ দৃষ্টি, বিশেষ স্নেহ। সবার জন্য সুতির কাপড়, রাখালের জন্য রেশমি কাপড়, রাখাল ভালোবাসে তাই 'তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হত'। এ নিয়ে প্রশ্ন করলে মা বলতেন, "রাখাল যে ছেলে"— এই ছোট্টো উত্তরের মধ্যে মা সব কথাই বলে দিতেন। মায়ের লোকাতীত দৃষ্টিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্নেহাস্পদ রাখাল—বালকস্বভাব, আবার সাক্ষাৎ নারায়ণ। আর বালকস্বভাব ব্রহ্মানন্দের কাছে মা হলেন স্বয়ং ভগবতী। তাঁকে দর্শন করতে এলে ভাব সংবরণ করতে না পেরে থরথর করে কাঁপতেন মহারাজ। তিনি জানতেন, "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।" তাই বাউল সুরে গান ধরতেন—"...এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে।/ কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াওরে ॥"

মা-ও বলতেন, "এই রাখাল-টাখাল এইসব ছেলেরা রয়েছে এরা কি কম!... জীবের মুক্তির চাবি এদের হাতে আছে।"

লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) : "এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধ-সত্ত্ব, তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে একে বলো, এ করে দেবে।"[১] ঠাকুর নিশ্চল লাটুকে ধ্যান থেকে তুলে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করলেন। সরল লাটু সেইসব দিনের স্মৃতিচারণ করে বলতেন, "দেখো! মা কত কষ্টে না দিন কাটিয়েছে। ...মার মত বৈরাগ্য হাম্‌নে দেখে নি। আউর তাঁর দয়াব কি তুলনা আছে? হামার বহু ভাগ্য যে, উনি হামাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন—মায়ের কৃপায় হামার জীবন তো সার্থক হয়ে গেছে।"[২] এই অদ্ভুত বালক মায়ের সঙ্গে কখনও ছেলের মতো কখনও পিতার মতো মান-অভিমান করতেন—মা ছাড়া তাঁকে আর কেউ বুঝতে পারতেন না। বলরামবাবুর বাড়ি থেকে মা জয়রামবাটী যাচ্ছেন। বুঝিবা মনের আবেগ চাপা দিতে সন্ন্যাসী লাটু মায়ের সঙ্গে দেখা না করে নিচের তলায় পায়চারি করতে করতে বলে চলেছেন, "সন্ন্যাসীকো কো পিতা, কো মাতা, সন্ন্যাসী নির্মায়া।" মাও দরজার কাছে এসে বললেন, "বাবা লাটু! তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই বাবা।" আর যায় কোথায়, রুদ্ধ আবেগ মুক্ত হয়ে গেল, কান্নায় ভেঙে পড়লেন লাটু মায়ের চরণতলে। মার চোখেও জল। অমনি পিতার মতো লাটু তাঁর চাদর দিয়ে মায়ের চোখ মুছিয়ে দিলেন, "বাপের ঘরে যাচ্ছ মা! কাঁদতে কি আছে? আবার শরোট্ তোমায় শীগ্‌গির এখানে নিয়ে আসবে, কেঁদো না মা! যাবার সময় চোখের জল ফেলতে আছে কি?"

পরবর্তী কালে লাটু মহারাজ নিজের অনুপম ভাষায় মায়ের সম্পর্কে আপন অনুভূতি প্রকাশ করেছেন : "মাকে মানা কি সহজ কথা রে। তাঁর (ঠাকুর) পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন, বুঝো ব্যাপার। মা-ঠাউন যে কি, তা একমাত্র তিনি বুঝেছিলেন আর কিঞ্চিৎ স্বামীজী

বুঝেছিলেন, তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী।"[৩]

বুড়োগোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) : লাটু মহারাজের মতো প্রথম থেকে মায়ের সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন বুড়োগোপাল, পরবর্তী কালের স্বামী অদ্বৈতানন্দ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বেশি বয়সে তিনি ঠাকুরের কাছে আসেন। তখন ঠাকুর তাঁকে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। মায়ের সেবাধিকার পাওয়া কি কম কথা! মা নিজমুখে বলেছেন—একদিন ঠাকুর ধ্যান থেকে বুড়োগোপালকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন আমার পায়ে ব্যথা বলে কি আর পা টিপতে বলি, জন্মজন্মান্তরে অনেক করা আছে তাই তোমার সেবা গ্রহণ করি। মায়ের সেবার প্রসঙ্গেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

মা বলেছেন—বুড়োগোপাল আমার বাজার করে দিত। তাঁর সঙ্গে মা নিঃসঙ্কোচে কথা বলতেন। পরবর্তী কালে বাতের কষ্ট নিয়েও অদ্বৈতানন্দ নিজের হাতে বেলুড় মঠে সবজি চাষ করে মায়ের জন্যও পাঠিয়ে দিতেন। সন্তানের এই পূজা মা সানন্দে গ্রহণ করতেন। তাঁর এই কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের ফলে মঠের ছেলেদের ভাতের সঙ্গে তরকারি জুটত আর তাতেই মায়ের সন্তোষ শতগুণ বেড়ে যেত।

বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) : প্রথম দিকে আগত ছেলেদের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করে সাধনভজন ও ঠাকুরের সেবা করতেন তাঁদের মধ্যে দরদী বাবুরাম ছিলেন 'নৈকষ্য কুলীন', 'মায়ের প্রাণেব জিনিস'। মায়ের স্নেহের স্পর্শ তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, পরবর্তী কালে মা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীমা ঠাকরুনের দেখেছি ঠাকুরের চেয়েও বেশি শক্তি। তিনি শক্তিস্বরূপিণী কিনা। শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, রাধারানী এঁদের কথা শুনেছো? মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন, অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা—সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য।" বাবুরাম মহারাজ ছাড়া এমন করে কেই বা বলতে পারেন! তিনি যে প্রথম থেকেই দেখেছেন, সাধনে ব্যাঘাত হবে বলে ঠাকুর যখন রাতে বরাদ্দ চারখানি রুটির বদলে ছয়খানি রুটি দেওয়ার জন্য অভিযোগ করেছেন মায়ের কাছে, মা তখন ঠাকুরকে বলেছেন, "ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অতো ভাবছো কেন? ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখবো।" এই কথায় ঠাকুরের অপার সন্তোষ, কারণ তিনি বুঝলেন ছেলেদের নিয়ে তাঁর ভাবী সঙ্ঘের ভার স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মা স্বীকার করে নিয়েছেন। গুরুভাব আর মাতৃভাবের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন ভাব—যেখানে আশ্রয় আর প্রশ্রয়ের ব্যতিক্রমী সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়।

যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) : মায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য 'অর্জুন-চক্ষু' যোগেন। বৃন্দাবনে ঠাকুর যখন শ্রীমাকে দর্শন দিয়ে যোগেনকে দীক্ষা দিতে বলেন, মা রাজি হননি। কিন্তু বারবার যখন একই নির্দেশ ঠাকুর দিয়েছিলেন তখন আর মা দ্বিধা করেননি। শ্রীঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষের কৌটো সামনে রেখে পুজো করতে করতে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁকে মন্ত্রদান করেন মা। যোগানন্দ মাকে এরকম ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দেখেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপনকালের একেবারে প্রথম দিকে। যোগানন্দ দেখলেন জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের

আলোয় মা নহবতে সমাধিস্থা। লালপেড়ে শাড়ি। গয়না পরা, গা থেকে আঁচল খসে উড়ে উড়ে পড়ছে কিন্তু মার একেবারেই হুঁশ নেই। যোগেন ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই চিরদিনের মতো বিজিত হয়ে গেলেন। সেদিন যোগানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন মায়ের স্বরূপ। আর কোনওদিনই মাকে মানবীরূপে দেখেননি। প্রথমে দর্শন, পরে দীক্ষা। মায়ের কৃপায় যোগানন্দ হয়ে উঠলেন তাঁর অন্তরঙ্গ। মা বলেছেন, "যোগীনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না।"[৪] যোগানন্দের শেষ অসুখের সময় মা বলেছেন—'তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল, মন ভাল নয়, যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো কাঁদছি। আবার যোগীন ভাল থাকছে তো ভাল থাকছি।' যোগীনের স্মৃতি চিহ্ন মা যত্ন করে রাখতেন। ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর ছেলেদের মধ্যে যোগীনই প্রথম তুলে নেয় মায়ের সেবার ভার। বারো বছর মায়ের জগন্মাতৃত্বে সদা সচেতন থেকে অনুপম সেবা করে গেছেন। যোগীনের সেবা তো নয়, যেন উপাসনা।

শরৎ (স্বামী সারদানন্দ): মায়ের কথায়, "শরৎ আর যোগীন এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।"[৫] যোগানন্দই অন্তরঙ্গ সারদানন্দকে পরামর্শ দেন, "শরৎ তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর, তিনি যা বলবেন, তাই ঠিক।"[৬] শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না নিজে নিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়েই সারদানন্দের চেতনায় মায়ের স্থায়ী আবির্ভাব। এর বহুপূর্বে তিনি মায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ভাতের থালা হাতে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরিহিতা মা সারদাকে দেখে যুবক শরচ্চন্দ্রের মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণার প্রতিমা। সংশয়াকুল ভক্তদের সারদানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলতেন, "মা আর ঠাকুর কি আলাদা?"[৭] প্রাণের এই সুরটি বেজে উঠল তাঁর রচিত প্রণামমন্ত্রে :

"যথাগ্নের্দাহিকা শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥"

সারদানন্দ নিজের জীবন সঙ্ঘসেবার পাশাপাশি জগজ্জননী সারদার সেবায় উৎসর্গ করে এক অসামান্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মায়ের কাছে তিনি ছিলেন নির্ভরতার প্রতিমূর্তি। তাই মানুষী লীলা সংবরণকালে মা সারদানন্দের হাত ধরে বলে গেলেন, "শরৎ এরা সব রইল দেখো।" মায়ের বাসুকি শরতের ওপর তাঁর সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাকলেও ঘোমটার আড়ালটি ছিল অটুট। তাই অভিমান করে শরৎ মহারাজ বলেছিলেন, "বেটী আমাকে যেন মনে করে শ্বশুর।" শেষে কিন্তু মা ছেলের এই আক্ষেপ মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কুড়ি বছর অসাধারণ সেবা করেছেন মায়ের সংসার-সমেত মাকে। তবুও স্বামী সারদানন্দকে লীলাপ্রসঙ্গের মতো শ্রীমায়ের জীবনী লিখতে অনুরোধ করলে তিনি নস্টালজিক হয়ে বলেন, "এতকাল রইলাম কাছে, বেড়াইলাম পাছে পাছে/ চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি।"

সারদাপ্রসন্ন (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ): মায়ের আর এক সেবক ও দীক্ষিতসন্তান সারদাপ্রসন্নও প্রথম অবস্থায় মাকে চিনতে পারেননি। বালক সারদা অভিভাবকের অমতে ঠাকুরের কাছে আসতেন। বাড়ি ফেরার পয়সা না থাকায় পাথেয় আনতে ঠাকুর তাঁকে নহবতে মায়ের কাছে পাঠাতেন, দূর থেকেই মা কিন্তু টের পেতেন, আগেই আড়াল থেকে দরজার গোড়ায় রেখে দিতেন চারটি পয়সা। সবসময় নিজেকে গোপনে রাখলে বালকভক্ত

কেমন করে মাকে জানবে? লাটু মহারাজের কথায় তারই সমর্থন, "প্রথম প্রথম সারদা মাকে মানতো না শেষে মাকে মেনেছিল।"[৮] মানবেনই তো, কারণ 'নিজ নিকেতনে' যাওয়ার পাথেয়টুকুও যে মা-ই তাকে জুগিয়েছিলেন। ঠাকুর নিজে বর্তমান থাকতেই তাঁকে দীক্ষা নিতে মায়ের কাছে নহবতে পাঠান। তখন "অনন্তরাধার মায়া কহনে না যায়,/ কোটি কৃষ্ণ কোটিরাম হয় যায় রয়।"—বলে ঠাকুর মায়ের স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন তাঁর কাছে। যোগেনের পরে কোনও একসময় মা তাঁকে দীক্ষা দেন, ত্রিগুণাতীতানন্দ 'ব্রহ্মময়ীর সেবা'য় নিজের জীবন তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। মাকে নিয়ে জয়রামবাটী যাওয়ার সময় পথের ঝাঁকুনিতে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ যাতে না হয় তাই আরুণির মতো শুয়ে পড়লেন গর্তের ওপর এবং গাড়োয়ানকে নির্দেশ দিলেন নির্বিঘ্নে তাঁর ওপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে। ভেবেও দেখলেন না যে এতে মৃত্যু অনিবার্য। অন্তর্যামিনী মা ঠিক জেগে রক্ষা করলেন তাঁকে। এই হঠকারিতার জন্য সেদিন মা তাঁকে ভর্ৎসনা করলেও পরে নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির প্রশংসা করে এই ঘটনাটি অন্য ভক্তদের বলেছেন। আমেরিকা যাওয়ার আগে সারদাপ্রসন্ন তিন বছর মায়ের সেবা করেছেন এবং ওখানে গিয়েও নিষ্ঠাবান ছেলেটি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিমাসে মায়ের খরচের জন্য টাকা পাঠাতেন।

নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) : রামের অংশে জন্মেছিলেন নিরঞ্জন। তিনি ছিলেন মায়ের বীরসন্তান। মায়ের প্রয়োজনে দৌড়ে গিয়েছিলেন কামারপুকুরে শরৎ মহারাজের সঙ্গে। মহিমা প্রচার করতেন সবার কাছে সোচ্চারে। গিরিশ ঘোষ মায়ের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমিই কি (মাকে) মানতুম, নিরঞ্জনই তো চোখ খুলে দিলে।" শুধু একা গিরিশ ঘোষ নয় আরও অনেক ভক্তের কাছে সবার আগে তিনি মায়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিলেন। তাই স্বামীজী বলতেন, "নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে, কিন্তু মায়ের ওপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়।"[১০]

তারক (স্বামী শিবানন্দ) : ঠাকুর অসমাপ্ত কাজের ভার মায়ের ওপর দিয়ে যাওয়ার আগে মাকে চেনাতে চেষ্টা করেছিলেন প্রায় সব ছেলেকে। মহাপুরুষ মহারাজ বলেছেন, "ঠাকুর আমায় একদিন বলেছিলেন, 'ঐ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা—অভেদ।' " তিনি পত্রে লিখছেন : "...তিনি (শ্রীমা) সাধারণ মানবী নন, সাধিকাও নন বা সিদ্ধাও নন। তিনি নিত্যা সিদ্ধা, সেই আদ্যাশক্তির এক অংশ-প্রকাশ; যেমন কালী, তারা, ষোড়শী—ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি তেমনি।"[১১] তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, মহাশক্তিরূপিণী মা সমগ্র নারীজাতিকে জাগানোর জন্য এসেছিলেন নরদেহে। এই বিশ্বাসের পরিচয় পাই তাঁর একটি উক্তিতে, "দেখ না, মার আগমনের পর থেকেই সব দেশের নারীজাতির মধ্যে কি অভিনব জাগরণ শুরু হয়েছে। ...জাগরণ এসেছে, আরও আসবে। এ সব ঐশী শক্তির খেলা। সাধারণ মানুষ এ সকলের গূঢ় মর্ম কিছুই বুঝতে পারে না।"[১২] মহাপুরুষ মহারাজ নিজেও বিনম্রভাবে বলতেন কতটুকু তিনি বুঝেছেন মাকে। মায়ের জন্মতিথিতে তিনি চলে যেতেন ভাবের রাজ্যে। ভক্তদের বলতেন, "আজ কি যে সে দিন? মহামায়ার জন্মদিন! আমাদের ভক্তি নেই, তাই এসব দিনের মাহাত্ম্য বুঝতে পারিনে।... একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন।"[১৩] কিন্তু মা বুঝতেন তাঁর ছেলেটিকে। তাই বলছেন, তারক সাদা-সাধু, ঠাকুরের জ্বলন্ত ত্যাগের আদর্শ নিয়ে আছে। আহা কত ভাগ্যে এমন হয়।"

শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) : শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় রামকৃষ্ণানন্দ নাম সার্থক করে ধন্য হয়েছেন শশী মহারাজ। তাঁকে ঠাকুরের দেহ যাওয়ার কদিন আগে বলেছেন, "ওকে (শ্রীমাকে) ডেকে নিয়ে আয়, ও বড় বুদ্ধিমতী আমার অবস্থা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে।" মহাভাবের কথা মহাভাবময়ীরই বোঝা সম্ভব। শশীর প্রাণেও অনুরণিত হতে থাকে মায়ের মহিমা। শরৎ ও শশী দু-ভাই, একই সঙ্গে এসেছেন ঠাকুরের কাছে। শশীর মাকে সেবা করার সুযোগ এসেছে প্রায় তাঁর নিজের জীবনের শেষ অধ্যায়ে। তাঁর অসীম আগ্রহে মা দক্ষিণদেশে আসেন। তিনিই যে শুধু সেইসময় সেবা করে ধন্য হয়েছিলেন তা নয়, দক্ষিণদেশকেও ধন্য করেছিলেন। 'The Hindu' দৈনিক কাগজ মাদ্রাজবাসীর পক্ষে শ্রীমাকে স্বাগত জানায়। এই প্রথম দেহে থাকতে সংবাদপত্রে মায়ের প্রচার। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে টিলায় উঠে মা যখন শশী মহারাজের ভাষায়—'পর্বতবাসিনী' হয়ে স্থানটিকে তীর্থে পরিণত করেন, ভাবে পরিপ্লুত শশী তখন মায়ের পায়ে মাথা রেখে মনের ভাবটি প্রকাশ করে স্তব করেন :

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥"

হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ) : 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' চর্চায় মগ্ন হরি যখন ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে আসেন, ঠাকুর একদিন তাঁকে বললেন, "ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?" তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গেল কথাটি। বোধহয় সেজন্য তিনিও ব্যাকুল হয়েছিলেন সবাই যাতে মাকে ধরতে পারে। একদিন আবেগে হরি মহারাজ মুখ-চোখ লাল করে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, "কোথায় লোক সব, মহামায়া বন্ধন খুলবার জন্য উদ্বোধনে বসে আছেন, কটা লোক তাঁর কাছে গেল, হাজারে হাজারে লাখে লাখে লোক যায় না কেন?" শ্রীশ্রীমা যখন সেবার জন্য কাশী থেকে সরলা দেবী (ভারতীপ্রাণা) -কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তখন হরি মহারাজ মায়ের অপার মহিমা স্বীয় অনুপম ভাষায় প্রকাশ করেন, "মা ডেকেছেন? কি মহাশক্তি জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন! যে মনকে আমরা এখানে (কণ্ঠদেশে) ওঠাতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, সেই মনকে তিনি সেখানে 'রাধু রাধু' করে, জোর করে নামিয়ে রেখেছেন, বোঝ ব্যাপারটা, জয় মা মহাশক্তি।"

একবার মঠে চণ্ডীপাঠ ঠিক না হওয়ায় মা বন্ধ করতে বলেন কিন্তু হরি মহারাজের পাঠ শুনে মা বলেন, "হরি পড়তে পারে।" শাস্ত্রজ্ঞ হরির পাঠে মায়ের এমনই সন্তোষ। কিন্তু প্রায় নিরক্ষরা মা চণ্ডীর মর্ম কী করে বুঝলেন? ছোট্টো কথাটির মধ্য দিয়ে প্রায় নিরক্ষরার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা মার সরস্বতীরূপটি ধরা পড়ে গেল। সাধে কি আর ঠাকুর বলেছিলেন, "ও সারদা সরস্বতী, ...এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"

হরিপ্রসন্ন (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) : মায়ের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ কম পাওয়ায় হরিপ্রসন্নের নিজের কথা, "বাপের দিকেই টান ছিল বেশি।" পড়াশুনার সুবাদে কলকাতার বাইরে থাকতে হত তাঁকে। তাই ঠাকুরের কাছেও বেশি আসতে পারতেন না। তবুও দু-একবার দক্ষিণেশ্বরে রাত কাটানোর জন্য মায়ের হাতে রুটি ডাল খেতে পেয়েছেন যার মধ্য দিয়ে মা পরিবেশন করতেন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি। তাই বিজ্ঞান মহারাজ মাকে

দর্শন করার এক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছিলেন, "আমি তখনও মাকে দেখিনি, দেখতে গিয়েছি। মা উপরে রয়েছেন, আমি নীচের তলায় বসে, আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল।"[১৪] তিনি কিন্তু প্রথম দিকে মায়ের ধারেপাশে বেশি ঘেঁষতেন না। স্বামীজীর আদেশে একবার মাকে প্রণাম করতে গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে উঠতেই শুনলেন স্বামীজী পিছন থেকে বলছেন, "সেকি পেসন—...মা যে সাক্ষাৎ জগদম্বা।"[১৫] তখন থেকেই তাঁর 'জীবন-সংগীত' হল, "...ঠাকুর চৈতন্য-স্বরূপ, মা চিন্তা-স্বরূপিণী, মা সর্ব-শক্তিময়।" শেষ জীবনের মুল সুর ছিল, "...মায়ের নাম জপ করি—'মা আনন্দময়ী' বলে। ঠাকুরের নামের চাইতে মায়ের নামে আমি বল পাই বেশি।"[১৬] "এখন মা মা বলি সকাল সন্ধ্যায় আর মনে হয়, ঠিক যেন মায়ের কোলের শিশুর মতন আছি। তাঁর কোলেই বসে রয়েছি।"

গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) : অনেকের মতোই মার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা পাওয়া যায় না হরির বন্ধু নিষ্ঠাবান বালক গঙ্গাধরেরও। তার ওপর আবার ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর উত্তরাখণ্ডের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও স্বামীজীর নর-নারায়ণের সেবাযজ্ঞের প্রথম হোতা গঙ্গাধরকে কাজের জন্য দূরে থাকতে হত, মায়ের সাক্ষাৎ সেবা না করলেও মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলেন, "মা হলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী।"[১৭] স্বামী অখণ্ডানন্দও স্বামীজীর মতো বিশ্বাস করতেন শ্রীমা-ই হলেন এযুগের নারীর আদর্শ এবং মেয়েদের অনুপ্রাণিত করতেন এই আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে।

কালী (স্বামী অভেদানন্দ) : কালীও মাকে অন্নপূর্ণা জ্ঞানেই দেখতেন, কাশীপুরে থাকাকালীন ঠাকুরের নির্দেশে ভিক্ষায় বার হয়ে স্বামীজীর সঙ্গে প্রথমেই মায়ের কাছে গিয়ে বললেন : "অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।/ জ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতী ॥"

মা নিশ্চিত সেদিন তাঁর ছেলেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সিদ্ধির প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। কালী ছিলেন সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন যিনি মার সঙ্গে প্রথম তীর্থযাত্রার সুযোগ পান। মা যখন নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে ছিলেন সেইসময় মায়ের সুবিখ্যাত সর্বজনবিদিত স্তোত্রটি রচনা করে মাকে শোনালে মা আশীর্বাদ করেন—"তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।"[১৮]

খোকা (স্বামী সুবোধানন্দ) : সকলের ছোটো ছেলেটি ঠাকুরের কাছে এলেই সকলে আদর করে খোকা বলে ডাকত। দাক্ষিণাত্য থেকে তীর্থ করে মা ফিরছেন বেলুড়ে। অধীর আগ্রহে অভ্যর্থনার জন্য সবাই অপেক্ষারত। রাজা মহারাজের কড়া নির্দেশ কেউ যেন এইসময় মার পাদস্পর্শ না করে। ছোট্টো খোকার মন মানবে কেন। হঠাৎ দ্রুতপদে খোকা মহারাজ পা ছুঁয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মহারাজ বলে উঠলেন 'কে, কে? ধরো, ধরো!' ব্যক্তিটি কে জানার পর আনন্দের হিল্লোল উঠল। খোকা যেন মনেপ্রাণেই খোকা। মা কিন্তু বললেন, "খোকা কেন দীক্ষা দেয় না? ঠাকুরের ছেলেরা যতদিন আছে লোকেরা লুঠে নিক।"[১৯] মা তো জানতেন তাঁর ছেলের মাঝে আছে পাবনী শক্তি। খোকা মহারাজের কাছে ঠাকুর আব মা-ঠাকরুন যেন টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন তাঁরাও তাই, তাই তো বললেন, "মা হলেন মহামায়া—আদ্যাশক্তি। ভগবান তাই নরদেহে অবতীর্ণ হলে তিনিও

তাঁর সঙ্গেসঙ্গে আসেন। নতুবা অবতারলীলা পূর্ণ হয় না।''[২০]

অবতারলীলা পূর্ণ করতে একে একে সব জড়ো হল দক্ষিণেশ্বরের সুরধুনীর তীরে। ''বাউলের দল নাচল, গাইল, চলে গেল, কেউ চিনল না।''—তাহলে চলবে কেমন করে? মানুষের কল্যাণের জন্যই তো করুণায় অবতরণ। তারাই যদি অন্ধকারে দিশা দেখতে না পায়, তবে যে অবতারের আসা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই চেনা-অচেনার আবছায়াতে শুরু হয় মহান কাব্যের নেপথ্য সংগীত। চেনা আর চেনানোর পালা। মা চেনায় ছেলেদের—''সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে তাঁর কাছে চলে যাবে! কেউ তাঁর বাহু হতে, কেউ পা হতে, কেউ লোম হতে হয়েছে—সব তাঁর অঙ্গ অংশ।'' ছেলেরা চেনায় মাকে, সাধারণ মেয়ের মতো দেখতে হলেও 'মা যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।'

আশ্বাস ও প্রেরণা

ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাতে দক্ষিণেশ্বরের আনন্দের হাট ভেঙে গেল। সুখে-দুখে, শোকে মা-ই ছিলেন ছেলেদের পরম আশ্রয়। শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে অন্তরঙ্গ ছেলেরা প্রাণপাত সেবা শুরু করলেন। ঠাকুরেব সেবার জন্য মা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও অসুখের সূত্র ধরে ছেলেদের অনেক কাছাকাছি আসতে বাধ্য হলেন। কাশীপুরে পথ্য তৈরিব প্রণালী ডাক্তারের কাছে জেনে বুড়োগোপাল মাকে বলে দিতেন, কালী জ্যান্ত-গুগলি ধরে মাকে দিতেন পথ্যের জন্য এবং অন্যান্য ছেলেরাও নানাভাবে নেপথ্যে সাহায্য করতেন।

আনন্দময় ঠাকুর এই দুঃসহ দেহযন্ত্রণার মধ্যেও ছেলেরা যাতে আনন্দে থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। মা বলেছেন, ''ঠাকুর বলতেন, একটু আনন্দ না পেলে ওরা কেমন করে পারবে।'' একদিন মা প্রত্যক্ষ করলেন ঠাকুরের এক দিব্য লীলা। ছেলেরা যাতে আনন্দ করে খেজুরের রস খেতে পাবে তার জন্য চলৎ-শক্তিহীন ঠাকুর বিদ্যুদ্‌বেগে সকলের অগোচরে খেজুর গাছের নিচে থাকা এক রাগী কালসাপকে তাড়িয়ে দিয়ে এলেন। কিন্তু সাক্ষাৎ লীলাময়ীকে কি লীলা লুকানো যায়? যখন ঠাকুর জানলেন মা দেখে ফেলেছেন তখন ঘটনাটি প্রকাশ কবতে বাবণ করলেন। মা অন্তরে অনুভব করলেন ছেলেদের আনন্দের জন্য ঠাকুবের কী অমানুষীক লীলা।

এইসময় একদিন বুড়োগোপালের আনা গেরুয়া ঠাকুর ছেলেদের দিয়ে বললেন ভিক্ষা করতে যেতে। তাঁদের সঙ্গে তিনিও পবিত্র ভিক্ষান্ন গ্রহণ করবেন। নরেন সোৎসাহে বললেন 'শ্রীমাই আমাদের ভিক্ষামাতা হবেন।' নিবঞ্জন, কালী, প্রভৃতিকে নিয়ে প্রথমেই তিনি গেলেন মায়ের কাছে, 'নারায়ণ হরি' বলে ভিক্ষা চাইলেন। মা তৎক্ষণাৎ একটাকা ভিক্ষা দিলেন। ষোলো আনা—একেবারে পূর্ণ—পূর্ণতালাভের জন্য বালযোগীদের মার পূর্ণ আশীর্বাদ। নরেন্দ্র তো আহ্লাদে আটখানা। শিবানন্দের ভাষায়, ''আমাকে ডেকে বললেন, 'তারক দা, আপনি তাড়াতাড়ি একটা খিচুড়ি ও তরকারি রেঁধে ফেলুন। কিছু জিলাপী আনছি।'...নরেন নিজেই শ্রীঠাকুরের ভোগ নিয়ে গেল আর শ্রীমায়ের ভোগ নিয়ে গেল গোপালদা। তাঁদের প্রসাদ নিয়ে আসার পরে আমরা সকলে আনন্দ করে প্রসাদ পেলাম।''

ছেলেদের সাধন-ভজনের সঙ্গে দিবারাত্র চলেছে ঠাকুরের সেবা। লাটু মহারাজ স্মৃতিচারণ করেছেন, ''শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতে করতে হামাদের মধ্যে কেউ হতাশ হয়ে পড়লে শ্রীশ্রীমা তা বুঝতে পেরে বলে পাঠাতেন ওদের হতাশ হতে মানা করো, তাঁর শরীর তো

আজ একটু ভালো রয়েছে, এখন তো ঘায়ের মুখ বাইরের দিকে হয়েছে। এমনি করে মা আমাদের সাহস দিতেন।"[২১]

ঠাকুরের অবস্থা ক্রমে আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ইতিমধ্যেই অসমাপ্ত কাজের ভার মাকে দেওয়া ও নরেনকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এইসময় ঠাকুর একদিন শশীকে দিয়ে মাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "দেখো গো, কেন জানি না—মনে সর্বদাই ব্রহ্মভাবের উদ্দীপনা হচ্ছে।"[২২] শ্রীমা বুঝলেন বিদায়ের ক্ষণ আসন্ন, ব্রহ্মে লীয়মান শ্রীঠাকুরের এ মনকে আর টেনে রাখা সম্ভব নয়। ঠাকুরের মহাসমাধির পর ছেলেরা শুনলেন এক অভূতপূর্ব সম্ভাষণ—"মা কালী গো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো" বলে একবার ডাক ছেড়ে কেঁদে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মা একদম চুপ করে গেলেন। মায়ের কথা বিশেষ করে ভেবে নরেন বললেন, "বাড়িটা আর একটু থাক্, আমরা ভিক্ষে করে খাওয়াবো মাকে—সদ্য সদ্য মায়ের মনঃকষ্ট।" কিন্তু গৃহী ভক্তরা বাড়ি ছেড়ে দিল।

দুর্বিষহ বিরহ উপশমের জন্য মায়ের তীর্থে যাওয়ার ব্যবস্থা হল, ছেলেদের মধ্যে যোগেন, লাটু, কালী সঙ্গে গেলেন। এসময় বার বার ঠাকুরের দর্শন মার বিরহবিধুর মনকে শান্ত করে। যোগেন বর্ণনা করেছেন, "মা এসময় একবার প্রায় দুদিন সমাধিস্থ ছিলেন...এর পর থেকেই মার মধ্যে বিরহবেদনার বদলে বিরাজ করতো গভীর আনন্দময় প্রশান্তি।" ভাব গোপন রাখার অশেষ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তীর্থে মায়ের ভাববিহ্বল অবস্থা প্রত্যক্ষ দর্শন করে ছেলেরা ধন্য হন। এরপর রাখাল, শরৎ, যোগীন প্রভৃতি ছেলেরাও মার সঙ্গে পুরী যান। গয়ায় কাজ করতে যাওয়ার সময় (১৮৯০, মার্চ মাসে) বুড়োগোপাল মায়ের সঙ্গে যান।

তীর্থ থেকে ফেরার পর মা স্বামীর ভিটায় কামারপুকুরে অতিকষ্টে দিনযাপন করেছেন। কয়েকজন মিলে মার দক্ষিণেশ্বরের মাসোহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাতর হয়ে নরেন কত বলেছিলেন, "মায়ের ও টাকাটা বন্ধ কোরো না।" তবুও বন্ধ হল। মা কাউকে কিছু জানাতেন না। শরৎ মহারাজ পরে দুঃখ করে বলেছেন, "আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মায়ের নুনটুকুও জোটেনি।" বরানগর মঠে তাঁদেব অবস্থাও ছিল অনুরূপ। মা আক্ষেপ করেছেন, "...তখন আহা! নিরঞ্জন-টন কতদিন আধপেটা খেয়ে জপধ্যান নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।" "...নরেন বাবুরাম ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ—সেই রাখালকেও আমার কতদিন হাণ্ডা মাজতে হয়েছে।" প্রবল বৈরাগ্যে ছেলেরা তপস্যার জন্য চারিদিকে বেড়িয়ে পড়ল। তপস্যায় যাওয়ার আগে মায়ের অনুমতি চাইলে মায়ের মন ব্যাকুল হত কিন্তু তাঁদের মনের অবস্থা বুঝে বাধা দিতেন না। শুধু মনে করিয়ে দিতেন—গতবার জগন্নাথে রাখালের কষ্ট হয়েছিল, এবার পশ্চিমের শীতে যেন কষ্ট না পায়, উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে নরেনের যেন খাওয়ার কষ্ট না হয় ইত্যাদি। এইসময় মা-ই ছিলেন তাঁদের প্রেরণা। জান্তে বা অজান্তে ছেলেরা মায়ের মুখের দিকেই চেয়ে থাকতেন।

স্বামীজী আমেরিকায় যাবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ পেয়েও দ্বিধায় দুলছেন। হঠাৎ মনে হল, মাকে চিঠি লিখি। সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে ছেলের চিঠি এল জয়রামবাটীতে। মা তাঁর অলৌকিক প্রজ্ঞায় যাওয়া অনুমোদন করে চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে মুহূর্তে স্বামীজীর দ্বিধা চলে গেল। বললেন, "আঃ এতক্ষণে সব ঠিক হল।" পল্লীবালা নিরক্ষরা মা কেমন করে জানলেন আমেরিকার কথা? সেখানকার 'শিবহীন' যজ্ঞে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন! আবার ওখানে স্বামীজীর বিশ্বজয়ের কথা আনন্দের সঙ্গে তাঁর নিরক্ষর পুত্র লাটুকে

জানিয়েছেন। এরপর থেকে লাটু মহারাজ শিকাগো পার্লামেন্টের সব খবর আগ্রহের সঙ্গে জেনে নিতেন গিরিশবাবুর কাছে। পরবর্তী কালে স্বামীজীর আহ্বানে পাশ্চাত্যে যাওয়ার সময় সারদানন্দের মনেও ভয় আর দ্বিধা ছিল, কিন্তু যাবার প্রাক্‌কালে মা বললেন, "ঠাকুর তোমাদের সর্বদা রক্ষা করছেন বাবা, কোন ভয় নেই।" তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংশয় নিঃশেষ হয়ে গেল। মা সর্বদাই ছেলেদের অভয় দিয়েছেন। যখন বাবুরাম পূর্ববঙ্গে যাবার আগে মাকে গিয়ে বললেন, তিনি মূর্খ, কি করে ঠাকুরের প্রচার করবেন? মা তখন বলেছিলেন, "ভয় কি, বাবুরাম, ভয় কি? ঠাকুর তোমার কণ্ঠে বসে কথা কইবেন।"[২৩]

শুধুমাত্র আমেরিকা যাওয়া অথবা বক্তৃতা দিতে যাওয়া নয়। সঙ্ঘ তৈরির মূল প্রেরণা ছিলেন মা। বরানগর মঠে নিদারুণ অর্থাভাব আর ছেলেদের ঘুরে বেড়ানো মায়ের প্রাণে দুঃসহ হয়ে বেজেছিল। বুদ্ধগয়ায় গিয়ে প্রাচুর্যপূর্ণ মঠগুলি দেখে সেই ব্যথা বহুগুণ বেড়ে যায়। মা কাঁদতেন আর প্রার্থনা করতেন, "ঠাকুর আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকার জায়গা হত।" মায়ের এই হৃদয় নিঙড়ানো প্রার্থনায় যুগধর্ম স্থাপনের জন্য সঙ্ঘ গড়ে উঠল। তাই তো সবাই বলেছে, "Ramakrishna left an eagles's nest full of eaglets. It was his widow, the Holy Mother, who watched and protected them till they had learned to fly." ক্যালিফোর্নিয়াতে বক্তৃতায় স্বামীজীও বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-শিষ্যেরা যখন বিরুদ্ধ পরিবেশে রীতিমতো অত্যাচার আর উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিল, তখন একমাত্র মায়ের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও অটুট আস্থা সর্বদাই প্রেরণাস্বরূপ ছিল।

বিশ্বজয় করে পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজী মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন কিন্তু চরণটি স্পর্শ করলেন না। অন্যদেরও বারণ করে বললেন—অতিলৌকিক স্তরে অবস্থিতা, অন্তর্যামিনী মা যে তাহলে সর্বগ্রাসী করুণা দিয়ে সকলের দুঃখকষ্ট নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নীরবে কষ্টভোগ করবেন। ছেলে কি তা হতে দিতে পারে?

আমেরিকার অসামান্য সাফল্যলাভের প্রসঙ্গে বললেন, "মায়ের আশীর্বাদের শক্তিতেই ঐ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল।" উত্তরে শান্তকণ্ঠে মা জবাব দিলেন, "ঠাকুর তোমার মাধ্যমে এইসব মহৎ ও বৃহৎ কাজগুলি করাচ্ছেন, তুমি মার চিহ্নিত শিষ্য ও সন্তান।"

স্বামীজী যখন শীঘ্র ঠাকুরের সঙ্ঘ তৈরি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন, মা আশ্বাস দিয়ে বললেন, "অল্পদিনের মধ্যেই তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে... এই কাজের জন্যই তোমার জন্ম—জগতের মানুষ তোমাকে লোকগুরু হিসাবে মানবে।" আশ্বাস ও প্রেরণার সঙ্গে এইভাবেই মা স্বামীজীর স্বরূপও নির্ধারণ করে দিলেন।

পরিচালিকা ও পরিসাধিকা

শ্রীমায়ের অমোঘ আশীর্বাদে অচিরেই সৃষ্টি হল ঐতিহাসিক সঙ্ঘ। শুরু হল বিশ্বের ধর্মজগতে এক নতুন অধ্যায়। স্বামীজী আবার প্রদর্শকের ভূমিকায়। ১ মে, ১৮৯৮ প্রথম মিশন মিটিং-এ স্বামীজীর যুগান্তকারী ঘোষণা, "শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে, আমাদের গুরুপত্নী হিসাবে মনে কর তিনি তা নয় ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।"

সঙ্ঘ তো হল কিন্তু নেই নিজস্ব জমি। নরেন একশো আটটি বিল্বপত্র ঠাকুরকে দিলেন

যাতে জমি হয়। মা বললেন, "আজ আমার মাথায় যে বোঝা ছিল তা নেমে গেল—তোমাকে তোমার নিজের জমিতে এনে।" মাও পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বললেন, "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজবার জায়গা হল।"

ছেলেদের সঙ্ঘের প্রশাসনিক কাজে খাতায় কলমে লেখা না থাকলেও সব ব্যাপারে মায়ের সীলমোহর ছিল চূড়ান্ত। 'মা বলেছেন,'—এই ছিল সব রত্ন ছেলেদের কাছে শেষ কথা। তীক্ষ্ণধী নিবেদিতা বলেছেন—এ এক অপূর্ব সম্পর্ক। মায়ের পরিচালনা ছিল আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকা বাতাসের মতো—স্বাভাবিক ও অনিবার্য।

স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছেন : "মঠে প্রথম প্রথম কার্যধারা নিয়ে অনেক সময় মতের পার্থক্য হলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন।" তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিপূর্ণ তাৎক্ষণিক মীমাংসা সকলেই দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিতেন—তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে।

কেউ কেউ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের সেবাকর্মের বিরোধিতা করলে মা দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর ত্যাগী ছেলেদের উদ্যোগে সমর্থন জানাতেন।

মা সারদার বরপুত্র স্বামীজীর প্রাণের কথা : "দাদা মায়ের কথা মনে পড়লে সময়ে সময়ে বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।" স্বামীজী জানতেন শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার অসম্ভব। তাই তো স্বামীজীর জাগ্রত স্বপ্ন ছিল, 'আগে মায়ের মঠ'। কিন্তু সেটি তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিতে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। যদিও নিজে উপস্থিত থেকে মাকে দিয়ে নিবেদিতা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রীমঠের বীজটি প্রোথিত করেছিলেন। জীবনের শেষের দিকে একদিন মাকে প্রণাম নিবেদন করে আবেগ নিঙড়ে বলেছিলেন, "মা এইটুকু জানি তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দের উদ্ভব হবে কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে একটিই, আর দ্বিতীয়টি নেই।" শত বিবেকানন্দের উদ্ভব না হোক তাঁর শত শত অনুগামী হয়েছেন যাঁরা মায়ের শতবর্ষে স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভব করে গঙ্গার পূর্বতটে 'শ্রীসারদা মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মঠে স্বামী সারদানন্দের হাতে গড়া মায়ের অন্তরঙ্গ সেবিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী যেদিন অধ্যক্ষা হন সেদিন বোধ হয় সত্যি সত্যি স্বামীজী মাথার বোঝা নামিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নরেনের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা একই শক্তির দুই প্রকাশ। তাই গাইলেন, "দাস তোমা দোঁহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে।"

স্বামীজীর জীবনের এই সুর আর একবার মধুর রাগিণীতে বেজে ওঠে যখন তিনি মায়ের নামে সংকল্প করে মঠে দুর্গা পূজা করেন। দুর্গা পূজায় বেলুড় মঠে মায়ের উপস্থিতি ছিল সশরীরে মা দুর্গার আবির্ভাবের সমার্থক। দুর্গাপূজায় যতবারই মা উপস্থিত থেকেছেন, ভাবের প্লাবনে মায়ের এই রত্ন ছেলেরা উদ্বেল হয়ে উঠতেন, সেসব কাহিনি এখন লীলা আস্বাদনের বিষয়।

বিচ্ছেদ-বেদনা

'মা' এসেছেন মানুষের খোলে। তাই অনুপম দৈবীলীলাকে কখনও কখনও ছাপিয়ে গেছে মায়ের মানুষী লীলা—সেখানে তিনি সন্তানহারা জননী, ব্যথায় কাতর, সে যন্ত্রণায় এতটুকু ফাঁক নেই। শোকসন্তপ্তা সেই মায়ের কথায় অভেদানন্দ বলেছেন, "মা আমাদের

নিজের ছেলের মতোই দেখতেন, গুরুভাইরা এক একজন শরীর ছাড়তেন আর মা কেঁদে আকুল হতেন। ...ঠাকুর আর কি শোক তাপ পেয়েছেন? মাকে অনেক সইতে হয়েছে।" মা থাকতেই একে একে আটজন ছেলে নিদারুণ শোকে ভাসিয়ে শরীর ত্যাগ করেছেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম কড়িটি খসেছিল মায়ের অন্তরঙ্গ যোগানন্দ স্বামীর দেহত্যাগে। দেহত্যাগের দিন বিমর্ষ মা বললেন, "আমার ছেলে যোগেনের কি হবে বাবা?... ভোরবেলা দেখলুম ঠাকুর নিতে এসেছেন।" প্রত্যক্ষদর্শী নিবেদিতা লিখেছেন, "শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম, তাঁর চোখে জল।"... সমবেত 'হরি ওঁ' মন্ত্র শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যেতে বললেন। ...ওপর তলায় কান্নার রোল উঠল, সে কান্না নিচের পূজারতির ধ্বনির সঙ্গে মিশে গেল। ... মনে হল মা এবং যোগীন মার হৃদয় বুঝি ভেঙে যাবে।" অসীম সংযমশীলা (সন্তানহারা) মায়ের সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। আকুল হয়ে কেঁদে বললেন, "বাড়ির একখানি ইঁট খসল।"

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সময় মা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। যতটুকু সংবাদ পাওয়া যায় তাতে জানা যায় মা শোকে দু-তিন দিন ভালো করে খেতে পর্যন্ত পারতেন না। ...মা কাঁদতেন আর সকলের কাছে বলতেন, "নরেন খেটে খেটেই মরে গেল।" স্বামীজীর এক সন্তানকে পত্রে লিখেছিলেন, শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই।

বাবুরাম মহারাজের শরীর চলে যাবার পর মর্মভেদী করুণস্বরে বললেন, "ঠাকুর নিলে! মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াতো।"

শশী মহারাজ উদ্বোধনে দেহত্যাগ করেন। তার আগে ব্যাকুল হয়ে মায়ের দর্শন প্রার্থনা করেছিলেন, মা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন, আসতে পারেননি। কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে সন্তানের শেষশয্যার পাশে এসে দাঁড়ালে, মৃত্যুপথযাত্রী উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মা এসেছেন'! তাঁর সেই শেষদর্শনের ভাবটুকু নিয়ে ভক্ত গিরিশ গান বাঁধলেন, গাইলেন সুকণ্ঠ পুলিনবাবু।

"পোহাল দুঃখ রজনী...
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী।"[২৪]

সন্তান অপার আনন্দে নয়ন চিরমুদ্রিত করলেন। শোকতাপিত মাতার কাতর উক্তি : "শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙে গেছে।"[২৫]

মাতৃভক্ত নিরঞ্জনানন্দের শেষ সময় মা-ই ছিলেন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, সাধন-সাধ্য। ভগ্ন শরীরে নিরঞ্জন হরিদ্বার যাচ্ছেন, দূরদৃষ্টিসম্পন্না মা আসন্ন চিরবিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ছেলে মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে আকুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাঁর দেহান্ত হয়।

মায়ের ছেলেদের মধ্যে তৃতীয় যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি মায়ের বুড়োগোপাল। আমেরিকায় পনেরো বছর থেকে মায়ের একদা সেবক সারদার (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) ওদেশেই শরীর যায় আর মায়ের লীলাবসানের কিছুদিন আগে লাটু মহারাজ দেহত্যাগ করেন।

আর বোধহয় মা সইতে পারলেন না বিচ্ছেদ-বেদনা। ঠাকুরের মহাসমাধির পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে বহন করলেন ঠাকুরের আরব্ধ কাজের ভার, এবার ছুটি এল। ১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ রাত দেড়টার সময় মা লীলা সংবরণ করলেন।

রাজা মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর মঠে। আগেই অদৃশ্য তারে খবর পৌঁছে গেছে পুত্রের

কাছে। ঠিক সেইসময় থেকেই তিনি নিশ্চুপ হয়ে জেগে বসে ছিলেন। পরদিন খবর আসার পর বারোদিন আর জুতো পরেননি, হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে 'পুত্রবৎ' নিয়ম পালন করলেন। মাতৃগতপ্রাণ মহারাজ মায়ের দিব্যস্বরূপ মর্মে মর্মে অনুভব করে বললেন : "এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম।"

শরৎ মহারাজ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে মায়ের তিরোধানের খবর পাঠানোর সময় লিখলেন, "গত পরশ্ব মহানিশা রাত একটায় পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কৈলাস যাত্রা করিয়াছেন।" এরপর বাংলার নব শক্তিপীঠ জয়রামবাটীতে অশেষ পরিশ্রমে 'মাতৃমন্দির' প্রতিষ্ঠা করে সারদানন্দ সারদার চরণে শেষ অর্ঘ নিবেদন করলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মায়ের মহাপ্রয়াণের খবর পেয়ে এতই অভিভূত হয়ে পরেন যে তিনি সকাল থেকে যেভাবে বসেছিলেন সেইভাবেই সারাদিন বসে থাকেন—দেহ স্থির, চক্ষু পলকহীন।

মায়ের ভাগবতী তনু দাহ শেষ হলে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "সতীর দেহের এক একটি অংশ পড়ে একান্নটি পীঠ হয়েছে আর আজ সেই সতীর সমগ্র দেহ দাহ করা হল। তাহলে বোঝ, বেলুড় মঠ কি জায়গা। শুধু পীঠ নয়, মহাপীঠ।"

উপসংহার

শক্তিপীঠও বটে। যুগে যুগে এভাবেই মহাশক্তি মর্তে এসে অমর্তলীলা করে গেছেন। ভক্তদের সঙ্গে মানুষের মতো করে মিশেছেন, আবার অসুর-দলন করেছেন। তিনিই হৈমবতী, তিনিই উমা, তিনিই কাত্যায়নী, তিনিই চণ্ডী, আবার তিনিই মহামায়া। কখনও মায়ায় জড়াচ্ছেন, কখনও মায়ার বাঁধন কাটছেন। কিন্তু কী তাঁর স্বরূপ? মায়াচ্ছন্ন মানুষকে কে চেনাবে তাঁকে? চেনাবেন ঋষিরা, যেমন চিনিয়েছেন অনাদিকাল থেকে। যখনই প্রশ্ন উঠেছে 'কা হি সা দেবী'—তখন ঋষি উত্তর দিয়েছেন—'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ'..., নিত্যা তিনি তবু 'দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।'—ভক্তদের সিদ্ধির জন্য আসেন। 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—তাঁর প্রসাদেই মুক্তি।

তেমনি মায়ের রত্ন ছেলেরা যাঁরা আজকের ঋষি, তাঁরা সাধারণের কাছে মায়ের স্নেহের ঘোমটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জগজ্জননীর স্বরূপটি জানিয়ে দিচ্ছেন। কারণ মহামায়া দ্বার রুদ্ধ করে দাঁড়ালে কার সাধ্য তাঁর কাছে পৌঁছায়, আর সেই মহামায়াই যদি ভক্তের অশ্রুতে, আকুলতায় ব্যথিত হয়ে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, তবে ভক্তি-মুক্তি ঠেকায় কে?

যে মহান কাব্যের গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে শুরু হয়েছিল কথারম্ভ, শেষ হল যেন সেই ভূমিকাতেই। আগাগোড়াই পার্ষদ-সহ মায়ের মানুষী আর অমানুষী লীলা। অবতারণ, অন্তরালে-আত্মগোপন, ঋষিদের মুখে আত্মপ্রকাশ, কৃপাবারি সিঞ্চন—সবটাই ছবির মতো লেখা ছিল মহাকালের ক্যানভাসে। সময় এলে ফুটে উঠল সবার চোখের সামনে। সময় ফুরোল, শেষ হল বাউলের দলের গানের পালা। শুধু "সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে, যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে, আজিও সে গীত মহাসংগীতে, বাজে মানবের কানে।"

নরেনের দুর্গোৎসব

হর্ষ দত্ত

আমরা লক্ষ-কোটি অকৃতী-অভাজন, তাপিত-পীড়িত। আমরা অর্থী-প্রার্থী, আপন্ন-আকুল। আমরা 'পিঁপড়ের সার', যুগ যুগ ধরে 'অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল' করছি। আমরা অগণন, দারিদ্র্যে অথবা শোকে জর্জর। আবার ভোগে অবসন্ন, ক্লান্ত। চোখের আলো, প্রাণের আলো নিভিয়ে দিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাইছি। কখনও কখনও জমাট বাঁধা তিমির রাত্রি পার হতেও চাই আমরা, নতুন প্রত্যুষের প্রত্যাশা করি। এমনতর যে আমরা, সেই আমাদের মাঝখানে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, এক সামান্যা পল্লীবালিকারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীমা সারদা। একথা আজ, তাঁর পুণ্য আবির্ভাবের একশো পঞ্চাশ বছব সময়লগ্নে ভাবতে বসে অবাক লাগছে। কী করে সম্ভব হয়েছিল এমন একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা! শুধু বিস্ময়, শুধু বিস্ময়!

অথচ জগৎজুড়ে অতিনীরবে শ্রীমায়ের অনন্ত উদয়। তাঁর এই উদয় আমাদেরই চিদাকাশে, আমাদেরই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনে। এই উদয় শুধু অনন্ত নয়, অনির্বাণ। অন্তহীন, অপার। তাঁর সমগ্র জীবনখানি আমাদের কাছে পরতে পরতে আশ্রয়-প্রশ্রয়। আশা-অন্ন, জীবন্ত শাস্ত্র। এক অমর 'সত্যধৃত মহাশ্বাস'।

সেই মহা আশ্বাসটি কেমন? কেমন আবার! খুব সহজ, সরল, তাতে কোনও জটিলতা নেই, দায় নেই, কন্ডিশন নেই। পুণ্যতোয়া নদীর মতো স্বচ্ছ সেই আশ্বাস : "আমাদের একটি মা আছেন যিনি করুণাময়ী, আনন্দময়ী, সর্বগ্রাহিকা, পরমার্থদাত্রী, যিনি কাউকে পরিত্যাগ করেন না, যিনি অবিশ্বাস্য সমদর্শিনী, যাঁর জীবিত চরিত্রের কান্তমণির শান্ত আলোকে ভাস্বর হয়ে আছে বিশ্বের আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রমাণ।"[১]

শ্রীমা সশরীরে যখন আমাদের মাঝখানে, আমাদেরই মতো একজন হয়ে বিরাজ করেছিলেন, তখন যেমন, তেমনই আজও তিনি আমাদের পরমনির্ভর। যুগ যুগ ধরেই, "এমন ভয়-কাতুরে জগতে কেউ নেই, শ্রীমাকে দেখে যার ভয় কাটেনি; এমন অপবিত্র জগতে কেউ নেই, এই পবিত্রতাস্বরূপিণীকে দেখে যার চিত্তের মল ফিকে হয়নি; এমন উপেক্ষিত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত জগতে কেউ নেই, মাকে দেখে যার মনে হয়নি—আর কেউ না হলেও মা তো আমার আছেন, আর মা যদি আছেন, কি যায়-আসে আর কেউ যদি বা না থাকে! কত অশান্ত, বিক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, মায়ের প্রশান্ত মুখশ্রী দেখে ফিরে পেয়েছে হৃদয়ের স্বস্তি।"[২]

মানুষেব মাঝে মায়ের এই শাশ্বত উদয়ের তাৎপর্য নিয়ে এযাবৎ অনেক আলোচনা, অনেক চর্চা হয়েছে। রচিত হয়েছে নানা গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র রচনায় সে-সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু রচনার সূচনায় ভূমিকা হিসেবে এই কথাগুলি বলতেই হল মা-

ঠাকুরাণীর উদ্দেশে নরেনের একটি উক্তির সূত্রে। মায়ের পায়ে শরণাগত নরেন সেদিন বলেছিলেন : "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।"[৩]

শ্রীমায়ের অদ্বিতীয়, অনুপম জীবনের নির্যাসটুকু এমন স্বল্প, সূচীভেদ্য এবং অমোঘ ভাষায় নরেন ছাড়া আর কার পক্ষেই বা প্রকাশ করা সম্ভব? এমন স্বানুভব, হৃদয়সংবেদী উক্তি নরেনকেই বুঝি মানায়। কেননা ঠাকুরের সন্তানদের ভেতর নরেনই শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের আট বছরের মাথায় (১৮৯৪) আমেরিকা থেকে লেখা তাঁর একটি বিখ্যাত চিঠিতে নিঃসঙ্কোচে, নিঃশঙ্কায় লিখেছিলেন, "মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পারনা, ক্রমে পারবে।... দাদা, রাগ ক'রোনা, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়।... ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া।... দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়ে দেবে; সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব।... তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি ক'রে দাও দেখি।... দাদা, মায়েব কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওই খানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন. যা হয় বলো, দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।"[৪]

নরেনের বীরহৃদয়ে শ্রীমা তাঁর সমগ্র মাতৃত্ব নিয়ে প্রকাশিতা হয়েছিলেন। তিনি নিজেই এ কাজটি সংগোপনে করেছিলেন, নাকি নরেন তাঁর আকাশসম প্রশস্ত হৃদয় আগে থেকেই শ্রীমায়ের পদকমল ধারণ করার জন্য প্রস্তুত রেখেছিলেন, তার কোনও ইঙ্গিত আমরা পাইনি। তবে সম্ভাবনার দ্বার নিশ্চিতভাবে দুদিক থেকেই উন্মুক্ত ছিল। 'সত্যিকারের মা' তাঁর 'সত্যিকারের ছেলে'র হৃদয়ে অবলীলায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এর জন্য কোনও জপ-তপ, যাগ-যজ্ঞ করতে হয়নি। বিশ্বজুড়ে শ্রীমায়ের ঈশ-মাতৃত্বের স্ফুরণ নরেন প্রথম ও স্পষ্ট অনুভব করেছেন। তাই তাঁর ঘোষণা অকম্পিত। অন্য গুরুভ্রাতাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভবের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছে। আবার তাঁদের সেই শূন্যতার প্রতি তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত করতেও তিনি স্পষ্টবাক্।

তাঁর সমস্ত উপলব্ধি ও অনুভব দিয়ে মাকে 'চিনতে' পেরেই নরেন্দ্র ক্ষান্ত থাকেননি। যখন প্রব্রজ্যা নিয়ে ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ধুলোয় ধুলোয় ঘুরছেন, তখন থেকেই তিনি শ্রীমাকে নিয়ে ভাবছেন, চৈতন্যে-চিন্তায় তাঁকে সর্বক্ষণ বয়ে বেড়াচ্ছেন, সবার উপরে মাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। নরেন্দ্র একথা মর্মে-মর্মে জানতেন তাঁর সমস্ত কর্মৈষণার আশিস-উৎস হচ্ছেন শ্রীমা। অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপন করতে এসে নরেনকে যন্ত্ররূপে রেখে গেছেন। মহাসমাধির আগে, "ঠাকুর নরেনকে দিয়েছিলেন জীবকে শিক্ষা দিবার চাপরাশ, আর দিয়েছিলেন জীবের দুঃখ দূর করার জীবনব্রত। পরম গুরুভক্ত ব্রতৈকাগ্রমানস নরেন কী অপূর্ব নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে গুরুর আদেশ পালন করে, মানুষের অমেয় কল্যাণসাধন করে গেছেন ও করে চলেছেন, তা সুবিদিত।"[৫]

নরেন্দ্র-বিবেকানন্দের সেই যুগান্তকারী আত্ম-বিসর্জনের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। নরেন জগতকে চিরঋণী করে রেখে গেছেন। তবে নরেন নিজে

জানতেন, তিনি কিন্তু অনৃণ্য নন। একজনের কাছে তাঁর ঋণ অপরিসীম। সেই একজন আর কেউ নন, তিনি শ্রীমা সারদা। নরেনের সবটা জীবনব্রতই যে শ্রীমায়ের স্নেহাঙ্গনে লালিত, বর্ধিত, স্নিগ্ধ ও সার্থক হয়েছিল, এ তথ্য ও তত্ত্ব বিবেকানন্দ-মহিমায় মুগ্ধ সাধারণ জনগণ না জানলেও, নরেন নিজের আত্মার অঙ্গীকারে তা জানতেন। মুক্তকণ্ঠে তাই তাঁর বলতে বাধেনি : "রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ।"[৬]

দূরদেশ থেকে যখনই অন্তরঙ্গদের পত্র লিখেছেন, বিশেষত বাংলাভাষায় লেখা পত্রগুচ্ছে, বিদ্যুৎঝলকের মতো চিত্রায়িত করেছেন শ্রীমায়ের প্রসঙ্গ। যখন শ্রীমা এসেছেন অনেক বাক্য জুড়ে তখন নরেনের চিঠি যেন মাতৃময়। আবার যখন সামান্য কয়েকটি শব্দে কিংবা একটি-দুটি বাক্যে মাতৃপ্রসঙ্গ অঙ্কিত হয়েছে, তখনও তা দীপ্ত, দীপ্র অগ্নিমালিকা। যেমন, "মা-ঠাকুরাণীকে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্বাদে আমার সর্বতোমঙ্গল।"[৭] কিংবা "যাঁর ...মা-ঠাকুরানীতে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙলা বললুম, মনে রেখো।"[৮]

বিবেকানন্দ আজন্ম স্বপ্নদ্রষ্টা মহাপ্রাণ, আমৃত্যু স্বপ্নভাবনার বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এমন মহামানব আধুনিক ভারতে বিরল। তাঁর সমগ্র জীবন, যার ব্যাপ্তিমন্ত্র উনচল্লিশ বছর কয়েকমাস, সর্বতোভাবে, সর্বদিক থেকেই স্বপ্নময়। জগৎ ও জীবনকে ঘিরে এত স্বপ্ন তিনি নির্মাণ করেছেন, যা হিমালয়ের উচ্চতাকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন-প্রত্যাশা, স্বপ্ন-কল্পনা এক জায়গায় জড়ো করলে গভীর বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে আসে। একথা ঠিক, তাঁর সমস্ত স্বপ্নই যে ইতিমধ্যে আকৃতি পেয়েছে, তা নয়। এখনও আমরা বিবেকানন্দের বহু স্বপ্ন-সম্ভাবনার ইঙ্গিত বুঝতেই পারিনি, কার্যে পরিণত করা তো দূরের কথা! তবে অনেক ক্ষেত্রেই সেই চেষ্টা অব্যাহত আছে, হয়তো আরও কয়েকশো বছর লেগে যাবে বিবেকানন্দের সমস্ত স্বপ্ন মূর্ত করে তুলতে।

নিবেদিতাকে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "Dreams, oh! dreams! Dream on! Dream, the magic of dream, is the cause of this life, it is also the remedy. Dream, dream, only dream! Kill dream by dream."[৯]—স্বপ্ন, আহা! স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখে চল। স্বপ্ন—স্বপ্নের ইন্দ্রজালই এ-জীবনের হেতু—স্বপ্নেই তার লয়। স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন! স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন ভাঙো!

এমন আত্মদর্শী উক্তি কেবল তিনিই করতে পারতেন। তাঁর সমগ্র চিন্তাভাবনার মধ্যে স্বপ্নের বীজ পোঁতা আছে। তাঁর ভাষণ, রচনা ও চিঠিপত্র পড়তে পড়তে স্বতই মনে হয় বিবেকানন্দের স্বপ্ন যে-কোনও মুহূর্তে অঙ্কুরিত হবে। তারপর চক্ষের পলকে তা হয়ে উঠবে মহীরুহ। সেই মহীরুহের অজস্র শাখা-প্রশাখা। সবুজ-শ্যামল পত্রসম্ভারে পূর্ণ, স্বপ্নজাত সেই মহাবৃক্ষের পদতলে, সমগ্র পৃথিবী আশ্রয় নেবে।

স্বপ্নপ্রাণ বিবেকানন্দ সাধ্যের কথা ভাবেননি। তাঁর স্বপ্নসাধ কবে, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে তিনি হয়তো স্থিরনিশ্চিত নন। এমনকি বুঝতে পারছেন সামনে অনেক বাধা, সংকট, সমস্যা। কিন্তু তাঁর কাছে কোনও কিছুই অনতিক্রম্য নয়। নিজের অন্তরাত্মার ভেতরে যে-শক্তি তাঁর জন্মগত, সেই শক্তিকে সম্বল করে তিনি স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন, একদিন না একদিন অভীষ্ট লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাবেন। পথ যতই দীর্ঘ এবং কণ্টকাকীর্ণ হোক না কেন। এই আত্মবিশ্বাসই তাঁকে শ্রেষ্ঠ স্বপ্নসন্ধানী করে

তুলেছিল। তিনি জানতেন : পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। এ তাঁর নিজেরই কথা। নিজের জীবন দিয়ে এই উক্তির সারবত্তা তিনি প্রমাণ করে গেছেন।

গুরুপত্নী শ্রীসারদাকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী ও কিছু গৃহী ভক্ত যখন দোলাচলে ভুগছেন, নরেনের অন্তরে তখন শ্রীমায়ের স্বরূপটি পূর্ণ প্রকাশিত। মাকে নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় নেই, অনিশ্চয়তা নেই। কেননা তিনি স্পষ্ট জানতেন, শ্রীমা সকল সন্তানের জীবনে এক অনন্ত আশীর্বাদিকা শক্তি। মায়ের আশীর্বাদের জোরে সব হবে, সবকিছু হতেই হবে।

আঠারোশো তিরানব্বইয়ে বিশ্বজয়ের পর নরেন্দ্র তাঁর স্বপ্নভাবনার যেসব নিবিড় ইঙ্গিত চিঠিপত্রে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে মাকে নিয়ে নরেনের চিন্তা অন্তহীন। শ্রীমায়ের তখনও কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই। তিনি কখনও শ্বশুরের ভিটেয়, কখনও জন্মস্থানে, কখনও তীর্থে, কখনও বলরাম বসুর বাড়িতে, কখনও বা হাওড়া-কলকাতার বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে অবস্থান করছেন। মায়ের এই নিয়ত স্থানবদল, বাসাবদলে নরেন স্থির হতে পারছেন না। যিনি তাঁর সকল কৃতী-অকৃতী সন্তানকে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, তিনিই এমন নিরাশ্রয়া! অতএব মায়ের নিজস্ব গৃহমন্দির না হওয়া পর্যন্ত নরেন স্বস্তি পাবেন কী করে। কেননা তিনি মর্মে-মর্মে জেনেছিলেন : "জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে; কারণ কেবল এই অবস্থাতেই মানুষ চরম নিঃস্বার্থপরতা আয়ত্ত করিতে ও কার্যে প্রকাশ করিতে পারে।"[১০]

'মায়ের স্থান' যেখানে সকলের ওপরে, সেখানে নরেনের আপন মায়ের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুই নেই। এ অসম্ভবকে বিবেকানন্দ মানতে পারেননি। তাই আঠারোশো চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বইয়ের ভেতর লেখা অন্তত সাতটি চিঠিতে মায়ের একটি নিজস্ব বাড়ির জন্য, এক খণ্ড জমির জন্য নরেনের তীব্র আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

এক : "প্রথমে মাতাঠাকুরানীর জন্য একটি জায়গা করবার দৃঢ়সংকল্প করেছি... যদি মায়ের বাড়িটি প্রথমে ঠিক হয়ে যায়, তা হ'লে আর আমি কোন কিছুর জন্য ভাবি না।... মায়ের জমিটা যেমন করেছ, অমনি আমি হুপ্ ক'রে আসছি আর কি। জমিটা বড় চাই, building (বাড়ি) আপাততঃ মাটির ঘর ভাল, ক্রমে ভাল building (পাকাবাড়ি) তুলব, চিন্তা নাই।"[১১] (১৮৯৪, শিবানন্দকে লেখা)

দুই : "মা-ঠাকুরানীর জন্য জমি খরিদ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবে—অর্থাৎ বিল্ডিং আপাতত মাটির হউক, পরে দেখা যাইবে। কিন্তু জমিটা প্রশস্ত চাই। কি প্রকারে কাহাকে টাকা পাঠাইব, সমস্ত সন্ধান করিয়া লিখিবে।" (১৮৯৪, ব্রহ্মানন্দকে লেখা)

তিন : "মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা খাড়া করতে পারলে তখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্তি। বুঝতে পারিস? দুই তিন হাজার টাকার মতো একটা জায়গা দেখ। জায়গাটা বড় চাই। আপাততঃ মেটে ঘর, কালে তার উপর অট্টালিকা খাড়া হয়ে যাবে। যত শীঘ্র পার জায়গা দেখ। আমাকে চিঠি লিখবে।... যত শীঘ্র পার ঐ কাজটা হওয়া চাই। ঐটি হ'লে বস, আদ্দেক হাঁপ ছাড়ি। জায়গাটা বড় চাই, তারপর দেখা যাবে। আমাদের জন্য চিন্তা নাই, ধীরে ধীরে সব হবে। কলকাতার যত কাছে হয় ততই ভাল। একবার জায়গা হ'লে মা-ঠাকুরানীকে centre (কেন্দ্র) ক'রে গৌর-মা, গোলাপ-মা, একটা বেড়োল হুজুগ মাচিয়ে দিক।"[১২] (১৮৯৪, রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা)

চার : "পূর্বের পত্রে লিখিয়াছি যে, তোমরা মা-ঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা স্থির করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। যত শীঘ্র পারো।"[১৩] (১৮৯৪, রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা)

পাঁচ : "মা-ঠাকুরানীর জন্য পত্রপাঠ জায়গা অনুসন্ধান করিবে।... একটা বড় জমি প্রথমে চাই; তারপর বাড়ি ঘর সব হবে। আমাদের মঠ (সন্ন্যাসীদের মঠ) ধীরে ধীরে হবে, ভাবনা নাই।"[১৪] (১৮৯৫, রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা)

ছয় : "যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক; বাকি কাউকে আমি চাই না, মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ ক'রে সেইটি ক'রে দেবে—মাঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা। আমার টাকাকড়ি সব মজুত; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো। জমির জন্য ৩।৪ অথবা ৫ হাজার পর্যন্ত লাগে তো ক্ষতি নাই। ঘর-দ্বার এক্ষণে মাটির ভাল। একতলা কোঠার চেয়ে মাটির ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর-দ্বার ধীরে ধীরে উঠবে।"[১৫] (১৮৯৫, ব্রহ্মানন্দকে লেখা)

সাত : "মা-ঠাকুরানীর জন্য জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে ক'রব।... মা-ঠাকুরাণীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত।"[১৬] (১৮৯৫, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে লেখা)

নরেনের কাছে, মাতৃমন্দির নির্মাণ তখন যেন প্রধানতম কাজ। কী গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি গুরুভাইদের কাছে উত্থাপিত করছেন। সেইসঙ্গে মিশে আছে তাঁর আকুলতা, গভীরতম ব্যাকুলতা। যেভাবেই হোক তাঁর এই স্বপ্নসম্ভব আরব্ধ কাজটি হওয়া চাই, এবং যত শীঘ্র সম্ভব।

এই চিঠিগুলির ভেতরে উপ্ত হয়ে আছে মাকে ঘিরে নরেনের আব একটি উচ্চ স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের নাম 'মাতাঠাকুরানীর মঠ।' শুধু মায়ের জন্য একটি মেটে বাড়ি কি সুবিস্তৃত জায়গাই নয়, নরেন একই সঙ্গে চেয়েছিলেন মায়ের মঠ। শ্রীমার জন্য একটি ছোটো বাড়ি হলেই তো নরেনের স্বপ্ন পূর্ণ হয়ে যেত। অথচ তিনি একই সঙ্গে চাইছেন মায়ের মঠ। কেন? এমনকি, রামকৃষ্ণ মঠ বা সঙ্ঘস্থাপনের আগে তাঁর আদিজন্ম কল্পনায় ভাসছে মায়ের মঠের চিত্ররূপ। আবারও প্রশ্ন, কেন?

সব প্রশ্নের উত্তর নরেন নিজেই দিয়েছেন তাঁর অননুকরণীয় শব্দশৈলীতে : "আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে।"[১৭] এই মহান কার্য সম্পাদনের জন্য নরেনের তাই দৃঢ়প্রত্যয়ী উক্তি, "তাঁর মঠ **প্রথমে** [স্থূলাক্ষর স্বামীজীকৃত] চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে!... আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার কি?... দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার ক'রে লড়াই ক'রে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে। ...আমাদের মঠের চিন্তা নাই, আমি দেশে গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রব।"[১৮]

শিবানন্দকে লেখা আঠারোশো চুরানব্বইয়ের চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় নরেন তাঁর এই স্বপ্ন

ব্যক্ত করেছিলেন। যদিও নানা ঘটনাগতিকে আঠারোশো সাতানব্বইয়ে রামকৃষ্ণ মিশন এবং আটানব্বইয়ে রামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড়) প্রতিষ্ঠিত হলেও, নরেন্দ্রের পক্ষে তখনও শ্রীমায়ের জন্য স্থায়ী কোনও গৃহমন্দির কিংবা মঠ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার মানে এই নয়, বিবেকানন্দ তাঁর স্বপ্নকে মুছে ফেলেছিলেন, কিংবা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অন্তরে তখনও মায়ের মঠের স্বপ্ন কল্পনা আরও গাঢ়, আরও বহুবর্ণী।

শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত কথোপকথনে, উনিশশো এক সালের জুন মাসে তিনি পুনরায় বলেছিলেন : "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ—সে-জাত কখনও বড় হ'তে পারেনি, কস্মিন্ কালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এই-সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা। মনু বলেছেন, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।/ যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥' যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের— সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই। এ-জন্য এদের আগে তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।... এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) ক'রে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁদের central figure (কেন্দ্রস্বরূপা) হয়ে বসবেন।"[১৯]

স্বামীজীর স্বপ্নের উচ্চশিখরটি দেখার মানসেই সবিনয়ে প্রিয় শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন, "মহাশয়, মেয়েদের জন্য কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।"[২০]

এর উত্তরে বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন, তা তাঁরই সেই স্বপ্নময় উক্তির অনুকরণ—'স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন।' মায়ের প্রতি নরেনের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শরণাগতির গভীরতা বুঝি খানিকটা মাপা যায় তাঁর দেওয়া এই উত্তরে। সমগ্র নারীসমাজ ও নারীশক্তির প্রতি বিবেকানন্দের গভীর আস্থা ও আকাঙ্ক্ষার আর এক বাণীরূপ তাঁর এই উত্তর। স্বপ্ন তো বটেই, কিন্তু তারই ভেতর একটি সুনির্দিষ্ট এবং সর্বতোমুখী, জীবনাভিসারী পরিকল্পনা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন : "গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরস্তের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না, পুরুষ-মঠের বয়োবৃদ্ধ সাধুরা দূর থেকে স্ত্রী-মঠের কার্যভার চালাবে। স্ত্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্কুল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ চাই কি—অল্পবিস্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূলবিষয়গুলিও শেখানো হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব তো শিক্ষার অঙ্গ থাকবেই। যারা বাড়ি ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের অন্নবস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রীরূপে এসে পড়াশোনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকতে এবং যতদিন থাকবে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচাবিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫/৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পারবে। যোগ্যাধিকারিণী ব'লে বিবেচিত হলে অভিভাবকদের মত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী ব্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই

মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপন্না, ওইরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম এখানকার ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবন ব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস করবে? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হ'লে তবে তো তোদের দেশে সীতা, সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে।"[২১]

এই রচনায় আমরা নরেনের স্বপ্নসমূহকে মহাবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছি। বাস্তবিক শ্রীমাকে কেন্দ্র করে নরেন স্ত্রীমঠের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা একটি স্বতন্ত্র মহীরুহ। প্রতিটি চিন্তা জীবনমুখী, বিজ্ঞানসম্মত। পারম্পর্যে গঠিত। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে একটি নবীন নারীর জীবনাদর্শ কীভাবে গঠিত হওয়া উচিত, তার জীবনচর্যা কোন শুভবোধের দ্বারা লালিত হওয়া উচিত, স্নেহ ও সেবা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, শিক্ষা ও সংকল্প এবং অভিজ্ঞান কেমনটি হলে একটি বালিকা কি শিশুকন্যা পূর্ণতমা নারীতে পরিণত হতে পারবে—সে সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই চিন্তাস্রোত, স্বপ্নপ্রবাহ এতটাই বাস্তবসম্মত যে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অবান্তর।

একই সঙ্গে আমরা মনে রাখব, নারীর জীবনাদর্শ গঠনের যে-পথনির্দেশ বিবেকানন্দ সেদিন শিষ্যকে জানিয়েছিলেন, তার প্রায় সবটাই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীমায়ের জীবনযাপনে। তাই সবসময় তাঁর মনে হয়েছে, শ্রীমা স্বপ্নলব্ধ স্ত্রীমঠের কেন্দ্রস্বরূপা হয়ে বিরাজ কববেন। কেননা তিনিই একমাত্র উপমা, একমাত্র 'মডেল', একমাত্র অনুকরণীয় চিরাদর্শ। এই মাতৃমান্যতা ছাড়া নতুন যুগের মেয়েদের আর কোনও উপায় নেই।

মায়ের নরেন একথা মনেপ্রাণে সূর্যালোকের মতো সত্য বলে জানতেন যে, "...পবিত্রতাস্বরূপিণী সারদা দেবীর জীবনের মধ্য দিয়ে ভাবতীয় নারীর মহান আদর্শ পুনরুদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। একদিকে তিনি স্বকীয় জীবন দ্বারা বহু প্রাচীন রীতিনীতির সার্থকতা প্রমাণ করেছেন, অন্যদিকে আবার আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির মধ্যে যা-কিছু কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাযুক্ত, প্রচণ্ড বলিষ্ঠতার সাথে তা পরিহার করেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় নারী-সংস্কৃতির যা-কিছু শিব ও সুন্দর তা এই যুগে তুলে ধয়েছেন.. তিনি প্রাচীন ও নবীন নারী-ঐতিহ্যের সংযোগসেতুরূপে যেন আবির্ভূতা হয়েছেন।"[২২] অতএব নরেনের স্বপ্নে স্ত্রীমঠের প্রাণতপস্যার প্রধান অবলম্বন শ্রীমায়ের জীবনচর্যা, মায়ের জীবনে আচরিত শুদ্ধ জীবনযাপনের নির্যাস।

একথা ঠিক, তাঁর স্বল্পনির্দিষ্ট জীবনে নরেন মায়ের মঠ কিংবা মায়ের বাড়ি নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। সহস্র কর্মপ্রবাহ এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের ফলে। নরেন আরও উদ্যোগী ও উদ্যমী হতে পারেননি সেদিন। এ আক্ষেপ যাওয়ার নয়। আবার পাশাপাশি একথাও ঠিক, নরেন মাকে নিয়ে আকুল হয়ে থাকলেও ব্রত উদ্‌যাপনের সাময়িক ব্যর্থতায় কখনও হতাশ হননি। বরং তিনি একথা বিশ্বাস করতেন, শ্রীমা "তাঁর যেমন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, তিনি সেভাবেই তাঁর মিশন চরিতার্থ করবেন।"

মায়ের আর এক প্রিয় সন্তান স্বামী সারদানন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ি' নির্মিত হয়েছিল উনিশশো নয় সালে, আর উনিশশো চুয়ান্ন

সালে নরেনের মহাপ্রয়াণের বাহান্ন বছর পর শ্রীমায়ের 'মিশন চরিতার্থ' হয়েছিল শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক মুহূর্তে। নরেনের স্বপ্নোৎসারিত মায়ের মঠ ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্য-নিষ্ঠা ও গভীর আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে এক দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেদিন স্থূলশরীরে মা কিংবা মায়ের ছেলে—কেউই ছিলেন না। ছেলের স্বপ্ন এতদিনে সাকার হল দেখে বিশ্বজননী নিশ্চিত তাঁর পরিশুদ্ধতম অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। আর নরেন অবশ্যই রামকৃষ্ণলোক থেকে দেখেছেন তাঁর জীবনে মায়ের আশীর্বাদ চির-অক্ষয়। তার কোনও লয়-পথ নেই, যুগ-যুগান্ত নেই, কালভেদ নেই। সর্বকালে সর্বলোকে মায়ের এই আশীর্বাদ ছড়িয়ে আছে: "তুমি নিশ্চিত জেনো, ঠাকুর তোমার আকাঙ্ক্ষা অচিরেই পূর্ণ করবেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।"[২৩]

নরেন একদিন 'জ্যান্ত দুর্গা'র পূজা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই অভিনব 'দুর্গোৎসব'-এর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়নি। সেই উৎসব বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০৯) এবং অর্ধশতকের (১৯৫৪) সামান্য পরে সেই যে শুরু হয়েছিল, তা আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে পালিত হচ্ছে। সেই উৎসব অঙ্গন থেকে আবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের চিরন্তনী, পাবনী, 'জ্যান্ত দুর্গা' মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, নিঃসংশয় আশ্বাস : "আমি মা, জগতের মা, সকলের মা।... আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি?"

শুধু কি আমারই দায়, তোমারও দায়

স্বামী বলভদ্রানন্দ

শিরোনামের কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের। যাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন তিনি সারদা দেবী। বহু পরিচিত কথা। কিন্তু এর তাৎপর্য ও মাধুর্য বহু-শ্রুতির জন্য শেষ হওয়ার নয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে এই উক্তির প্রাসঙ্গিক অংশটি যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তা থেকে মনে হয় ঠাকুর এই কথাগুলি বলেছিলেন কাশীপুর পর্বের আগে এবং একবার নয়, একাধিকবার। কাশীপুরে ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।" এই ঘটনার উল্লেখ করে গম্ভীরানন্দ মহারাজ বলেছেন, "ইহারও পূর্বে ঠাকুর সুর করিয়া গাইতেন—

'এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়,
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?
হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া একি দায়!' "

আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমাকে সজাগ করিয়া দিতেন, "শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।"[১]

কী দায় শ্রীরামকৃষ্ণের? অবতারের মূল দায়ই হল যুগধর্ম প্রতিষ্ঠা। সেই দায়িত্ব-পালনেরই প্রকাশ ঘটে তাঁর অন্যান্য কাজকর্মে। এই প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে গীতার বহু-কথিত শ্লোকগুলি যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-অবতাররূপে ভগবান তাঁর বারবার অবতরণের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুদয় হয়, সজ্জনেরা বিপন্ন বোধ করেন ও দুর্জনের দৌরাত্ম্য বেড়ে ওঠে তখন ধর্মের স্থাপনার জন্য ভগবান নরদেহ ধারণ করে আসেন।[২] ভগবানের এই দেহধারণ আমাদের মতো মায়ার অধীন হয়ে কর্মফল ভোগ করার জন্য নয়। আমরা মায়াধীন, ভগবান মায়াধীশ। তাঁর বারবার দেহধারণের যে কারণ, তা জীবের বারবার দেহধারণের কারণের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাহলে কোন প্রেরণায় ভগবান দেহ ধারণ করেন? শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যের শুরুতেই তা সুন্দরভাবে বলেছেন, 'স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ-জিঘৃক্ষয়া'[৩] তাঁর নিজের কোনও প্রয়োজন নেই দেহধারণ করার। তা সত্ত্বেও তিনি যে দেহধারণ করে আসেন, তার কারণ ভূতানুগ্রহ। বিশ্বের প্রাণিকুলকে অনুগ্রহ করার প্রবল ইচ্ছাই ভগবানের নরদেহ-ধারণের একমাত্র প্রেরণা, অবতারের অবতরণের কারণই হল প্রেম।

আবার চণ্ডীতেও ভগবতী বলেছেন, "যখনই জগতে দানব বা দুর্জনদের কাছ থেকে বাধার উৎপত্তি হবে, তখনই তিনি নিজেকে প্রকট করবেন শত্রুনাশের জন্য।"[৪]

তাই ভগবান যেমন যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, শক্তিরূপিণী ভগবতীও তেমনি বারবার অবতীর্ণ হন কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো। এই ধারাতেই পূর্ব পূর্ব যুগে এসেছেন রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাধারানী, চৈতন্যদেবের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা দেবীর আবির্ভাব তাই কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। ব্যতিক্রমী ঘটনা এইটিই যে, এবারের লীলায় ভগবতীও প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় যুগাবতারের যুগধর্মস্থাপনে। রামকৃষ্ণ-সারদা লীলা ভগবান ও ভগবতীর যুগ্ম অবতার-লীলা। অবতারের সঙ্গে নিত্যযুক্তা ও অবতারের নিত্য-অনুসারিণী হয়েও অবতার-সঙ্গিনীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এই লীলায় সুস্পষ্ট। এই লীলায় উভয়েরই প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, একে অন্যের পরিপূরক এবং একের দায় অন্যেরও দায়। এই দায় অর্পণ ও গ্রহণের পালা শুরু হয়েছিল কাশীপুর-পর্বের অনেক আগে—শ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আসারও আগে, কামারপুকুরেই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কাজ শুরু করেছিলেন জ্ঞাতসারে, ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্টভাবে চোখের সামনে রেখে, কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে দায়-গ্রহণের পর্ব শুরু হয়েছিল সম্ভবত নিজেরও অজ্ঞাতসারে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা ছাড়া তার অন্য কোনও তাৎপর্য তখন মায়ের কাছে প্রতিভাত হয়নি বলেই মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে তাঁরই 'মুখাপেক্ষিণী কিশোরীর হৃদয়' ভালোবাসার দ্বারা জয় করে নিয়েছিলেন, তারপর শ্রীমার সেই সর্বসমর্পিত বিশ্বাসী হৃদয়ে তাঁর 'আপন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানরাশি' অকুণ্ঠচিত্তে ঢেলে দিয়েছিলেন।[৫] যেমন তাঁকে শিখিয়েছেন আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি, তেমনি শিখিয়েছেন সাংসারিক ব্যাপারের খুঁটিনাটি। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই জানতেন, যুগধর্মস্থাপনের জন্য সারদা দেবীকে অবস্থান করতে হবে সংসার আশ্রমে—যে-সংসারের দাবি আর যে-কোনও গৃহস্থের সংসারের মতোই রূঢ় ও নির্মম, হয়তো বা আরও বেশি। তাই রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতে হয় তা যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে শিখিয়েছেন, তেমনি শিখিয়েছেন প্রদীপের সলতেটি কেমন করে রাখতে হয় তা-ও।

এরপর মায়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমন। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখছেন, "দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের আগমনের পর হইতে একটি বিষয় ক্রমেই স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল—শিক্ষা, দীক্ষা, উদ্দীপনা ইত্যাদি অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রমেই স্বীয় ভাবধারার পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত আধার করিয়া তুলিতেছিলেন।"[৫] দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" আবার ঠাকুরও শ্রীশ্রীমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, "কি গো তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?" বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে মা উত্তর দিয়েছিলেন, "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।"[৬] এ যেন উভয়ে উভয়কে পরীক্ষা করলেন। যেন বাজিয়ে দেখে নিলেন—যে যৌথ দায়িত্ব পরে মাথায় তুলে নিতে হবে, তার জন্য একে অন্যের প্রতি কতটা দায়বদ্ধ।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে গৃহকর্ম, আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ব্যবহার, অপরের গৃহে আচরণ ইত্যাদি সাংসারিক শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে ভজন-কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুই শিখিয়েছিলেন। তিনি শুধু ওইসব বিষয়ে মৌখিক

উপদেশ দিয়েই নিশ্চিন্ত হতেন না, শ্রীমা নিজের জীবনে কতটা ওইগুলি আচরণ করেছেন, তারও খোঁজ রাখতেন। সাধনভজন সম্বন্ধে তিনি এতই কঠোর ছিলেন যে ভোর তিনটের সময়ই নহবতের কাছে এসে মা ও লক্ষ্মীদিদিকে ঘুম থেকে তুলে দিতেন, ঘুম না ভাঙলে দরজার নিচ দিয়ে জল ঢেলে দিতেন। একদিন ঠাকুর নিজের হাতে ষট্‌চক্র এঁকে মাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর একদিন মায়ের জিভে 'কিছু একটা' লিখে দিয়েছিলেন। আর একদিন মা ও লক্ষ্মীদিদিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা বর্ণনা করে ঠাকুর বলেছিলেন, "আমার কাছে যা সব শুনলি, তোরা দুজনে বলাবলি করবি গরুগুলো দিনের বেলায় যা সব খায়, রাত্রে সেগুলো জাবর কাটে। তুই আর তোর খুড়ী দুজনে বলাবলি করবি। তাহলে কৃষ্ণের এসব লীলাকথা আর ভুলে যাবি না—বেশ মনে থাকবে।"[৭]

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও নিত্য-সান্নিধ্যগুণে ধর্মজগতের এক-একটি দিগন্ত যেমন শ্রীমায়ের কাছে খুলে যাচ্ছিল, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের গভীরতা ও তাৎপর্যও তাঁর কাছে ক্রমশ ব্যাপকতর হয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর নিজ জীবনের উদ্দেশ্যও যে মহৎ ও বৃহৎ, তা-ও নিশ্চয়ই তিনি ক্রমশ বুঝে উঠতে লাগলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে কিশোরী সারদা দেবী ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার উত্তরাধিকারিণীরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। তাঁর মানসজগতে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। তিনি যে এক 'সোনার মানুষ'কে[৮] নিজের স্বামী, অভিভাবক ও একমাত্র অবলম্বনরূপে পেয়েছেন, এই অনুভূতি তাঁকে এক দিব্য আনন্দে সবসময়ের জন্য ভরিয়ে তুলল। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর অনুপম ভাষায় লিখেছেন, (ঠাকুরের সাহচর্যজনিত) "পূর্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার (মাতাঠাকুরাণীর) চলন-বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর একটা পরিবর্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কারণ উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টি-নিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্ন করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল।"[৯] ভবিষ্যতে যিনি পাপী-পুণ্যবান, সাধু-অসাধু-নির্বিশেষে জগতের সকলের 'সত্যজননী' হয়ে উঠবেন, তিনি এইভাবেই নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে শান্ত অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। শ্রীমায়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী (ত্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা) পূজার মাধ্যমে সারদাপ্রতিমায় দেবীত্বের বোধন ঘটিয়েছিলেন। যুগাবতারের 'শক্তি' যাতে নিদ্রিত না থেকে তাঁর লোকসংগ্রহ-কার্যে সক্রিয় হয়ে ওঠেন, তার জন্য স্বয়ং যুগাবতারই এগিয়ে আসেন দেবীর আবাহনে। জগতের ধর্ম-ইতিহাসে এই ঘটনা এই প্রথম। "ক্ষুদ্র বালিকাকে ঠাকুর পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কামারপুকুরে অবস্থানের সুযোগে তাঁহাকে দিব্যপ্রেমের আস্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর ও দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে লৌকিক ও দেবজীবনোচিত অপূর্ব সম্পদরাশিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ...যাঁহাকে ঠাকুর অতঃপর স্বীয় লীলা সম্পূরণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাঁহাকে অন্তরের পূজা প্রদানপূর্বক নিজসকাশে ও জনসমাজে সম্মানিত ও মহিমমণ্ডিত এবং সেই দেবীকে স্বীয় শক্তিবিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজন ছিল। এইজন্যই ষোড়শীপূজার আয়োজন।"[১০] অর্থাৎ ভবিষ্যতের দায়িত্বভার

গ্রহণের পূর্ণ যোগ্যতা শ্রীমায়ের আছে, এই আত্মবিশ্বাস মায়ের মধ্যে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন যেমন ছিল, তেমনি প্রয়োজন ছিল জগতের লোককেও শ্রীমার সেই যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী করে তোলার। ষোড়শী পূজার প্রধান উদ্দেশ্য এই দুটিই। এই পূজার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে, নিজের সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি 'সর্বস্ব দেবীর (অর্থাৎ ষোড়শী জ্ঞানে পূজিতা শ্রীমায়ের) শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিসর্জন' দিয়েছিলেন এবং পূজার সময় তিনি দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেছিলেন, "ইঁহার (অর্থাৎ শ্রীমায়ের) শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।" 'সর্বকল্যাণ' কথাটি লক্ষণীয়।

ষোড়শী পূজার ফলে দেবী উদ্বোধিতা হলেন, কিন্তু তখনই তাঁর পূর্ণস্বরূপে জাগরিতা হলেন না। তা না হওয়া পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাম নেই। কারণ, যুগাবতারের আরব্ধ কার্যের ভার নিতে গেলে শ্রীমাকে নিজের স্বরূপ ও শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হতেই হবে। তাই লীলাবসানের আগের কয়েকটি বছরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেই চেষ্টাই পরিকল্পিত ধারায় করে গেছেন। একদিকে যেমন তিনি তাঁর কথায় ও আচরণে, সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে শ্রীমাকে তাঁর দেবীত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়েছেন, তেমনি স্বীয় ভক্তদেরও মায়ের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন সময় শ্রীমা সম্বন্ধে শ্রীবামকৃষ্ণ বলেছেন, "ও কি যে সে! ও আমার শক্তি!"[১১] "ও (শ্রীমা) সারদা—সবস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"[১২] হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করত। অভ্যাসবশে একদিন শ্রীমায়ের সঙ্গেও রূঢ় ব্যবহার করে বসলে তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন তিনি স্বয়ং যদি রুষ্ট হন, হৃদয় রক্ষা পেলেও পেতে পারে, কিন্তু শ্রীমার ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও তাকে বক্ষা করতে পারবে না। অন্য এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "নহবতে যে আছে সে যদি কোনও কাবণে কারও উপর বিরূপ হয় তো তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যাতীত।"[১৩] শ্রীমায়ের প্রতি তাঁর নিজের আচরণেও সবসময়ের জন্য একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটে উঠত। একবার তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর কোনও একটা কথায় শ্রীমা মনে কষ্ট পেয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে তিনি ভাইপো রামলালকে বলেছিলেন, "যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগ করলে (নিজেকে দেখাইয়া) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।"[১৪] আবাব দেখি, ভুল করে ভাইঝি লক্ষ্মীদিদি ভেবে মাকে 'তুই' বলে ফেলেছেন ঠাকুর এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভুল সংশোধনও করে নিয়েছেন। তবু তিনি সারারাত ঘুমোতে পারেননি। সকাল হতেই নহবতে মায়ের কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বলেছেন, "দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয়নি, ভেবে ভেবে—কেন এমন রূঢ় বাক্য বলে ফেললুম।"[১৫] নিজের আচরণ দিয়ে ঠাকুর জগতকে বুঝিয়ে দিলেন, সারদা দেবীরূপে যে মহাশক্তি জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁকে অনিচ্ছাকৃতভাবেও সামান্যতম অবজ্ঞা করা যায় না। শ্রীমা তথা জগদ্‌বাসীর কাছে এইভাবেই ঠাকুর সারদা-মহিমা পরিস্ফুট করে দিচ্ছিলেন—যাতে সারদা দেবী শীঘ্র তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং জগতের লোকও বিনা দ্বিধায় সসম্ভ্রমে তাঁকে সেই ভূমিকায় বরণ করে নেয়।

এইসময় ঠাকুর শ্রীমায়ের গুরুশক্তিকেও জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। সারদা দেবী শুধুই লোকজননীরূপে বিরাজ করবেন না, তিনি হবেন জ্ঞানদায়িনী। মাতৃত্বের আবরণে চিরন্তন পারমার্থিক জ্ঞানদানই হবে তাঁর ভাবী জীবনের ব্রত। ঠাকুর তাই নিজের সাধনার দ্বারা

উজ্জীবিত বহু মন্ত্র মাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন এবং কোন অধিকারীর জন্য কোন মন্ত্র উপযুক্ত, তাও বলে দিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে মা জনৈক সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন, "এসব ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র, তিনি আমাকে দিয়েছিলেন—সিদ্ধমন্ত্র।"[১৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সারদা দেবীকে দীর্ঘসময় ধরে তাঁর দায়-সমর্পণের জন্য গড়ে তুলছিলেন, সারদা দেবীও নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন সেই দায়-গ্রহণের জন্য। তফাৎ হল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাজ করছিলেন জ্ঞাতসারে, আর সারদা দেবী তাঁর ভূমিকার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন অনেকটাই অজ্ঞাতসারে, শ্রীরামকৃষ্ণ-নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির যন্ত্ররূপে। (মা যখন আপন ভূমিকায় পূর্ণ প্রভায় বিরাজমানা তখনও তাঁর মনোভাব ছিল তা-ই, ঠাকুরই সব—তিনি তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র।) মা ঠাকুরকে বলেছিলেন, তিনি তাঁর জীবনে এসেছেন তাঁর 'ইষ্টপথে' সাহায্য করতে। মায়ের সমগ্র জীবনই শ্রীরামকৃষ্ণের 'ইষ্টপথ'কে সুগম ও বিস্তৃত করার জন্য ব্যয়িত। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের আগে পর্যন্ত মা তা করেছেন প্রধানত তিনভাবে—শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গীণ রক্ষণাবেক্ষণ করে, স্বয়ং সাধনভজন করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের জননী হয়ে উঠে। প্রথমত শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গীণ রক্ষণাবেক্ষণ করে মা জগতের কাছে সেই রামকৃষ্ণকে উপহার দিয়েছেন, ঠিক যে-'রামকৃষ্ণ'কেই জগতের প্রয়োজন ছিল। 'সর্বাঙ্গীণ রক্ষণাবেক্ষণ' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনু এবং ভগবৎ-তন্ময় মন দুয়েরই রক্ষণাবেক্ষণ বুঝতে হবে। কখন তিনি কোনভাবে থাকবেন, তা শ্রীমা ছাড়া আর কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। শ্রীমা না থাকলে ঠাকুর অনেকসময় সমাধিতে মগ্ন হয়ে খাওয়ার কথা ভুলে যেতেন, কালীর প্রসাদ ঘরে থেকে শুকিয়ে যেত। মা যখন ঠাকুরকে খেতে দিতেন, নানা দিকে খেয়াল রেখে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁকে খাওয়াতেন। খাবারের পরিমাণ দেখতে বেশি হলে ঠাকুর ভয় পেতেন। মা তাই ভাত চেপে চেপে দিতেন, দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে কমিয়ে আনতেন। ঠাকুরের সামনে বসে বাতাস করতেন যাতে খাবারে মাছি না বসে এবং নানারকম কথা বলে ঠাকুরের ঊর্ধ্বগামী মনকে আহারের দিকে মনোযোগী করে রাখতেন। যোগীন-মা বলেছেন, "একমাত্র মা-ই খাবারের সময় তাঁর ভাবসমাধি আসা অনেকটা ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন, আর কারও সে সাধ্য ছিল না।"[১৭] ঠাকুরও বালকের মতো মায়ের সেবার ওপর নির্ভর করতেন। হৃদয় দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে রামলাল পূজারী হন এবং ঠাকুরের সেবায় অযত্ন করতে থাকেন। তিনি তখন ব্যাকুল হয়ে মাকে খবর পাঠিয়েছিলেন, "এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা কালীর পূজারী হয়ে বামুনদের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে—ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক; দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক—আমি দেব।"[১৮] কাশীপুরে একবার আড়াই সের দুধের বাটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মা পড়ে যান এবং কয়েকদিন চলৎ-শক্তিহীন হয়ে পড়ে থাকেন। তখনও ঠাকুর অসহায়বোধ করে বলেছিলেন, "তাই তো, বাবুরাম, এখন কী হবে, খাওয়ার উপায় কী হবে? কে আমায় খাওয়াবে?"[১৯]

ভাবরাজ্যের কোন স্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, তা বুঝে তাঁর শরীর ও মনের সেবা শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষেই কেবল সম্ভব ছিল। তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে। একদিন ঠাকুর ভবতারিণীর মন্দিরে প্রণাম করতে গেছেন দেখে মা ঠাকুরের বিছানা ও ঘর

পরিষ্কার করছেন, এমন সময় ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ, পা টলছে। ঠাকুর বালকের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, "ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?" মা উত্তর দিলেন, "না, না, মদ খাবে কেন?" ঠাকুর তবুও জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে কেন টলছি, তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না। আমি মাতাল?" শ্রীমা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।" এই উত্তর ঠাকুরের মনঃপূত হল। তিনি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ"। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ যথার্থই বলেছেন, "...মানবের সেবার একটা ধারা আছে, দেবতারও পূজার বিধি আছে; কিন্তু দেবতা যখন মানবদেহে আগমন করেন, তখন সম্ভবত শ্রীমায়ের ন্যায় দেবী-মানবীই তাঁহার সর্বপ্রকার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন।"[২০]

দ্বিতীয়ত, নিজস্ব সাধনভজনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকসাধনার ক্ষেত্রেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন। এই সাধনভজনের অধিকাংশই ঘটেছে সকলের অগোচরে। মায়ের দু-একটি কথায় এবং সামান্য কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে তাঁর এই সাধনজীবনের ঝাঁকি-দর্শনই শুধু সম্ভব। দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটার সময় উঠে মা জপে বসতেন, কোনও হুঁশ থাকত না। স্বামী যোগানন্দ মহারাজ এক জ্যোৎস্না রাতে নহবতের বারান্দায় মাকে সমাধিস্থা দেখেছিলেন। যোগীন-মা দেখেছিলেন, মাকে ভাবের ঘোরে হাসতে, কাঁদতে এবং শেষে একেবারে স্থির হয়ে যেতে। মা স্বয়ং বলেছেন—জ্যোৎস্না রাতে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে কেঁদে তিনি মনের নির্মলতা প্রার্থনা করেছেন। বলেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরে রাতে কে বাঁশি বাজাত, সেই বাঁশির শব্দে তাঁর সমাধি হয়ে যেত। এইভাবে সাধনভজনের ফলে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমকক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তাঁরও মুহুর্মুহু সমাধি হত, কিন্তু ভাব চাপবার অসীম ক্ষমতা ছিল বলে চারপাশের লোক সচরাচর তা বুঝতে পারত না।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীনই শ্রীরামকৃষ্ণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ভক্তসঙ্ঘের দায়িত্ব শ্রীমার কাঁধে তুলে দিতে। শ্রীমাও তাঁর স্বাভাবিক মাতৃহৃদয় নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন এবং ভক্তদের অজ্ঞাতসারেই কখন যেন তাদের প্রকৃত জননী হয়ে উঠেছিলেন। নহবতের নিভৃতে বসে তিনি পরম তৃপ্তিতে সারাদিন রান্না করে যেতেন ঠাকুরের কাছে আগত গৃহী ও ত্যাগী সন্তানদের জন্য। যার যেমন রুচি এবং যার যেমন প্রয়োজন সেই অনুসারে। নরেন্দ্রকে ঠাকুর থাকতে বলেছেন শুনেই রাঁধতেন, মোটা মোটা রুটি আর ঘন ছোলার ডাল। কারণ, নরেন্দ্র তাই ভালোবাসতেন। অভিভাবকদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আসতেন বলে বালক-ভক্ত সারদার (পরবর্তী কালে ত্রিগুণাতীতানন্দ) কাছে বাড়ি ফেরার পয়সা থাকত না। বাড়ি ফেরার আগে ঠাকুর তাকে নহবতে পাঠিয়ে দিতেন। মায়ের গোটা মনটা ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকত, তাই নহবতে কাজ করতে করতেই মা শুনতে পেতেন ঠাকুরের কথা। সারদা গিয়ে দেখত তার ফেরার ভাড়া চারটি পয়সা কে যেন নহবতের দোরগোড়ায় রেখে দিয়েছে। ঠাকুরের কাছে অনেক স্ত্রী-ভক্তও আসত। নহবতে জায়গার অভাব জেনে ঠাকুর তাদের রাতে নিজের ঘরের রোয়াকে শুতে বলতেন। কিন্তু শ্রীমা জোর করে তাদের নহবতে টেনে নিয়ে যেতেন এবং নিজের কাছেই তাদের শোওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শে স্ত্রীভক্তদের সব সংকোচ দূর হয়ে যেত। ভবিষ্যতে জগজ্জননীরূপে যিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, দক্ষিণেশ্বরে সীমিতসংখ্যক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের জননীরূপে এইভাবেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে

তুলেছিলেন। শ্যামাসুন্দরী দেবীকে ঠাকুর বলেছিলেন, "শাশুড়ী ঠাকরুন, ...আপনি দুঃখ করবেন না; আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, 'মা' ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।"[২১] পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে বলেছেন : ঠাকুরের বাণী সত্য হয়েছে, কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে হয়নি। কারণ, বহুলোকে মা বলে ডেকেছে সত্যি, কিন্তু মা কখনও অস্থির হয়ে ওঠেননি।

তাঁর ভক্তদের শ্রীমা আপন সন্তানজ্ঞানে গ্রহণ করুন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু এইজন্যই ব্যাকুল ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চেষ্টা করেছিলেন ভক্তরাও যাতে শ্রীমাকে আপন জননীরূপে গ্রহণ করে এবং একইসঙ্গে তাঁর জগজ্জননী-স্বরূপও স্মরণে রাখে। লীলা-অবসানের আগের কয়েকটি বছর শ্রীরামকৃষ্ণ এই চেষ্টা পরিকল্পিতভাবেই করে গেছেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজকে (পূর্বে উল্লেখিত সারদাকে) ঠাকুর মায়ের কাছেই মন্ত্র নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং মায়ের গুরুশক্তিতে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বলেছিলেন, "অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।/ কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।"[২২] মানসপুত্র রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ঠাকুরই নিজে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাখালের স্ত্রী যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন, ঠাকুর তাঁকে মায়ের কাছে নহবতে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, টাকা দিয়ে পুত্রবধূর মুখ দেখতে। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র শ্রীমায়েরও 'বিশেষ' পুত্র এবং তাঁর স্ত্রী ঘরের বধূর মতোই আদরণীয়। রাখালের প্রতি মায়ের এই 'বিশেষ দৃষ্টি' চিরকাল ছিল।

বালক-ভক্ত পূর্ণ যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন, ঠাকুর তাঁকে খাওয়ার জন্য নহবতে পাঠিয়ে দেন এবং ঠাকুরের ইচ্ছা অনুসারে মা তাঁকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে পাশে বসিয়ে সস্নেহে আহার করান। ঠাকুর তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে মাঝে মাঝে এসে মাকে বলে দেন কীভাবে পূর্ণকে আদর-যত্ন করতে হবে। এইরকম সচেতনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে শ্রীমায়ের মাতৃহৃদয়ের সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ত্যাগী ভক্তদের কয়েকজনকে তিনি নিজেই শ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন, লাটু মহারাজ, যোগীন মহারাজ এবং বুড়োগোপাল মহারাজকে। এদের মধ্যে লাটু ও যোগীন বালক এবং 'বুড়ো গোপালদাদা' ঠাকুরের থেকেও বয়সে বড়ো ছিলেন। দানা-কালী (কালীপদ ঘোষ) বিপথে চলে গেলে তার স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসে—স্বামীর স্বভাব পরিবর্তনের জন্য মন্ত্রৌষধি প্রার্থনা করতে। ঠাকুর এরকম ওষুধ কখনও দিতেন না, তিনি মজা করে তাকে নহবতে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মা বলেন তিনি কিছু না, ঠাকুরই সব। মহিলাটি ঠাকুরের কাছে ফিরে যায় এবং মজা জমে উঠেছে দেখে ঠাকুর আবার তাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে বার তিনেক সেই মহিলাটি ঠাকুর ও মায়ের কাছে যাতায়াত করলে মায়ের মন তার দুঃখে বিচলিত হয়ে ওঠে। তিনি তাকে পূজার একটি বেলপাতা দিয়ে বলেন, "এতেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।"[২৩] এরপর অলৌকিকভাবে দানা-কালীর মতিগতি পরিবর্তন হয়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতে শুরু করেন এবং অচিরে ঠাকুরের একান্ত অনুরাগী হয়ে ওঠেন। লক্ষণীয় এইটিই যে, এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে ঠাকুর মায়ের কৃপাহস্ত উন্মোচন করে দিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখেছেন, "এইভাবে, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্মস্থাপন-প্রচেষ্টার সহিত শ্রীমা, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে, ক্রমেই অধিকতর সংশ্লিষ্ট হইতেছিলেন, আর এই শক্তিবিকাশের ধারা

স্বভাবতঃই তাঁহার মাতৃস্নেহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। মাতৃস্নেহের আকারে আকারিত করিয়াই শ্রীমা আপন অনন্তশক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন।"[২৪]

যেসব যুবকভক্তকে ঠাকুর সন্ন্যাসজীবনের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন, তাদের জন্য ঠাকুর রাত্রের খাওয়ার রুটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, কারণ রাতে বেশি খেলে সাধন-ভজন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মাতৃত্বের উপর এই কড়া শাসন শ্রীমায়ের পছন্দ হত না। ঠাকুরের অনুযোগের উত্তরে তিনি বলেন, "ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।"[২৫] যে মা ঠাকুরের প্রয়োজনে নিজেকে মুছে ফেলতেই সর্বদা ব্যগ্র, তাঁর মুখে 'আমি দেখব' কথাটি শুনে ঠাকুর নিশ্চয়ই চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি আর কোনও কথা বললেন না। শ্রীমা নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের ইহকাল-পরকালের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন—এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি আনন্দের তো তাঁর কাছেই!

এইভাবে একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সচেতন প্রয়াস যুগধর্মপ্রচার-উপযোগী পরিবেশ গঠনের জন্য এবং অন্যদিকে শ্রীমায়ের স্বাভাবিক সন্তানস্নেহ—এই দুটি মিলে শ্রীমাকে তাঁর ভাবী কর্মক্ষেত্রে ক্রমশই আকর্ষণ করে নিয়ে আসছিল। এই সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ অনুভব করলেন, তাঁর নরলীলার দিন সমাপ্তপ্রায় এবং শ্রীমাকে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সুস্পষ্ট আহ্বান জানানোর শুভমুহূর্ত সমাগত। কাশীপুরে মায়ের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর একদিন অনুযোগের সুরে বললেন, "হ্যাঁগা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজদেহ দেখাইয়া) এ-ই সব করবে?" শ্রীমা উত্তর দেন, "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।"[২৬] এর পরে আর একদিনও তিনি শ্রীমাকে বলেছিলেন, "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল-বিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" মা নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন, "আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?" ঠাকুর নিজেকে দেখিয়ে বলেন, "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।"[২৭] এখানে 'কলকাতা' আসলে সারা জগতের প্রতীক। গোটা জগতকেই দেখার ভার ঠাকুর দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমাকে। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর বিরহযন্ত্রণায় মাও যখন দেহত্যাগ করবেন বলে স্থির করেছেন, তখনও ঠাকুর সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে মাকে তাঁর দায়িত্বের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "না, তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে।" মা বলতেন, "শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকী আছে।"[২৮]

এরপরে ঠাকুরেরই ইচ্ছায় রাধুরূপী যোগমায়াকে অবলম্বন করে জীবনের শেষ তেত্রিশ বছর ধরে শ্রীমা 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' 'তদ্ভাবরঞ্জিতাকারা' হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধকার্যের ভার বহন করে গেছেন এবং তা তিনি করেছেন, একাধারে লোকজননী ও সঙ্ঘজননী হয়ে। সতেরও মা অসতেরও মা হয়ে, সতীরও মা অসতীরও মা হয়ে, সাধু-গৃহী, পাপী-পুণ্যবান, নারী-পুরুষ, আমজাদ-শরৎ সকলের ইহকাল-পরকালের, 'জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা' হয়ে। ঠাকুর বলেছিলেন, তাঁর চেয়েও বেশি করতে হবে মাকে। তা-ই করেছেন তিনি। ঠাকুর বলেছিলেন বটে, "তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব,

মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষ পায় না।"[২৯] *কিন্তু মায়ের সব সন্তানই নরেন-রাখাল-শরৎ-নাগমশায়ের মতো 'রত্ন ছেলে' ছিল না।* এমন সন্তানও আসত যারা পাদস্পর্শ করলে মায়ের মনে হত যেন 'বোলতা' কামড়াচ্ছে, পবিত্রতাস্বরূপিণীর পাবন-দেহ জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত। তবুও সকলকে গ্রহণ করতেন, শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করতেন, পাছে শরৎ মহারাজ প্রণাম করা বন্ধ করে দেন। বলতেন, "কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন?"[৩০] "ভাল ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটি কে নেয়?"[৩১] "আমরা তো ঐ জন্যেই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব তবে কে করবে? পাপী-তাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?"[৩২] সংসারের নানা কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে আপন মনেই ডেকে উঠতেন, "ছেলেরা তোরা আয়।"[৩৩] কোনওদিন যদি কেউ না আসত, তাহলে ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে বলতেন, "একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে, 'তোমাকে নিত্যই কিছু না কিছু করতে হবে'?... কই, ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?"[৩৪] জগজ্জননীর আকৃতি বৃথা যেত না। রোজই কোনও না কোনও ভক্ত এসে উপস্থিত হত, যোগ্যতার অনেক বেশি পেয়ে তৃপ্ত হয়ে চলে যেত। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) নিয়েছেন বাছা বাছা ছেলে কটি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে পিঁপড়ের সার।"[৩৫] মায়েরই কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত তাঁর মাতৃজীবনীতে লিখেছেন, "এই পিঁপড়ের সারের জন্যই মার দয়াব শেষ বা চিন্তার অবধি ছিল না। ইহারা কেহ ঈশ্বরকোটীও না, বা অন্য কোন দিব্য গুণেও বিভূষিত নয়। অতি সাধারণ মানুষ—সাধারণ দোষ-গুণ পাপ-পুণ্যের অধীন। কিন্তু তাহারা যখন আসিয়াছে মা দুহাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যদি একটু ভাল দেখিয়াছেন, তিনি যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছেন। অনেক সময়েই পরিচয় লওয়া বা একটি কথা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। এমনকি, যখন অতি অযোগ্য লোক সকল তাঁহার নিকট আসিয়াছে, তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু দয়ার বশবর্তী হইয়া তাঁহাদেরও দীক্ষা দিয়াছেন। অতি অল্প ক্ষেত্রেই কাহাকেও ফিরাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারও অধিকাংশ স্থলে একটু কাঁদাকাটিতেই তিনিই হার মানিয়া দীক্ষা দিয়াছেন।"[৩৬]

আমরা যুগাবতারের কাছে সবসময় প্রার্থী হয়েই থাকি, তাঁর যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারি না। অহৈতুকী প্রেমের বশে যাঁর দেহধারণ ও লোকসংগ্রহের দায় বরণ, তাঁর সেই দায়ের যন্ত্রণা যে কী, তা ঠাকুর সুর করে গেয়ে গেছেন ওই দুটি গানের কলিতে, "এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়;/ যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?" দরদী না হলে এই যন্ত্রণা বোঝা যায় না। সমমাপের না হলে দরদী হওয়া যায় না। তাই একমাত্র শ্রীমা-ই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন ঠাকুরের দায়ের ভার ও যন্ত্রণা। একদিনের দর্শন শ্রীমা বর্ণনা করছেন, "একটা ডেঁও পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মার্‌বে—দেখ্‌লুম কি জান? দেখ্‌লুম, সেটা পিঁপড়ে ত নয়—ঠাকুর—ঠাকুরের সেই হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই।—রাধিকে আট্‌কালুম—ভাব্‌লুম, তাইত, সব জীব যে ঠাকুরের। আমি আর কি কর্‌তে পাচ্ছি—ক'জনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন! সকলকে দেখতে পাত্তুম, তবে তো হ'ত।"[৩৭] আর একদিনের দর্শনের কথা, "একবার দেখি কি তা জান? দেখি না, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই ঠাকুর—কাণাও

ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝ্‌লুম, তাঁর সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না—তিনিই পাচ্ছেন। তাইত যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিষে তাঁকেই করি।"[৩৮] জীবের যন্ত্রণা শ্রীরামকৃষ্ণেরই যন্ত্রণা। শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্রণা, 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' সারদারও যন্ত্রণা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহমর্মিণী বলেই লোকজননীরূপে যেমন সঙ্ঘজননীরূপেও শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের 'দায়' পালন করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত—স্বেচ্ছায়, আনন্দে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বলেছেন, সাধনজীবনের শেষেই শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে।"[৩৯] কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার দিনগুলিতে সেই 'নবসম্প্রদায়ের' বা সঙ্ঘের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ তাকে পূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে আমরা লক্ষ্য করেছি, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীমা ছাড়া আর কেউই উপলব্ধি করেননি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের একটা যুগান্তকারী তাৎপর্য আছে এবং তাঁর ভাবকে অনাগত কালের জন্য ধরে রাখতে একটি নতুন ধরনের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রয়োজন। তাই সেই সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য স্বামীজী যেমন আকুল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন প্রথমে ভারতে ও পরে পাশ্চাত্যে, তেমনি সেই সঙ্ঘের জন্য নিত্য আকুলভাবে প্রার্থনা করে গেছেন জগজ্জননীও। নিজ মুখেই তিনি বলেছেন সেকথা, "আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁর কৃপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সব সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রম করে একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়। আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে আর তোমার সব ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে।"[৪০]

যুগাবতার ও যুগজননীর মিলিত আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। সেই সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য কী হবে, তা-ও মায়ের ওই প্রার্থনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। সন্ন্যাসিসন্তানরা ঠাকুরের ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে এবং সংসার তাপদগ্ধ মানুষ তাদের কাছে এসে শান্তি পাবে—এই দুয়ের মধ্যে স্বামীজীর 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' ভাবটিই ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর মা তাঁর পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি নিয়ে ত্যাগী ভক্তদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'My Life and Mission' বক্তৃতায় তার

উল্লেখ করেছেন।

স্বামীজী তাই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিনে মাকে 'সঙ্ঘজননী' আখ্যায় ভূষিত করে অন্তরের কৃতজ্ঞতা ঢেলে দিয়েছিলেন। মায়ের ভরণপোষণের জন্য মাসিক কত টাকা দেওয়া উচিত, সে-প্রসঙ্গে উপস্থিত ভক্তদের সঙ্গে মতপার্থক্য হলে স্বামীজী সেদিন (১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে) ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিতভাবে বলেছিলেন, "শ্রীশ্রীমাকে হাতখরচা বাবদ মাসিক ২৫ টাকার কম দিতে পারব না। শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী বলে মনে কর? তিনি শুধু তা নয় ভাই, আমাদের এই যে সঙ্ঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।"[৪১]

শ্রীমা জননীর স্নেহ দিয়ে যেমন সঙ্ঘের প্রতিটি সন্তানকে লালন করেছেন, তেমনি সঙ্ঘের আদর্শের দিকেও সর্বদা সজাগ নজর রেখেছেন, ভুল করলে সতর্ক করেছেন এবং সঙ্ঘের দিকপাল শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদবাও যখন সঙ্ঘ পরিচালনার ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছেন, মা তাদের সমাধানের পথ বলে দিয়েছেন। এইভাবেই কাশীর সেবাশ্রমে অনাথা বৃদ্ধাদের সেবাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কাজ বলে ঘোষণা করে স্বামীজীর সেবাযজ্ঞ সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন ও সংশয় চিরতরে দূর করে দিয়েছিলেন। প্লেগসেবার জন্য স্বামীজী বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করে দিতে চাইলে, স্বামীজীর মানবপ্রেমের উদ্দাম আবেগকে রাশ টেনে থামিয়েছিলেন এবং 'বেলুড় মঠে'র মানবকল্যাণ ব্রত যে বহু বছর ধরে চলতে থাকবে, একটা মাত্র সেবাকাজেই শেষ হয়ে যাবে না, স্বামীজীকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

লর্ড কারমাইকেল তাঁর দরবার ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের গোপন যোগসূত্র থাকার অভিযোগ তুললে, রামকৃষ্ণ মিশন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এতে গৃহী ভক্তরা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ভয় পান এবং অনেকেই স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে পরামর্শ দেন, যেসব সাধু পূর্বজীবনে বৈপ্লবিক কাজকর্মে জড়িত ছিলেন, তাদেরকে সঙ্ঘ থেকে বের করে দিতে। সারদানন্দ মহারাজ মাকে সবকথা জানালে মা বলেছিলেন, "ওমা! এ-সব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।"[৪২] মা আরও বলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ-মিশন হয়েছে; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যাবা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।"[৪৩] মায়ের পরামর্শ অনুসারে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেন। ওই আলোচনার পর লর্ড কারমাইকেল তাঁর আগের বক্তব্য ফিরিয়ে নেন এবং ওই বক্তব্য প্রকাশের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহে থাকাকালীন মা যেমন তাঁর সর্বাঙ্গীণ রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শরীর-রূপ এই সঙ্ঘের ভাব, আদর্শ ও মর্যাদাকে সবসময় রক্ষা করেছেন, পুষ্ট করেছেন এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সে সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছেন।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার জন্য ঠাকুরের কাছে মা যে ব্যাকুল প্রার্থনা করেছিলেন—যার উল্লেখ

আমরা আগে করেছি—তাতে মা ঠাকুরকে বলেছিলেন : সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা ঠাকুরের ভাব-উপদেশ নিয়ে থাকবে ও সংসার তাপদগ্ধ মানুষ তাদের কাছে এসে শান্তি পাবে, 'এইজন্যই তো তোমার (অর্থাৎ ঠাকুরের) আসা।' অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত এই সঙ্ঘ অন্ন-চিকিৎসা-বিদ্যাদান প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের উপস্থিত জাগতিক দুঃখ নিশ্চয়ই দূর করবে, কিন্তু এই সঙ্ঘের চরম উদ্দেশ্য হবে মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-উপদেশের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে ক্রমশ তাদের আত্যন্তিক শান্তির অধিকারী করে দেওয়া।

প্রশ্ন হল : শ্রীরামকৃষ্ণের মূল ভাব কী এবং সেই ভাব-পুষ্টিতে মায়ের কী ভূমিকা?

শ্রীরামকৃষ্ণের মূলভাব বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'লীলাপ্রসঙ্গে' বলেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করেছিলেন, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সব সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। সব মতেরই শেষকথা অদ্বৈততত্ত্ব এবং দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈততত্ত্ব পরস্পর-বিরোধী নয়—সাধকের জীবনে পর্যায়ক্রমে এই তিনটি এসে আবির্ভূত হয়। 'সঙ্ঘজননী'রূপে শ্রীমাও স্পষ্ট বলেছেন, ঠাকুর 'অদ্বৈতী' ছিলেন। স্বামীজী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমকে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাধনার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সেখানে কোনও ছবি বা মূর্তির পূজা করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী মায়াবতীতে গিয়ে দেখলেন (জানুয়ারি ১৯০১), সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির পূজা হচ্ছে, যদিও খুব সাধাসিধে ভাবে। আশ্রমের পরিচালকদের স্বামীজী ভর্ৎসনা করলেন এবং স্বামীজীর মনোভাব বুঝে তাঁরা ঠাকুরের প্রতিকৃতি সরিয়ে দিলেন। কিন্তু মনে তাঁদের সংশয় থেকেই গেল—মূর্তিপূজা বা দ্বৈত-উপাসনার বিরুদ্ধে স্বামীজীর এই আপত্তি কি সমর্থনযোগ্য? তাঁদের মধ্যে একজন স্বামীজীরই শিষ্য (দীক্ষিতসন্তান) এবং সকলেরই সন্ন্যাসগুরু স্বামীজী। তবুও তাঁরা স্বামীজীর নির্দেশ মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। শ্রীশ্রীমাকে তাঁরা সব লিখে জানালেন ও তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। উত্তরে মা স্বামীজীকেই সমর্থন কবে লিখলেন (চিঠির তারিখ স্বামীজীর দেহত্যাগের মাস দুয়েক পরে—৩১ আগস্ট ১৯০২), "আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য—তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।"[৪৪]

জগজ্জননীর নির্দেশে এই অদ্বৈতজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে ছিলেন। মাঝ-গঙ্গায় বড়ো মাঝি ছোটো মাঝিকে চড় মারলে, তীরে বসে তিনি যন্ত্রণায় কাতরে উঠেছেন এবং তাঁর পিঠে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বিভোর হয়ে সবুজ প্রান্তরের শোভা দেখছেন। এমন সময় কেউ হেঁটে গেল সেই মাঠের উপর দিয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর। মনে হল কেউ যেন তাঁর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। স্বামীজী তাঁর 'ব্যবহারিক বেদান্তের' (Practical Vedanta) ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকেই পেয়েছিলেন। এই 'জীবন্ত উপনিষদ' দেখেছিলেন বলেই স্বামীজী বলতেন, বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁর জীবনব্রত। বলতেন, শংকর যে বেদান্তকে বনে-জঙ্গলে-সাধুর কুঠিয়ায় রেখে গিয়েছিলেন, তাকে তিনি লোকালয়ে ছড়িয়ে দেবেন, প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন, যাতে সে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই অদ্বৈততত্ত্বকে কাজে লাগাতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বা স্বামীজীর 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার... ' আসলে অদ্বৈত বেদান্তেরই ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ।

কিন্তু এই 'ব্যবহারিক বেদান্ত'ও একটা তত্ত্বমাত্রই থেকে যেত, সারদা দেবী না থাকলে।

'ব্যবহারিক বেদান্ত'কে জীবনে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন শ্রীশ্রীমা। বিন্দুমাত্র তরল না করেও শ্রীরামকৃষ্ণ তথা ভারতাত্মারই মর্মবাণী—এই অদ্বৈততত্ত্বকে মা সরল সুস্বাদ সর্বজনপাচ্য করে পরিবেশন করেছেন। 'জ্ঞানদায়িনী' সারদা আসলে অদ্বৈতজ্ঞান দিতে এসেছিলেন এবং তা তিনি দিয়েছেন মাতৃত্বের মোড়কে। তাই 'শ্রেয়' তার শ্রেয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও প্রিয় হয়ে উঠেছেন প্রতিপদে। ধর্ম যে এত মিষ্ট হয়, মা না এলে আমরা বুঝতে পারতাম না। মা হয়তো উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব মুখে তত বলেননি কিন্তু নির্বিশেষ মাতৃস্নেহে অদ্বৈতানুভূতির জীবন্ত প্রতিমা হয়ে উঠেছেন। অদ্বৈতজ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে 'ব্রহ্ম' দেখে, মা দেখেছেন, ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সবাই তাঁর সন্তান। 'ব্রহ্ম' না বলে 'সন্তান' বলেছেন। 'ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়োচ্ছ'—এই অনুযোগ করলে বলেছেন, "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?"[৪৫] একত্ব অনুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখি তাঁর জীবনের প্রতি-মুহূর্তে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে একমাত্র সারদা দেবীই তাঁর জীবনব্রত পালন করেছেন গৃহীর ভূমিকায়। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনিও শ্রেষ্ঠ ত্যাগী। কিন্তু লোককল্যাণের কারণেই তাঁর ভূমিকা 'সংসারী'র। জাগতিক অর্থে সন্তানের মা না হয়েও আত্মীয়স্বজনদের সন্তানদের আপন সন্তানজ্ঞানেই তাঁকে পালন করতে হয়েছে, জগৎজোড়া সন্তানদের জন্য উদ্বেল-উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হতে হয়েছে যে-কোনও 'সংসারী' জননীর মতোই।

স্বামীজী যে বেদান্তকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাকে পারিবারিক জীবনের একেবারে কেন্দ্রে বসে আচরণ করে মা দেখিয়ে দিয়েছেন—বেদান্তের এই ব্যবহারিক রূপ শুধু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্যই নয়, সংসারের তপ্ত কটাহে নিত্য যারা দগ্ধ হচ্ছে সেই গৃহীদের জন্যও। বস্তুত, স্নেহ-করুণা-মমতায় ভরা শ্রীমায়ের সর্বংসহা জীবনের দৃষ্টান্ত যদি না থাকত, তবে বনের বেদান্তকে সত্যই এযুগের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা, ব্যবহারিক বেদান্তকে সত্যিই নিত্য-ব্যবহার্য করা যায় কিনা, নাকি শুধু সমীহই করা যায়—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকেই যেত। শ্রীরামকৃষ্ণের দায়-পালনে মায়ের যে ভূমিকা, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক এইটিই। তিনি ছিলেন বলেই রামকৃষ্ণ-ভাবধারা সাধু-গৃহী-নির্বিশেষে, নারী-পুরুষ-নির্বিচারে সর্বসাধারণের ব্যবহার-উপযোগী হয়ে উঠেছে।

জন্মদিনের মধুর স্মৃতি

মালতী সেনগুপ্ত

আমাদের মায়ের সার্ধশত আবির্ভাব তিথি। অনন্তচৈতন্যরূপিণী, যাঁর আদি নেই অন্ত নেই, তাঁকে কি কালের হিসেবে বাঁধা যায়? শুধু চিহ্নিত করা যায় সেই মুহূর্তটিকে, চিন্ময়ী যখন অবতীর্ণা হয়েছিলেন মৃন্ময়ীরূপে অবতারের লীলাসঙ্গিনী হয়ে। অব্যাকৃতা আদিশক্তির নাম-রূপ-ধারণের ক্ষেত্র—অখ্যাত, দুরধিগম্য গ্রাম, জয়রামবাটী। কৃষ্ণা সপ্তমী তিথির জমাট অন্ধকার চিরে যেন নীল বিদ্যুৎশিখা রামচন্দ্রের গৃহকোণ স্পর্শ করে মিলিয়ে গেল। মহাশক্তির অবতরণ ঘটল। দেড়শো বছর আগে। সেদিন এক অনির্বচনীয়, বিশুদ্ধ মাতৃসত্তারূপে আদিশক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আজ সাড়া পড়ে গেছে দিকে দিকে, মঠমন্দিরে, ভক্তহৃদয়ে। জগদ্‌বাসী মায়ের সার্ধশত আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন করবে মহাসমারোহে, মহোল্লাসে। পৃথিবী জুড়ে।

আমার কিন্তু মনে হয় যত দিন যায়—দেড়শো বা দুশো বছর—সেই প্রথম শুভক্ষণটি তো আরও, আরও দূরে চলে যায়। কালের ব্যবধানে এখনই ম্লান হয়ে এসেছে আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি, এখনই কত দূরে চলে গেছে মাধুর্যে ভরা স্নিগ্ধ, মায়াময় সেইসব দিন। জন্মতিথি পালিত হবে সভাসমাবেশে, পূজায়, পাঠে, ভজনকীর্তনে। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে যে আনন্দ সন্তানরা, ভক্তরা পেয়েছিলেন—তার কণামাত্রও কি পাওয়া যাবে?

কেমন হত জন্মোৎসব, যখন জননী স্থূলশরীরে বিরাজ করতেন? কখনও শান্ত-অনাড়ম্বর, কখনও উৎসবমুখর সেই জন্মতিথিগুলির ছবি আঁকা আছে কত স্মৃতিচারণে। ধরা আছে মনোরম, কখনও বা মর্মস্পর্শী, দুর্লভ সেই মুহূর্তগুলি। কখনও অগণিত ভক্তের ঢেউ লুটিয়ে পড়েছে মায়ের চরণে, কখনও স্বল্প ভক্তসমাগম—একটি-দুটি সন্তানের পূজায় জগজ্জননী গ্রহণ করেছেন সকল সন্তানের পূজা—সেইসব স্মৃতি-ছবির কয়েকটিকে তুলে ধরার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

জন্মতিথিগুলি যেভাবেই পালিত হয়ে থাকুক না কেন—সাড়ম্বর বা অনাড়ম্বর—সবগুলিতেই ফুটে উঠেছে সন্তানের পূজাগ্রহণে মায়ের প্রসন্নতা ও আগ্রহ। ব্যতিক্রম নেই। মায়ের জন্ম পৌষমাসে, জগদ্ধাত্রী পূজার কিছুদিন বাদে। তাই অনেক সময়ই তিনি ওই দিনটিতে জয়রামবাটীতে থাকতেন। সেখানকার সকল উৎসবে, মায়ের নিজের জন্মতিথিতেও, তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। কলহপরায়ণ আত্মীয়দের তুষ্ট রেখে, গ্রামবাসীদের প্রত্যাশা পূরণ করে, সীমিত সাধ্যের মধ্যে সুব্যবস্থা করতে হত তাঁকেই। দূরস্থিত সন্তানদের প্রেরিত অর্থ বা উপচার যতই আসুক না কেন, ভক্তসেবকরা যতই প্রাণপাত পরিশ্রম করুন না কেন—সুষ্ঠুভাবে উৎসব-পালনের দায় ছিল মায়েরই। একটি স্মৃতিচারণে[১] দেখি মা জন্মতিথির

সকালে দুজন সন্তানকে পাঠিয়েছেন কামারপুকুরে শিবুদাদার কাছ থেকে এক কলসি দুধ আর ফুল আনতে। সেবক মহারাজ তাঁদের বলে দিলেন অবশ্যই নটার মধ্যে ফিরে আসতে, নাহলে তাঁরা মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারবেন না। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিষণ্ণ-মনে মাথায় করে দুধের কলসি আর ফুলের ডালা নিয়ে এসে ছেলেরা যখন সেবক মহারাজের বকুনি খাচ্ছেন, মা কোথা থেকে এসে ফুলের ডালা ছেলের মাথা থেকে নিয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "বড়ো সুন্দর ফুল তো! এ দিয়ে আগে ঠাকুর ·পূজা করতে হয়। তোমরা শীগ্‌গির নেয়ে এসো।" পুলকিত সন্তানেরা স্নান সেরে এসে দেখেন মায়ের চরণে তাঁদের অঞ্জলি দেওয়ার জন্য সেই ফুলই সাজানো রয়েছে!

জয়রামবাটীতে ১৯০৭ সালে একটি অনাড়ম্বর জন্মতিথির বর্ণনা দিয়েছেন স্বামী অরূপানন্দ।[২] সেই বছরেই তরুণ রাসবিহারী প্রথম মাতৃসান্নিধ্য লাভ করেন এবং মঠবাস শুরু করেন। পৌষমাসে ঘাটালে বন্যাত্রাণের কাজ শেষ করে তিনি কিছুদিন জয়রামবাটীতে থাকেন। মায়ের জন্মতিথির দু-চারদিন আগে তাঁর ভক্তসন্তান প্রবোধচন্দ্র জয়রামবাটীতে এসেছিলেন। আগের দিন তিনি মামাদের হাতে পাঁচ টাকা দেন পরদিন ঠাকুরকে বিশেষ ভোগ দেওয়ার জন্য। জন্মদিনে কী হবে ভক্তরা জানতে চাইলে মা বলেছিলেন, "আমি একখানা নতুন কাপড় পরব, ঠাকুরকে একটু মিষ্টান্নাদি করে ভোগ দেওয়া হবে, আমি প্রসাদ পাব। এই আর কি!"

নতুন কাপড় পরে পূজা শেষ করে মা তাঁর ঘরে চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসলে প্রবোধবাবু ভিতরে গিয়ে তাঁর পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন। নবাগত রাসবিহারী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। মা ডেকে বললেন, "কই, তুমি দেবে না? নাও, এই ফুল নাও।" রাসবিহারী মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন। যেচে প্রণাম নিলেন, অবোধ সন্তানের কল্যাণার্থে।

শোনা যায় আর একবার জয়রামবাটীতে তাঁর জন্মদিনে তিনি এমন করেই যেচে প্রণাম নেন। একটি বাগদি উঠানে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ চোখে মাকে দেখছিল। মা তাকে কাছে ডেকে, ফুল দেন ও তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে বলেন।[৩]

আগাগোড়া তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই এই সরল, অহংশূন্য, নিরভিমান অথচ পূর্ণ স্বরূপ-সচেতনতা। স্বামী অরূপানন্দ লিখছেন: "মধ্যাহ্নে খুব প্রসাদ পাওয়া গেল। প্রবোধবাবুর অফিস, তাই তিনি কলিকাতা রওনা হইলেন। আমার... যাওয়া হইল না।" এই বিবরণ থেকে মনে হয় সে বছর বহিরাগত ভক্ত— এই দুইজন ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

· কলকাতায় মায়ের দুটি জন্মতিথির উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন সরলাবালা সরকার।[৪] দুইবারই মা অসুস্থ ছিলেন। "মা পালঙ্কে অবগুণ্ঠিতা হইয়া বসিয়া আছেন, শত শত ভক্ত চরণপূজা করিতে আসিতেছেন। মা সস্নেহে সকলের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ত্বরা সত্ত্বেও পূজায় বহু সময় লাগিল, কিন্তু মা সমভাবেই প্রসন্নময়ীরূপে সন্তানদের অর্চনা গ্রহণ করিতেছেন।" আর একটি ছবি এঁকেছেন—(মা) দাঁড়িয়ে আছেন উদ্বোধন অফিসে, অবগুণ্ঠিতা, 'যেন একখানি প্রতিমা।' ভক্তেরা সার দিয়ে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যাচ্ছেন। দ্বারী স্বামী সারদানন্দ, ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে, বলছেন "পাঁচ মিনিটের বেশি কেউ সময় নিও না, অনেক লোক গলিতে দাঁড়িয়ে আছে। সকলকেই সময় দিতে হবে।" মনে হয় এই উৎসবটি মা উদ্বোধন বাড়িতে আসার অল্পদিন পরই হবে ,কারণ

মা দাঁড়িয়ে থেকে প্রণাম নিতে পেরেছেন, নিচের অফিস ঘরে। সরলাবালা সরকারের বর্ণনায় মুগ্ধতা আছে, সাল-তারিখ নেই।

কাশীধামে অনুষ্ঠিত ১৯১২ সালে মায়ের জন্মোৎসব বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের 'রত্ন-ছেলে'দের উপস্থিতিতে। মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী শান্তানন্দ, স্বামী গিরিজানন্দ প্রমুখ আরও অনেক সাধু সেইসময় কাশীতে অবস্থান করছিলেন। সেবার পূজার পরে মা কাশীতে 'লক্ষ্মীনিবাসে' মাস তিনেক ছিলেন। মায়ের জন্মতিথি পড়েছিল ৩০ ডিসেম্বর। এই দিনটিতে মাকে তাঁদের মধ্যে পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের আনন্দের শেষ ছিল না। মহাসমারোহে উৎসব পালিত হয় দুই জায়গাতেই, 'লক্ষ্মীনিবাস' আর অদ্বৈত আশ্রমে। অদ্বৈত আশ্রমে রাখাল মহারাজের নির্দেশে চন্দ্র মহারাজ ও ভক্ত নৃপেনবাবু উৎসবের বিপুল আয়োজন করেন। এই দিনটির বর্ণনা আমরা পাই স্বামী গিরিজানন্দের[৫] স্মৃতিচারণে ও স্বামী অপূর্বানন্দের (স্বামী শান্তানন্দের মুখে শোনা)[৬] লেখায়।

সেদিন সকালে 'লক্ষ্মীনিবাসে' মা স্নানপূজা সেরে সাধুদের ও সমাগত ভক্তমহিলাদের পূজা গ্রহণ করেন। স্বামী গিরিজানন্দ লিখেছেন, "জন্মতিথির দিন মা একখানা কমলা রঙের রেশমী কাপড় মহারাজকে দেন।" মহারাজ কাপড়খানা পরে সেবাশ্রমে আসেন "ছোট ছেলের মতো হাসতে হাসতে" ও পরে 'লক্ষ্মীনিবাসে' যান মাকে প্রণাম করতে। সেইসময় স্বামী গিরিজানন্দও সেখানে যান মাকে প্রণাম করতে। তাঁর বিবরণ: "রাসবিহারী মাকে বলিতেছে, 'হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের কাপড় দুখানা কিন্তু মহারাজের মতো হল না।' শুনে মা বললেন, 'তা হোক, রাখাল ছেলে।' "

এই সুমধুর স্বীকৃতির পুনরাবৃত্তি পাই অদ্বৈত আশ্রমের অনুষ্ঠানে। বিকেলে মা সেখানে আসেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে মণ্ডপে বসেন। সমবেত সকল সাধুকে তিনি নিজহাতে নতুন কাপড় দেন। রাখাল মহারাজকে 'তসরের জোড়' দেওয়ায় স্বামী শান্তানন্দ হেসে বললেন, "মা, আমাদের সকলকে সুতার কাপড় দিলেন আর মহারাজকে যে 'তসরের জোড়' দিলেন?" মা নিজেও হেসে ফেলেন, বলেন, "রাখাল যে আমার ছেলে।" এই কথায় উপস্থিত সকলে খুব আনন্দিত হন। অদ্বৈত আশ্রমে সেদিন "শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং দুই আশ্রমের সাধু, ভক্ত মিলে প্রায় দুইশত লোক বসে পরিতোষপূর্বক প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের জয়ধ্বনিতে আশ্রম মুখরিত হয়ে ওঠে।"

স্বামী শান্তানন্দের স্মৃতিচারণে[৭] সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। তিনি বলেছেন যে, মায়ের জন্মতিথিতে অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে পূজা ও হোম হয় মা তা দর্শন করেছিলেন ও কিছুক্ষণ সেখানে থেকে, সামান্য কিছু খেয়ে 'লক্ষ্মীনিবাসে' ফিরে যান। এতে মনে হয় মা সেখানে সকালেও এসেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, "৩০শে ডিসেম্বর এখানে খুব ঘটা করিয়া শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। সকলে বলিল যে, এরূপ আনন্দ এ আশ্রম হইয়া অবধি আর কখনও পূর্বে হয় নাই।... বাস্তবিকই সেদিন যেন আনন্দের ঢেউ খেলিয়াছিল।"[৮]

১৯১৮ সালে মায়ের জন্মতিথি দুবার পড়েছিল। জানুয়ারি মাসে ও ডিসেম্বর মাসে। জানুয়ারি মাসে বিপুল সমারোহে মায়ের জন্মতিথি পালিত হয় জয়রামবাটীতে মায়ের নূতন বাড়িতে বহু সাধুভক্ত সমাগমে।[৯] কলকাতা থেকে কপিল মহারাজ এসেছেন কয়েকদিন আগে

থাকতেই। তাঁর সঙ্গে এসেছে শরৎ মহারাজ, গোলাপ-মা ও অন্যান্য ভক্তদের পাঠানো কাপড়, ফল-মিষ্টি, মায়ের সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় নানারকম জিনিসপত্র। আর এসেছে মায়াবতী থেকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের পাঠানো একটি অতি সুন্দর গালিচার আসন, এক ভুটিয়া মহিলার মাকে দেওয়া উপহার। স্নানান্তে মা কাপড়ের স্তূপ থেকে শরৎ মহারাজের দেওয়া কাপড়টি বার করে পরে, সেই আসনটিতে বসে পূজা করলেন। পূজাশেষে খাটে বসলেন পা ঝুলিয়ে। হাত দুটি কোলের উপর রেখে। "স্নেহকরুণাপূর্ণ প্রশান্ত মুখমণ্ডল আজ আরও সুন্দর, মধুর মনে হইতেছিল"—লিখছেন স্বামী সারদেশানন্দ।[১০] মায়ের এক সন্তান হলুদ ও খয়েরি গাঁদা ফুলের মালা গেঁথেছিলেন। প্রথমে কপিল মহারাজ মালাটি মায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। "লম্বিত মালা শুভ্রবস্ত্র ও কৃষ্ণকেশের উপর দিয়া নিচে ঝুলিয়া পড়িয়া অতিশয় শোভমান হইয়াছিল, মার মুখমণ্ডলও আজ অসাধারণ শ্রীমণ্ডিত বোধ হইতেছিল। গৃহের অভ্যন্তর সুসজ্জিত নৈবেদ্যাদি, সুন্দর পুষ্পাদি, সুগন্ধ ধূপ ও উজ্জ্বল দীপাদি সুশোভিত হইয়া দেবলোকের ভাব আনয়ন করিয়াছিল।" ধন্য তাঁরা যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন সেই অপরূপ মুখশ্রী কীভাবে 'অসাধারণ শ্রীমণ্ডিত' হয়ে উঠল।

একে একে সকলেই—প্রথমে প্রাচীন সাধুরা ও তারপর ব্রহ্মচারী আর ভক্তেরা—মায়ের শ্রীচরণে ফুল দিয়ে প্রণাম করলেন। পরিবেশের গাম্ভীর্যে সকলেই কেমন অভিভূত হয়ে পড়লেন। কিছু কৌতূহলী দর্শক ছিলেন, তাঁরাও পরম ভক্তি সহকারে মাকে প্রণাম করলেন। সুপ্রসন্নতার সঙ্গে পূজা গ্রহণ করেই কিন্তু মা সকলকে জলখাবারের তাড়া দিলেন। জলখাবার খেয়ে ভক্তেরা পরম আনন্দে ভজন-কীর্তনে মেতে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ নিবেদনের পরেই নলিনীদিদির ঘরে সেই গালিচার আসনটি পেতে, থালা গেলাস দিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ সুন্দর করে সাজিয়ে মাকে ডাকা হল।[১১] মা কোনওদিনই তাঁর ছেলেদের আগে খেতেন না। তাদের খাইয়ে তিনি মেয়েদের নিয়ে খেতে বসতেন। এইদিন ছেলেদের বিশেষ ইচ্ছা যে মা আগে খাবেন, তাঁরা প্রসাদ পাবেন। একজন আগ্রহী সন্তান মায়ের কাছে তাঁদের মনোবাসনা জানালে মা আপত্তি করেননি। কিন্তু আমরা এক মর্মস্পর্শী পরিস্থিতি দেখতে পাই। যখন ডাকা হল, মা যন্ত্রচালিতের মতো আসনে গিয়ে বসলেন, যা যা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল সব দেখলেন, একটু আধটু মুখে দিলেন, তারপর সেই সন্তানের (স্বামী সারদেশানন্দ) দিকে চেয়ে কাতরভাবে বললেন, "ছেলেদের খাওয়ার আগে গলার নিচে যায় না, তাড়াতাড়ি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর।" এই বলেই তিনি উঠে পড়লেন। হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরের দরজার সামনে বসলেন তাদের খাওয়া দেখতে। ছেলেরা তখনই খেতে বসলেন। মা শান্তি পেলেন কিন্তু সন্তান-হৃদয় ব্যথায়, তীব্র অনুশোচনায় মথিত হল, কারণ মার সেদিন খাওয়াই হল না।

ডিসেম্বর মাসে উদ্বোধন বাড়িতে খুব ধূমধাম করে জন্মোৎসব পালন করেন শরৎ মহারাজ। সে বছর দুর্গাপুজোর সময়ে মা অসুস্থ থাকায় ভক্তেরা আশ মিটিয়ে আনন্দ করতে পারেননি।[১২] এইসময় মায়ের শরীর একটু ভালো থাকাতে মহারাজ উৎসবের বিরাট আয়োজন করেন। অবশ্যই মায়ের অনুমতি নিয়ে। ছাদে সামিয়ানা খাটিয়ে এক পাশে রান্নার আর এক পাশে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ছাদে 'বিরাট ভোগে'র আয়োজনে ছিল খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, কপির তরকারি, পেঁপের চাটনি, পায়েস, দই, মিষ্টি। নিচে ঠাকুরের ভোগের জন্য রকমারি নিরামিষ পদ রেঁধেছিলেন যোগীন-মা।

সেদিন সকালে গঙ্গাস্নান সেরে বাড়িতে ফিরে যোগীন-মার ব্যস্ততা লক্ষ্য করে মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "এসব কি গো যোগেন?" মায়ের দিয়ে একটু চেয়ে থেকে, গভীর প্রীতির সঙ্গে মার চিবুক স্পর্শ করে যোগীন-মা বললেন—"আজ যে তোমার জন্মতিথি, মা!" ভুবনভুলানো হাসি হেসে মা বললেন, "ও মা তাই?" পূজান্তে এক ভক্তের দেওয়া তসরের কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা পরে মা বসেছিলেন তাঁর ঘরে খাটের দক্ষিণ দিকে মাটিতে পা রেখে। ওই শুভবাসরে যোগীন-মাকে মা নিজেই সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "মা যোগীন, তোমার তো খপ্ কোরে হবেনি। তুমি আসে এসো, এইবেলা। এর পর ভিড় বাড়বে। ফাঁক পাবে না।" প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী নির্লেপানন্দ 'দেবী সারদামণি' গ্রন্থে লিখেছেন, "যোগীন-মার পেন্নাম। সে একটা চুপিচুপি দেখবারই ব্যাপার। ... বহুক্ষণ ধরে মার শ্রীপদে মাথা রেখে প্রণতি নিবেদন, পুষ্পার্ঘ্যদান। দাঁড়িয়ে উঠেও ভাবের ঘোর কাটেনি। যেন টলছেন। মা মাথায় হাত বুলুচ্ছেন।... দেখলাম, মার মুখ দিয়ে আনন্দ ঠিকরে, ফেটে বেরুচ্ছে।"[১৩] ভক্তরা এক এক করে পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম কবলেন। কেউ ফলমূল, কেউ কাপড়, কেউ গিনি দিয়ে প্রণাম করলেন। ঘরের অর্ধেক ভরে গিয়েছিল পুষ্পাঞ্জলির ফুলে।

শরৎ মহারাজকে যোগীন-মা ডাকলেন মাকে প্রণাম করতে। সরলা দেবী (প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) লিখেছেন যে শরৎ মহারাজ, 'আনন্দে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, আবেগে কম্পিত পদে' ঠাকুরঘরে ঢুকে কোনওমতে মাকে প্রণাম করেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। যোগীন-মা ডাকলেন, "কই পুষ্পাঞ্জলি দিলে না?" মহারাজের হাতে ফুল দেওয়া হলে তিনি 'কম্পিত হস্তে' পুষ্পাঞ্জলি দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। স্বয়ং ঠাকুরের পার্ষদ, অমন রাশভারী, গম্ভীর মেজাজের মানুষ—মাতৃসান্নিধ্যে এসে তাঁর এই অপূর্ব সম্ভ্রমের কারণ তিনি জানতেন মা সাক্ষাৎ ভগবতী। একই অবস্থা হত স্বামী বিবেকানন্দের, স্বামী ব্রহ্মানন্দের, স্বামী প্রেমানন্দ ও অন্যান্যদের।

প্রণাম নেওয়া তখনকার মতো শেষ হলে মা দুটি আসন নিয়ে সিঁড়ির পাশের বড়ো ঘরটিতে গেলেন ও যাওয়ার সময় ঠাকুরকে ডেকে গেলেন, "এসো, খাবে এসো।" আসন দুটির একটি ঠাকুরের জন্য। একটি তাঁর নিজের জন্য। পরে ছাদে গিয়ে ঠাকুরকে 'বিরাট ভোগ'ও তিনি নিজেই নিবেদন করেন।[১৪]

সারাদিনের আনন্দোৎসবের শেষে ক্লান্ত মা যখন বিশ্রাম নেবেন, জ্ঞান মহারাজ তাঁর অনুগত একদল কিশোর নিয়ে উপস্থিত হলেন। এদের তিনি অধ্যাত্ম-পথে চলার উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। সে-কারণেই এই বিশেষ দিনে মাকে দর্শন ও প্রণাম করাতে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা গলিতে দাঁড়িয়েছিলেন। উপরে খবর যেতে মায়ের ঘরের বারান্দা থেকে রাসবিহারী মহারাজ বললেন, "সমস্ত দিন ভক্তদের দর্শন দিয়ে মা এখন ক্লান্ত। জ্ঞান মহারাজ একা মাকে প্রণাম করে যেতে পারেন।" জ্ঞান মহারাজ নিচের থেকেই উত্তর দিলেন যে তাঁর সঙ্গী ছেলেরা যদি দর্শন ও প্রণামের সুযোগ না পায় তাহলে তিনি নিজেও নিচের থেকেই মাকে প্রণাম জানাবেন। এই কথা মা শুনে থাকবেন। সম্ভবত তাঁর নির্দেশেই রাসবিহারী মহারাজ সকলকেই উপরে যেতে বললেন। মা তাঁর ঘরের সামনে একটি চেয়ারে বসেছিলেন, আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা, শুধু শ্রীচরণদুটি বার করা। এক এক করে সবাই প্রণাম করলেন চরণস্পর্শ করে।

ওই দলে ছিলেন কিশোর বিজয়চন্দ্র, পরবর্তী কালে স্বামী ভূতেশানন্দ। এই স্মৃতিচারণটি তাঁরই।[১৫] মাকে স্থূলদেহে তাঁর ওই প্রথম ও শেষ দর্শন। হয়তো সঙ্ঘজননী জানতেন ওই কিশোরদের দলে আছেন সঙ্ঘের ভাবী অধ্যক্ষ।

সেবার ভক্তদের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া শেষ হলে মা বরদা মহারাজকে (স্বামী ঈশানানন্দ) ডেকে তাঁর পায়ে ফুল দিতে বললেন।[১৬] পরে তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, "জয়রামবাটীর ও কোয়ালপাড়ার সকলের হয়ে সকলের নাম করে পায়ে ফুল দাও। মঠের তারক ওরা আসতে পারেনি। আজ বিশেষ দিন। আমার জানা অজানা সকলের হয়ে ফুল দাও।" বরদা মহারাজ তাঁর আদেশ পালন করলে পরে তিনি গলবস্ত্রে, হাতজোড় করে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সকল সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। "ছলছলনেত্রে বলিলেন, 'ঠাকুর! সকলের ইহকাল পরকাল দেখো। আমি সকলের মা, আমি আর কি বলব!"

'আমি সকলের মা'—কী অপূর্ব উদ্ঘোষণ! দেবীসূক্তের তেজোদৃপ্ত 'অহং রাষ্ট্রী'র মতোই মহিমান্বিত। যিনি রাজরাজেশ্বরী, পরমাপ্রকৃতি, সাক্ষাৎ ভগবতী, নিজ স্বরূপ প্রকাশে তাঁর কী অপূর্ব দৈন্য! হৃদয় জুড়ে কেবল সন্তানের মঙ্গল কামনা। যাদের জানেন না সেই সন্তানদের হয়েও ফুল দিতে বলছেন। এই বলায় লেশমাত্র অহংবোধ নেই, আছে বিশুদ্ধ মাতৃভাবের প্রকাশ।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর থাকাকালীন শেষ জন্মোৎসব পালিত হয় জয়রামবাটীতে। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ লিখছেন,[১৭] "তাঁর শুভ জন্মতিথির দিন উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীমা বেশি ঝঞ্ঝাট করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'ভক্ত ছেলেগুলি যারা আছে আর প্রসন্ন, কালীদের বাড়ির সবাইকে বলে দাও।' কালীমামা সেই শুনে বললেন, 'দিদি, বোষ্টম ভিখারি আছে।' শ্রীশ্রীমা বললেন, 'থাম, ঘরের বোষ্টম আগে সামলাই, তারপর তোর বোষ্টম ভিখারি হবে।' "

এইপ্রসঙ্গে স্বামী ঈশানানন্দ বলছেন[১৮] যে, জন্মতিথির কয়েকদিন আগে থেকেই কালীমামা ঘন ঘন মায়ের কাছে আসা-যাওয়া করতেন, খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি চাইতেন যে সব ভার তাঁকে দেওয়া হয়। "লোকজন অনেক হবে, হাটবাজারও সেই আন্দাজে করতে হবে। বরদা ছেলেমানুষ, সব সামলাতে পারবেনি।"

আগেই বলেছি জয়রামবাটীর উৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায় ছিল মায়েরই। সংক্ষেপে বাজার-হাট সারার জন্য বরদা মহারাজকেই মায়ের সব ভার দেওয়ার ইচ্ছা কিন্তু কালীমামাকে প্রসন্ন রেখে চলতে হত অশান্তি এড়াতে। তিনি বললেন, "দেখ বরদা, এবারে কোতলপুরের হাট কালীকে দিয়েই করাতে হবে, কদিন থেকে এর জন্য সে ঘোরাঘুরি করছে.. শেষে চটেমটে একটা কাণ্ড বাধাবে।" কাণ্ড বাধানোর প্রবণতা ভালোই ছিল কালীমামার। তাই মা তাঁকেই বাজারের ভার দিলেন। উৎসবের সব ভার তাঁর উপরে থাকায় কালীমামা মহোৎসাহে সব দেখাশোনা করলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এইরকমই আর এক উৎসবের একটি ঘটনা। সেদিনও মা কালীমামাকেই সব ভার দিয়েছিলেন আর মামাও সারাদিন খোশমেজাজে ছিলেন। কিন্তু বিকেলে গোপেশ মহারাজ (স্বামী সারদেশানন্দ) দেখলেন মা তাঁর ঘরের বারান্দায় 'ম্লানমুখে' বসে আছেন। অন্যান্য সকলেই তখন খাওয়া-দাওয়া করে কাজকর্ম সেরে বিশ্রাম করছেন। গোপেশ মহারাজ মাকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, "বাবা, এই কেলে সর্বনেশে যত নষ্টের গোড়া। অকারণ

আমাকে যন্ত্রণা দেয়। এই দেখ, সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, ওর খাবার নিয়ে আমি বসে আছি। 'আসি', 'আসি' করে এখনও আসছে না। আমিও বিশ্রাম করতে পারছি না।" কালীমামা চেয়েছিলেন উৎসবের সর্বময় কর্তৃত্ব, কোথাও কোনও ত্রুটি হয়ে থাকবে, তাই মাকে 'শিক্ষা দিতে উদ্যত' হয়েছেন। গোপেশ মহারাজ মামার খোঁজে বেরিয়ে দেখেন মামা খামারে ধানের খড় জড়ো করছেন। "তাঁহার চোখে-মুখে ক্রোধের জ্বালা দেখিয়া আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া গোপেশ মহারাজও খড় জড়ো করিতে লাগিয়া গেলেন। একটু পরেই মামার ক্রোধ জল হইয়া গেল; তিনি বলিলেন, 'বাবা, তুমি এখানে কেন এত কষ্ট করতে এসেছ?' গোপেশ মহারাজ সুযোগ বুঝিয়া কহিলেন, 'মা ভাত নিয়ে বসে আছেন।' মামা বলিলেন, 'দিদি খাবার নিয়ে বসে আছেন, তাতো জানিনি; চল।' শ্রীমা তাঁহাকে পাইয়া খুব খুশি হইলেন এবং সাদরে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন—যেন কিছুই হয় নাই।"[১৯] ক্ষমারূপা তপস্বিনী!

কলকাতা থেকে আসা সব জিনিসপত্রের মধ্যে শরৎ মহারাজের পাঠানো একটি সাদা র‍্যাপার ছিল। সেইসঙ্গে ছিল মায়ের কাছে যোগীন-মা প্রভৃতিদের একান্ত প্রার্থনা যাতে তিনি সেটি নিজে ব্যবহার করেন, বিলিয়ে না দেন।

মায়ের সেদিন শরীর ভালো ছিল না। সামান্য তেল মেখে অল্প গরমজলে গা মুছেছেন। শরৎ মহারাজের পাঠানো শাড়িটি পরে পূজান্তে রাধারানীর ছেলেটিকে কোলে নিয়ে মা চৌকিতে বসলেন। সমবেত ভক্তরা একে একে ফুলচন্দন দিয়ে মায়ের পাদপদ্ম পূজা করলেন। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ মাকে একটি গাঁদা ফুলের মালা পরালেন। তারপর তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বললেন, "মা, আজ আপনার জন্মদিন, অনেকের ইচ্ছা আজ আপনাকে দর্শন ও পূজাদি করেন কিন্তু তাঁরা এই দুর্গম দেশে আসবার সুযোগ পান না। আজ এই বিশেষ দিনে আমি সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। সকলের যাতে মঙ্গল হয় সেই আশীর্বাদ করুন, মা।"[২০]

জয়রামবাটীর যামিনী দেবীর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় সেদিন। তিনি স্মৃতিচারণ করছেন : "মা স্নান করিয়া ভক্তদের দেওয়া অনেকগুলি কাপড়ের ভিতর হইতে শরৎ মহারাজের দেওয়া কাপড়খানি বাহির করিয়া পরিলেন। আমি মার কপালে সিঁদুর চন্দন, গলায় ফুলের মালা ও পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া মুখের দিকে চাইতেই দেখি, তাঁহার আগেকার রূপ যেন নাই, চকিতের মধ্যে এক ভীষণ সুন্দর, অপূর্ব, অপার্থিব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে রূপের বর্ণনা ভাষায় দিতে পারি না। খানিক পরেই তিনি পূর্বের মত হইয়া গেলেন, আমাকে বলিলেন এস মা, প্রণাম কর।"[২১]

এইদিনে মায়ের অতি-মর্ত-চরিত্রের একটি অসাধারণ পরিচয় আমরা পাই স্বামী সারদেশানন্দের কাছ থেকে।[২২] "সাধুভক্ত সকলেই পূজার আয়োজন, দ্বিপ্রহরে ভোগের জন্য রন্ধন, ভজন-কীর্তন ইত্যাদিতে ব্যস্ত।" সেইসময় তিনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখেন শ্রীমা সেজমামীর জন্য পথ্যের ব্যবস্থা করছেন। "অদ্য তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব চলিতেছে। কিন্তু তাঁহার নিজের দৃষ্টিতে তিনি যেন কিছুই নহেন...। তিনি স্বাভাবিক, শান্ত ধীরভাবে মাছ কুটিয়া ঘাটে ধুইয়া আনিলেন, রান্নাঘরের বারান্দায় স্বয়ং ঝোল রান্না করিয়া সেজমামীর বাড়িতে গিয়া দিয়া আসিলেন। এইসব কাজের জন্য তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখে একটুও বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল না।" অথচ সেবক-ভক্তদের যাঁকেই তিনি আদেশ দিতেন তিনিই হাসিমুখে

এই কাজটুকু নিষ্পন্ন করতেন। উপস্থিত সন্তান মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবলেন, "পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ততা কি এই?"[২৩] সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিতা কিন্তু সংসারের নন, in the world but not of the world.

জয়রামবাটীর এই জন্মদিনে মায়ের লীলা সংবরণের সূচনা। সেইদিনই বিকেলে জ্বর আসে। এই জ্বর আর তাঁকে ছাড়েনি।

কোথায় হারিয়ে গেছে সেই দিনগুলি, যখন ভক্তের মাকে প্রণাম করার চেয়ে মনে হয় মায়ের প্রণাম নেওয়ার আগ্রহ ছিল বেশি। সেই অপার্থিব মাতৃস্নেহ স্মরণ করে ভক্তের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে—"মনে হয়, 'পাখি হয়ে উড়ে যাই' সেখানে, সেই বারান্দায়, যেখানে আসন বিছিয়ে জলের গ্লাস ও কাঁসিতে গুড়-মুড়ি, পাতায় প্রসাদী ফল-মিষ্টি রেখে দরজার দিকে মা চেয়ে আছেন সস্নেহ নয়নে, ব্যগ্র হয়ে 'বৎসের প্রতীক্ষায় গাভীর ন্যায়।' "[২৪] প্রতিটি উৎসবে, ছোটো বা বড়ো, ছিল সেই ব্যগ্রতা, সন্তানের কল্যাণার্থে জগজ্জননীর প্রণাম নেওয়ার একান্ত আগ্রহ। সভা-সমাবেশে, স্তবপাঠ ভজন-কীর্তনে—কোথাও কি তার লেশমাত্র পাব? তাই দেড়শো বছরের উৎসবে সেই মধুময় দিনগুলির স্মৃতিতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সারদা সে বালিকা

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

জয়রামবাটীতে একবার শ্রীশ্রীমার ভাই কালীকুমারের সঙ্গে নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষের খুব তর্ক বেধেছে। কালীকুমার বলছেন, "তোমরা দিদিকে 'মা জগদম্বা, জগজ্জননী' ইত্যাদি কতই বল। কই, আমরা এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি—আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।" গিরিশবাবু সেকথা শুনে মহা বিরক্ত। তিনি তাঁর দৃপ্ত, গম্ভীরকণ্ঠে তাঁর নিজস্ব অনুভবের কথা প্রকাশ করছেন। প্রতিপন্ন করছেন সারদা দেবীই সাক্ষাৎ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া এবং শেষকালে আদেশের সুরে কালীকুমারকে বলছেন, "যাও, যদি ইহ ও পরজন্মে মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও। আমি বলছি, যাও।" কালীকুমার আর কী করেন। সাধারণ পাড়াগেঁয়ে মানুষ। তিনি কি আর শাস্ত্রজ্ঞ মানুষের সঙ্গে তর্কে পারেন? গিরিশ ঘোষের আদেশ শুনে বাধ্য ছেলেটির মতো তিনি সারদা দেবীর কাছে গিয়ে তাঁর পা-দুটি ধরে শরণ নিতে চাইলেন। কিন্তু সারদা দেবী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি তাঁকে নিরস্ত করলেন। স্নেহমাখা গলায় ভর্ৎসনা করে বললেন, "ওরে কালী, আমি তোর সেই দিদি। আজ তুই এ কি করছিস?"[১]

আর একদিনের কথা। জয়রামবাটীতে তখন দূর-দূরান্ত থেকে নিয়মিত ভক্তসমাগম হচ্ছে। তাঁরা একটিবার শ্রীশ্রীমার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করে আসছেন, মায়ের মহিমা কীর্তন করছেন, ভক্তিভরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। গ্রামের চৌকিদার অম্বিকা বাগদির এসব দেখেশুনে ভারি অবাক লাগে। তাদের গ্রামের এই মেয়েটি যাকে সে তাঁর ছেলেবেলা থেকে চেনে, শহুরে শিক্ষিত ভদ্রজনের কাছে তাঁর হঠাৎ এত খাতির-সম্মান কেন? সে আর থাকতে না পেরে একদিন সারদা দেবীকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসে, "লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কি বলে; আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না।" মা সারদা মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমার বুঝে দরকার কি? তুমি আমার অম্বিকা দাদা, আমি তোমার সারদা বোন।"[২]

ঈশ্বরের মর্তলীলার কালে নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশীরা তাঁকে চিনতে কিছুটা সময় নেন। এ-ঘটনা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা, বুদ্ধ, চৈতন্যদেব ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। শ্রীমাও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু তবু এই দুই ঘটনা অন্য কারণে অভিনব এবং উল্লেখ্য। কারণ এই দুটি ক্ষেত্রেই সারদা দেবী দুই অবোধ ব্যক্তির কাছে একদম অন্যরূপে নিজেকে ধরা দিয়েছেন।

'অন্যরূপে' অর্থাৎ সারদা মায়ের যে প্রচলিত মাতৃরূপ সেই পরিচিতি থেকে সরে গিয়ে। বাস্তবিক, ঠাকুরের সন্তানদের দেখানো পথকেই শিরোধার্য করে, রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে

সারদা দেবী বরাবর মাতৃরূপে পূজিতা। এই ভক্তমণ্ডলী 'ঠাকুর' বলতে যেমন শুধু রামকৃষ্ণদেবকেই বোঝে, তেমনি 'মা' বলতে, না, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মা কালীকে বোঝে না, বোঝে সঙ্ঘজননী সারদা দেবীকেই।

তাঁর স্বীকৃত জীবনীগ্রন্থগুলির নাম স্মরণ করুন : 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে', স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা', স্বামী পরমেশ্বরানন্দের 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী', আশুতোষ মিত্রের 'শ্রীমা', স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী', স্বামী নিরাময়ানন্দের 'শ্রীশ্রীমা সারদা', Chandra Kumari Handoo-র 'Glimpses of the Holy Mother', Winifred Iles-র 'The Mother Sarada Devi', স্বামী নিখিলানন্দের 'The Holy Mother'—তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। বোঝা যাচ্ছে, সারদা দেবীকে নিয়ে যাঁরা গবেষণামূলক কাজ করেছেন, আকর গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরাও তাঁকে 'মা' ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারছেন না; বা চাইছেন না।

কোনও সন্দেহ নেই, এ-ব্যাপারে সারদা দেবীর নিজেরও প্রশ্রয় আছে পুরোপুরি। তিনি বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের এই মাতৃপরিচয়টিকেই ভক্তহৃদয়ে পাকাপাকিভাবে গেঁথে দিতে চেয়েছেন। কখনও বলেছেন, "কেউ 'মা' বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারব না।" কখনও বা, "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" আবার কখনও, "মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।"

শুধু তাঁকে 'মা' হিসেবে স্বীকার করা নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, তাঁর পরিবারের মানুষগুলিকে পর্যন্ত ভক্তরা সেই পরিচয়েব সূত্রে গ্রহণ করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ তাঁর লেখা 'শ্রীমা সারদা দেবী' জীবনীগ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন, "শ্রীশ্রীমায়ের মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রীরা রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে যথাক্রমে দিদিমা, মামা, মামী ও দিদি বলিয়া পরিচিত। এই গ্রন্থে আমরাও এইরূপ উল্লেখ করিব।"[৩] যেমন কালীকুমারকে 'মেজোমামা', প্রসন্নকুমার বা বড়োমামার কন্যাকে 'নলিনীদিদি', অভয়চরণ বা ছোটোমামার অপ্রকৃতিস্থ স্ত্রী সুরবালাকে 'পাগলিমামী'। সঙ্ঘজননীর প্রতি এমন আত্মীয়তাবোধ আর কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আছে বলে জানা নেই। এমনকি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আত্মীয়স্বজনদেরও ভক্তমণ্ডলী এমন আপন করে নেয়নি।

এখন এই যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভক্তরা সারদা দেবীকে শুধু 'মাতা' হিসেবেই মেনে এসেছে, সেই প্রচলিত রীতি ভেঙে, সেই দীর্ঘকালীন অভ্যেস থেকে সরে এসে তাঁকে কালীকুমারের দিদি হিসেবে, বা অম্বিকা চৌকিদারের বোন হিসেবে--অর্থাৎ এক স্নেহাস্পদ বালিকা হিসেবে কল্পনা করতে গেলে একটা খটকা লাগবেই। অথচ মাতৃমূর্তিকে কন্যারূপে কল্পনা করে তাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধার এক হৃদয়স্পর্শী ঐতিহ্য ভারতবর্ষের ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খুব পরিচিত পথ। বোধনের দিনে মা-দুর্গাকে বাড়ির মেয়ের মতো সমাদরে আহ্বান, আবার বিজয়ার দিন তাকে চোখের জলে বিদায় জানানো আমাদের প্রতিবছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেখানে 'গৌরী আমার এসেছিল' বলে আর্দ্রসুরে আনন্দ প্রকাশ করলে মায়ের অসুরদলনী, দুর্গতিনাশিনী রূপ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। তাহলে সারদা মাকে কখনও কখনও ভক্তের ইচ্ছায় বালিকারূপে আঁকতে গেলে আমাদের কুণ্ঠা হবে কেন?

সারদেশানন্দ মহারাজ স্মৃতিচারণ করেছেন, "যাঁহার স্নেহসুধায় প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, তিনিই মা। আবার পুলকিত প্রাণের স্নেহধারা যাঁহার দিকে ধাবিত হয়, তিনিই মেয়ে; জয়রামবাটীতে

প্রবীণ ভক্তগণের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই দুই ভাবের জোয়ার-ভাঁটা খেলিত!"[৪] অথচ তিনিই আফশোস করেছেন, "পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর লীলাকথার আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রকাশিত পুস্তকসমূহে সেই অদ্ভুত মানবীলীলার বড়ই বিচিত্র, অতীব হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যেও তাঁহার চরিত্র মাধুর্য—বিশেষভাবে 'একাধারে মা ও মেয়ে'—সম্যক পরিস্ফুট করিতে পারা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, যদিও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ও জীবনীচরিতে এখানে-সেখানে—চকিত চপলার ন্যায়, সেই সব চিত্রে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র।"[৫]

কেন 'মা'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'মেয়ে'-র রূপটি বা বালিকার রূপটি সমান সজীবতায় পরিস্ফুট করা যায়নি, সে প্রশ্ন নিয়ে বিশদ আলোচনায় যাওয়া বৃথা। সারদা দেবীকে কন্যা হিসেবে যাঁরা দেখতেন তাঁরা কোনও নির্ভরযোগ্য স্মৃতিচিত্র রেখে যাননি, যা অবলম্বন করে আমরা পরবর্তী প্রজন্ম এগোতে পারতাম, এটা হয়তো একটা কারণ হতে পারে। তাঁকে বরাবর মাতৃরূপে পূজা করার যে রীতি বা অভ্যেস সেটিও নিশ্চয় আমাদের অন্যরকম ভাবনায় বাধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া এটাও ঠিক, রামকৃষ্ণদেব যত সহজে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর বালক স্বভাবকে ভক্তসকাশে প্রকাশ করতেন, সারদা দেবীর পক্ষে লৌকিক এবং সামাজিক কারণেই তা সম্ভব হয়নি। তাই চপলা বালিকা রূপের বদলে লোকশিক্ষক হিসেবে অবগুণ্ঠনবতী মায়ের রূপটিই তাঁর পক্ষে বেশি অভিপ্রেত ছিল।

কারণ যাই-ই হোক, সে-প্রসঙ্গ এখন থাক। আজ, তাঁর জন্মসময় থেকে দেড়শত বৎসরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে, সেই সামাজিক বাধ্য-বাধকতাকে অস্বীকার করার মতো মনস্কতা অর্জন করে, আধুনিক খোলা মন নিয়ে এক নতুন পথে যদিও তাঁর কাছে যেতে চাই; 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' যদি বালিকারূপে আমরা আজ সারদা দেবীকে খুঁজতে যাই—তাহলে কোনও সন্দেহ নেই, সেই পথ আমাদের সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যের অনুসারীই হবে এবং কালীকুমারের বড়োদিদি বা অম্বিকা চৌকিদারের সারদা বোন আমাদের সস্নেহ সমর্থনই জানাবেন।

তাঁর সমগ্র জীবনচিত্র পর্যবেক্ষণ করতে করতে আমরা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব কখন কখন 'চকিত চপলার ন্যায়' দেখা দিয়ে যায় সেই নিষ্পাপ ফুটফুটে মেয়েটি—সারদার জন্মের কিছুদিন আগে তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে যে মেয়ে বলেছিল, "এই আমি তোমার কাছে এলুম", মাতা শ্যামাসুন্দরীর পিঠের দিক থেকে গলা জড়িয়ে ধরে যে বলেছিল, "আমি তোমার ঘরে এলাম, মা"। অপ্রচলিত, অল্পপরিচিত পথে সে এক অন্য সারদাকে খুঁজে ফেরা। সে এক পবিত্র অন্বেষণ।

সারু—সারি—সারদা

ঠাকুর বলতেন, "ও সারদা—সরস্বতী—।"

কিন্তু কে সারদা? ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩-র রাত্রে রামচন্দ্র আর শ্যামাসুন্দরীর ঘর আলো করে যে কন্যাসন্তান জন্মাল তার নাম রাখা হল ক্ষেমঙ্করী। রাশ্যাশ্রিত নাম ঠাকুরমণি। সেখান থেকে 'সারদা' হয়ে ওঠার পেছনে আছে অন্য এক দুঃখী মাকে শান্ত করার আকূতি। শ্যামাসুন্দরীর আগে তাঁর এক বোনের এক কন্যাসন্তান জন্মায় এবং অল্পদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। সেই শিশুটির নাম দেওয়া হয়েছিল সারদা। শোকসন্তপ্তা সেই মা শ্যামাসুন্দরীকে

বললেন "দিদি, তোর মেয়ের নামটি বদলে সারদা রাখ; তাহলে আমি মনে করব আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে... ।"[৬] সেই থেকে ক্ষেমঙ্করীর নাম বদলে হল সারদামণি।[*] বাবা-মায়ের আদরের সারু, সারি, সারদা।

গরিব চাষী পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে খুব ছেলেবেলা থেকে সারদাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। ঘরের কাজ, বাইরের কাজ, ছোটো ছোটো ভাইবোনদের সামলানোর কাজ। বড়ো হয়েও তার স্পষ্ট মনে পড়ে, "ছেলেবেলায় গলা-সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।"[৭] মেজোভাই কালীকুমার বলতেন, "দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কি না করেছেন! ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজই তো দিদি করেছেন।"[৮] এমনকি সংসারের প্রয়োজনে সারদাকে কখনও কখনও রান্নাতেও হাত লাগাতে হত। কিন্তু রান্না কোনওরকমে সাঙ্গ করলেও ওই কোমল অপটু হাতে গরম, ভারি পাত্রগুলি উনুন থেকে নামাতে পারত না সারু। তাই ডাক পড়ত বাবার। ঘরের কাজে জল আনতে কলসী কাঁখে পুকুরঘাটে যেতে হত। সেই সুযোগে কলসী ধরে ধরে সাঁতার শেখাও হয়ে গেল সারদার।

গ্রামে আসত যাত্রাগান, কথকতা, কীর্তন, বাউলের দল। গ্রামের আরও পাঁচটা মেয়ে জুটিয়ে সারদা সেখানে একাগ্র শ্রোতা। ছেলেবেলায় শোনা কত গ্রাম্য 'শোলোক' তার মনে এমন গেঁথে যেত যে বড়ো হয়ে যুৎসই প্রাসঙ্গিকতায় অবিকল মুখস্থ বলতে পারত সেসব। লোকসংস্কৃতির এই মাধ্যমগুলি দিয়েই তখন পল্লীবাংলার শিক্ষাপ্রসার, আমোদ-প্রমোদ।

তবে শুধু আমোদ নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে সারদার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটছিল মানুষের দুর্দশার সঙ্গেও। ঘরের ভেতরে দারিদ্র্য তো আছেই। তার ওপর এগারো বছর বয়সে সারদা মুখোমুখি হল এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের। খিদের জ্বালা মানুষকে কেমন দিশেহারা বোধবুদ্ধিহীন করে দেয় সে স্মৃতি সারা জীবন সারদাকে তাড়া করে ফিরেছে, "ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে। একদিন একটি বাগদী না ডোমের মেয়ে এসেছে—মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মতো। ছুটে এসে গরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজানো ছিল, তাই খেতে আরম্ভ করেছে!"[৯]

এই ভয়াবহ স্মৃতির সূত্রেই এসে পড়ে সারদার বাবার সহৃদয়তার কথা। আগের বছরের জমানো কিছু ধান আর, কলায়ের ডাল ছিল তাঁর সম্বল। আর ছিল তাঁর এক বিরাট স্বার্থশূন্য হৃদয়। নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে ওই সঞ্চিত চাল-ডালের খিচুড়ি রেঁধে তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের বাঁচার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষ যাঁরাই আসতেন গরম খিচুড়ি তাঁদের পাতে ঢেলে দেওয়া হত আর শিগগির জুড়োবে বলে সারদা পরম মমতায় তার ছোটো ছোটো হাত দুখানি দিয়ে প্রাণপণে বাতাস করত।

এমন বাবার ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছে যে মেয়ে সে তো হৃদয়-সম্পদে ধনী হয়ে উঠবেই। অন্য আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের থেকে সে হবেই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। খেলার সাথী অঘোরমণি যেমন মনে রেখেছিলেন সারদা কেমন সাদাসিধে ছিল। সরলতা যেন তার মধ্যে মূর্তিমতী। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলায় মাতত। কিন্তু কখনও তার সঙ্গে কারও ঝগড়া হয়নি। অন্য মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া বাধলে বরং সে এগিয়ে এসে সব মিটমাট করে দিত। তাই

স্বাভাবিকভাবেই খেলার আসরে সে সাজত কর্তা বা গিন্নি। অন্যদের মতো পুতুল গড়ার খেলা খেলত সে-ও। কিন্তু সে গড়ত কালী বা লক্ষ্মীর মূর্তি। তারপর ফুল-বেলপাতা দিয়ে তার পুজো করত।

এই পুজোর প্রসঙ্গেই অঘোরমণি আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা মনে রেখেছেন: গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে। প্রতিমার সামনে সারদা একমনে ধ্যানে বসে। হলদেপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল মশাই সেসময় ঠাকুর দর্শন করতে এসে সারদাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল, মাতৃপ্রতিমার সঙ্গে এই ছোটো মেয়েটি যেন মিলেমিশে যাচ্ছে, তিনি যেন কিছুতেই আলাদা করতে পারছেন না। অনেকক্ষণ বিমূঢ়ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও কূল-কিনারা করতে না পেরে তাঁর মনে কেমন এক ভয়ের উদয় হল। তিনি দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে এলেন।

সারদামণিকে ঘোষাল মশাইয়ের জগদ্ধাত্রীরূপে দর্শন তার বাল্যজীবনের একটি বিচ্ছিন্ন অলৌকিক ঘটনা নয়। বরং এই অলৌকিকত্বের অনুষঙ্গ আরও স্পষ্ট হয় সারদার নিজের স্মৃতিচারণেই, "ছেলেবেলায় দেখতুম আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত—আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ এগার বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল।"

এমন অভিজ্ঞতা সারদার আবার হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি কামারপুকুরে গিয়ে। সেখানে আটটি মেয়ে—অষ্টসখী তাকে আগলিয়ে নিয়ে গিয়ে রোজ হালদারপুকুরে স্নান করিয়ে আনত।

গম্ভীরানন্দ মহারাজ এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "দৈব বিধানে তাঁহার শৈশব ও বাল্য অলক্ষিতে অলৌকিক শক্তিতেই পরিবেষ্টিত ছিল।"[১০] থাকারই তো কথা। এক বিরাট কাজের দায়িত্ব নিতে হবে যে সারদামণিকে। তাকে তাই আগলে রাখার, শিখিয়ে পড়িয়ে প্রস্তুত করে তোলার দায়িত্ব তো সেই পরম পুরুষেরই।

প্রস্তুতিপর্ব

শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার কথা বলছি বটে। কিন্তু সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ আর কতটুকু। নেহাত খুব আগ্রহ ছিল, তাই যখন যতটুকু সুযোগ পেয়েছে সারদা তার সদ্ব্যবহার করেছে। জয়রামবাটীতে থাকার সময় বড়োভাই প্রসন্নকুমার আর রামনাথের সঙ্গে কখনও কখনও পাঠশালায় যাওয়ার সুযোগ হত। তাতেই লেখাপড়ার হাতেখড়ি। তারপর কামারপুকুরে শ্বশুরঘর করতে এসে লক্ষ্মীর সঙ্গে 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়া শুরু হল। কিন্তু তাতেও নানান বাধা। 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগটি কোনওরকমে শেষ করে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম লাইনের 'ঐক্য, মাণিক্য, কুবাক্য' পর্যন্ত শিখতেই ভাগনে হৃদয় একদিন জোর করে বই কেড়ে নিল। বলল, "মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখা ভালো নয়। তাহলে চরিত্র ভালো থাকবে না, চুপি চুপি ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে চিঠি লেখা লিখি করবে ও নাটক-নভেল পড়বে।"[১১] সারদা আর কী করে। একে ছেলেমানুষ মেয়ে, তার ওপর শ্বশুরবাড়ি। প্রতিবাদ তো করতে পারে না। এদিকে পড়াশোনার আগ্রহ আছে পুরোপুরি। তাই চুপিচুপি সে আর একখানা 'বর্ণপরিচয়' এক আনা দিয়ে কিনে আনল। লক্ষ্মী পাঠশালায় পড়তে যেত আর

ফিরে এসে তার এই নতুন খুড়িকে একটু একটু পড়াত। এরপর আবার পড়ার সুযোগ হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে এসে। সেখানে ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে গঙ্গাস্নান করতে এসে সারদাকে পড়িয়ে যেত। যার ফলে সারদা নিজে নিজেই রামায়ণ পড়তে শিখে গেল। কৃতজ্ঞতায় গুরুদক্ষিণা হিসেবে সে তাই মেয়েটিকে বাগানের শাকপাতা দিত। তাছাড়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরবাগানের পীতাম্বর ভাণ্ডারীর এগারো বছরের ছেলে শরৎ লক্ষ্মী এবং তার সারদা খুড়িকে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ কিছুদিন পড়িয়েছিল।[১২]

তা এই পর্যন্ত যার লেখাপড়ার দৌড় সে মেয়ে বড়ো হয়ে লোকের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করবে কী করে, নানা লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করবে কী করে? স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজ স্মৃতিচারণ করেছেন, "আমি তখন ছেলেমানুষ। ভক্তেরা এবং সাধু-ব্রহ্মচারীরা মাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। আমার ভয় হত—মায়ের তো 'কুবাক্য' পর্যন্ত শিক্ষা, তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কি? এঁরা বেলুড় মঠে গিয়ে পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতিদের কেন জিজ্ঞাসা করেন না? তাঁরা কত শাস্ত্র পাঠ করেছেন। কিন্তু মা কখনও বলতেন না—'এইসব প্রশ্নের উত্তর রাখালকে, তারককে বা শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে।' তিনি সকলের প্রশ্ন শুনতেন এবং এমন উত্তর দিতেন যাতে প্রশ্নকর্তাদের সব সংশয়ের সমাধান হয়ে যেত।"[১৩]

এই অসম্ভব সম্ভব হল কীভাবে? খুব সহজ কথায় উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, ঠাকুরের ইচ্ছে। ঠাকুর, অর্থাৎ অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব। প্রথমে কামারপুকুরে এবং তারপর দক্ষিণেশ্বরে তিনিই সারদার বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে ওঠার সময়কালে তাকে লৌকিক-সামাজিক এবং অবশ্যই আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান-অভিজ্ঞতাকে উজাড় করে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ মহারাজ জানিয়েছেন, "প্রদীপে সলতেটি কিভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ি যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।"[১৪]

খুব অনাড়ম্বর, আটপৌরে ভঙ্গিতে সেই অমূল্য শিক্ষাদান।

কামারপুকুরে একদিনের কথা সারদার বড়ো বয়সেও মনে পড়ে, "ঠাকুর যখন পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন, আমি তখন ছেলেমানুষ বউটি ছিলুম গো। ঠাকুর একটু রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন, 'কাল এই এই সব রান্না করো গো।' আমরা তাই রান্না করতুম। একদিন পাঁচফোড়ন ছিল না, দিদি (লক্ষ্মীর মা) বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে।' ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে ডেকে বলছেন, 'সে কি গো পাঁচফোড়ন নেই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না; যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের ব্যান্নন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো পায়েসের বাটি ফেলে এলুম আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?' "[১৫]

আবার গভীর শাস্ত্রীয় শিক্ষাও ঠাকুরের হাত ধরেই। ঠাকুর নিজহাতে এঁকে এঁকে বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগে আটকে যাওয়া সারদাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কুলকুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্রের মতো জটিল বিষয়।[১৬] ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে পড়ার অভ্যেসটিও ঠাকুরেরই করে দেওয়া। পরিণত বয়সে সারদা স্মৃতিচারণ করতেন, "রাত তিনটে বাজলেই যেখানেই

থাকি, কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম।"[১৭] ঠাকুরের তো রাত্তিরে বেশি ঘুমই হত না। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ উঠে তিনি দক্ষিণেশ্বরের ঝাউতলায় যেতেন। যাওয়ার সময় নহবতের পাশে এসে ডাক দিতেন, "ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়িকে তোলরে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। গঙ্গাজল মুখে দিয়ে মার নাম কর, ধ্যান-জপ আরম্ভ করে দে।" অত ভোর রাতে, বিশেষ করে শীতকালে কি আর উঠতে ইচ্ছে করে! লক্ষ্মী আর তার খুড়ি হয়তো সাড়া না দিয়ে লেপের তলায় মটকা মেরে শুয়ে আছে। ঠাকুর তখন দুষ্টুমি করে কোনও কোনও দিন দরজার নিচ দিয়ে জল ঢেলে দিতেন। আর রঙ্গ করে গান ধরতেন, "প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়, শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়।"[১৮] সব ভিজে যাওয়ার ভয়ে তখন আর ঘুমিয়ে থাকার উপায় নেই।

'সব' ভিজে যাওয়া মানে অবশ্য একখানা মাদুর আর একটি কাঁথা পেতে তো শোওয়া। ঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকে নহবতের নিচের ঘর। অপরিসর ছোটো ঘরে রাজ্যের ভাঁড়ারের জিনিস—কাঠ, উনুন, জলের জালা, কাঠের সিন্দুক, পোর্টমেন। ওপরে শিকেয় জিয়ল মাছ। আর মাঝে বিছানা করে লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে বাস। ঠাকুর মজা করে বলতেন শুকসারি। কখনও কখনও আবার তার সঙ্গে এসে জুটতেন অন্য অতিথিরা। যেমন গোলাপ-মা, যোগীন-মা, মাস্টারমশায়ের স্ত্রী, চুনিলালের স্ত্রী, গৌরী-মা। তার মধ্যেই শোয়া-খাওয়া-ঘরকন্না-সব। লক্ষ্মীদিদি স্মৃতিচারণ করেছেন, "মাকে রান্না করতে হত, আমি যোগাড় দিতাম। রান্না আবার অনেক রকম। ছেলেদের জলখাবার, ডাল-ভাত, তরকারি; রাত্রিতে ঘন ঘন ডাল ও বড়ো বড়ো রুটি। ঠাকুরের জন্য ঝোলভাত। আর আমাদের প্রায়ই ভাতে-ভাত যা-হয় হত। এর ওপর কোনও ভক্ত বেলায় এসে গাড়ি থেকে নামবার সময় হয়তো হেঁকে বললেন : 'আজ ছোলার ডাল খাব।' মা আবার ছোলার ডাল বসালেন।"[১৯] ঠাকুর যে বলতেন, "কর্ম করতে হয়; মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে।"—ছেলেমানুষ সারদা বাধ্য ছাত্রীটির মতো সেকথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। আর সবই নিরুচ্চারে। লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের খাজাঞ্চি যেমন বলেছিলেন, "তিনি এখানে আছেন বটে শুনতে পাই। কিন্তু কখনও দেখিনি!" পরিণত বয়সে মাঝে মাঝেই মনে পড়ত ছেলেমানুষ বয়সের সেই দিনগুলোর কথা, "দক্ষিণেশ্বরে নবত দেখেছ? সেইখানে থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যেস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজায় দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো! '"[২০]

এক অর্থে বনবাসই বটে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে দৌড়ে বেড়াত যে মেয়েটি, কলকাতার শহুরে বিধি-নিষেধে সে হাঁপিয়ে উঠবেই। তবু এই বনবাসের সময়কেও আশ্চর্য আনন্দে ভরিয়ে রাখতেন ঠাকুর নিজেই। তাঁর ঘরে কীর্তন, গান ইত্যাদি হওয়ার আগে রামলালদাদাকে নহবতের দিকের দরজাটি খুলে দিতে বলতেন, "এখানে কত ভাব-ভক্তি হবে। ওরা সব দেখবেনি? শুনবেনি? কেমন করে তবে শিখবে?"—'ওরা' অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী আর তার খুড়ি সারদা। নহবতের বারান্দায় যে দরমার বেড়া ছিল তার মধ্যে আঙুল প্রমাণ ছোটো ছেঁদায় চোখ লাগিয়ে ঠাকুরের ঘরের ভেতরটা দেখা যেত,

কারণ উত্তরের দরজাটা প্রায় খোলা থাকত। সেখান থেকে দেখা যেত, শোনা যেত কত ভগবদ্ আলোচনা, কত কীর্তন, নাচ, সমাধি—সব। কথামৃতে ঠাকুরের ঘরের যে আসরের ধারাবিবরণী পড়ে আমরা রোমাঞ্চিত হই, শিক্ষিত হই, সমৃদ্ধ হই—সারদা নামের সেই ছেলেমানুষ মেয়েটি সেই শিক্ষাদান পর্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, একাগ্র শিক্ষার্থী—দিনের পর দিন। ঠাকুর নিজেও সে-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। একদিন দরমার সেই ছেঁদা একটু বেড়ে গেছে দেখে ঠাকুর হাসতে হাসতে রামলালদাদাকে বলছেন, "ওরে রামনেলো, তোর খুড়ীর পরদা যে ফাঁক হয়ে গেল!"[২১]

দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এক বছর ধরে চলল এই আনন্দময় শিক্ষাপর্ব। শিক্ষান্তে উত্তীর্ণ হওয়ার পর যেমন সমাবর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তেমনি তাঁর চেয়ে বয়সে উনিশ বছরের ছোটো সারদাকে স্বীকৃতি জানালেন ষোড়শী পূজার মাধ্যমে। ৫ জুন ১৮৭২ ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে সারদাকে দেবীর আসনে বসিয়ে আবাহনমন্ত্র উচ্চারণ করলেন : "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এঁর শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

লক্ষ্য করার বিষয়, সর্বকল্যাণকারিণীকে ঠাকুর এখানে একাধারে মা ও কন্যা এই দুই রূপেই আহ্বান করলেন। বললেন, 'হে বালে', বললেন, 'হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ'। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো অবতারবরিষ্ঠের দ্বারা দেবীকে আবাহন তো আর বিফল হওয়ার নয়। ষোড়শী পূজার দিন তাই জয়রামবাটীর সেই নিষ্পাপ বালিকা মেয়েটির উদ্বুদ্ধ হওয়ার দিন, দেবীত্বে উন্নীত হওয়ার দিন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছেন, "অনেক অনেক সাধু-মহাজন সহধর্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা।—চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমতি মা লক্ষ্মী আমাদের—সেই ষোড়শীপূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ-শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্র মণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।"[২২] বিরাজ করতে লাগলেন, ঠাকুর যেমন আহ্বান করেছিলেন, ওই একাধারে শ্রদ্ধেয়া মা এবং স্নেহাস্পদ বালিকা হিসেবেই। তাঁর মাতৃরূপের কথা আমরা অনেকটাই জানি, অনেক শুনেছি। আর সেই রূপের সমান্তরালে দেবীর যে অন্য আর এক রূপ, ঠাকুর যাকে 'হে বালে' বলে সম্বোধন করেছেন, সেই যে বালিকা রূপ—তাকেই আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি। ঠাকুরের যেমন একটা বালক-ভাব ছিল, তিনি নিজেই বলতেন, "মা আমাকে বালক ভাবে রেখেছেন", আমরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছি, অত স্পষ্টভাবে না হলেও দেবী সারদার মধ্যেও নিশ্চিতভাবে তেমন এক বালিকা-রূপ ছিল।

তার এক উজ্জ্বল প্রকাশ দক্ষিণেশ্বরে আসার পথে তেলোভেলোর মাঠে ডাকাতবাবার ঘটনায়। এই ঘটনার সন-তারিখ নির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও, ঘটনাটি যে ষোড়শী পূজায় উদ্বোধিত হওয়ার পরে ঘটেছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। কারণ সেদিন সারদা দেবীর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন লক্ষ্মীদিদি এবং লক্ষ্মীদিদি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১৮৮১ সালে। বহুকথিত এই ঘটনাটি রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে প্রায় সকলের পরিচিত। সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়ে সারদা দেবী সন্ধ্যার নির্জনতায় এক ভীষণদর্শন ডাকাতের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু একটুও হতচকিত না হয়ে ডাকাতকে পিতৃ-সম্বোধন করে সারদা বললেন, "তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি

যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তিনি তোমায় খুব আদরযত্ন করবেন।" কথা বলতে বলতেই ডাকাত-গিন্নিও এসে হাজির। সারদা তাকে বললেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতুম বলতে পারি নে।"

আপাতদৃষ্টিতে বলশালী শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে সারদা দেবীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথাই মনে আসবে। কিন্তু শুধু কি সেইটুকুই? পরদিন তাদের আশ্রয় থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ডাকাত-দম্পতি অনেকদূর পর্যন্ত সারদাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। তিনজনের চোখেই তখন জল। মহিলাটি ক্ষেত থেকে কিছু কড়াইশুঁটি তুলে দিয়ে বলল, "মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলি দিয়ে খাস।"[২৩]

সারদা দেবীকে অনেকেই 'মা' বলে ডেকেছেন। এখনও ডাকেন। কিন্তু সে তো সশ্রদ্ধ মাতৃপূজার ভাব। আর এই বাগদি ডাকাত-রমণীর 'মা' ডাকের মধ্যে রয়েছে বিশুদ্ধ অপত্য স্নেহ। স্নেহের পাত্রীকে যেমন বাড়ির বড়োরা 'মা' বলে ডাকেন, এ-ও তেমনি। এখানে মা সারদা কন্যারূপে নিজেকে তুলে ধরেছেন—যেমন বালিকা রূপ তাঁর পরিণত জীবনেও 'চকিত চপলার ন্যায়' মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

বিরাট শিশু আনমনে

পরিণত বয়সে বালিকা ভাবকে খুঁজে নেওয়ার কথা যে বলছি, তা তার জন্য কোন বৈশিষ্ট্যকে আমরা প্রধান সূচক হিসেবে নির্দিষ্ট করব? কোন প্রধান গুণ অব্যর্থভাবে চিনিয়ে দেবে বাল্যভাবকে? আমার মনে হয়, সেই বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যটি হল নিষ্পাপ সারল্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যভাবের ক্ষেত্রেও আমরা বারবার দেখেছি, সারদা মায়ের ক্ষেত্রেও অল্প আয়াসেই চিনে নেওয়া যাবে এই সারল্যকে। নানা ছোটোখাটো ঘটনা আর অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট হবে বিশুদ্ধ জলের মতো স্বচ্ছ সে অন্তঃকরণ।

যেমন ধরা যাক, ভক্তদের আনা জিনিস পেয়ে আনন্দ প্রকাশের কথা। দরিদ্র-দুস্থ ভক্তরা কত সংকোচ করে সামান্য কিছু সবজি বা ফল নিয়ে হয়তো আসত, কিন্তু মায়ের আনন্দ প্রকাশ দেখে তাদের সব দ্বিধা দূর হয়ে যেত। যে মা বহু মূল্যবান জিনিসের দিকে লক্ষ্যও করতেন না, তিনিই আবার ভক্তের অমন কিছু তুচ্ছ জিনিস পেয়ে এত আনন্দ প্রকাশ করতেন যে, 'মনে হত কোনও শিশু যেন পুতুল কিংবা মোয়া' পেয়েছে।

অথবা, সারল্যের অন্য এক দিকের কথা ভাবি। ভক্তদের নানা উপদেশ দিচ্ছেন, নানা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করছেন তিনি। এদিকে হ্যারিকেন লণ্ঠন পরিষ্কার করতে পারেন না। সরল মুখে বালক রামময়কে বলেন (পরবর্তী কালে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ), "বাবা, তুমি কর। ওর মধ্যে অনেক কলকব্জা—আমি পারব না।"[২৪]

একবার মাহেশের রথ দেখতে যেতে গিয়ে তাঁর মোটরের তলায় একটা কুকুর চাপা পড়ে। সেই থেকে কিছুতেই আর মোটরগাড়ি চড়তে চান না।[২৫]

নিজের এমন ছেলেমানুষী বুদ্ধি নিয়ে নিজেই আবার ঘনিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গে মশকরা করেন। যেমন প্রথম কলকাতায় এসে কলঘরে স্নান করতে গিয়ে কেমন বিব্রত হয়েছিলেন সেকথা নিজেই বলতেন সহাস্যে। কাঁসারীপাড়ায় বড়ো ভাই প্রসন্নকুমারের বাসায় সেবার

উঠেছিলেন, "প্রথমে যখন কলকাতায় আসি আগে জলের কল-টল তো কিছু দেখিনি, একদিন কলঘরে গেছি—দেখি কল সোঁ সোঁ করে সাপের মতো গর্জাচ্ছে। আমি তো মা, ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বলছি, 'ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস। সোঁ সোঁ করছে।' তারা হেসে বললে, 'ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয়।' আমি তো হেসে কুটিপাটি।"[২৬]

বালক রামময়ের সঙ্গে রুটি বেলার প্রতিযোগিতা মায়ের আর এক ছেলেমানুষী ঘটনা। "মা ছোট শ্বেতপাথরের চাকিতে আবলুস কাঠের ছোট বেলুন দিয়ে একখানি করে রুটি বলছেন আর আমি বড় কাঠের চাকিতে মোটা বেলুন দিয়ে একসঙ্গে তিনখানা করে বেলেছি। বেশ কাজ এগিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ নলিনীদি বলে উঠলেন : 'পিসিমা, তোমার চেয়ে রামময়ের রুটি ভাল ফুলছে।' যেই না বলা! বললেন, 'আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলাম, আর রামময় দুধের ছেলে, গলা টিপলে মুখ দিয়ে দুধ বেরোবে—সে আমার চেয়ে ভাল রুটি বেলছে! আমি আর বেলব না। ও-ই বেলুক।' মা তো বেলুন-চাকি সরিয়ে বসে রইলেন।"

সেদিনের সেই রামময় পরবর্তী কালে প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ হিসেবে এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন, "এখন আমার বয়স ৮৮ বছর। যখন এইসব ভাবি—তখন মা কেন এরূপ অভিমান করলেন, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে শাস্ত্রে পাই, এঁদের বিচিত্র ব্যবহার হয়। কখনও ছেলেমানুষের মতো এবং কখনও প্রাজ্ঞের মতো। অকাতরে সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন; সকলের প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছেন। আবার ছেলেমানুষীও করছেন।"[২৭]

লেখাপড়া জানা মানুষদের, বিশেষত শিক্ষিত স্ত্রীলোকদেব প্রতি তাঁর অদ্ভুত সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ছিল। হয়তো তাঁদের দেখে নিজের মনে পুষে রাখা এক ইচ্ছাপূরণের আনন্দ পেতেন। অনেক সময় এত সরল মনে এই সমীহ প্রকাশ করতেন যে অন্যেরা তাঁর ছেলেমানুষী কথা শুনে মজা পেত। যেমন এলাকার কোনও নব বিবাহিত বধূ সম্পর্কে বলতেন, "বাঁড়ুজ্জেদের একটি বৌমা এসেছে। সে কলকাতাব মেয়ে। ঘড়িতে দম দিতে জানে।"[২৮]

অবশ্য লেখাপড়া বা বিদ্যার্জনের প্রতি এই আগ্রহকে শুধু সারল্য বললে ঠিক হবে না। এর পেছনে আছে অজানাকে জানার একটা তীব্র আকূতি। এবং মনোবিদরা মনে করেন, চারদিকের জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে এই সক্রিয় কৌতূহল সতেজ মস্তিষ্কের এক লক্ষণ।

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজের স্মৃতিচারণই আবার উদ্ধৃত করি, " 'উদ্বোধন', 'তত্ত্বমঞ্জরী' প্রভৃতি পত্রিকা এলে শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করতেন : 'উদ্বোধন-এ শরতের লেখা কিছু আছে?' কিছু থাকলে পড়তে বলতেন। একবার 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে সংস্কৃতে একটি স্তোত্র প্রকাশিত হয়। আমি তা পড়ে শোনালে মা বলেন : 'বাংলা করে বল।' 'দেশিকেন্দ্রং' প্রভৃতি শব্দের মানে না জানায় এবং ওখানে অভিধান না থাকায় আমি বললাম : 'সব কথার মানে জানি না। স্কুলে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বুঝে এসে আপনাকে শোনাব।' তিনি ছাড়লেন না। বললেন : 'তুমি যেটুকু পার, তাই বল।' "[২৯]

এমনকি ইংরেজি যে বিদেশি শাসকের ভাষা, তার প্রতিও তাঁর আগ্রহ। উদ্বোধন বাড়িতে একদিন "নিবেদিতা স্কুলের কয়েকটি মেয়ে এসেছে—ওখানে দুটি মাদ্রাজি মেয়ে

আছেন। তাঁরাও এসেছেন আর মা তাঁদের পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁরা ইংরেজি জানেন শুনে মা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আমরা এখন বাড়ি যাব—এর ইংরেজি কর তো।'... মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাড়ি গিয়ে কি খাবে?—এর ইংরেজি কি হবে?' উত্তর শুনে মা খুব খুশি, হাসতে লাগলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা গান জান?' তাঁরা 'জানি' বলাতে মাদ্রাজি গান গাইতে মা আদেশ করলেন। মেয়ে দুটি মাদ্রাজি গান গাইলেন। মাও শুনতে শুনতে খুব আনন্দ করতে লাগলেন।"[৩০]

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তার ব্যাপক বিশ্বগ্রাসী প্রভাব সম্পর্কে সারদা মা আগ্রহী। তাঁর ভক্ত সরযূবালা দেবীকে একদিন বলছেন, "কাজকর্ম-চাকরি কিছুরই তো এখন সুবিধা নেই। কি পোড়া যুদ্ধ লেগেছে! কতদিনে যে থামবে, লোকে খেয়ে পরে বাঁচবে! তা এ যুদ্ধটা গোড়ায় লাগল কেন বল তো, মা?"[৩১]

আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের খবর মাকে জানাতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মশাই যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফা সন্ধিশর্ত বোঝাতে লাগলেন। মা একটু শুনেই বলে উঠলেন, "ওরা যা বলে, ওসব মুখস্থ।" যতীন্দ্রনাথ কথাটার মানে বুঝতে না পেরে চুপ করে আছেন দেখে মা বললেন, "যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।"[৩২]

বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে থাকার সময় ছুটির দিনে নিবেদিতা স্কুলেব ঘোড়ারগাড়িতে করে মাকে অনেক সময় মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, হগমার্কেট, গড়ের মাঠ, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন এইসব জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। মায়ের তাতে কী আনন্দ-উৎসাহ! গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। বালিকার মতো আনন্দে উচ্ছল হতেন। আবার গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটক দেখেও মা কী খুশি! ১২ কার্তিক ১৩২৫ তিনি নির্বাক চলচ্চিত্র 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' দেখেছেন। ওই বছরেই বড়োদিনের সময় ভাইঝিদের সঙ্গে নিয়ে গড়ের মাঠে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলেন।[৩৩] সরযূবালা দেবীর বালীগঞ্জের বাসায় গিয়ে গ্রামাফোনে গান শুনে অবাক বিস্ময়ে বলছেন, "কী আশ্চর্য কল করেছে!"[৩৪]

তখনকার দিনে কলকাতার নানা দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ানো বা আমোদের এমন আধুনিক উপকরণের অভিজ্ঞতা অর্জন তাঁর বয়সী এক মহিলার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল না। প্রচলিত নানা সংস্কারের দোহাই দিয়ে সেকালে বয়স্কারা সাধারণত এসবের থেকে দূরে এক নিজস্ব ঘেরাটোপে থাকতেই ভালোবাসতেন। আসলে নতুন কিছুকে গ্রহণ করার জন্য যে এক তাজা সবুজ মন দরকার, বয়স বাড়াব সঙ্গে তা প্রায় সকলেরই নির্জীব হয়ে আসে। কিন্তু নির্জীব হয়নি সারদা মায়ের। নির্জীব হতে তিনি দেননি। তিনি বারবার বলতেন, "মনে সর্বদা উৎসাহ রাখতে হয়।"[৩৫] মন বুড়ো হয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।

এই বিশ্বাসকে সযত্নে তিনি লালন করে গেছেন সারা জীবন। তার জন্যই চারদিকের জীবন-সংসার সম্পর্কে যে সক্রিয় কৌতূহলের কথা বলছিলাম—যা ছেলেমানুষ বয়সেরই বৈশিষ্ট্য, তাকে তিনি কখনও নষ্ট হতে দেননি। আমরা আমাদের সর্বজনীন মায়ের মধ্যে তাই খুঁজে পাই এক উচ্ছল স্নেহাস্পদকেও। তাঁর কথায় বলতে গেলে, তাঁর আনন্দের ঘট সবসময়ই পূর্ণ।

এই আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ কখনও কখনও আবার আমাদের চমকে দেয়। মনে হয়

এই বালিকাসুলভ চপল হাসির পেছনে যে মস্তিষ্ক, আমাদের নাগালের অনেক ওপরে যেন তার অবস্থান।

দুটি ঘটনার কথা স্মরণ করি। একবার জয়রামবাটীতে কালীকুমার আর সেজোভাই বরদাপ্রসাদের সঙ্গে জমির বেড়া দেওয়া নিয়ে খুব ঝগড়া হচ্ছে, তিক্ত বৈষয়িক ঝগড়া থেকে শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি। মা স্বয়ং, স্বামী ঈশানানন্দ মহারাজ প্রমুখ কয়েকজন এগিয়ে এসে কোনওরকমে তাদের নিরস্ত করলেন। পরক্ষণেই দেখা গেল বাড়ির ভেতরে এসে মাটির দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে মা হাসছেন। হাসছেন আর আপন মনে বলছেন, "মহামায়ার কি মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে, এ সব পড়ে থাকবে! জীব এটুকু আর বুঝতে পারে না।" স্বামী ঈশানানন্দ লিখেছেন, "এই পর্যন্ত বলিয়াই মা হাসিয়া অস্থির; সে হাসি আর থামে না!"[৩৬]

দ্বিতীয় ঘটনাটি উদ্বোধনে থাকাকালীন। মা রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে হাসতে হাসতে ভেতর ঘর থেকে সরযূবালা দেবীকে ডাকছেন, "ও মেয়ে, ও মেয়ে একবার এদিকে এস, শিগ্‌গির এস।" যেন খুব মজার কিছু একটা বাইরে ঘটছে। মজার দৃশ্যটা আর কিছুই নয়, অদূরে পতিতা পল্লীর সামনে একটি লোক এ-জানলা, ও-জানলা করে মরছে; ঢুকবার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই দেখে মায়ের সহাস্য মন্তব্য, "দেখ, কি মোহ, কি প্রবৃত্তি! ভিতর থেকে ঐ গানের শব্দ আসছে, আর ও ঢুকতে পারছে না। আহা! মলো গো ছটফটিয়ে।" সরযূবালা স্মৃতিচারণ করছেন, "মা এমনি করে কথাগুলি বলছেন যে, হাসি আর চাপতে পারলুম না। তখন মাও হাসেন, আমিও হাসি। হাসতে হাসতে দুজনে ঘরে এলুম।"[৩৭]

কোনও ক্রোধ নেই, কোনও উত্তেজনা নেই, কোনও ঘৃণা নেই। মানুষটি শুধু হাসছেন। যেন আমাদের চারপাশের ক্লেদ-গ্লানি-কলহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক ওপর থেকে আমাদের অবলোকন করছেন আর আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দেখে মজা পাচ্ছেন। তাই সরল বালিকার মতো হাসছেন। যেন তিনি খেলার মজায় মজেছেন। খেলছেন 'এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।'

সেই গানটির কথা মনে পড়ছে। কাশীর এক ভিখারি মেয়ের গলায় গানটি শুনে মা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, "মা আমারে দয়া করে/ শিশুর মতো করে রাখ,/ শৈশবের সৌন্দর্য ছেড়ে/ বড় হতে দিও নাক। /সুন্দর সরল প্রাণ,/ মান অপমান নাহি জ্ঞান,/ হিংসা নিন্দা লজ্জা ঘৃণা,/ কিছুই সে জানে নাক।"[৩৮]

কিন্তু মর্তলীলায় এসে মনটাকে সতেজ সজীব করে রাখলেও, শরীরকে তো আর 'বড় হতে দিও নাক' বললে চলবে না। শরীর তার মাশুল বুঝে নেবেই। সেখানে রোগ-ব্যাধি আসবে, জরা আসবে, মৃত্যুর হাতছানি দেখা যাবে।

শেষ যে ঘটনাটির কথা বলছি, মা সারদা তখন সেই জাগতিক নিয়মের পাকেই, তাঁর মৃত্যুশয্যায়। ঘটনাটির জীবন্ত স্মৃতিচারণ করে গেছেন মায়ের শেষবেলার সেবিকা সরলা, পরবর্তী কালে যিনি শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা নামে পরিচিত হন : "আমি মাকে দুধ খাওয়াতুম আর থার্মোমিটারও দিতুম। মাঝে মাঝে দুধ কিছুতেই

খেতে চাইতেন না। আমি 'তবে মহারাজকে ডাকি' বলাতে ছেলেমানুষের মতো চুপ করে খেয়ে নিতেন। রাত এগারোটায় শেষ দুধ খেতেন। একদিন রাত্রে দুধ খাওয়াতে গেছি। মা বেঁকে বসলেন : 'আমি দুধ খাব না।' কিছুতেই খাবেন না দেখে আমি বললুম : 'তবে কি মা মহারাজকে ডাকব?' মা বললেন : 'ডাক তোর মহারাজকে, আমি খাব না।'... আমার কাছে সব শুনে তিনি (স্বামী সারদানন্দ) উঠে এসে মায়ের মাথার কাছটিতে দাঁড়ালেন। মায়ের ঘরের মধ্যে প্রদীপ জ্বলছিল। বাইরে একটি হ্যারিকেন। মা বলছেন : 'কি শরৎ এল?... এস বাবা, কাছে এসো, বোসো' বলে নিজের খুব কাছটিতে বসতে বললেন।...

"মহারাজ মায়ের গায়ে মাথায় কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দেবার পর খুব আস্তে আস্তে বললেন : 'মা, এবার একটু খাবেন?' মা, 'খাব' বলাতে বললেন : 'সরলা তবে খাইয়ে দিক একটু?'

"মা—'না, ও খাওয়াবে না। ও খালি রাতদিন বলবে, মা খাও, মা খাও আর বগলে কাঠি দাও। ঐ দুটোই শিখেছে। আমি ওর হাতে খাব না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও।'

"মহারাজের হাতদুটো তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, খাওয়াবেন কি! খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।... আমি হ্যারিকেনটা কাছে এনে ফিডিং কাপে দুধ ঢেলে দিলুম। মহারাজ একটু একটু করে মায়ের মুখে ঢেলে দিতে লাগলেন।"[৩৯]

বার্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব বলে তা আমরা জানি। কিন্তু মায়ের শেষবেলার অবোধ ছেলেমানুষী মাত্র নয়, এই ঘটনার এক গভীরতর তাৎপর্য আছে। আগে মা মহারাজের সামনে একগলা ঘোমটা দিতেন, কখনও সামনে সোজাসুজি কথা অবধি বলতেন না। মহারাজের মনে এজন্য দুঃখ ছিল। তিনি বলতেন, "আমি যেন বেটির শ্বশুর!" আজ সেই অবুঝ, অবাধ্য বেটিকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফিডিং কাপে দুধ খাইয়ে মহারাজের এক অনির্বচনীয় প্রাপ্তি হল। তাঁর নিজের কথায়, "মা আমার মনের ঐ ক্ষোভটুকু মুছে দেবার জন্য আমার হাতে এভাবে সেবা নিলেন।"[৪০]

শুধু মহারাজের ক্ষোভটুকুই নয়। এই ঘটনা মুছে দেয় আমাদের অনেক দ্বিধাকেও। আমরা বুঝতে পারি, বালিকা ভাবে মাকে সেবা করা যেমন মায়ের কৃপালাভেরই এক পথ, মাকে বালিকা ভাবে স্মরণ করা তেমনি মাকেই পূজা করা—একটু অন্যভাবে। অন্যরূপে।

সহজিয়া কবি যেমন জগজ্জননীকে ঘরের মেয়ের মতো ডাক দিয়ে আগমনী সুর বাঁধেন : "যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী/ উমা নাকি বড় কেঁদেছে।"—আমরাও তেমনি সারদা দেবীকে আজ পরম স্নেহের পাত্রীর মতো কাছে ডাকলাম।

ভরসা করি, আমাদের এই ডাকে যদি সত্যি আন্তরিকতা থাকে তাহলে নিশ্চয় তিনি সাড়া দেবেন। কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলবেন, "এই আমি তোমার কাছে এলুম।"

আসুন, আমরা অপেক্ষায় থাকি। আর নিজেদের প্রস্তুত রাখি।

জয়রামবাটীর মানবী মা

বন্দিতা ভট্টাচার্য

আজ জয়রামবাটী পৃথিবীর সব দেশের, সব জাতির ধর্মপ্রাণ নরনারীর কাছে মহাতীর্থভূমি। এই গ্রামটিকে আলো করে একশো পঞ্চাশ বছর আগে মা সারদার আবির্ভাব। 'গ্রামখানি যে ধন্য হল মায়ের চরণধূলিতে।' ছোট্টো গ্রাম জয়রামবাটী—অজ পাড়া-গাঁ, যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অশিক্ষা, জাতপাতের বিচার এবং ছুঁৎমার্গ। দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অভিশাপে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হলেও গ্রামীণ মানুষের জীবনে ছিল শান্তি। পল্লীবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখে ছিল সরলতার ছাপ। গ্রামবাসী অল্পে সন্তুষ্ট ছিল। নিজেরা নানাভাবে আনন্দ পেত এবং অন্যকেও আনন্দ দিত। এমনই পরিবেশে এযুগের মহাশক্তির জাগ্রত পীঠস্থান জয়রামবাটীতে মা সারদা এলেন। ধারে কাছে অনেক গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামটির সংযোগ। অদূরে আমোদর নদ—যে নদটির সঙ্গে মা সারদার নাড়ীর যোগ। আমোদরে স্নান করে মা গঙ্গাস্নানের তৃপ্তি পেতেন এবং তাকে গঙ্গার মর্যাদা দিতেন। কিছু দূরে উর্বর শস্যক্ষেত্র এবং তাতে নানা ফসল উৎপন্ন হত আবার তুলোর চাষও হত। জননী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে ছোট্টো সারদা মাঠে গিয়ে তুলো এনে পৈতে কেটেছেন, গলা-সমান জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছেন, ক্ষেতে মজুরদের জলখাবার পৌঁছে দিয়েছেন। একবছর পঙ্গপাল মাঠের সব ধান নষ্ট করে দিলে বালিকা সারদা মাঠময় ছড়িয়ে পড়া ধানগুলি কুড়িয়ে এনেছেন। সব কাজেই যে বালিকা সারদার অসাধারণ আগ্রহ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা!

বাল্যকাল থেকেই গৃহস্থালির কাজে মা নিপুণা। ধান সেদ্ধ করা, বাসন মাজা, ঘুঁটে দেওয়া, ঘর নিকানো এসবের সঙ্গে ছোটো ভাইবোনদের স্নান করানো এবং তাদের দেখাশোনা মা সারদা একহাতে আনন্দের সঙ্গে করে গেছেন। সাধারণত গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহিণীকে যা যা করতে হয় তাই সারদা করেছেন। তাঁর ভাইয়ের বর্ণনায় পাই—"দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, দিদি কি না করেছেন। ধান ভানা, পৈতে কাটা, গরুর জাব্‌না দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশী কাজই তো দিদি করেছেন।"

শৈশবের দিনগুলি সারদার কেটেছে 'ছায়া-সুনিবিড়-শান্তির নীড়' জয়রামবাটীর গ্রাম্য পরিবেশে। তাই এখানে তিনি কত স্বচ্ছন্দ, সহজ ও সরল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে কত সহজে মেলামেশা করতেন। গ্রামে তিনি কারও পিসি, কারও খুড়ি, কারও দিদি আবার কারও বা মাসি। তাঁকে দেখে কখনও কারও মনে হয়নি যে অসাধারণ এক দৈবীশক্তি তাঁর মধ্যে নিহিত।

গ্রামের সব দেবদেবীর প্রতি ছিল মা সারদার অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। জয়রামবাটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিংহবাহিনীর প্রতিও তিনি আজীবন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখেছিলেন। একবার তাঁর কঠিন অসুখে দেবী সিংহবাহিনীর কাছে হত্যা দিয়ে তাঁর কৃপায় মা সারদা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তারপর থেকেই সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচারিত হয়। মানবী মা সারদার দ্বারাই এটি সম্ভব হয়েছিল।

জয়রামবাটীর অদূরে কয়াপাট, কোতলপুর, আনুড়, শিহড়, শ্যামবাজার ও কোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে মা সারদার কতই না যোগাযোগ। কয়াপাটে মা সারদার পিলে দাগানো হয়েছিল। আর কোয়ালপাড়া ছিল 'শ্রীশ্রীমায়ের বৈঠকখানা'। আনুড়ের বিশালাক্ষী দেবীর প্রতি ছিল মার অন্তহীন ভক্তি।

জয়রামবাটীতে মাকে দীর্ঘকাল বাস করতে হয়েছে। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর যে কষ্ট ও দারিদ্র্য তা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু কী সহিষ্ণুতা মায়ের! তিনি আছেন এক বৃহৎ পরিবারে—পাগলিমামী, রাধুদি, মাকুদি, ন্যাড়া, ভূদেব আর মায়ের বিষয়াসক্ত ভাইয়েরা। সর্বদাই তাঁরা বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত। মা সারদাকে এইসব ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল। তার ওপর রয়েছে বৃহৎ ভক্ত-পরিবার। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহবধূকে যেসব কাজ করে দিনযাপন করতে হয় মা সারদাকে তাই-ই করতে হত। পান সাজা, আটা-ময়দা মাখা, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, কলসিতে জল আনা, বর্ষার দিনে বাড়ির সকলের ভিজে কাপড় শুকনো করা, লন্ঠন পরিষ্কার করা, সলতে পাকানো কত কী কাজ! সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার বেতো-পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মা সারদা চলেছেন পাড়ায় পাড়ায় কলকাতার সন্তানদের জন্য চায়ের দুধ সংগ্রহ করতে! কত ভক্তের কত আবদার, কত দাবি মা হাসিমুখে পূরণ করতেন।

অভুক্ত সন্তানের জন্য দোরগোড়ায় প্রতীক্ষারতা মা। কী অপূর্ব চিত্র! জয়রামবাটীর মানবী মা সারদার চিত্র।

জয়রামবাটীতে মায়ের এক সন্তান আশুতোষ মিত্র দেখলেন—"শ্রীমা ঢেঁকিশালে বসে চাল কুটছেন—নিজে 'গড়ে' চাল দিচ্ছেন, আর চাল কোটা হয়ে গেলে তুলে নিচ্ছেন।" কিছুক্ষণ পরে আবার দেখছেন—মা ধুচুনিতে ডাল নিয়ে কলু পুকুরে কচলে ধুয়ে খোসা তুলছেন। ফিরে এসে মা সেই ডাল নলিনীদি আর ছোটোমামীকে বাটতে দিলেন। 'কী হবে', জিজ্ঞাসা করায় মা শুধু বললেন, 'দেখতে পাবে।' এরপর আশুতোষ মিত্র যা দেখলেন তাতে তিনি স্তম্ভিত ও নির্বাক। মা নানান ধরনের পিঠে পুলি, রসবড়া ইত্যাদি পরিবেশন করছেন আর মায়ের সন্তানেরা পরিতৃপ্তি সহকারে খাচ্ছেন। এ চিত্র আমাদের সংসারে সন্তানকে পেট ভরে খাইয়ে গর্ভধারিণীর পরিতৃপ্ত মুখখানিকে স্মরণ করায়। জয়রামবাটীর পরিবেশ বা পরিস্থিতি সবসময় যে সুখকর বা অনুকূল ছিল তা নয় কিন্তু মা সারদা এমন একটা শান্তির পরিমণ্ডল রচনা করতেন যে ভক্তসন্তানেরা বা ঘোর সংসারী আত্মীয়স্বজনেরা মা সারদার কাছে আনন্দে থাকতেন, কখনও কেউ মা সারদাকে কটু কথা বলতে বা বিসদৃশ আচরণ করতে সাহস পেত না। এমনই তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব!

শুধু কি মানুষ? কীটপতঙ্গ, জীবজন্তুর প্রতিও মায়ের কত দরদ ও মমতা! বাড়ির বেড়ালগুলির জন্য মায়ের কত ভাবনা! তাই তিনি জ্ঞান মহারাজকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—"জ্ঞান, বেড়ালগুলোর জন্যে চাল নেবে, যেন কারও বাড়ী না

যায়।"[১]

যখন স্বামী সারদেশানন্দ 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা'য় লিখছেন—"মা নিজে যে-সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরই উপযোগী এবং যতদিন ব্যবহার করা চলিত তাহা ত্যাগ করিতেন না, এমনকি ব্যবহৃত বস্ত্রাদি সেলাই করিয়াও পরিতেন যতদিন চলিত," তখনই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি দরিদ্র পরিবারের মাতৃমূর্তি।

যখন কোনও এক ভক্ত জয়রামবাটীতে এসে জপধ্যানে মগ্ন হলেন তখন মা তাকে বলেন, "এখানে এসে খাবে, দাবে, আনন্দ করবে। এখানে অতসব করতে হবে না।" ঘটনাটি আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের কারণ আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মায়ের মুখ চেয়েই দিন কাটাতে পারি।

জয়রামবাটীতে মাকে দেখলেই অনেকের মনে হয়েছে মা ঘোর সংসারী—মায়ায় আবদ্ধ। সংসারের প্রতি মায়ের যেন ঘোর আসক্তি। কিন্তু তাঁর এই আসক্তি একান্তভাবেই বাহ্যিক—অন্তরের অনাসক্তিই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ। তাই স্বামী সারদানন্দ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন "এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি।"[২]

জয়রামবাটী থেকে মা সারদা যাত্রা করবেন কলকাতায়। সব প্রস্তুত। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল পূর্বরাত্রের ভাত ঢাকা আছে। ভাতগুলি নষ্ট হবে মনে করে মা নিজেই এগিয়ে এসে একটি মেয়েকে খেতে দিলেন এবং পুকুরে হাত ধুতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলেন না। সন্তান অনুযোগ করলে মায়ের অকপট উক্তি : "তা হোক বাবা, ভাতগুলি নষ্ট হবে তাই দিয়ে গেলাম।" এ কি সাধারণ সংসারের চিত্র নয়?

শেষের দিকে জয়রামবাটীতে মায়ের কাজের জন্য রাঁধুনী পরিচারিকা সব রেখে দেওয়া হয়েছিল। কোনওদিন বাঁধুনীর আসার বিলম্ব দেখলে মা নিজেই রান্না চাপিয়ে দিতেন। তাদের অনেক কাজ সেরে রাখতেন। শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীর স্মৃতিচারণে পাই : "একদিন ভোরবেলায় পুকুরে বাসন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে মাজিতে গিয়া দেখি তাহা আব সেখানে নাই, মা মাজিয়া ঘরে লইয়া আসিয়াছেন।"[৩] একজন সাধারণ বাঙালি নারীর মতোই গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ মা সারদা করেছেন।

জয়রামবাটীর প্রতি মায়ের অকুণ্ঠ ভক্তি। জয়রামবাটীর ধুলো মাথায় নিয়ে বলতেন : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"[৪]

জয়রামবাটীতে জন্মলগ্ন থেকেই সারদা মাতৃরূপে আবির্ভূতা এবং যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিনই তিনি ছিলেন 'মা'—'সবারই মা'—'সতেরও মা অসতেরও মা'। জয়রামবাটীতে মা তাঁর অসংখ্য ভক্তসন্তানদের যেভাবে দুহাতে কৃপা বিতরণ করেছেন, তা বিশ্বের ধর্মেতিহাসে অপূর্বদৃষ্ট। তাই জয়রামবাটী শুধু মা সারদার জন্মস্থানই নয়, এখানের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর অনুপম লীলা-বিলাসের নীরব দ্রষ্টা, এই পুণ্যভূমি আধুনিক বিশ্বের নবতম শক্তিপীঠের ধারক ও বাহক।

সংসারের আলোছায়ায় শ্রীমা

প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণা

জগজ্জননী শ্রীমা জগতের মানুষের সামনে একটি মহৎ জীবনদর্শনকে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ জীবনের আলোচনা আমরা যতই করি ততই মনে হয় তার গভীরতা পরিমাপ করার শক্তি আমাদের নেই। অতি সাধারণভাবে সংসারে থেকে তিনি জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন। সেই জীবনচর্যার প্রতিটি ভঙ্গি মাধুর্যময়, ভাবগম্ভীর এবং প্রেরণাপ্রদ। একটি বাঙালি হিন্দু মেয়ের ঘরোয়া জীবনে কন্যা, বধূ, গৃহিণী ও জননীরূপে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব সাধনা, অদৃষ্টপূর্ব ত্যাগ-বৈরাগ্য সাধারণের নাগালের বাইরে ছিল—একথা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও জানতেন। তাই লীলাসংবরণের আগে লোককল্যাণের দায়িত্ব শ্রীমার ওপরই তিনি অর্পণ করেছিলেন। মানবী শরীর অবলম্বন করে মানুষের অনন্ত কল্যাণসাধনায় সংসার-জীবন আশ্রয় করেই শ্রীমার আত্মপ্রকাশ। সংসারে তিনি অশেষ কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘকাল সাধারণ মানুষের জন্য গার্হস্থ্যজীবন যাপন করে গেলেন।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর দরিদ্র গৃহে সারদার জন্ম। শৈশবে সংসার প্রতিপালনে যাবতীয় কাজে সহায়তা করে তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের সূচনা। সারদার স্নেহ, মমতা, সংযম, নম্র-মধুর ব্যবহার সেই দরিদ্র সংসারে দৈনন্দিন জীবনকে বড়োই মধুময় করে তুলেছিল। শ্যামাসুন্দরী দেবী একদিন বলেই ফেললেন, "সারদা, তোর মতন আমার যেন (জন্মান্তরে) একটি মেয়ে হয়, মা।"[১]

পাঁচ বছর বয়সে সারদার বিবাহ হয়। চোদ্দো বছর বয়সে তাঁর প্রকৃত পতি-পরিচয়। এইসময় কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সবরকম পাঠ তিনি নিয়েছিলেন—সংসারযাত্রা থেকে শুরু করে ঈশ্বরলাভ পর্যন্ত। ঈশ্বরই যে একমাত্র নিত্য বস্তু—এই ধারণাটি তখনই ঠাকুর তাঁর মনে গেঁথে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও সান্নিধ্যে তিনি কতখানি আনন্দে পূর্ণ হয়েছিলেন তা ব্যক্ত করে পরবর্তী কালে স্ত্রীভক্তদের বলেছিলেন, "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই ধীরস্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"[২]

সাত মাস পতিসান্নিধ্যে কাটিয়ে শ্রীমা ফিরে গেলেন জয়রামবাটীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানববুদ্ধির অগোচর উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনায় মগ্ন হলেন। সাধারণের দৃষ্টিতে তাঁর আচার-আচরণ উন্মাদের। জয়রামবাটীতে সে খবর পৌঁছালে মা মর্মান্তিক আঘাত পেলেন। গ্রামবাসীর চোখে এখন তিনি পাগলের স্ত্রী। শ্রীমা স্থির থাকতে

পারলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন মূর্তি বারবার তাঁর মনে পড়তে লাগল। অবশেষে নিজেই কর্তব্য স্থির করে পিতার সঙ্গে দীর্ঘ আশি মাইল পথ পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছালেন। প্রেমময় ঠাকুর যেন তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিলেন। দেখামাত্র বলে উঠলেন, "তুমি এসেছ, বেশ করেছ!... এখন কি আর আমার সেজোবাবু (মথুরবাবু) আছে যে, তোমার যত্ন হবে?"[৩] মুহূর্তের মধ্যে শ্রীমার হৃদয় শান্ত। তিনি নিশ্চিন্ত—তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ—আগের মতো সেই আনন্দময় প্রেমময় পুরুষই আছেন।

শ্রীমার বয়স এখন আঠারো, সদ্য তরুণী বধূ পতিসান্নিধ্যে বাস করতে এসেছেন। তাঁদের দাম্পত্যজীবনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেখানে দাম্পত্যপ্রেম অটুট কিন্তু মুহূর্তের জন্য দেহসম্বন্ধের ছায়াপাত ঘটেনি। দেহসম্বন্ধ নিরপেক্ষ আত্মার মিলনেও যে গভীর প্রেম সম্ভব তা দেখল জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার জীবনে। ভারতীয় দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য ভোগবিলাস নয়, দৈহিক আকর্ষণের পথ থেকে ক্রমোন্নতির পথে আত্মজ্ঞান লাভ করা। 'কথামৃতে' ঠাকুর সেকথা বারবার স্মরণ করিয়েছেন : স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ইষ্টলাভের সহায়ক হবে। মহালীলার শুরুতেই শ্রীমা ঠাকুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁকে ইষ্টপথে সাহায্য করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইষ্টপথ হল লোককল্যাণব্রত। এই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই শ্রীমা ঘোষণা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্মসংবহনে তাঁর ভূমিকা, যা তিনি নীরবে পালন করেছেন দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ সংসারের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের পর ঠাকুর তাঁর স্বভাবসুলভ মধুর ভাষায় শ্রীমাকে কত শিক্ষাই না দিতেন। শ্রীমাও ছিলেন সে-সমস্ত শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত আধার। তিনি ভক্তদের কাছে বলেছেন, "ঠাকুর ভগবানের বিষয় ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। আমাকে বলতেন, 'দেখছ তো মানুষের দেহ কি!—এই আছে, এই নাই, আবার সংসারে এসে কত দুঃখ, কত জ্বালা পায়!... এক ভগবানই নিত্যসত্য, তাঁকে ডাকতে পারলেই ভাল। দেহ ধরলেই নানা উপসর্গ।"[৪]

দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন বাস করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হলেন যে শ্রীমা-ই তাঁর যুগধর্ম সংস্থাপনের অন্যতম সহায়িকা। সেইসময় তাঁকে ষোড়শীরূপে পূজা করে নারীর শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিতা করলেন। মাতৃভাবের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের সামনে প্রতিষ্ঠা করলেন সারদা দেবীর অপরূপ মাতৃমূর্তিকে। পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এ-ঘটনা এই প্রথম। শ্রীমায়ের সুপ্ত দেবীশক্তিকে ঠাকুর উন্মোচন করলেন জগতের কল্যাণে। শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা পূজিতা হয়েও শ্রীমার প্রতিদিনের জীবনযাত্রার কোনও পবিবর্তন হয়নি। আপন মহিমাকে অনায়াসে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে তিনি অতিসাধারণ জগতে বিচরণ করেছেন। রামকৃষ্ণ-সারদার সাধনার লক্ষ্য বস্তু এক কিন্তু পদ্ধতি, প্রকৃতি পৃথক। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই ঈশ্বরময়। মায়িক জগৎসংসারকে তিনি ভুলে থাকতেই ভালোবাসতেন। কিন্তু শ্রীমার সাধনায় দেখি অন্য ছবি। মাতৃরূপে সাধনায় তিনি জগতকে দূরে সরিয়ে রাখেননি বরং জাগতিক সবরকম কর্ম করেই মনকে রেখেছেন নিরন্তর ঈশ্বরাভিমুখী। তিনি দেখাতে এসেছিলেন সাধারণ মানুষ সংসারের সব কর্তব্য সম্পাদন করেও ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের সুখের জন্য নিজেকে বিলীন করে বিরাটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার একটি পথ গার্হস্থ্য জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা গ্রহণ করে মা ফিরে গেছেন নহবতে। সেখানে দরমা দিয়ে ঘেরা

ক্ষুদ্র ঘরটিতে শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং ঠাকুরের পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তদের জন্য শ্রীমায়ের সেবারূপ তপস্যা। সে তপস্যায় মা নিঃশব্দে নিজের দেহ-মন ঢেলে দিয়েছেন। পল্লীগ্রামের উন্মুক্ত আলোবাতাসে মা লালিতা; আর দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে থাকতে হয়েছে নহবতের ওই ছোট্টো আটকোণা ঘরটিতে। ওরই মধ্যে রান্নাবান্নার যাবতীয় জিনিস। আর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা সহজসাধ্য ছিল না। কখনও তিনি অখণ্ডে বিলীন, আবার কখনও ভাবভক্তিতে মাতোয়ারা 'মায়ের বালক'। এই দেবমানবের সেবা মা নিরলসভাবে করেছেন প্রায় চোদ্দো বছর, সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে দৈনন্দিন নানা অসুবিধার মধ্যে। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কখনও তাকাননি। কিন্তু এর জন্য ছিল না তাঁর মনে কোনও অনুযোগ। বরং এত কৃচ্ছ্রতা বরণ করেও বলেছেন, "আমি তো, মা, তখন অশান্তি কেমন জানতুম না।"[৫] নহবতের ওই ক্ষুদ্র ঘরটিতে প্রায় বন্দিনীর জীবন কাটিয়েও বলেছেন, " ...তাঁর সেবার জন্য কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।"[৬] আমাদের মনে হতে পারে শ্রীমা ঠাকুরের প্রতি দিব্যপ্রেমের উল্লাসে সংসারের দৈনন্দিন অসুবিধা-অভাব-অনটনের কথা ভুলে থাকতে পারতেন। কিন্তু এই চিন্তাধারায় যতই চমৎকারিত্ব থাক, বাস্তবে তার প্রতিফলন সহজ নয়। প্রকৃতপক্ষে লৌকিক ও লোকোত্তরকে এক সুরে মিলিয়ে চলার পেছনে ছিল মায়ের দুর্লভ চারিত্রিক গুণ। শ্রীমার কোনও চাহিদা ছিল না। তাই ভোগের বস্তু পাওয়া বা না পাওয়ার ওপর তাঁর মনের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করত না। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"[৭] শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এই মন্ত্রের সার্থক প্রয়োগ। তাই তাঁর কাছে শুনি, "চটের উপর পটপটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁশোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনো তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হতো, এখন এই সবে (খাট বিছানায়) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাত বোধ হয় না, মা।"[৮] বলেছেন ..."সন্তোষের সমান ধন নাই।"[৯]

দক্ষিণেশ্বরে একদিকে নহবতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলেছে শ্রীমার নীরব সংসার সেবা, অপরদিকে ভবতারিণীর মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবসুধা বিতরণে। কত কত জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসছেন। তাঁরা পবিত্র হচ্ছেন, তৃপ্ত হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করে। আবার কখনও সেখানে চলেছে অবিরাম ভজন, কীর্তন। শ্রীমা দূর থেকে শোনেন আর আনন্দে ভরপুর হয়ে যান, মনে ওঠে না দৈনন্দিন কঠোরতার কোনও গ্লানি। তাঁর নিজের কথা : "ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাঁপির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাতজোড় ক'রে পেন্নাম করতুম। কি আনন্দই ছিল। দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে।"[১০] "কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে, রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি।' "[১১]

ভক্ত হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাবার অনুমতি শ্রীমার নেই, আবার স্ত্রী হিসেবে ইচ্ছামতো পতির পাশে থেকে ওই দুর্লভ আনন্দ আস্বাদন করার উপায় নেই। দিনের মধ্যে একটিবারমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান তাঁকে খাওয়ানোর সময়। শুনলে মন বিদীর্ণ হয় যে সেই একটিবারের দর্শন-সৌভাগ্যও তিনি ত্যাগ করেছেন অপরের আনন্দের জন্য। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, আক্ষেপ নেই। তাঁর কখনও একথা মনে হয়নি যে

ফাল্গুন ১৩১৯ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর অপর কারও থেকে একটু বেশি অধিকার তাঁর অছে। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন : "...মায়ের চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য, আরাধ্য স্বামীর বিষয়ে কথা বলবার সময়ে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাস কখনো ফুটত না।... তাঁর পরিচয় জানে না এমন কারো পক্ষে তাঁর কথাবার্তা থেকে কোনোমতে অনুমান করা সম্ভব নয় যে, চারপাশের অন্য কারো থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপরে তাঁর দাবি অধিকতর, বা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর...।"[১২] আজ পর্যন্ত কোনও ইতিহাস নেই যা এই কাহিনির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিতে পারে, কোনও মহাকাব্য নেই যা এই আত্মবিলয়ের মহিমার কথা আমাদের শোনাতে পারে।

নহবতে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মা ইষ্টসাধনায় মগ্ন হয়েছেন, সময়ের অভাব তাঁর হয়নি। রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতেন, জগৎ ভুলে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতেন, কখনও বা সমাধিতে ডুবে যেতেন। প্রতিদিনের জীবনচর্যায় ঈশ্বর-আরাধনার শিখাটিকে অনির্বাণ রাখতেন বলেই এমন 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হয়ে সংসারে বাস করেছেন। নিয়মিত জপ, ধ্যান, প্রার্থনার ওপর তিনি জোর দিতেন। বলেছেন, "ওটি হল যেন নৌকার হাল।"[১৩] তাঁর উপদেশ : "সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে।"[১৪] তাঁর ভাষায়—জীবনের উদ্দেশ্য হল, "ভগবানলাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা মগ্ন হ'য়ে থাকা।"[১৫]

শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরেও লজ্জাশীলা মা তাঁর সমস্ত সংকোচ ত্যাগ করে নিজের অসুবিধার কথা বিস্মৃত হয়ে কলকাতার প্রতিকূল পরিবেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীমাকে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। রানী রাসমণির তহবিল থেকে শ্রীমার জন্য প্রতিমাসে সাত টাকা করে আসত। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সে টাকা বন্ধ হয়ে গেল। মা তখন চরম বৈরাগ্যে নির্বিকারচিত্তে বললেন, "বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেলেন—টাকা নিয়ে আমি আর কি করবো?"[১৬] এ ঘটনার পর মা ফিরে গেছেন কামারপুকুরে। সেখানে ভাতের পাতে নুনটুকুও জোটেনি। নিকট আত্মীয়েরা কেউই কোনও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, একটি পয়সার জন্য কারও কাছে চিৎহাত করবে না। নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থায় মা ঠাকুরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে কারও কাছে হাত পাতেননি বা মুখ ফুটে নিজের দুঃখের কথা কাউকে জানাননি।

'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে শঙ্করাচার্য তিতিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার বাস্তব অনুশীলন-ক্ষেত্র শ্রীমায়ের জীবন।

"সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্বকম্
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।"[১৭]

সমস্ত দুঃখ অপ্রতিকারপূর্বক সহ্য করা—শুধু তাই নয়, মনে মনেও তা নিয়ে কোনও দুঃখপ্রকাশ না করাই হল তিতিক্ষা। শ্রীমা তাঁর সুদীর্ঘ সংসার-জীবনে তিতিক্ষার সাধনায় অবিশ্বাস্যভাবে সফল হয়েছিলেন। শ্রীমার চরিত্রের সহজাত ত্যাগ, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা সর্বদাই তাঁকে দৈনন্দিনতার অনেক ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় কখনও উৎপীড়িত বোধ করেননি। এর অনেক আগের ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মাড়ওয়ারি ভক্ত

লছমীনারায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দশহাজার টাকা দিতে চাইলেন। ঠাকুর যেন পরীক্ষা করার জন্যই শ্রীমাকে ওই টাকা গ্রহণ করতে বললেন। শ্রীমা ধীর অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন—টাকা নেওয়া হবে না। কারণ টাকা নিলে সে টাকা শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাতেই খরচ হবে। মনে রাখতে হবে তখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের সংসার মোটেই স্বচ্ছল নয়। শারীরিক কঠোরতা ও অভাব-অনটনের মধ্যেই তিনি দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু প্রলোভন তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। সাধারণ মানুষ এই প্রজ্ঞার অধিকারী নয় ঠিকই কিন্তু প্রলোভনকে সংযত করা প্রত্যেকটি মানুষের সামাজিক কর্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসংবরণের পর মাকে দেখি এক বিচিত্র পারিবারিক পরিবেশে। মায়ের পিত্রালয় তখনও দরিদ্রের সংসার। হাঁড়ি হাঁড়ি ধান সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে ধানভানা, ঘর নিকানো, বাসনমাজা প্রভৃতি কাজে মাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হত। এরপরও ছিল পূজার আয়োজন। স্বহস্তে পূজা করা, প্রসাদ ভাগ করে দেওয়া, তরকারি কাটা ইত্যাদি কাজ প্রতিদিন তিনি প্রীতির সঙ্গে করতেন। শৈশবে পিতামাতার সংসারে যেমন নিরলস পরিশ্রমের জীবন কাটিয়েছেন, বেশি বয়সেও পিত্রালয়ে তার ব্যতিক্রম হয়নি। পার্থক্য ছিল সংসারের পরিবেশে। শ্রীমার পিতামাতা ছিলেন বহু সদ্‌গুণের অধিকারী এবং তিনিও ছিলেন তাঁদের উপযুক্ত কন্যা। সুতরাং সেই দরিদ্রের সংসারে শান্তির অভাব ছিল না।

কিন্তু ভ্রাতাদের সংসারে শত ঝঞ্ঝাটপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে তিনি যে উদ্বেগজনক, বিরক্তিকর, ক্লেশদায়ক জীবন কাটিয়েছেন তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। সাধারণ মানুষও সংসারে যেসব ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত হয় তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শান্তি পেতে চায়, শ্রীমায়ের সংসারের ঝামেলা ছিল তার চেয়েও শতগুণ বেশি। সে সংসারে তাদের পরস্পর স্বার্থ-সংঘাতের ফলে ঝগড়া, মনোমালিন্য সর্বদা লেগেই থাকত। এছাড়া ভাইঝিদের পরস্পর হিংসা, নলিনীদির শুচিবায়ু, রাধুর সহস্র আবদার, ছোটোমামীর পাগলামি—এসবই ছিল মায়ের পারিবারিক জীবনের নিত্য ঘটনা। কিন্তু যে-কোনও পরিস্থিতিতেই মা ধীর, স্থির, শান্ত, সংযত। হৃদয়ে অপার্থিব ভালোবাসা, অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে বিচিত্র, বিরুদ্ধ স্বভাবের অনেকগুলি আত্মীয়-পরিজনের যে সেবা মা নীরবে করেছেন জগতের ইতিহাসে তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আব আছে কিনা আমাদের জানা নেই। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মুখের প্রসন্ন হাসিটুকু তাঁর কখনও মিলিয়ে যায়নি। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে সংসারের অবুঝ ও সংকীর্ণ মানুষগুলিকে একসূত্রে তিনি বেঁধে রেখেছিলেন।

শ্রীমায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণের মৃত্যুর পর তার কন্যা যোগমায়াস্বরূপিণী রাধুর দায়িত্ব সর্বান্তঃকরণে শ্রীমা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাকে সন্তান-স্নেহে পালন করেছেন, যথাসময় বিবাহ দিয়েছেন এবং তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সবরকম লৌকিকতার সম্পর্ক বজায় রেখে সামাজিকতা রক্ষা করেছেন। কিন্তু শ্রীমায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা অনুভব করার যোগ্যতা রাধুর ছিল না। বরং সহস্র আবদার ও অত্যাচারে তাঁকে সে উত্যক্ত করেছে। ভাবতে অবাক লাগে যিনি নিজেই জগৎকারণ, সর্বকর্মফলপ্রদায়িনী, তিনি প্রাকৃত জননীর ন্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে উপায় খুঁজেছেন কীভাবে সন্তানকে রোগমুক্ত করবেন। বলেছেন, "আমি তো সকল দেবতাদের মান্য করে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি; কিন্তু কেউ মুখ তুলে চাইছেন না। বিধির বিধান যা আছে—রাধুর কপালে যা আছে—তাই হবে। ঠাকুর, তুমিই রক্ষাকর্তা।"[১৮]

একদিকে ঈশ্বর-নির্ভরতা, অপরদিকে মাতৃহৃদয়ের আকুলতা—দুটি ভাবের সংমিশ্রণ

শ্রীমার জীবনে বারবার দেখা গিয়েছে। শ্রীমার স্নেহ ও শিক্ষা সত্ত্বেও রাধুর বুদ্ধি-বিবেচনা কোনওদিন সংযত হয়নি, আচার-আচরণও মার্জিত হতে পারেনি। ধৈর্যশালিনী মা সেসব শুধু নীরবে সহ্যই করেননি, সতত তার কল্যাণচিন্তা করেছেন। একদিনের ঘটনায় সামান্য কারণে সে ক্ষিপ্ত হয়ে মার শ্রীঅঙ্গে আঘাত পর্যন্ত করেছিল। শ্রীমা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের দিকে তাকিয়ে জোড়হাতে প্রার্থনা করেছেন, "ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ!"[১৯] আরও বলেছেন, "রাধী এ শরীরকে ঠাকুর কোন দিন একটু শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস। তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায়?"[২০] অন্য আর একদিনের ঘটনায় রাধু শ্রীমাকে পা দিয়ে আঘাত করতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে "করলি কি, করলি কি, রাধী?"[২১]—বলে নিজের পায়ের ধুলো তার মাথায় দিলেন। সত্যই তিনি 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী' বা তার থেকেও বেশি। শুধু ক্ষমাই করলেন না, মহাপাপ থেকেও মুক্তি দিলেন। শত অপরাধ ক্ষমা করে মা সকলকে স্নেহে বুকে টেনে নিয়েছেন। নিঃস্বার্থ প্রেমই ছিল তাঁর সম্বল যা শুধু দিয়ে যায়, প্রতিদানে কিছুই চায় না।

শ্রীমায়ের অপর দুই ভাইঝি—নলিনী ও মাকু শ্রীমায়ের সঙ্গে বাস করত। তাদেরও সব দায়িত্ব শ্রীমাই গ্রহণ করেছিলেন। তারা দুজনেই ছিল অবুঝ ও সংকীর্ণ মনের মানুষ। তাদের নানা দোষক্রটি সত্ত্বেও সংসার-সুখে বঞ্চিতা মেয়ে দুটির প্রতি মায়ের স্বাভাবিক স্নেহ ছিল। নলিনীদির অস্বাভাবিক শুচিবাই নিয়ে গভীর রাতেও মহা অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হত। শ্রীমা কত প্রবোধ দিতেন। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইতেন কিন্তু নলিনী সেসব কিছুই শুনত না। এই কারণে পরিবারের আর সকলে বিরক্ত হলেও শ্রীমা কখনও তাঁর প্রতি বিরূপ হতেন না। গভীর রাতে কোমলকণ্ঠে মা বলেছেন, " 'নলিনী, ওমা নলিনী, ওঠ মা, ঘরে চল্। কেন বাইরে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছিস, মা?...' 'আহা, নলিনী ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম বুঝতে পারে না, তাই রাগ করে কষ্ট পায়, আর সকলেও তার ওপর বিরক্ত হয়।' "[২২] স্নেহসিক্তকণ্ঠে মিষ্ট কথায় মা নলিনীর অভিমানী মনকে শান্ত করতেন, অন্যের রোষ থেকেও রক্ষা করতেন।

শ্রীমার ভ্রাতৃবধূ—রাধুর মা, ভক্তদের ছোটোমামী যেমন ছিলেন বিকৃতমস্তিষ্ক তেমনই ঈর্ষাপরায়ণ। তাঁর মনের ইচ্ছা শ্রীমা সর্বাপেক্ষা রাধুকেই বেশি ভালোবাসেন, অন্য কাউকে নয়। তাঁর পাগল-বুদ্ধিতে যখনই মনে হত শ্রীমা এর বিপরীত কিছু করছেন, শ্রীমাকে অকথ্য গালিগালাজে উত্যক্ত করেছেন। মা সেসব গালিগালাজ পাগলের প্রলাপ বলে উপেক্ষা কবতেন। শুধু তাই নয়, বলতেন " ...ওর আমি ছাড়া কেউ নেই।"[২৩] স্নেহভরে বলছেন, "গিরিশবাবু বলতেন, এটা আমার সঙ্গের পাগলী।"[২৪] শ্রীমা একদা এই পাগলিকে শান্ত করার জন্য তার দরিদ্র লোভী বাপের পায়ে পর্যন্ত ধরেছেন। ঘটনাটি হল : পাগলিমামী রাধুর গয়নাগুলি নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। মামীর বাবা ঘোর বিষয়ী—লোভে গয়নাগুলি কেড়ে রেখে দিয়েছেন। গয়না হারিয়ে মামীর পাগলামি আরও বেড়েছে। জয়রামবাটীতে ফিরে সিংহবাহিনীর মন্দিরে 'মা গয়না দাও, মা গয়না দাও' বলে কাঁদছেন। শ্রীমা নিজের বাড়িতে বসে সে কান্না শুনতে পেয়েছেন যা অন্য কারও পক্ষে শোনা সম্ভব ছিল না। তিনি সিংহবাহিনীর মন্দির থেকে তাকে নিয়ে এলেন। পাগলির তখন খেয়াল চাপল, মা-ই তার গয়না নিয়েছেন। তিনি সুর পালটে বলতে লাগলেন "ঠাকুরঝি তুমিই আমার গয়না আটক করে রেখেছ, তুমিই দিচ্ছ না।" শ্রীমা উত্তর দিলেন, "আমার হলে এই দণ্ডে কাক-বিষ্ঠাবৎ ফেলে দিতুম।" সেদিনের ঘটনা এখানেই শেষ হল। পরে একদিন সকালে মা লোক পাঠালেন

পাগলিমামীর বাবার কাছে—অলংকার ফিরিয়ে আনতে অথবা তাঁর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে। ব্রাহ্মণ এলেন কিন্তু গয়না দিলেন না। শ্রীমা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পা ধরে অনুরোধ করলেন : "আপনি আমাকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করুন।"[২৫] কিন্তু লোভী ব্রাহ্মণের মন গলল না। উপায়ান্তর না দেখে মা কলকাতায় সব জানিয়ে চিঠি দিলেন। মায়ের চিঠি পেয়ে মাস্টারমশাই ও ললিত চট্টোপাধ্যায় জয়রামবাটী এলেন। ললিতবাবুর সঙ্গে কলকাতার একজন বড়ো পুলিশ কর্মচারীর চিঠি ছিল। তিনি নিজেই পুলিশের বড়ো কর্তা সেজে গয়না উদ্ধার করতে রওনা হলে শ্রীমা ভয় পেলেন পাছে ব্রাহ্মণের কোনও অপমান হয়। তাই তিনি মাস্টারমশাইকেও সঙ্গে পাঠালেন। সন্ধ্যার আগেই গয়না-সমেত ব্রাহ্মণকে শ্রীমার নিকট উপস্থিত করা হল এবং তিনি অলংকার ফেরত দিলেন। ঘটনার সমাপ্তি হল। কিন্তু রাত দুটোর সময় খবর এল—শ্রীমার ঘুম হচ্ছে না, মাথা ঘুরছে। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে শ্রীমা বললেন, "ওরা তো সব চলে গেল গয়না আনতে; আমি সমস্ত দিন ভেবে অস্থির, পাছে ব্রাহ্মণেব কোনরূপ অপমান হয়। এই ভাবনায় বায়ু প্রবল হয়ে এমন হয়েছে।"[২৬] প্রতিদিনের জীবনে শ্রীমা এভাবে সংসারের বহু নিপীড়ন সহ্য করেছেন। কিন্তু নিরভিমানী মায়ের ভালোবাসা সংসারের বিরূপ আচরণেও কখনও থমকে দাঁড়ায়নি। মনে পড়ে, প্রথম জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনেই তাঁর ভাগনে হৃদয়ের অপমান তিনি অম্লান বদনে সহ্য করেছিলেন। তাঁর কোনও অভিমান হয়নি, হৃদয়ের প্রতিও তিনি ক্ষুব্ধ হননি। মনের বেদনা নিবেদন করেছিলেন অন্তর্যামী দেবতার কাছে।

পাগলিমামী ও নলিনী—অহিনকুল সম্বন্ধযুক্ত দুটি মানুষকে শ্রীমা তাঁর সংসারে সর্বদা মানিয়ে নিয়ে চলেছেন। একসময় মায়ের অপূর্ব বিচক্ষণতায় নলিনী সাময়িকভাবে ঈর্ষা ভুলে গিয়ে সুবিবেচনা ও সহৃদয়তার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। বহুকথিত ওই ঘটনাটির উল্লেখ না করলে শ্রীমায়ের বিচক্ষণতা, পক্ষপাতহীন ভালোবাসার কথা পরিস্ফুট করা যাবে না। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাতে হবে আর তা নিয়ে নলিনীদি অবধারিত কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। এ অবস্থায় মা করলেন কি, নলিনীদির কাছেই তত্ত্বের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়ে নলিনীদির মন একেবারে গলে গেল। পাগলিমামীর সঙ্গে তাঁর শত্রুতার সম্পর্ক ভুলে গিয়ে মা যে ফর্দ করেছিলেন তা দেখে বললেন, "ওতে কি করে হবে, পিসীমা? ওরা যেমনই ব্যবহার করুক—আর রাধীটা তো একটা পাগল, জ্ঞানগম্য কিছুই নেই—কিন্তু তোমার তো একটা মর্যাদা আছে, তুমি অত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন, পিসীমা? তুমি তোমার মতন করে যাও।"[২৭] এই বলে সেই ফর্দের সঙ্গে আরও কিছু জিনিস যোগ করে দিলেন। মা বলতেন " ...সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।"[২৮]

শ্রীমার ভ্রাতাদের অত্যন্ত স্বার্থবুদ্ধি ও পরস্পরের সাংসারিক কলহে মাকে অশান্তিতে জর্জরিত হতে হয়েছে। শ্রীমায়ের সামান্য আয় থেকে কিছু পাবার আশায় তাঁরা সর্বদা সুযোগ খুঁজতেন এবং তা নিয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা শ্রীমাকে অনেকসময় বড়োই বিব্রত করে তুলত। তাঁদের লোভ ও স্বার্থপরতায় সংসারে যে অশান্তির ঝড় উঠত তা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে মা সহ্য করতেন। সব বুঝেও কিছুটা আলগা দিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে সংসারকে বাঁচাতে চাইতেন। কিন্তু এত করেও রেহাই মিলত না। শ্রীমা একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "ভাইগুলি আমার রত্ন বটে। ওরা গলাকাটা তপস্যা করেছিল বলেই আমি

ওদের সংসারে পড়ে আছি।"[২৯] শ্রীমায়ের সর্বংসহা মূর্তি দেখে স্বামী সারদানন্দ বলেছিলেন, "আমাদের তো দেখছ—পান থেকে চুন খসলে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কি কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি যেমন তেমনটিই আছেন—ধীরস্থির!"[৩০]

বিরুদ্ধ বা বিপরীত ভাবের একদল লোকের সঙ্গে থেকেও শ্রীমা নিজের মহত্ত্ব থেকে কখনও সামান্যতম বিচ্যুত হননি, স্বমহিমায় বহু উর্ধ্বে নিজেকে রেখেছিলেন। দেখালেন সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই দয়া, প্রেম, ত্যাগ, সহনশীলতা, ক্ষমা প্রভৃতি দৈবীগুণ বিকশিত হয়ে ওঠে যার অপার্থিব সুগন্ধে পারিপার্শ্বিক জগৎ আমোদিত হয়।

শ্রীমায়ের সংসারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু, বালক-বালিকা সকলেরই যথাযোগ্য স্থান ছিল। শ্রীমা তাঁর শাশুড়ি চন্দ্রমণি দেবীর সেবা প্রাণ দিয়ে করেছেন ওই ছোটো নহবত ঘরে থেকে। শত কাজ ও নানা অসুবিধার মধ্যেও সর্বদা তৎপর থাকতেন বৃদ্ধার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। শ্রীমা শ্বশুর-শাশুড়িকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। পরবর্তী কালে আলাপচারিতায় ভক্তদের কাছে তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রশংসা করে আনন্দ পেতেন, গৌরব অনুভব করতেন। তিনি তাঁর খুড়ো নীলমাধবের সেবা পরমযত্নে আমৃত্যু করেছেন। মায়ের এই সেবারতা মূর্তির পাশে মনে পড়ে আজকেব সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের করুণ অবস্থা। তাদের অনেকেরই স্থান এখন বৃদ্ধাশ্রমে যা ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। শ্রীমা আদর্শকে জীবনে মূর্ত করে গেছেন যা অনুসরণ করার ওপর নির্ভর করে নিজের শান্তি ও অপরের শান্তি।

পরিবারের শিশুদের সঙ্গেও ছিল মায়ের মধুর সম্পর্ক। হামা দিয়ে আসা মাকুর ছেলে ন্যাড়ার দিকে নৈবেদ্যের কলা বাড়িয়ে বলছেন—"খা, গোপাল খা।"[৩১] বুঝিয়ে দিলেন ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের সেবাই ঈশ্বরসেবা। ভ্রাতৃবধূ ইন্দুমতীর পুত্র ক্ষুদিকে মা খুব স্নেহ করতেন। সে একবার মায়ের পায়ে মুঠো মুঠো ফুল দিয়ে প্রণাম করলে মা কোলে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, "বাবা, তোরা যে আমার মুক্ত হয়ে এসেছিস!"[৩২] শ্রীমার সমগ্র জীবনটি ছিল একটানা নীরব উপাসনা।

শুধু আত্মীয়স্বজন নয়, পাড়া-প্রতিবেশী, অতিথি-অভ্যাগত সকলের জন্যই তাঁর ছিল স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক। তিনি খুব মিষ্টভাষিণী ছিলেন। সুখে দুঃখে মা তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। গ্রামের বৃদ্ধা মাঝি-বউ দীর্ঘদিন না আসার পর যেদিন এসে জানাল তার রোজগেরে ছেলেটি মারা গেছে, আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন মা। সন্তান হারানোর ব্যথা নিজের মধ্যে টেনে নিলেন। মায়ের বুকভাঙা আর্তনাদে শোকাতুরা মাঝি-বউ অবাক হয়ে নিজেই মাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

আর একটি ঘটনা। জয়রামবাটীতে এক অনাথা বিধবা কানের যন্ত্রণায় মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষতের দুর্গন্ধে রোগীর নিকট যাওয়াও দুঃসাধ্য। খবর পেয়েই শ্রীমা রোগীর কাছে যান। নিমপাতা ও গরম জল দিয়ে ঘা ধুয়ে দিয়ে আসেন। তাঁর আদেশে অসহায় মহিলাকে কোয়ালপাড়া আশ্রমে আনা হয়, চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা হয়। কিন্তু রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হল না। শ্রীমা সেবকদের বলেছিলেন, "আহা! তোমরাই তার ছেলের কাজ করলে বাবা।" পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য ছিল মায়ের এমনই গভীর সমবেদনা।

জয়রামবাটীর দুর্ধর্ষ ডাকাত তুঁতে মুসলমান আমজাদ তাঁর কাছে শিশুর মতো আবদার করত এবং শ্রীমা তার সব দোষের কথা জেনেও তাঁর প্রতি স্নেহের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত

ঢেলে দিতেন। শুধু তাই নয় বলেছেন, "শরৎ (সারদানন্দজী) আমার যেমন ছেলে, আমজাদও আমার তেমন ছেলে।"[৩৩] শরৎ তাঁর অনাঘ্রাত পুষ্প, দেবসেবায় অর্পিত আর আমজাদ কীটদষ্ট কুসুম—দেব ও মানব উভয়ের পরিত্যক্ত। কিন্তু পতিতপাবনী মা তো আমজাদকে ফেলবেন না! তাঁর কাছে দুই-ই সমান আদরের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাম্যবাদ ছিল জনপ্রিয় মতবাদ এবং তার প্রয়োজনীয়তাকেও কোনওভাবে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু হৃদয়ে যদি সাম্যের অনুভূতি না থাকে তবে শুধু মতবাদ হিসেবে তার স্থায়িমূল্য থাকে না, থাকলও না। আজ থেকে একশো বছর আগে শ্রীমায়ের সুদীর্ঘ সংসার-জীবনে সাম্যবাদের যথার্থ অভিব্যক্তিতে প্রশ্নাতীত সাফল্য আমরা দেখেছি। কারণ মায়ের এই সাম্যবোধের পিছনে ছিল আত্মজ্ঞান যা কখনও ক্ষীণ বা লুপ্ত হয় না। তাই সেযুগেও মা অনায়াসে এক বাগদিকে বলতে পেরেছিলেন, "তুমি আমার অম্বিকা দাদা, আমি তোমার সারদা বোন।"[৩৪] একথা নিয়ে সমাজে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। জীবনের উদ্দেশ্য ওই অদ্বৈতজ্ঞানকে কেন্দ্রে রেখে জীবনচর্যায় অবতীর্ণ হওয়া। মা কেদারবাবুকে বলেছিলেন, "আমাদের যা কিছু, সবের মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ।.. তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।"[৩৫]

সংসারে শান্তিতে থাকার নিশ্চিত পথটিও বলে দিয়েছেন। তাঁর অন্তিম উপদেশ : "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনাব করে নিতে শেখ; কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"[৩৬] কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছেন "ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি নে।"[৩৭] গভীর রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করেছেন—"তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল ক'রে দাও।"[৩৮] আমাদের জন্যই জগন্মাতাব এই প্রার্থনা। মানুষের চরিত্রেব একটি বড়ো দুর্বলতা অপরের দোষদর্শন, যে কারণে সংসারে মনোমালিন্য ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। এর মূলে রয়েছে ভালোবাসার অভাব। সংসারের সকলকে আপন করে নিতে পারলে দোষদৃষ্টি চলে যায়। দৃষ্টি নির্মল হলে দোষীর জন্য সহানুভূতি জাগবে এবং সেই স্পর্শে তার দোষ সংশোধনও সম্ভব হতে পারে, তাই মা বলেছেন : "লোক কেবল দোষই দেখে, গুণটি কজন দেখে?"[৩৯] "ভাঙ্গতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে ক'জনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে ক'জনে?"[৪০] শ্রীমায়ের জীবনে অসংখ্য ঘটনা আছে যেখানে মা দোষ না দেখে ক্ষমা করে ভালোবাসায় দোষীকে আপন করে নিয়েছেন। বলেছেন : "আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে?"[৪১]

শ্রীমায়ের মুখনিঃসৃত ওই বাণীর অপরাংশ মায়ের জীবনের মূল সুর। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর নিজেকে তিল তিল করে উৎসর্গ করেছেন সর্বভূতের কল্যাণকামনায়। কত তাপদগ্ধ, হাহাকার-পীড়িত মানুষকে মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন। কত পথভ্রষ্টকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শুধু স্নেহের শক্তিতে। তাঁর অপার্থিব ভালোবাসা পেয়ে সাধারণ মানুষ দেবতা হয়েছে, দস্যু ভক্তে পরিণত হয়েছে। বলেছেন : "ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।"[৪২]

আজকের পৃথিবীতে মায়ের এই উদার হৃদয়ের মহৎ ভালোবাসা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সংসারের ক্ষুদ্র অঙ্গনে যেমন, সমাজের বৃহত্তর প্রাঙ্গণেও তেমন—ওই একই সমস্যা আজ প্রকট। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের কল্যাণে পৃথিবী ভোগ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ। জীবনে

স্বাচ্ছন্দ্য অনেক এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞান কি মানুষকে শান্তি দিতে পারছে? একই ছাদের তলায় থেকে কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কাউকে ভালোবাসে না। অতিরিক্ত ভোগস্পৃহা হৃদয়কে সঙ্কুচিত করেছে। হৃদয়ের প্রসারতা যদি রুদ্ধ হয়ে যায়, ভালোবাসার দীপটি যদি নিভে যায় তবে কোনও কিছুর দ্বারাই কি শান্তি পাওয়া সম্ভব? আজকের সামাজিক চিত্র বলে—না। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতাই একমাত্র পথ। শ্রীমায়ের সমগ্র জীবন এই ভালোবাসার চরম অভিব্যক্তি।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসার অমৃতধারায় অবগাহন করেই মা সংসারে বাস করেও সংসারের ঊর্ধ্বে থেকেছেন। স্বয়ং মহামায়া সংসার করতে এসে মায়ার রাজত্বের কোনওকিছুকেই অস্বীকার করেননি, আবার সযত্নে আঁকড়েও ধরেননি। মায়ের ভূমিকা ছিল সাক্ষীর। আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ বেদনায় কাতর হয়েছেন, চোখের জল ফেলেছেন। কিন্তু তাতেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকেননি। পরমুহূর্তে শান্ত হয়ে যার প্রতি যা কর্তব্য, সব করেছেন। এটি কীভাবে সম্ভব? তাঁর উত্তর : "যার যেমন কর্তব্য করে যাবে; কিন্তু ভালো এক ভগবানকে ছাড়া কাউকে বেসো না।"[৪৩] যে রাধুকে ছেড়ে মা এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, সেই রাধুকে মা অক্লেশে ত্যাগ করেছেন যখন নরলীলার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি।"[৪৪] আসক্তি ও নিরাসক্তির আলোছায়ায় মা নিপুণভাবে জীবন-শিল্পখানি রচনা করেছিলেন।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই এক। ভারতবর্ষে ওই কারণে গার্হস্থ্যজীবনকে আশ্রম নামে অভিহিত করা হয়। গৃহস্থাশ্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও কীভাবে অন্তর্নিহিত দেবত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে জীবনের দায়ভার বহন করা যায় তার অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ শ্রীমার জীবন। মা করেছিলেন ষোলো টাং। সাধারণ মানুষ যদি আন্তরিক নিষ্ঠায় কিছুটাও অনুসরণ করতে পারে তবে সংসারের ছায়াময় পথে আলোর সন্ধান পেয়ে ধন্য হবে।

সমদর্শিনী মা

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

'সমদর্শন' শব্দটির অর্থ 'সমত্ব' বা 'একত্ব' দর্শন। জগতে সৃষ্ট বহু বিচিত্র বা বিভিন্ন বস্তুকে একরূপে দেখা। এর আর এক নির্গলিতার্থ 'পক্ষপাতহীনতা'। বিভিন্ন দর্শন থেকেই পক্ষপাতিত্ব দোষ এসে থাকে—ভালো-মন্দ, প্রিয়-অপ্রিয়, সুন্দর-কুৎসিত, আপন-পর, শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি। ঈশ্বর বা ঈশ্বরকল্প মানবকে আমরা 'সমদর্শী' এই গুণে ভূষিত করি। সাধারণ ভূমিতে অবস্থিত মানব-মন পক্ষপাতহীন হতে পারে না। বস্তুর রূপ, গুণ ও অবস্থানের বৈচিত্র্য মনে স্বাভাবিক ভাবেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সৃষ্টি করে। এই বৈপরীত্যের টানাপোড়েনেই আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার নকশি কাঁথাখানি বোনা হয়ে চলে।

'ঈশ্বর সর্ববস্তুর স্রষ্টা'। একথা মেনে নিচ্ছি অন্তত যতদিন না প্রমাণিত হচ্ছে যে আর কোনও জড়শক্তি সৃষ্টির মূলগত কারণ। এখনও পর্যন্ত কারণের রহস্যময়তা কোয়ান্টাম মেকানিকস্ যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা থেকে ধরে নিতেই পারা যাচ্ছে যে জড়শক্তির সীমাবদ্ধতা প্রশ্নাতীত। কিছুদিন পূর্বেই একটি বিদগ্ধ বিজ্ঞান আলোচনায় একথাই ঘোষিত হয়েছে সগৌরবে যে চেতনাই (চৈতন্য?) এযুগের বিষয়, বিস্ময় ও বিপ্লব। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রজার পেনরোজ একটি সভায় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন—অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সৃষ্টির কারণ বিশ্বচেতনার মধ্যেই খুঁজতে হবে। নবযুগের অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদও উচ্চারিত হয়েছে হয়তো সেই দিককে নির্দেশ করেই—'তোমাদের চৈতন্য হোক'।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ঘোষণা করেছেন, এ জগৎ এক সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তিনিই বিচিত্ররূপে প্রকাশমান। এ সত্য তাঁদের ধ্যানলব্ধ। এ কোনও মতামত নয়। তাই যদি হয়, তবে অন্তত তাঁর কাছে কোনও বস্তুই পৃথগ্‌ভাবে প্রিয়-অপ্রিয় নয়। সবই ভিন্ন নামরূপের খেলামাত্র। যেমন মানবী মায়ের সব সন্তানই নিজ শরীরজাত বলে সমান প্রিয় তাঁর কাছে। তবু যেহেতু তিনি মানবশরীর ও মনের অধিকারিণী, তাই সেখানেও কিছু পক্ষপাত থাকা অসম্ভব নয়। শাস্ত্রে শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই হেয়-উপাদেয়-জ্ঞানবর্জিত বলা হয়েছে। তা না হলে তাঁর সর্বব্যাপিত্ব বা বিভুত্ব খণ্ডিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বরকল্প মানবের পক্ষেও কি যথার্থভাবে 'সমদর্শন' সম্ভব? কেমন করে বা কোন অর্থে সম্ভব? 'সমদর্শন' আক্ষরিক অর্থে বিশ্লেষণ করলে হয়—'সম' বা অবিকল এক দেখা, অথবা 'সদৃশ' দেখা। অবিকল এক বা identical দেখার অর্থ মানুষ জীবজন্তু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, ঘটিবাটি—সর্বপ্রকার জড় ও জীব, সকলকেই একরূপে বা আকারে

দেখা। কিন্তু 'সমত্ব' বলতে আমরা নিশ্চয়ই 'total identity' দেখা বুঝি না, কারণ বিভিন্নত্ব দর্শনই বাস্তবসম্মত। প্রত্যেকের পৃথক নাম ও রূপ আছে এবং এই কারণেই একটি আর একটির থেকে আলাদাভাবে দৃষ্ট। গাছপালা, ঘটিবাটি, ভাতডালকে কিছু মানুষ, গরু, বিড়াল, পাখির সঙ্গে এক করে দেখা নয়। তাহলে 'সমত্ব' শব্দটিকে 'অবিকল এক' অর্থে না গ্রহণ করে 'সদৃশ দর্শন' অর্থে নেওয়া ভালো।

দুটি বস্তু সদৃশ মানে দুয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল ও কয়েকটি বিষয়ে অমিল আছে। যদি বলি 'ক' ও 'খ' সদৃশ, তাহলে বুঝতে হবে 'ক' ও 'খ'-এর মধ্যে কয়েকটি গুণ সাধারণভাবে আছে, আবার কয়েকটিতে উভয়ে পৃথক। তাই সদৃশ বস্তুতে কয়েকটি বিষয়ে ভেদ ও অভেদ উভয়কেই দেখি। অর্থাৎ শ্রেণীগতভাবে সব মানুষকেই 'মানুষ' বলে দেখি, আবার ব্যক্তিরূপে 'এ পুরুষ, ও স্ত্রীলোক, এ লম্বা, ও বেঁটে,' এইসব প্রভেদ দেখে থাকি। কিন্তু এই দর্শনকে সমদর্শন বলা হচ্ছে না, কারণ তাহলে আমরা সকলেই 'সমদর্শী'-র পর্যায়ে পড়ে যাব। আবার ঈশ্বরকল্প পুরুষেরও এরূপ দেখায় সমদর্শন হচ্ছে না, কারণ তিনিও কিছু বিষয়ে অভেদের সঙ্গে কিছু বিষয়ে ভেদ দেখছেন এবং আমাদের মতন তাঁরও তাহলে পক্ষপাতদোষ এসে যাবে। তবে কি 'সমদর্শন' কথাটি শুধু তত্ত্বের ক্ষেত্রেই থেকে যাবে? বাস্তবে প্রয়োগ করা যাবে না?

সমদর্শন আসলে একটি উচ্চতম আদর্শের কথা। একে প্রয়োগ করতে গেলে বাস্তবের বৈচিত্র্যকে রেখেই এক জায়গায় অবিকল একত্বকে দেখতে হবে, কিছু বিষয়ে অভেদকে নয়। বলা যেতে পারে বৈচিত্র্যকে বহিরঙ্গে দর্শন করেও ভিতরে 'এক'-কে দেখতে হবে। তবেই ঠিক 'সমদর্শন' কথাটির অর্থ বোধগম্য হবে। নামরূপের প্রভেদকে অস্বীকার করা চলবে না, তাহলে বাস্তবতা খণ্ডিত হয় এবং তত্ত্ব কখনওই বাস্তববিরোধী হতে পারে না। বরং বাস্তবকে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করে বলেই তার সার্থকতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে (২য় ভাগ, গুরুভাব) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর সংসারের সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আমাদের মতো কেবল একভাবেই দেখিতেন না। উচ্চ উচ্চ ভাবভূমি সকলে আরোহণ করিয়া ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে যেমন দেখায়, তাহাও সর্বদা দেখিতে পাইতেন। তজ্জন্যই তাঁহার সংসারের কোন বিষয়েই আমাদের ন্যায় একদেশীমত ও ভাবাবলম্বী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেইজন্যই তিনি আমাদের কথা ও ভাব ধরিতে বুঝিতে পারিলেও, আমরা তাঁহার কথা ও ভাব বুঝিতে পারিতাম না। আমরা মানুষটাকে 'মানুষ' বলিয়া গরুটাকে গরু বলিয়া, পাহাড়টাকে 'পাহাড়' বলিয়াই কেবল জানি। তিনি দেখিতেন মানুষটা, গরুটা, পাহাড়টা—মানুষ, গরু, পাহাড় বটে, অধিকন্তু আরও দেখিতেন সেই মানুষ, গরু ও পাহাড়ের ভিতর হইতে সেই জগৎকারণ, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ উঁকি মারিতেছেন। মানুষ, গরু ও পাহাড়রূপ আবরণে আবৃত হওয়ায় কোথাও তাঁহার প্রকাশ অধিক দেখা যাইতেছে, কোথাও বা কম—এইমাত্র প্রভেদ। সেইজন্যই শ্রীঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি—'দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল—সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো।' 'বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিসনি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের; কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেইরকম। আর বালিশের ওই ভিন্নরকম খোলের ভেতরে যেমন একই জিনিস—তুলো ভরা থাকে, সেইরকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্বত—সব খোলগুলির ভেতরেই সেই এক

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাই রে, মা যেন নানারকম চাদর মুড়ি দিয়ে নানারকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন।' "

এইরূপ উচ্চভাবভূমি বা অধ্যাত্ম উপলব্ধি থেকে দেখার সামর্থ্য সাধারণ মানবের নেই। আছে শুধু স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের দর্শন—যাতে বাইরের ভিন্ন ভিন্ন নামরূপের সঙ্গে তার class concept বা শ্রেণীগত নামের একত্বটুকু বোঝা যায়। এই 'একত্ব' বুদ্ধিতে ধরা পড়ে। তার পারে যে সর্বজনীন একত্ব তা ধরা পড়ে না। 'Identity in and through difference' যাকে, উপনিষদের ভাষায় 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' বলা হচ্ছে, তা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় না। এর জন্য চাই সাধনলব্ধ আত্মদৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা জড়ের প্রভুত্ব স্বীকার করে এইরূপ একত্বে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ এঁদের মতে সর্ববস্তু জড়-জীব—সেই এক অণুপরমাণু বা কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। কিন্তু সমস্যা হল জড় থেকে চৈতন্যের বিবর্তন এঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এ সত্য ধরা পড়েছে ঋষিদের ধ্যানলব্ধ দৃষ্টিতে, তাঁরা দেখেছেন, সবকিছুই সেই এক চৈতন্যসত্তা বা পরমাত্মার বিচিত্র প্রকাশ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভেদ স্বীকার করেও পাবমার্থিক দৃষ্টিতে অভেদ জ্ঞান—এটিই সত্যদর্শন এবং এটিই 'সমদর্শনের' মর্মকথা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অর্জুনকে জানাচ্ছেন, 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব', এই ভগবদ্‌বাক্যটিকে সমদর্শনের মূল সূত্র বা দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। মণিগুলি বহু ও ভিন্ন। তাদের একত্রিত করে সংগঠিত করে রেখেছে এক অদৃশ্য সুতোর বন্ধন। এই অদৃশ্য 'এক' ও দৃশ্য 'বহু'কে যিনি একসঙ্গে দেখতে পান, সমদর্শন তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবেব ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। এক্ষেত্রে জাগতিক 'বহু'দর্শন ও আত্মিক 'এক' দর্শনের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দেবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে এ সত্যও উদ্ঘাটিত হয়েছে যে সেই একক চৈতন্যসত্তার প্রকাশের তারতম্য রয়েছে—জীবজন্তু থেকে মানুষে তার বেশি প্রকাশ, অবতারে তার সর্বাধিক প্রকাশ আর জড় বস্তুতে তার প্রকাশ অতি নিম্নমাত্রায়। কিন্তু স্বরূপত এরা একই। একটি ঘাসের ডগায় যে কিরণকণা, আর একটি সরোববে কিরণের যে বিশালব্যাপ্তি তা গুণগত বা স্বরূপত একই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদা দেবীর জগদ্‌ব্যবহারে এরূপ দর্শনেরই প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীশ্রীমা এক ভক্তকে বলছেন, "সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি।" অর্থাৎ ওই ব্যক্তি ও দুলে বাগদির মধ্যে নাম, রূপ ও সমাজ অবস্থানের ভেদ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের আন্তর সত্তায় কোনও ভেদ নেই এবং এই অভেদ জ্ঞানে মা প্রতিষ্ঠিতা। আরও কথা হল সমদর্শন অর্থ সমমানে বা সমমর্যাদায় বস্তুর গ্রহণ ও মূল্যায়ন। শ্রীমা একটি ঝাঁটাকেও তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে বলেছেন, কারণ আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগে। পরিষ্কারের কাজ হয়ে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াকে মা সম্মার্জনীর পক্ষে অসম্মানকর মনে করেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীমার ভাবনা প্রায় ঐশ্বরিক পর্যায়ে চলে গেছে যেখান থেকে কোনও বস্তুকেই 'জড় মাত্র' আখ্যা দেওয়া যাচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও স্বামী বিবেকানন্দকে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে উন্নীত করে দিয়েছিলেন যার বলে উনি ঘটিবাটি, থালা, চৌকাঠ—সবকিছুকেই চৈতন্যময় দেখেছিলেন।

আবার সব বস্তুকেই সমমর্যাদায় গ্রহণ করা নয়, সব মানসিক অবস্থাতেও সমভাব বজায়

রাখাও সমদর্শনের মধ্যে পড়ে। শ্রীশ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ'—(২/৩৮) এইরূপ সাম্যভাব অবলম্বন করে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আত্মজ্ঞানীই একমাত্র 'মানাপমানয়োস্তুল্যঃ' করতে পারেন, এই,আধ্যাত্মিক সন্তোষ বা প্রসন্নতার বলেই মানসিক সমতা লাভ সম্ভব। স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ 'Great Women of India' গ্রন্থে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, ''সামাজিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির শিখরে সমারূঢ়া শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ছিল প্রাণস্পন্দনস্বরূপ। তিনি এগুলির পূর্ণাঙ্গ আদর্শরূপে দণ্ডায়মানা।''

শ্রীমা যখন চতুর্থবার জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন, তখন ঠাকুরের ভাগনে হৃদয় তাঁকে এবং তাঁর মা শ্যামাসুন্দরীকে 'কেন এসেছ, কি জন্য এসেছ,' ইত্যাদি বলে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। ঠাকুরও হৃদয়ের ভয়ে ওঁদের অভ্যর্থনা করেননি। সুতরাং মাকে ফিরে আসতে হয় সেইদিনই। স্বামী সন্নিধানে আসা এক তরুণীর পক্ষে এ ঘটনা তীব্র বেদনাদায়ক, মর্মান্তিক। কিন্তু আমরা শ্রীমার মধ্যে তখন বা পরেও কোনও অভিযোগ বা ক্ষোভের প্রকাশ দেখছি না। শুধু এক প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে মনের গহনে ''মা কালী, যদি কোনদিন আনাও তো আসব।''[৩] আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এখানে জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরের পথের দূরত্ব, দুর্গমতা ও কষ্টের কথা। স্বামিসঙ্গ-বঞ্চিতা হয়ে নহবতের ওই স্বল্পপরিসরে অতি শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করে দীর্ঘদিন বসবাস করেও মা বলতে পেরেছেন তখন তাঁর হৃদয়ে আনন্দের ঘটটি যেন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই আত্মসন্তোষ আত্মজ্ঞানীর লক্ষণ এবং তার ফলেই সর্বত্র আত্মদর্শন ও শোক-মোহরাহিত্য। ঈশোপনিষদে ঋষি বলছেন, ''যস্মিন সর্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।''(মন্ত্র-৭)

শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥''[৪] (৫/১৮)। ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী হন। এখন এই দর্শন দুটি স্তরে থাকতে পারে। এক—ব্রহ্মবিদ সর্বত্র 'এক'কে দর্শন করে সাধনার চরিতার্থতা উপলব্ধি করেন ও পরমানন্দ লাভ করেন। তিনি এরপর জগতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন আবার নাও পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন, কেউ আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলে আবার কেউ বা পাঁচজনকে ডেকে খাওয়ায়। এই জগতের কাজে নিয়োজিত করা বা ডেকে খাওয়ানো দ্বিতীয় স্তর। বলা বাহুল্য, অবতারকল্প মানবেরা এই দ্বিতীয় স্তরের। মানবের প্রতি করুণায়, মানবকল্যাণে এঁদের দেহধারণ, তাই সংসারের পথে বিচরণ ও প্রেমে সর্বজনকে গ্রহণ। শ্রীশ্রীমাকে দেখি আপন সন্তানবোধে সকলকে ভালো-মন্দ, উচ্চ-নিচ, ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ ও সেবা করেছেন। শ্রীমার 'সমদর্শন' তাই প্রেমের ভিত্তিতে, তা বৌদ্ধিক, যৌক্তিক বা শুধু জ্ঞানের পথে নয়। তাই বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ নয়। দক্ষিণেশ্বরে নহবত থেকে ঠাকুরের ঘরে ভাতের থালাটি বহন করে নিয়ে যাওয়ার পথে যখন একটি মহিলা তাঁর কাছ থেকে 'মা' সম্বোধন করে থালাটি চেয়ে নিয়ে ঠাকুরকে দিয়েছেন এবং ঠাকুর স্পর্শদোষ ঘটায় অনুযোগ করে আর কখনও যার-তার হাতে না দেওয়ার জন্য মাকে বলেছেন, মা তখন নির্দ্বিধায় তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, ''তা তো আমি পারব না ঠাকুর!... আমায় মা বলে চাইলে আমি তো না দিয়ে থাকতে পারব না।

" তিনি যে পরিচিত-অপরিচিত, শুদ্ধ-অশুদ্ধ চরিত্রের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে তাঁর অনন্ত প্রেমস্বভাব খণ্ডন করবেন না, তা জানিয়ে দিয়েছেন।

একটি মহিলা শ্রীশ্রীমার কাছে নহবতে আসতেন দুপুরবেলায় সকলের অগোচরে। ঠাকুর একদিন তাকে দেখতে পেয়ে মাকে নিষেধ করলেন তার সঙ্গে মিশতে, কারণ অল্পবয়সে তার পদস্খলন হয়েছিল। মা তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, "ও তো এখন ভালো কথাই কয়" এবং তাকে তাঁর কাছে আসতে বারণ করেননি। এটি শ্রীমার 'প্রেমের দায়' স্বীকার এবং এর জন্য 'শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা' হয়েও সমাজ-ব্যবহারে ঠাকুরের কথা মান্য না করা। এখানে বিচার-বিতর্ক করে সাবধানে পা ফেলা নয়, হৃদয়ের অপার ভালোবাসার প্রবাহে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে চলা। মা তাই 'সতেরও মা অসতেরও মা' হতে পেরেছেন। শ্রীমা শুধু সকলকে সমভাবে গ্রহণ করেছেন তাই নয়, একই সঙ্গে তাদেরও এই অনুভূতিতে আরূঢ় করেছেন যে তারা সকলেই তাঁর স্নেহের বৃত্তের মধ্যে সমভাবেই আছেন।

ভক্তেরা খেতে বসেছেন, মা নিজহাতে এটা-ওটা পরিবেশন করছেন। কাউকে একটু বেশি, কাউকে কম দিচ্ছেন। কিন্তু ভক্তেরা অনুভব করছেন যে তাঁরা যেটি খেতে পছন্দ করেন বা করেন না, মা সেটিই যেন বুঝে তাকে বেশি বা কম পরিমাণে দিচ্ছেন এবং মা তাকেই বেশি ভালোবাসেন। এ যেন সেই বৈদিক মন্ত্রের সাক্ষাৎ উপলব্ধি—পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, উচ্চ-নিচ, আপন-পর, এসব বিভাজন আমাদের সীমিত মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের কাজ। শ্রীমা মানবশরীর ধারণ করলেও সদা ব্রহ্মসমীপে দণ্ডায়মান। ব্রহ্ম সমরস সম্পন্ন। তাই শ্রীমার সদা শান্ত ও সাম্যভাব। মানসিক সুখ-দুঃখ, শোক-মোহের ঊর্ধ্বে একটি চিদ্‌ঘন অবস্থা আছে যা থেকে সদাই অমৃত আনন্দরস ক্ষরিত হচ্ছে, যা এঁদের মনকে নিত্য সমরস ও আনন্দিত রাখে এবং এই কারণেই বহির্জগতের কোনও সুখসম্পদের ওপরে এঁদের মনের আনন্দ নির্ভর করে না। শ্রীমার ক্ষেত্রে দেখি স্বাভাবিক ঈশ্বরসান্নিধ্যই তাঁকে সর্বব্যাপারে 'সমদর্শিনী' করেছে এবং এই সান্নিধ্যজনিত একাত্মতার উপলব্ধি থেকেই তিনি নলিনীদিকে বলতে পেরেছেন, "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?"[৫]—যখন নলিনীদি মার নিম্নজাতির উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই অভৌগোলিক, অপার্থিব ভালোবাসা, এই বিশ্বজননীত্বই তাঁর স্বরূপ। যে জগন্মাতার সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধিলাভ, তিনিই নারীশরীর অবলম্বনে মাতৃপ্রেমের পূর্ণতা প্রদর্শন করে গেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কোনও তপস্যা ব্যতিরেকেই।

স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের স্তবে লিখেছেন 'প্রেমার্পণ সমদরশন'—প্রেমেতেই সমদৃষ্টি তাঁর। শ্রীশ্রীমারও তাই। জ্ঞানেতে সমদর্শন অবশ্যই আছে, তবে তাতে প্রেমের আকর্ষণকারী ও একত্রে বন্ধনকারী শক্তি নেই। ঠাকুরের মতে জ্ঞান বারবাড়িতে থাকে, প্রেম অন্তরজগতে, অন্দরমহল পর্যন্ত যায়। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর যে ব্যবহারিক বেদান্তের ভাবধারা, তাতে প্রেমই প্রধান অবলম্বন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর একাকী ধ্যানচিন্তায় বিভোর হয়ে না থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রেমের আহ্বান জানালেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।" শ্রীমাও এই প্রেমেই একীকরণ করেছেন 'শরৎ আমার যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।"[৬] জ্ঞানীর সমদর্শিতা নয়, সন্তানবাৎসল্যে একত্ববোধ—'আমার ছেলে'।

ব্যক্তিভেদে শ্রীমার ভিন্ন ব্যবহারে কখনও কোনও কোনও ভক্ত মার পক্ষপাতিত্ব দোষ

হচ্ছে ভেবেছেন, কিন্তু পরে আসল ভাবটি বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছেন। জয়রামবাটীর জমিজমা ভাগের কাজে গরমকালে সারদানন্দ মহারাজ দু-এক জনকে সঙ্গে করে কলকাতা থেকে এসেছেন। কোয়ালপাড়া থেকে কেশবানন্দ স্বামীকেও ওই কাজে ডেকেছেন। রাত্রে আহারে শ্রীমা স্বামী সারদানন্দকে গরম লুচি পরিবেশন করছেন, কিন্তু স্বামী কেশবানন্দকে জল দেওয়া ঠাণ্ডা ভাত দিচ্ছেন। এতে কেশবানন্দ স্বামীর মনে হল কলকাতার সাধু বলে মা সারদানন্দ মহারাজকে বেশি খাতির-যত্ন করছেন। উনি একটু ক্ষুণ্ণ মনেই আহার শেষ করলেন। পরদিন রাত্রে উনি দেখলেন মা ওঁর পাতেও ভাতের পরিবর্তে গরম লুচি দিলেন। কিন্তু গ্রামের ছেলে, গরমে রাত্রে ময়দার খাবার খাওয়া অভ্যাস ছিল না বলে পরদিনই পেট খারাপ হল। তখন প্রাণে প্রাণে বুঝলেন করুণাময়ী মা ওঁর শরীরের কথা ভেবেই গরমের রাত্রে আহারে ভিজে ভাত দিয়েছিলেন।

উদ্বোধনের বাড়িতে একদিন নিচে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হচ্ছে। গোলাপ-মা অনুযোগ করে মাকে বললেন, "তোমার ছেলেদের ওপর কোন শাসন নেই, পরমহংস মশাই ছেলেদের কেমন শাসনে রাখতেন।" মা উত্তর দিলেন, "কি জানি মা, আমি কারোর কিছু খারাপই দেখতে পাই না। তা শাসন করবো কি? আমি ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার কবে নিই, আমি যে মা।"[৭] আরও জানালেন, "আমাদের প্রেমের ঠাকুর। তাঁর আপনভোলা ভালোবাসায় সবই সোজা হয়ে যায়, তাতে কোনও কঠোর ভাব নেই।" মার এই কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ অতি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত। আর মার 'ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করা' মানে জীবভাবের মলিনতার আবরণ সরিয়ে তার ব্রহ্মসত্তার জাগরণ ঘটানো। মানুষের জীবগত ত্রুটি-দুর্বলতা আছেই। তার অন্তরালে যে ব্রহ্মভাব রয়েছে, তার উন্মোচনই এঁদের জীবনব্রত এবং সেই উন্মোচনে ভালোবাসাই একমাত্র অস্ত্র। যেমন তেলোভেলোর প্রান্তরে আচম্বিতে এক ডাকাতের সামনে পড়ে তাকে মার আবেগপূর্ণ পিতৃসম্বোধন, যা তৎক্ষণাৎ ডাকাত মানুষটির রুক্ষ হৃদয় মথিত করে সেখানে সন্তানবাৎসল্যের স্নিগ্ধধারা প্রবাহিত করে দিল এবং যা, সাময়িকভাবে হলেও, তার হীন পেশাকে বিস্মৃত করিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলল দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বরের জীবন্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণতলে। কোথা থেকে কোথায় উত্তরণ!

আমরা মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে যে ভেদরেখা টেনে দিই, শ্রীমার মাতৃত্বের বৃত্তে তা একেবারেই লুপ্ত। টিয়াপাখি 'গঙ্গারামে'র কৃত্রিম মাতৃসম্বোধনে তাঁর আবেগঘন উত্তর 'যাই বাবা যাই'। আত্মজের মতো তাকে নিজে হাতে না খাওয়ালে তাঁর তৃপ্তি নেই। গঙ্গারাম মারা গেলে মা বলেছিলেন, "গোপাল আমার অনেক ভগবানের নাম শুনিয়েছে।" মার কথামতো গঙ্গারামের শরীর গেরুয়া কাপড়ে ঢেকে বরদামামা ও দু-একজন ভক্ত খোল বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে নদীতীরে নিয়ে যান ও তাকে মাটিতে সমাধি দেন।[৮] মার বাড়িতে দুটি বেড়ালে ঝগড়া করবাব সময় একটির পা ভেঙে যায়। মা আক্ষেপ করে বললেন, "বেড়ালের পাটি ভেঙে গেল গো, কি করে শিকাব ধরে খাবে?" পরে ডাক্তার নলিনীবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে বেড়ালের পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে দিলেন, কয়েকদিন পরে পা-টি ভালো হলে মা পরম শান্তি পেলেন। জয়রামবাটীতে একবার গরুর গলায় দড়ি বেধে যাওয়ায় গরুর কাতর রবে আকুল হয়ে মা দূর থেকে ছুটে আসেন ও ঐকান্তিক মমতায় তাকে সেবা করে সুস্থ করে তোলেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমাদের ছেলেদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম সমর্থন

করলেও, বিদেশি সন্তানদের প্রতিও শ্রীমা তাঁর অকৃপণ মাতৃস্নেহ প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হননি। এক বিপ্লবী সন্তান মার কাছে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করে কাতরভাবে মাকে বলেন, "মা, তুমি একবার মুখ দিয়ে বল ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক।"[১] শ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আমি মা হয়ে তাদের উচ্ছন্নে যেতে কি করে বলবো, বাবা। ইংরেজ কি আমার সন্তান নয়? আমি বলি সকলের কল্যাণ হোক।" দেখা যাচ্ছে, প্রেমপূর্ণ মাতৃহৃদয়ের অনন্ত ব্যাপ্তিই তাঁকে একথা বলার অধিকার দিয়েছে,—

"কেউ পর নয় মা, জগত তোমার।" স্বামীজী লিখেছেন, 'প্রেম প্রেম, এইমাত্র ধন;' এবং 'এই প্রেম হৃদয়ে সবার।' সুতরাং প্রেমে সমীকরণ সহজ। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে দুর্বার গতিতে বাঁধাধরা নিয়মের নিগড় ছিন্ন করে, প্রেম ভাসিয়ে নিয়ে চলে সকলকে এবং 'এক' করে দেয়। শ্রীমার আচরণের ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখি। মার জন্য একটি ছেলে চালের পিঠে করে এনেছে। বহুদূর থেকে তাকে আসতে হয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে পৌঁছাতে। মা ব্রাহ্মণ-বিধবা। রাত্রে চালের জিনিস খাবেন না। মা খাবেন না শুনে ছেলেটি খুবই বিষণ্ণ হয়ে রইল, মা তার মুখ দেখে মনের ভাব জানতে পেরে রাত্রে তার আনা পিঠে খেলেন এতদিনের নিয়ম ভেঙে। ছেলেটির মুখে হাসি দেখে মা পরিতৃপ্ত হলেন ও বললেন, "ছেলেদের আনন্দের জন্য আমার নিত্যদিনের নিয়মকানুন ঠিক থাকে না।" একথা মার ক্ষোভের নয়, আনন্দের স্বীকৃতি।

সর্বজীব, সর্বপ্রাণীর প্রতি এই সর্বগ্রাসী ভালোবাসা থেকেই মা অনর্থক, যুক্তিহীন দেশাচার, জাতিবিচার, কুসংস্কারপূর্ণ হৃদয়হীন ব্যবহারকে সমর্থন করেননি। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণের শববহন করতে দেখে গোলাপ-মাব তীব্র আপত্তির উত্তরে মা দৃঢ়কণ্ঠে জানান, "শুদ্দুর কে গোলাপ? ভক্তের কি জাত আছে?" শ্রীমা এখানে ভক্ত বলতে শুধু ঠাকুরের ভক্ত বোঝাননি, বুঝিয়েছেন 'সকল মানুষকে', কারণ মানুষ জানুক বা না জানুক, সে অবশ্যই ঈশ্বর সৃষ্ট সন্তান, হৃদয়ে তাঁকেই বহন করে বেড়াচ্ছে, এই অর্থে সে ঈশ্বরের ভক্ত।

মানুষ তার স্বার্থবোধ থেকে, অধিক সুখ-সুবিধা ভোগেচ্ছায় জাতি ও শ্রেণী বিভাগ করেছে। তাছাড়া এসব ভেদাভেদের কোনও কল্যাণমূলক তাৎপর্য নেই। জাগতিক ভোগ-অসাম্য, বিশেষ অধিকারের দাবি শ্রীমার মাতৃপ্রেমের কাছে পরাজিত। অনাত্মদৃষ্টিতেই ভেদদর্শন, পক্ষপাতিত্ব থাকে। আত্মদৃষ্টিতে বহুর মধ্যে সেই 'পরম এক'কে দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমা কিন্তু এই আত্মদৃষ্টিলাভের জন্য সাংসারিক নিত্যকর্ম ত্যাগ করে 'আবৃতচক্ষু' হয়ে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্না ছিলেন না। বরং সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, আধি-ব্যাধি—সবকিছুর মধ্যে প্রবলভাবে জড়িত থেকেও সকলকে ভক্ত-অভক্ত-নির্বিশেষে আপন আত্মার আত্মীয় জ্ঞানে কাছে টেনে তাদের দুঃখ দূর করেছেন।

একবার ঘাটালের একদল ভক্ত এসেছেন শ্রীশ্রীমার কাছে উদ্বোধনের বাড়িতে। অপরিচ্ছন্ন বেশবাস দেখে সেবক তাদের ওপরে আনতে না চাইলে মা তৎক্ষণাৎ তাদের তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য বললেন এবং আরও বললেন, "ওদের বাইরেটা নোংরা, হলে কি হবে বাবা, ওদের ভেতরটা পরিষ্কার।" ভগবান যিশু বলেছেন, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." শরীর বা পোশাকের অপরিচ্ছন্নতা বাধা নয়, মনেব অপরিচ্ছন্নতাই মস্ত বাধা। এখানে শ্রীমায়ের প্রেমদৃষ্টি সরাসরি তাদের স্থূল আবরণের প্রাচীর ভেদ করে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বিচ্ছুরিত হয়েছে, যেখানে বিরাজ করছেন সেই

একই প্রেমাস্পদ। মা একদিন আশু মহারাজকে বলেছিলেন যে, ঠাকুরের ভোগের থালার কাছে পিঁপড়েরা আসছে গুটিগুটি, কিন্তু মা দেখছেন যেন ছোটো ছোটো হাত-পা মেলে ঠাকুরই এগিয়ে আসছেন। 'যথা যথা নেত্র পড়ে তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে।'—এই দর্শনই শ্রীমার প্রতিটি লোকব্যবহারকে, তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যাকে মহিমান্বিত করেছে।

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, "সত্যই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের পাত্র। মাগো, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ তুমি। আর তাতে নেই জগতের ভালোবাসার মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা। তোমার ভালোবাসা এক স্নিগ্ধ শান্তি, যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ।" মা শুধু উদার মনোভাবের বশবর্তী হয়েই যে নিবেদিতার মতন একজন বিদেশিনীকে নিজ গৃহে, নিজ সংস্পর্শে রেখেছিলেন বা তার রাঁধা পায়সান্ন ঠাকুরকে নিবেদন করেছিলেন, তা নয়। হৃদয়ের অকৃত্রিম মমতাবশতই তাঁর এই আচরণ। এই দৈবী প্রেমেই তিনি বিশ্বজননীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। এর দায় স্বীকার করতেই তিনি যেমন সাধু-মহাত্মার 'মা' হয়েছেন, তেমনই অতি হীন চরিত্রের রমণীকেও আপন কন্যার সমাদরে গ্রহণ করেছেন, যার বিরুদ্ধে অতি আপনজনের প্রতিবাদেও তিনি কর্ণপাত করেননি। বৃদ্ধা মাঝি বউয়ের মুখে তার জোয়ান ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনে মার আকুল ক্রন্দন মুহূর্তের মধ্যে মাঝি বউয়ের শোকাকুল হৃদয়ের সঙ্গে তাঁকে যেন একাত্ম করে দিয়েছে এবং তার শোকের তীব্রতা প্রশমিত করেছে, যা অনেক গুরুজনোচিত সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারাও সম্ভবপর হত না। এই 'ভাবাত্মকতা' মার কাছে সাধনলব্ধ ছিল না, ছিল সহজাত। বেদান্তের ঐক্যানুভূতি শুধু তত্ত্বগতভাবে জানা নয়, সংসারের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায়, সর্বকর্মে তার সার্থক প্রয়োগে নিজের ও সর্বজনের হৃদয়-সমৃদ্ধি ঘটানোয় ও দিব্য আনন্দলোকে তার উত্তরণেই শ্রীমা সারদা দেবীর মহিমার চির প্রতিষ্ঠা।

সাধনার নীরব অধ্যায়
প্রব্রাজিকা সদাত্মপ্রাণা

অন্তরঙ্গ সেবক অরূপানন্দ মহারাজকে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একদিন বলছেন, "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা, মা' শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে।"[১] বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার যাঁর ইচ্ছাধীন, তিনিই পারেন এমন অনায়াসে সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করতে। শ্রীরামকৃষ্ণও কথামৃতে বলছেন, 'অবতার পর্যন্ত শক্তির অন্ডারে!' নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্মের সগুণ-সাকার রূপ না মানলে ঈশ্বরের অবতারলীলাও মানা যায় না। সেই মহামায়া মহাশক্তিই এবার মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণা—কৃপাকটাক্ষে যিনি জন্মজন্মান্তরের বন্ধন ঘুচিয়ে দেন। অভয় আশ্বাস দেন, "মনে জানবে আর কেউ না থাক তোমার একজন মা আছেন।"[২] কোনও নির্দিষ্ট বিধি তাঁর জন্য নয়—যাকে আশ্রয় দেবেন বলে স্থির করেছেন তার প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা। সংস্কৃত বীজমন্ত্র যদি উচ্চারণ না হতে চায়, তাতে ক্ষতি নেই, কেবল 'মা' মন্ত্র জপ করলেও হবে—পাত্রবিশেষে এমন আশ্বাসও দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণেব দেওয়া দায় তিনি স্বীকার করেছেন। চৌত্রিশ বছর ধরে তা পালনও করেছেন। আমাদের এই মা ঠাকরুন এমনই অন্তর্মুখ, এমনই গভীর যে তাঁর অনন্ত ভাবরাশি কখনও উচ্ছ্বসিত হয় না। মায়ের এই শান্তমূর্তিই কি তাঁর অতলান্ত মহিমার দ্যোতক নয়! সেই কবে কামারপুকুরে এক ঘর লোককে ঈশ্বরীয় কথা শোনাচ্ছিলেন ঠাকুর, কিশোরী বধূ সারদা কাজকর্মের শেষে ঘুমে অচেতন—একটি ভালো কথাও তার শোনা হল না—এমন আক্ষেপ করছে কেউ কেউ। ঠাকুর কিন্তু বলছেন, "না গো, ওকে তুলনি। ও কি সাধে ঘুমিয়েচে? এসব শুনলে ও এখানে থাকবে নি, চোঁচা দৌড় মারবে।"[৩]

পাছে স্বরূপ মনে পড়লে এই দেবীমানবী তাঁর মানবলীলা থেকে মন তুলে নেন, সেই আশঙ্কায় শ্রীরামকৃষ্ণ সময়ের অপেক্ষা করেছেন। পরে নিজেই দিয়েছেন জগৎ-জীবনের পাঠ। উচ্চ ধর্মজীবনের জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, সেই চারিত্রসম্পদ অর্জন করতে শিখিয়েছেন শ্রীমাকে।

ধীরে ধীরে মা সারদা তাঁর দেবীত্বের বিপুল গরিমাকে সংহত করেছেন। অলৌকিক দর্শনাদি তাঁর বাল্য ও কৈশোরে ছিল অতি সহজ, সুলভ ঘটনা। ধূলিধূসর পৃথিবীকে যত আপন করেছেন, ততই ঢেকেছেন তাঁর দিব্য বিভূতির ঐশ্বর্য। স্বয়ং মহামায়া কিনা—তাই নিজেকে গোপন করার খেলায় তাঁর জুড়ি নেই। এবার মায়া তাঁর 'আবরণশক্তি' দিয়ে নিজের স্বরূপকে করেছেন আবৃত—আর জীবকে কৃপায় করছেন আবরণমুক্ত, মায়াবন্ধনবিরহিত। এই মর্তলীলায় যে কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত, তার বন্ধননাশে তিনি

ব্যাকুল।

মনে প্রশ্ন জাগে, ত্যাগীশ্বর ঠাকুরের বিষয়বিরাগের কথা না হয় নজিরবিহীন। সামান্য ধাতুর স্পর্শে তাঁর হাত বেঁকে যায়, কোঁচড়ে এতটুকু জোয়ান, মৌরি বাঁধলে তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন—এমন ঠাকুরের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা না হয় মানলুম কিন্তু সহজত্যাগে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমা—এ রহস্য আমরা বুঝব কেমন করে! ধাঁধা লাগার কারণ অবশ্য আছে। আপাতদৃষ্টিতে তিনি গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনী নন, সংসারের শতসহস্র কর্তব্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনও নিভৃত সাধনার পঞ্চবটীতে স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসনও নেননি তবু তিনি ত্যাগবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। নির্লিপ্তির সহজ মাধুর্য তাঁর প্রতি কথায়, প্রতি আচরণে। ১৮৭২ থেকে ১৮৮৫—এই তেরো বছরের অধিকাংশ সময় শ্রীশ্রীমা নহবতের চার দেওয়ালের মধ্যে অহোরাত্র বাস করেছেন।

স্বয়ং মহামায়া না হলে সাধারণ মানুষ কি এতটুকু পরিসরের মধ্যে বছরের পর বছর এমন অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ থাকতে পারেন! তিনি পেরেছিলেন কারণ ততদিনে তাঁর কাছে এই মানবলীলার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বরূপের বোধ জাগ্রত ছিল বলেই স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিলেন বিন্দুবাসিনীর জীবন। তিনি মা—তিনি 'কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা।' নিখিল চরাচরের প্রতি তাঁর মাতৃভাব, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণেরও প্রতি। এ জগতে কারও কাছে তাঁর কোনও প্রাপ্তি নেই, প্রত্যাশা নেই। খেলা যখন চলে তখন সেই রঙ্গে তিনি যোগ দেন, আবার যখন নামরূপের লয় হয়, তখন আপনাতে আপনি সমাহিত। সেই অন্তর্মুখ সাধনার ছবি এঁকেছেন পুঁথিকার তাঁর নিজস্ব ভাষায় :

"বাহির দুয়ারে মাতা জগৎ-জননী।
সমাধিতে বসিয়া আছেন একাকিনী
প্রকাশ্য বদন, আবরণ নাহি তায়।...
লজ্জাপরিপূর্ণ দেহে মোটে নাহি মন।
বিশ্বহিত ধিয়ানে যেন নিমগন"

ধ্যানলীল দেবীর সেই অপার্থিব রূপ দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ছেলে স্বামী যোগানন্দ। গভীর নিশীথে নহবতের সিঁড়ির পাশে মায়ের স্থির নিষ্পন্দ মূর্তি, চাঁদের নির্মল জ্যোৎস্নায় পঞ্চবটী, নহবত, গঙ্গা—সমগ্র চরাচর যেন প্লাবিত। মা নিজমুখে ওই নীরব সাধনার কথা বলেছেন : "তখন আমার অন্যরকম চেহারা ছিল—গয়না পরা, লালপেড়ে শাড়ি। গা থেকে আঁচল যখন বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই।... সেসব কি দিনই গিয়েছে মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলেছি, "তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।"[৪]

এই নিরাসক্ত দেবী নিঃশব্দে পালন করতেন অনলস কর্মময় জীবন। ঠাকুরের পথ্য-আহার্য প্রস্তুত করা শুধু নয়, সেইসঙ্গে চলত ক্রমবর্ধমান ভক্তগোষ্ঠীর সেবা। তাঁদের রুচি ভিন্ন, চাহিদা ভিন্ন! এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রীভক্তদের নিত্য আসা-যাওয়া, কখনও বা রাত্রিবাস। ওইটুকু নহবতে তিনি সকলকে নিয়ে আনন্দে থাকতে জানতেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের সেই আনন্দময় দিনগুলি থেমে রইল না। ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত এবং ক্রমবৃদ্ধির ফলে সুচিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে শ্যামপুকুরে আনা হল। সেখানে মাস দুই কাটিয়ে কাশীপুর বাগানবাড়ির খোলামেলা পরিবেশে এলেন ঠাকুর। নেপথ্যচারিণী মা

জানতেন লীলাসংবরণের আর বেশি দেরি নেই। ঠাকুর অনেক আগেই বলেছিলেন, যখন তিনি কলকাতায় রাত্রিবাস করবেন, আহার্যের অগ্রভাগ অন্য কাউকে দিয়ে খাবেন, লোকের কাছে তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা চাপা থাকবে না—তখন আর বেশিদিন তাঁর দেবশরীর থাকবে না।

তবু অসম্ভব সম্ভব করে দেবতা যদি মুখ তুলে চান এই ভেবে তাবকেশ্বরে হত্যা দিয়েছিলেন শ্রীমা। নিজের হাতে নিজের নিয়ম কাটবেন বলেই কি বিধাত্রীর ক্লেশ স্বীকার! না, নশ্বরতাই জগতের ধর্ম—তাকে মেনে চলতে হয় সকলকেই। দুদিন হত্যা দেওয়ার পর মাঝরাতে মায়ের মনে হল কে যেন কুমোরের মাটির হাঁড়িগুলো লাঠির ঘা মেরে ভেঙে দিল। জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ মহাবাজ সেই শব্দকে তুলনা করেছেন, 'রুদ্রের প্রলয়বিষাণের অস্ফুট নিনাদে'র সঙ্গে। সেই মা যিনি সৃষ্টি-স্থিতির খেলায় রয়েছেন, প্রলয়ে তো তিনিই আছেন সংহারকর্ত্রীরূপে। রুদ্রের বিষাণের অনুষঙ্গ কি তাই মায়ের মনে মহাপ্রলয়ের স্মৃতি বহন করে আনল! গভীর বৈরাগ্যের ধ্বনি উঠল অন্তরে। চমকে উঠে ভাবলেন, "এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?"[৫] সব মায়া কাটিয়ে প্রবল বৈরাগ্যে মন ভরে গেল। দুদিন জলস্পর্শ করেননি মা—এখন মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে জলপান করে যেন বাঁচলেন, পরদিন ফিরলেন কাশীপুরে।

যাঁকে ঘিরে এতবছর ধরে শ্রীমার দৈনন্দিন জীবনে আনন্দের স্রোত বয়ে চলত, তাঁর বিরহ যে কত দুঃসহ সে কথা স্বার্থান্ধ মানুষ, কী বুঝবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদা—ব্রহ্ম ও শক্তি চিব অভিন্ন, এক সত্তা হলেও একের অন্তর্ধানে অন্যের চিত্তে বৈরাগ্যের দাবানল হু হু করে জ্বলে উঠল। এমন সোনার মানুষ চলে গেলে কী নিয়ে আর বাঁচবেন! পূর্ববর্তী অবতারলীলায় আমরা দেখি, অবতারের তারণব্রতে তাঁদের শক্তিবা কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেননি। অবতারের আনন্দবিধানেই সেখানে অবতীর্ণ শক্তির সার্থকতা। এবাব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আরব্ধ কাজের অনেকটা দায় দিয়ে গেলেন শ্রীশ্রীমাকে, সেইসঙ্গে ত্যাগী সন্তান নরেন্দ্রকেও চাপরাশ দিলেন লোকশিক্ষা-দানের। ১৮৮৬-ব আগস্ট থেকে ১৯০০ সালের জানুয়ারিতে যোগমাযা রাধুর জন্ম পর্যন্ত দীর্ঘ চোদ্দো বছর সেই জীবোদ্ধারব্রতের যেন প্রস্তুতিপর্ব। এই পর্বে মা দীক্ষাদান শুরু করেছেন ঠিকই কিন্তু ১৯০০ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জীবনেব শেষ কুড়ি বছর যেভাবে অনন্ত শক্তিব, অনন্ত করুণার উৎসারে সকলকে আশ্রয দিয়েছেন, সকলের পাপ-তাপ হজম করেছেন—তার তুলনায় এই প্রথম চোদ্দো বছরের অনেকটাই তাঁর অতিবাহিত হয়েছে নীরব তপশ্চর্যায়, নিভৃত সাধনায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে মা অনায়াসে ষোড়শী পূজার রাত্রে যুগাবতারের বারো বছরের পুঞ্জীভূত সাধন-ফল গ্রহণ করলেন, তাঁর আর পৃথক সাধনার কী প্রয়োজন. শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রত্যেক ত্যাগী সন্তানকেই তাঁর অপার্থিব সাধন-ঐশ্বর্যে ভূষিত করেছিলেন, এত পেয়েও কিন্তু তাঁরা তপস্যা থেকে বিরত হননি। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরের আদরের রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) একসময় প্রশ্নকর্তা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলেছিলেন, "তাঁর কৃপায় যেসব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।"[৬]

শ্রীশ্রীমার ক্ষেত্রেও বলা যায় ষোড়শীপূজার দিন থেকে যে পরম দায়িত্ব তিনি গ্রহণ

করেছিলেন তাকে নিভৃত তপস্যার মধ্য দিয়ে আরও ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিলেন তিনি। অবতারের কাজই হল জীবকে অজ্ঞানের আঁধার থেকে আলোর রাজ্যে নিয়ে চলা। ঈশ্বর যখন মানুষের শরীরধারণ করে আর্ত পীড়িত দুর্বল মানুষের কাছে নেমে আসতে চান, তখন সেই অবতরণও ঐশী তপস্যা। মানুষের প্রতি কী গভীর প্রেমেই না ঈশ্বরের সেই দায় বহন! ঈশ্বর তপস্যা করেন অবতরণের ইচ্ছায়—অসহায় জীবকে ধরা দেন তার অতি কাছের মানুষটি সেজে। জীব তপস্যা করে উত্তরণের। সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে, তুচ্ছতা থেকে মনটাকে সে উঠাতে চায়। সব অবতারেই তাই দেখি বৈরাগ্য ও তপস্যার মধ্য দিয়ে চলেছে এক বিরাট প্রস্তুতি—জীবের দায়গ্রহণের জন্য অবতারের তপস্যা। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—সকলের জীবনেই রয়েছে এই তপস্যা ও সাধনার নির্দিষ্ট পর্ব। শ্রীশ্রীমাকে আমরা করুণার সচল বিগ্রহরূপে দেখে ধন্য হই—ভুলে যাই এই করুণাপাথারের পিছনে রয়েছে জীবদুঃখে কাতর মাতৃহৃদয়ের অতলান্ত প্রেম। সে প্রেম মহামায়ারই আশীর্বাদ। জীবে জীবে এই প্রেমবিতরণই মহামায়ার পরম তপশ্চর্যার ফল।

কাশীপুরের অন্ত্যলীলার দিনগুলি ছিল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে পূর্ণ। রোগব্যাধি যতই গুরুতর হোক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকেই আনন্দে ভরিয়ে রাখতেন। ত্যাগী সন্তানেরা পালা করে ঠাকুরের সেবা করত—অবসর সময় চলত জপধ্যান, ভজন-কীর্তনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ।

যাঁকে ঘিরে এত আনন্দ সেই 'হরি গেল মধুপুর'—ঠাকুরের শুদ্ধসত্ত্ব ছেলেরা তাঁর অবর্তমানে শোকার্ত, বিহ্বল। কিন্তু কঠোর বাস্তব তাদের একান্তবাসের স্বর্গটুকু ভোগ করতে দিল না। গৃহী ভক্তেরা কাশীপুর বাগানবাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিলে ছেলেরা ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হল।

শ্রীমার জীবনে তখন কঠোর পরীক্ষা। নিষ্ঠাবান হিন্দুঘরের বিধবা তিনি। সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সধবার বেশ পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে দর্শন দিয়ে নিবৃত করলেন। সে দর্শন এত সংশয়শূন্য যে তাকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

শাস্ত্র বলে 'সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'—পৃথিবীতে একমাত্র বৈরাগ্য সেই মহার্ঘ বস্তু যাকে আশ্রয় করলে আর কিছু হারানোর থাকে না। ধনসম্পদ, মানযশ, রূপ, বিদ্যাবত্তা—কী না চায় মানুষ। এসবের কোনটিরই প্রতি যার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই সেই বাসনাহীন মানুষের আর কার থেকে ভয়, কিসের ভয়! শ্রীমা সেই প্রবল বৈরাগ্যের স্রোতে ভেসে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর ইহকাল, পরকাল, তাঁর একমাত্র আশ্রয়। সেই শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রীতির জন্য লোকনিন্দাকে তিনি উপেক্ষা করলেন। সাদা থান কাপড়ের পরিবর্তে ধারণ করলেন লাল নরুণপেড়ে কাপড়—হাতের দুটি ডায়মনকাটা বালা হাতেই রইল। ভক্ত বলরামবাবুর বাড়িতে এক পক্ষকাল কাটিয়ে লক্ষ্মীদিদি, গোলাপ-মা, নিকুঞ্জদেবী আর ঠাকুরের ছেলেভক্ত লাটু, যোগীন, কালীর সঙ্গে বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে গেলেন। বৃন্দাবনে তপস্যারত যোগীন-মার সঙ্গে দেখা হলে দুজনেরই শোকাবেগ তীব্র হয়ে উঠল। লজ্জাশীলা মা তখন কী এক আবেশে যমুনাপুলিনে একাকিনী ছুটে যান, বাঁশির শব্দে সমাহিত হন, কখনও বা স্বগতোক্তি করেন, 'আমিই রাধা'। একসময় দক্ষিণেশ্বরে থাকতে শ্রীমা যোগীন-মাকে দিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তাঁর যেন 'একটু ভাব-টাব' হয়। ঠাকুরের ঘর থেকে নহবতে ফিরে দরজা সামান্য ফাঁক করতেই যোগীন-মা দেখেছিলেন

মা ভাবে খুব হাসছেন, আবার একটু পরেই কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। মা বলতেন, "দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশি বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত; মনে হত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশি বাজাচ্ছেন। অমনি সমাধি হয়ে যেত।" শ্রীশ্রীমার সেই নিভৃত সাধনকথা অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরা মাত্র জানতেন—ভাব চাপার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। এখানে বৃন্দাবনে সেই ভাব যেন 'মহাভাবে' পরিণত হল। শরীর বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম। ক্রমে সেই উন্মাদনার অবসানে তিনি আরও অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছিলেন। জপধ্যান, নিত্য মন্দিরাদি দর্শনে ধীরে ধীরে একটি বছরে সেই তীব্র শোকও যেন শান্ত হয়ে এল।

শোক প্রশমনের অন্য কারণও ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের একাধিকবার দর্শনলাভে মায়ের মনে বিরহের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল। যশ্রীমা পূজার আসনেখন যেমন প্রয়োজন সেভাবে ঠাকুর তাঁকে নির্দেশ দিতেন। কখনও বা শ্রীরামকৃষ্ণেরই চিন্তায় তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত। সেসময় সমাধিভঙ্গে তাঁর প্রত্যেকটি আচরণ ঠাকুরেরই মতো হয়ে উঠত—এমনকি ঠাকুর যেমন পানের সরু দিক দাঁতে কেটে বাকিটুকু খেতেন, শ্রীশ্রীমাকেও অবিকল সেইরকম আচরণ করতে দেখা যেত। এভাবেই ঠাকুরের বারবার দর্শনে মার নিঃসঙ্গতা অনেকটাই দূর হয়েছিল। একটানা একবছর বৃন্দাবনবাসের শেষপর্যায়ে শ্রীশ্রীমাকে তাই অনেকটাই স্বচ্ছন্দ মনে হয়। এক অপূর্ব বালিকাভাব তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকত।

শ্রীরামকৃষ্ণই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে পরম আশ্রয়—সত্যস্বরূপ ঠাকুরের প্রতিটি কথাই অবশ্যম্ভাবী বলে মা বিশ্বাস করতেন। একসময় অন্তরঙ্গদের উদ্দেশ্যে ঠাকুর বলেছিলেন, "এখানকার (আমার) একটি কথা মিথ্যা হলে জানবে এর (ঠাকুরের) সব কথা, সাধনভজন, অনুভূতি, উপলব্ধি সবকিছুই মিথ্যে।"[৮] শ্রীমা তাই নিঃসংশয়ে জানতেন ঠাকুর তাঁর স্ত্রীভক্তদের প্রত্যেকের সম্পর্কে যে যে মন্তব্য করেছেন, তা সর্বতোভাবে সত্য। যোগীন-মা ছিলেন শ্রীশ্রীমার ভাবসহচরী, তাঁর দীর্ঘকালের সুখদুঃখের সঙ্গী। ঠাকুর এই উচ্চকোটিব সাধিকা সম্পর্কে বলেছিলেন, "ও কুঁড়ি—ফুল নয় যে একটুতেই ফুটে যাবে। ও যে সহস্রদল পদ্ম! ধীরে ধীরে ফুটবে।"[৯] সংসারের নানা শোকতাপ তাঁকে ঈশ্বরপরায়ণ করে তুলেছিল। শ্রীশ্রীমার প্রতি প্রথম দিন থেকেই তাঁর ছিল এক অদ্ভুত ভালোবাসা। যোগীন-মার মতো গোলাপ-মাও শ্রীশ্রীমার অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী। ঠাকুরই এই দুই স্ত্রীভক্তকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। যোগীন-মা, গোলাপ-মা শুধু নন—ঠাকুরের আশ্রিতা ভক্তিমতী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বসুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দেবী। ঠাকুর বলতেন, শ্রীরাধার অষ্টসখীর প্রধানা তিনি। সেইরকম নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী নিস্তারিণী জন্মান্তরে ছিলেন অতিশুদ্ধস্বভাবা ব্রজরমণী। শ্রীশ্রীমা একদিন ভাবে দেখেছিলেন নিস্তারিণী দেবী বৃন্দাবনে রাধারমণ বিগ্রহকে ব্যজন করছেন। রক্ষণশীল ধনাঢ্য পরিবারের মেয়েদের শুভ সংস্কারের কথা শুনলে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যেমন 'কলমীর দলে'র মতো তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গেরা এসেছিলেন, তেমনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গেও এসেছিলেন মহাতপস্বিনী মাতৃকাগণ। শুদ্ধস্বভাবা এইসব অন্তঃপুরচারিণী শ্রীশ্রীমাকে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা জানাতেন না, তাঁদের প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীমার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং নিজেদের এই অবতারলীলায় শ্রীশ্রীমায়ের সখী-জ্ঞান করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক পরিচয় জানতেন বলে জমিদারগৃহিণী কৃষ্ণভাবিনীকে একসময় তাঁর নিজের জন্য ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন। ঠাকুর তখন

কাশীপুরে রোগশয্যায়। কৃষ্ণভাবিনী দেবী চালসংগ্রহ করে আনলে তা দিয়ে পায়েস তৈরি করে ঠাকুরকে দেওয়া হয় এবং তিনি পরম তৃপ্তিসহকারে তা গ্রহণ করেন।

বৃন্দাবন থেকে বলরামভবনে ফিরে মা শুনলেন তাঁর জন্য যে মাসিক সাত টাকা বরাদ্দ ছিল কালীমন্দিরের খাজাঞ্চি এবং রামলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঠাকুরের আত্মীয়দের প্ররোচনায় ত্রৈলোক্যবাবু তা বন্ধ করে দিয়েছেন। এত বড়ো সমস্যাকে মা কোনও গুরুত্বই দিলেন না। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন কামারপুকুরে স্বামীর ভিটায় পড়ে থাকতে—বলেছিলেন, "শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।" বাস্তবেও প্রায় তেমনই ঘটেছিল। রঘুবীরের সামান্য ধানজমির চাল থেকে দুটি ভাত আর জমিতে বোনা শাকপাতা ছিল তাঁর নিত্য আহার্য। শাকভাতের সঙ্গে নুনটুকুও জুটত না। সেইসঙ্গে ছিল সংকীর্ণচিত্ত গ্রামবাসীদের মিথ্যা গুজব, অপবাদ। অথচ তপস্বিনী মা কলকাতার স্ত্রীভক্তদের জানানো দূরের কথা, নিজের গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরীকে পর্যন্ত এই নিদারুণ দৈন্যের কথা জানাননি। জয়রামবাটীর নিকট-আত্মীয়দের কেউই ভাবতে পারেননি চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে মাকে কী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এইসময় লাহাবাবুদের কন্যা প্রসন্নময়ীর নির্দেশে বয়স্কা একটি মেয়ে মধ্যে মধ্যে রাতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকতেন। সম্ভবত তার মাধ্যমেই মায়ের নিদারুণ অভাব-অনটনের কথা মা শ্যামাসুন্দরী, কলকাতায় মায়ের ভাই প্রসন্ন এবং সেইসঙ্গে গোলাপ-মা, যোগীন-মা জানতে পারেন।

মা যে 'অনশনে অর্ধাশনে কায়ক্লেশে রুগ্নদেহে' কামারপুকুরে পড়ে আছেন—এই দুঃসংবাদে সবচেয়ে বিচলিত হয়েছিলেন কলকাতার স্ত্রীভক্তেরা। সেটা ছিল এমনই দুঃসময় যখন ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের মাথা গোঁজার জায়গাটুকুও ছিল না—তাঁরা তখন অধিকাংশই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মায়ের দায়িত্ব নেওয়া সেই মুহূর্তে তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

শুনে আশ্চর্য হতে হয়, এই দুর্দিনে ঠাকুরের বর্ষীয়সী ভক্তমহিলারা তাঁদের স্বামী ও স্বজনদের মানতে বাধ্য করেছিলেন যে, 'পরমহংস মশাইয়ের স্ত্রী ধর্মত তাঁদেরও মা'। মায়ের একান্ত অভাব-অনটনের দিনে সন্তানের কি কোনও দায়িত্ব নেই! অন্তঃপুরচারিণী সেই তেজস্বিনী মাতৃকাদের আমরা সহস্র প্রণাম জানাই যাঁদের সম্মিলিত প্রার্থনা শ্রীমাকে প্রতিকূল গ্রাম্য পরিবেশ থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনেছিল।

মা প্রথমবার কামারপুকুর থেকে ফিরে বলরামভবনে উঠলেন। মাকে ঘিরে বলরামের ভক্তপরিবারে যেন উৎসব শুরু হল। কামারপুকুরের একাকিত্বের পর বলরামভবনে বহু মানুষের সঙ্গ। শ্রীশ্রীমার মুখে কিন্তু এক শান্ত দিব্য শোভা—দেখে মুগ্ধ হলেন যোগীন-মা। বলতেন, "এবার কামারপুকুর হতে মা যেন সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্তিতে ফিরে এলেন। বৃন্দাবনে মা যেরূপ বালিকার ন্যায় ছিলেন, এবার তেমনটি ছিলেন না। যেন সর্বদাই আত্মস্থ। বাবুরাম মহারাজের মা একদিন মাকে প্রণাম করে বলেছিলেন, 'এমন রূপ কোথায় পেলে মা?' মা লজ্জা পেয়ে ঘোমটা টেনে রইলেন।"[১০]

বলরাম মন্দিরের ছাদে সন্ধ্যার পর গোলাপ-মা, যোগীন-মা, বাবুরামের মা মাতঙ্গিনী দেবী ধ্যানে বসতেন। যেদিন গভীর সমাধিতে শ্রীশ্রীমার দেহবোধ লোপ পেয়েছিল, সেদিনের প্রসঙ্গে মা নিজেই পরে ভক্তদের বলেছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে

আমায় কত আদরযত্ন করছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে—সে যে কি আনন্দ বলতে পারি নে। একটু হুঁশ হতে দেখি দেহ পড়ে রয়েছে। ভাবছি কী করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতরে ঢুকব? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম।"[১১]

এমন অভিজ্ঞতা একবার নয়, একাধিকবার ঘটেছে মায়ের জীবনে। বলরামবাবুর বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে মা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে প্রায় ছয় মাস বাস করেন। এখানেও একদিন ছাদে বসে ধ্যান করতে করতে মা সমাধিস্থা হন। সমাধিভঙ্গের পর অর্ধবাহ্যদশায় মা বলতে থাকেন, "ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?" গোলাপ-মা, যোগীন-মা তাঁর হাত-পা টিপে টিপে অতিকষ্টে দেহবোধ ফিরিয়ে আনেন। এই ঘটনায় প্রসঙ্গত মনে পড়ে কাশীপুরে নির্বিকল্পসমাধি থেকে ব্যুত্থানের পর স্বামীজীও বুড়ো গোপালদাদাকে চিৎকার করে ডেকে বলেছিলেন, "গোপালদা, গোপালদা আমার শরীর কোথায় গেল?"[১২] কাছেই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট গোপালদা ধড়মড় করে উঠে স্বামীজীর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টিপে বলেছিলেন, "কেন নরেন এই যে?" দেশ-কাল-পাত্রের বোধ পর্যন্ত মহাশূন্যে বিলীন হওয়ায় নামরূপের পারে নির্বিকল্পভূমিতে আত্মা যখন বিচরণ করে তখন সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে মনকে নামিয়ে আনাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। শাস্ত্রে যে নির্বিকল্পসমাধি অবস্থাকে সাধনার পরম স্তর বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় শ্রীশ্রীমার সেই অবস্থালাভের প্রসঙ্গ আমাদের স্তম্ভিত করে।

১৯০৯ সালে উদ্বোধনে স্থায়িভাবে বাস করার আগে পর্যন্ত শ্রীশ্রীমা কখনও কামারপুকুরে, কখনও বলরামবাবু, মাস্টারমশাই প্রভৃতি ভক্তের বাড়িতে কখনও বা ঘুসুড়ি, বাগবাজার প্রভৃতি স্থানে ভাড়াবাড়িতে বাস করেছেন। প্রায় সর্বত্রই গোলাপ-মা, যোগীন-মা থেকেছেন তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ জনের মতো সঙ্গিনী হয়ে। একবার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ির ছাদে শ্রীশ্রীমা ও যোগীন-মা 'পঞ্চতপা' ব্রত অনুষ্ঠান করেন। মাথার ওপর গ্রীষ্মের জ্বলন্ত সূর্য। নিচে পাঁচ হাত অন্তর ঘুঁটে দিয়ে চারটি আগুন স্থানটির চারপ্রান্তে জ্বলছে। শ্রীশ্রীমা ও যোগীন-মা সেই আগুনের মাঝখানে উদয়াস্ত বসে জপধ্যান করেছিলেন—ওই ব্রতানুষ্ঠান চলেছিল সাত দিন ধরে। 'পঞ্চতপা'র অনুষ্ঠানে মায়ের তীব্র বিরহজ্বালা অনেকটাই প্রশমিত হল।

এভাবেই কখনও অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে জপধ্যান, উচ্চ সাধনপ্রসঙ্গ, কখনও বা সমবেত ধ্যানাভ্যাস, ব্রতানুষ্ঠান শ্রীমার ব্যক্তিত্বে এনেছিল শান্ত গম্ভীর মাধুর্য। স্ত্রীভক্তেরা সর্বদাই একে অন্যের মাধ্যমে মায়ের গোপন সাধনার কথা জানতে চাইতেন। রঙ্গময়ী গৌরীমা এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় বলরামভবনে সকলের অলক্ষ্যে মায়ের ধ্যানের সময় তাঁর খাটের নিচে লুকিয়ে দেখতে থাকেন কীভাবে উনি ধ্যানকালে ভাবসমাধিতে মগ্ন হন। কখনও স্থাণুবৎ নিস্পন্দ, কখনও বা কান্নাহাসি। ঘণ্টা-দুই পর মা আসন থেকে ওঠামাত্র গৌরী-মা মায়ের পদযুগল মাথায় ধারণ করেন—লুকিয়ে তিনি মাকে ধ্যানকালে দেখেছেন শুনে মা হাসতে হাসতে বলেন—কি মেয়ে গো! শ্রীশ্রীঠাকুরের মতো মায়েরও মুহুর্মুহু সমাধি ও ধ্যানাবস্থা স্ত্রীভক্তদের মনে গভীর সম্ভ্রমবোধ জাগাত। এমনটাই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণেরও অভিপ্রেত ছিল। মা যে হরিপদবিহারিণী গঙ্গার মতো পবিত্র, তিনি যে স্বয়ং জগজ্জননী—এ বিশ্বাস তো ঠাকুরেরই শিক্ষার পরিণাম। মা বলতেন, কখনও বিশ্বাস-

শ্রীমা পূজার আসনে
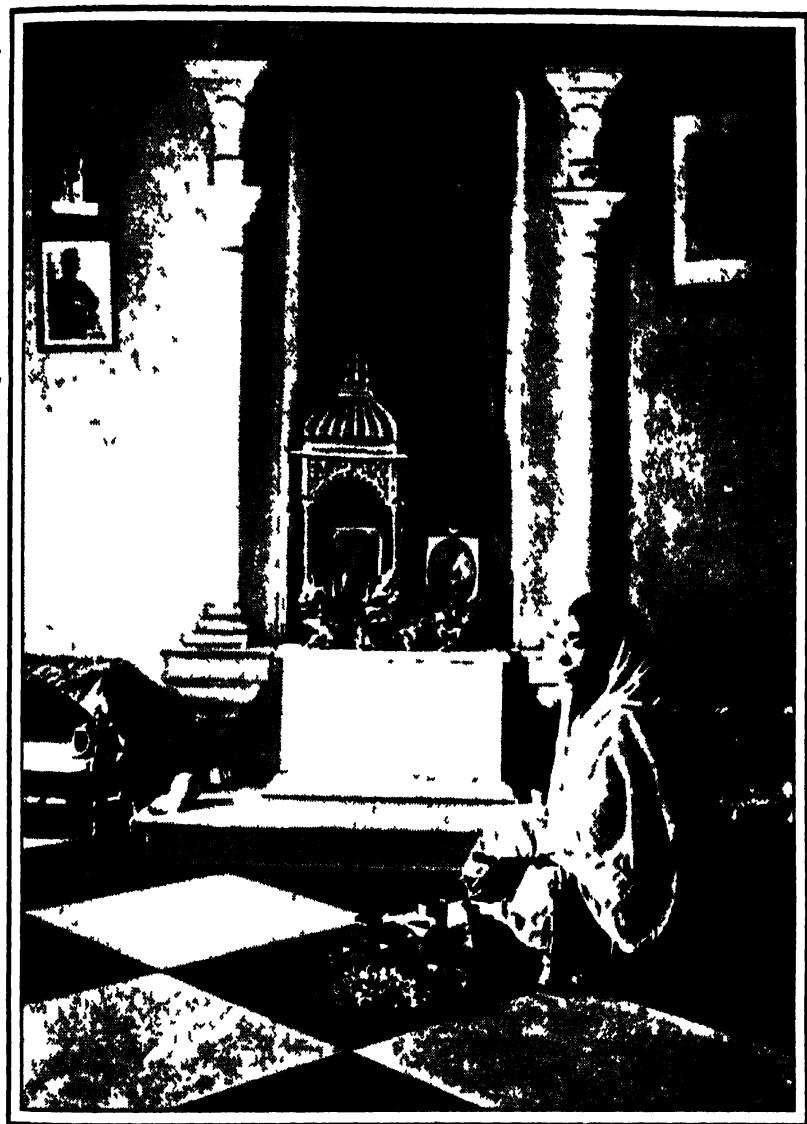
অবিশ্বাসের মধ্য দিয়েই বিশ্বাসের ভিত্তি পাকা হয়, আবার কোনওদিন পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থিনী সখীর মনস্তাপ এক লহমায় দূর করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ-আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা গোপনে থাকেনি। তিনি নিজে অন্তরঙ্গদের বলেছেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি সাধিকাও তাঁর উচ্চ অবস্থার কথা বহুজনের সামনে প্রমাণ করেছেন। তুলনায় মা নিজের সম্পর্কে নীরব, আত্মপ্রসঙ্গ উত্থাপনে অনিচ্ছুক। শোনা যায়, রাধুর জন্মের আগে পর্যন্ত শ্রীমা সর্বদাই এমন ঈশ্বরীয়ভাবে নিমগ্ন থাকতেন যে তাঁকে দেখলেই সম্ভ্রম জাগত। ভজনকীর্তন শুনে ঠাকুরের মতো শ্রীমাও সমাধিমগ্ন হতেন। মায়ের প্রায় সংজ্ঞাহীন দেহখানি গোলাপ-মা, যোগীন-মা একস্থান থেকে অন্য স্থানে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন।

ইচ্ছামাত্র নিজেকে সংবৃত করতে পারতেন শ্রীমা। প্রতিদিন পূজাকালে তাঁর সেই মহিমময়ী অন্তর্মুখ ছবি অপরিসীম মুগ্ধতায় প্রাণভরে দেখতে ভালোবাসতেন মায়ের আদরিণী কন্যা নিবেদিতা।

একই পূজারতা মূর্তি আবার পাত্রের যোগ্যতাভেদে অন্য প্রতিক্রিয়া এনেছিল। উদ্বোধনে মায়ের বিশেষ স্নেহভাজন চন্দু বা চন্দ্র পূজার আসনে উপবিষ্টা মায়ের গম্ভীর প্রশ্ন 'কী চাও' শুনে 'প্রসাদ চাই' মাত্র বলে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এসেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল—পূজাকালে মায়ের কাছে সে প্রার্থনা জানাবে, 'মা মুক্তি চাই।' অন্তর্যামিনী মা জানেন কার প্রাপ্য কী—কোথায় কার অধিকার।

শ্রীশ্রীমার পূজাকালীন প্রশান্ত মূর্তি চিরদিনের মতো অঙ্কিত ছিল নিবেদিতার মনে। তাই অসুস্থ সারার জন্য গির্জায় প্রার্থনা করতে গিয়ে মা মেরীর পরিবর্তে মা সারদার শান্ত মূর্তিটি তাঁর মনে পড়ায় প্রাণের আর্তি ঢেলে লিখেছিলেন : "রাগদ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমাব চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনও মলিন হয় না?"[১৩]

এই নির্লিপ্তিই মায়ের স্বরূপ। একা তিনি বই বিশ্বচরাচরে আর কে আছে! তিনি নিজেই ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করে তারই মধ্যে ওতপ্রোত রয়েছেন। এটা তাঁর খেলা। খেলা বলেই মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁর খুব আমোদ! অনন্ত পৃথিবী পড়ে আছে—পড়েও থাকবে। তবু জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, ক্রমে হাতাহাতি হওয়ার জো—অন্তরালে গিয়ে মা আর হেসে বাঁচেন না। আবার শিবুদাদার স্ত্রী ক্ষেপে গিয়ে ঘরে আগুন দিতে পারে শুনে টেনে টেনে মা বলতে থাকেন—তাহলে বে-শ হয়। বে-শ হয়। ঠাকুর শ্মশান ভালোবাসেন, সব শ্মশান হয়ে যায়। বলেন আর হাসেন—হাসির শব্দ ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে থাকে। চারপাশে যারা তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়েছিল তারা থমকে যায়। এ তো হাসি নয়। এ তো মায়ের অট্টহাস—সংহারের স্মৃতিতে মা যেন তখন আবিষ্ট। এ কার শরণাপন্ন আমরা! মহাভাবময়ী মহাশক্তি মুহূর্তে নিজেকে সংবৃত করে নেন—এবার তাঁব সর্বসাধারণের জন্য করুণাময়ী অভয়ামূর্তি—নিজের স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাকে আড়াল করে দীনার্ত সন্তানকে দেন পরম আশ্বাস "আমি মা থাকতে ভয় কি?"

শ্রীমার সাধনা ছিল নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনা। সেই সাধনপর্ব শেষ হলে যোগমায়া রাধুকে অবলম্বন করে তাঁর মন নেমে এসেছিল সুখদুঃখ, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বময়

জগতে। সেখানে তিনি 'পিঁপড়ের সার' অগণিত সাধারণ মানুষকে মায়ের মমতায় গ্রহণ করেছেন, জাতপাতের বিচার করেননি, পুণ্যবান-পাপীর ভেদরেখা টানেননি। অকাতরে নিজেকে শুধু দিয়ে গেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মময়ী যেন ভক্তি-মুক্তির চাবিকাঠি খুলে দিয়েছেন— সকলকে নিয়ে তাঁর প্রেমের ভুবন। সেই মা যখন বলেন, 'আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝে তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝে তিনি' তখন তাঁর অদ্বৈতচেতনার উদ্‌ঘোষ আমাদের বিস্মিত করে না, কারণ 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে' এই মহিমময়ী আগাগোড়া লীলা করে গেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর মধ্যে যে জ্ঞান ছিল বিশুদ্ধ অনুভূতির স্তরে, এবার তাকেই মা এনেছেন ব্যবহারিক পর্যায়ে। মায়ের এমন বানভাসি ভালোবাসায় আবিশ্ব মানুষ, জীবজগৎ সকলেরই সমান অধিকার।

সংগীতময়ী শ্রীশ্রীমা

স্বামী সর্বগানন্দ

"ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিখ্যাত উক্তি বহুদ্ধৃত। মা যে যথার্থ জ্ঞানদায়িনী সেকথা যত দিন যাচ্ছে ততই প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে, যিনি সরস্বতী, তিনি যেমন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তেমনি সংগীতেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিশ্চয়ই। মায়ের জীবনে কই তেমন তো কোনও সাংগীতিক অভিপ্রকাশ চোখে পড়ে না। সংগীত যেখান থেকে পরিনিষ্ক্রান্ত হয়েছে, সেই দেবীর মানবীলীলায় সংগীত কই? উত্তরে বলা যায়, আছে। ফল্গুধারার মতো। মায়ের জীবনে সংগীতের একটা প্রবাহ সর্বদা বয়ে যেত, বাইরে তার কোনও বিশেষ অভিব্যক্তি ধরা পড়েনি। রঙ্গময়ী যদি নিজে ধরা না দেন তো কারও সাধ্য নেই তাঁকে ধরে। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল লিখেছিলেন, "মা তোর রঙ্গ দেখে বঙ্গময়ী, অবাক হয়েছি।.. এতকাল রইলাম কাছে, ফিরলাম পাছে পাছে, কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার মেনেছি।" স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রায়শ শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলতে গেলেই এই গানের কলি উদ্ধৃত করতেন। কখনও বা গেয়ে শোনাতেন। প্রজ্ঞাপবমার বর্ণনা কে দিতে পারে? যেখানে সরস্বতী (বিদ্যা) মিলিত হন দৃষদ্বতীর (অনুভব বা দর্শন) সঙ্গে সেখানেই উপ্ত হয় সভ্যতার বীজ। সেখানে ঈশ্বরের জীবন্ত পদচিহ্ন ভক্তকে পথ দেখায় তার পবমপ্রাপ্তিব লক্ষ্যে।

শ্রীশ্রীমায়ের সংগীত-প্রীতি ছিল, এইটুকুই লোকমুখে প্রচলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন সংগীত-শ্রবণে ভাবস্থ হয়ে উদ্দাম নৃত্য করতেন কিংবা সমাধির গভীরে গিয়ে উপস্থিত সকলকেও প্রত্যক্ষ দিব্য অনুভূতিতে আপ্লুত করাতেন, শ্রীশ্রীমায়েব সেই সুযোগ ছিল না। ইচ্ছা করলে তিনি সেই সুযোগ করে নিতে পারতেন হয়তো। মীরাবাঈ তাঁর জীবনে সেই সুযোগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু মা যে প্রথমাবধি 'অবগুণ্ঠনবর্তী' হয়েই থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ সিদ্ধান্ত কোনও নৈসর্গিক সিদ্ধান্ত নয়, অনৈসর্গিক সিদ্ধান্ত। কারণ যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার পদযুগল শিবের বক্ষে বিরাজ করে, তিনি কি এত সহজে জগদ্‌বাসীকে ধরা দেবেন? খেলা বন্ধ হয়ে যাক, এ তাঁর মোটেই ইচ্ছা নয়। সেই কারণে মায়ের আনুষ্ঠানিকভাবে সংগীতশিক্ষারও সুযোগ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ রীতিমতো সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। ঠাকুরের ভাগ্যে তা জোটেনি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজী উভয়ই সংগীতকে অবলম্বন করে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংসার অবহেলায় ছেড়ে যেতে পারতেন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে। 'সেই নগর'-এর বর্ণনা কবি দিয়েছেন, "পক্ষভেদে ক্ষয় উদয় নাইক চাঁদের সে পুরে/ সেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।" শ্রীশ্রীঠাকুর বা স্বামীজীর সংগীত-সাধনা বা সংগীত-ক্রিয়া যতটা অভিব্যক্ত ছিল, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে

সে ব্যাপারটি ততটাই গুপ্তভাবে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। কিন্তু 'সেই নগর'-এ মায়ের অহর্নিশ গতায়াত ঠাকুরের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। মায়ের মুহুর্মুহু ভাবসমাধি কখন হচ্ছে, কখন থামছে, কেউ জানতে পারত না। গীতায় যেমন বর্ণিত হয়েছে, 'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ'—অর্থাৎ হাজার হাজার নদী যেমন সমুদ্রে অহরহ প্রবেশ করলেও সমুদ্র কখনও স্ফীত হয় না, বা এই হাজার হাজার নদী সেখানে প্রবিষ্ট হচ্ছে তাও বোঝা যায় না, মায়ের জীবনেও আমরা সেইরূপ ঘটতে দেখি। সুগম্ভীর, অতলস্পর্শী মাতৃরূপিণী দেবী সারদা অশেষ কষ্ট ও গ্লানি স্বীকার করেও সন্তানকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই স্রষ্টা স্বয়ং যেন তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা নিবেদন করেন—

"অম্বিতমে নদিতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নস্কৃধি॥"

—হে শ্রেষ্ঠা, হে দেবি সরস্বতি, আমরা অসমৃদ্ধ হয়ে রয়েছি, আমাদের সমৃদ্ধশালী করে তোলো।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী বা বিভিন্ন মাতৃবিষয়ক স্মৃতিচারণ যা-কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে মায়ের সংগীতপ্রিয়তার কথা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য, সেইসব সংগীত-সম্পৃক্ত দৃশ্যপট একত্রিত করা। কোথাও দেখা যায় মা স্বয়ং গান গাইছেন, কোথাও তিনি ভাব-সমাহিত-চিত্তে গান শুনছেন। কোথাও বা কথায় কথায় গানের কলি উদ্ধৃত করছেন। কখনও বা কাউকে গানের ব্যাপারে উৎসাহ দিচ্ছেন।

নহবতে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ-কক্ষে যে উদ্দাম কীর্তনানন্দে জগৎ ভাসত, সেখানে শ্রীশ্রীমা আক্ষরিকভাবে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর সমগ্র সত্তা সেখানে মগ্ন ও একীভূত হয়ে থাকত। পরবর্তী সময় স্মৃতিচারণ করে বলতেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,(দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল।" আর ভাবতেন, "আমি যদি ঐ ভক্তদের মতো একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম।"[১]

ভক্তদের মধ্যস্থতায় ঠাকুর কখনও কখনও নিজের অভিপ্রায় পূর্ণ করতেন। সেই সকল ঘটনা ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য এবং গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ। ভক্তাগ্রগণ্যা গৌরী-মা তখন দক্ষিণেশ্বরে সবে যাতায়াত করছেন। কখনও কখনও নহবতে থাকতেন। একদিন ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে উঠলেন, "বল্ তো গৌর-দাসী, তুই কাকে বেশি ভালবাসিস?" রঙ্গময়ী গৌরী-মাও কম যান না। সুর করে গেয়ে উঠলেন—

"রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী!
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল, 'রাই কিশোরী'।"

গানের তাৎপর্য সহজেই বোধগম্য। শ্রীশ্রীমা লজ্জায় গৌরী-মার হাত চাপিয়া ধরেন। ঠাকুর হার মেনে হেসে চলে গেলেন।[২]

শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যকালে ও যৌবনে তিনি যেসব গান শুনেছিলেন সেগুলি সবই লোকগীতি ও কীর্তন অঙ্গের ছিল। কিছু কিছু তাঁর মনে ছিল এবং মাঝে মাঝেই মনের আনন্দে গেয়ে উঠতেন। জয়রামবাটীর গোপালচন্দ্র মণ্ডল শ্রীশ্রীমাকে 'পিসিমা' ডাকতেন। পুণ্যিপুকুরের

পাড়ে তাঁর বাড়ি। স্মৃতিচারণে বলেছেন, "পিসিমা যাত্রা দেখতে খুব ভালবাসতেন। তখনকার দিনে গ্রামে এখনকার মতো রেডিও বা সিনেমার প্রথা ছিল না। ফলে গ্রামে কোন পালাপার্বণকে কেন্দ্র করে বাউলগান, তরজা, যাত্রা, রামায়ণগান, চব্বিশপ্রহর, মনসার পাঁচালী প্রভৃতি হতো। চব্বিশপ্রহরে ভাগবত কথকতার জন্য গাইতে আসত নদীয়ার নারাণপুরের দল, পশ্চিমের রামডিয়ার দল ও বরণডাঙ্গার দল। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামে শীতলা-মায়ের পুজো হতো।... আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে সিংহবাহিনীতলায় রামায়ণ-গান ও যাত্রা হত। রামায়ণ-গান গাইতে আসতেন পুকুরিয়ার বাঁকু ঘোষাল ও ভুরসুবোর সতীশ আচার্য। তাঁরা পিসিমাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। দুরকমের যাত্রা হতো—কৃষ্ণযাত্রা আর সাধারণ যাত্রা। কৃষ্ণযাত্রা গাইতে আসতেন শিহড়ের রাম ছুতোরের দল ও বেজো সন্তোষপুরের নলিনী মণ্ডল ও অনুকূল মণ্ডলের দল। জগদ্ধাত্রীপূজার সময় অনেকবার কৃষ্ণযাত্রা হতে দেখেছি। যতদূর স্মরণ হয়, তখন সাধারণ পালাগুলি হতো প্রহ্লাদচরিত, ধ্রুবচরিত, নিমাইসন্ন্যাস, নবাব সিরাজদৌল্লা প্রভৃতি। হ্যাজাক জ্বেলে যাত্রা হতো। সাধারণ যাত্রার জন্য কুমুড়সে-কানপুরের দল, রামজীবনপুরের দল, বগছড়ির দল জয়রামবাটীতে যাত্রা করে গেছে। বাউলগান ও তরজা হতো জগদ্ধাত্রীপূজার সময়। বাউলগান গাইতে আসতেন ক্ষুদিরাম গোদ ও সাতবেড়ের লালু জেলে।... তরজা গাইতেন সাতবেড়ের পাঁচু রায়, মুইদাড়ার মৃগেন্দ্র ধাড়া প্রভৃতি। মনসাতলায় মাঝে মাঝে মনসার পাঁচালীগান ও মনসার ভাসানের গান হতো। দলের নাম মনে নেই, তবে লোকে বলত বেঙ্গাই-এর পাঁচালী-দল। পিসিমা এই সমস্ত খুব আনন্দ করে শুনতেন। ছোটবেলায় অনেকবারই পিসিমাকে যাত্রা, রামায়ণ-গান, বাউলগান, তরজা প্রভৃতি শুনতে দেখেছি। ঐসময় জলের ঘটি ও পানের ডিবা তাঁর সঙ্গে থাকত। গোটা অনুষ্ঠান দেখে তবে বাড়ি ফিবতেন। তখনকার দিনে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান শুরু হতো বেশ রাতেই। শেষ হতো শেষ রাতে। রাত জেগে যাত্রা দেখেও তিনি ঠিক ভোরবেলা উঠতেন, নিত্যপূজা ও সংসারের কাজ সারতেন।"[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যে যেখান থেকে এসেছে, সেখানে (সেই তীর্থে) গেলে তার শরীর থাকে না। নরেন্দ্রকে কাশী পাঠাতে ঠাকুরের খুব ভয় ছিল। মা অন্নপূর্ণা কাশীর রাজরাজেশ্বরী। শ্রীশ্রীমা কাশী গিয়ে নিজের সকল আবরণের কথা ভুলে আলুলায়িতা কেশে প্রকাশ্যে গেয়ে উঠেছিলেন :

"যে মণিকর্ণিকায় মায়ের কুণ্ডল পড়েছিল খসি,
সে অবধি তা'রে মণিকর্ণি বলে ঘোষি।"[৪]

তখন শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন। গৌরী-মা ও দুর্গাপুরী দেবী মায়ের কাছে এসেছেন। গ্রামের বালক-বালিকাবৃন্দ মায়ের কাছে আসে। ছড়া, গল্প শুনতে চায়। একদিন মা সুর করে তাদের শুনিয়েছিলেন, বন থেকে বেরুল টিয়ে/ সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। রাধু বলল, এটা শুনেছি। নতুন একটা বলো।

শ্রীশ্রীমা বললেন : ঝিকিমিকি তারা, বনকে বাদুরা...।

রাধু সন্তুষ্ট না হয়ে বলল : পিসিমা তুমি একটা গান গাও।

মা তখন পুরোদস্তুর গান ধরলেন—

"কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।..."[৫]

বাগবাজার 'মায়ের বাড়ি'তে একবার সীতাদেবীর খেদোক্তি বিষয়ক একটি গান মা গেয়েছিলেন :

"বহু সাধনার গুণে পেয়েছিলাম নবদূর্বাদল শ্যামে,
হারায়েছি বিনা যতনে, ধিক রে জীবনে ॥"[৬]

সকলে নিঃশব্দে সেই সঙ্গীত উপভোগ করেছিলেন।

ডাকাতবাবার দিব্যদর্শন তাকে কন্যার সম্মুখে উদাত্তকণ্ঠে কয়েকটি গান গেয়ে কন্যার প্রীতি উৎপাদনে প্ররোচিত করেছিল। শ্রীশ্রীমা পরবর্তী কালে তার মধ্যে একটি গান প্রায়শ গাইতেন।

"কেন কাঁদে প্রাণ তারই তরে
সে যে নহেঁ অন্তরঙ্গ, কূল করেছে ভঙ্গ।
সাধুর ঘরে যেন চোরে চুরি করে ॥"

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৯১ সালে জয়রামবাটী দর্শনে যান। পল্লীবাসীর অনুরোধে তিনি গান গাইতেন। শ্রীশ্রীমা দূর থেকে শুনে একটি গান শিখে নিয়েছিলেন।

"হামা দে পালায় পাছু ফিরে চায়,
রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে ধর ধর বলে, হামা টেনে তত গোপাল চলে।"[৭]

রাধুর ছেলের নাম মা রেখেছিলেন বনবিহারী বা বনু। কারণ কোয়ালপাড়ার বনে তার জন্ম। প্রভাতে বনুর ঘুম ভাঙানোর জন্য মা গাইতেন মীরাবাঈয়ের ভজন :

"উঠ লালজী ভোর ভয়ো
সুর-নর-মুনি-হিতকারী।
স্নান করো, দান দেহু
গো-গজ-কনক-সুপারি ॥"[৮]

সিদ্ধ গায়ক তথা সংগীতকার নীলকণ্ঠের গান ঠাকুরের যেমন অতি প্রিয় ছিল, মায়েরও প্রিয় ছিল ওইসব গান। কাশীতে 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ থাকাকালীন সুধীরা দেবী, সরলা দেবীকে মা একবার নীলকণ্ঠের গান শুনিয়েছিলেন।

"ও প্রেমরত্নধন রাখিতে হয় অতি যতনে।..."

গানটি পরিবেশন করে বলেছিলেন, "আহা, নীলকণ্ঠের গান কি চমৎকার! ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, নীলকণ্ঠ কখনও কখনও তাঁর কাছে আসত ও গান গাইত। কি আনন্দেই ছিলাম!... দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত!"[৯]

শ্রীশ্রীমায়ের প্রিয়সংগীত-প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই তিনটি শ্রেণী-বিভাজনের কথা মনে আসে। মায়ের গাওয়া গান ও মায়ের শোনা গান এবং মায়ের উল্লিখিত গান। শোনা গানের মধ্যে আছে ঠাকুরের গাওয়া গান এবং অন্যান্যদের গাওয়া গান। শুধু গানের কথা বললে চলবে না, সংস্কৃত স্তোত্রাদিও বিবেচ্য।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য লাবণ্যকুমার চক্রবর্তীর 'মাতৃস্মৃতি'তে স্বামী অভেদানন্দকৃত 'শ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্' সম্পর্কিত সুন্দর স্মৃতিচারণ আছে। "ঘটনাটি শোনার সৌভাগ্য হইয়াছিল পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের স্তোত্রগীতি বচনা করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি মাকে ইহা শ্রবণ করাইবেন। মায়ের কাছে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন : "কি স্তোত্র? কার স্তোত্র?" মহারাজ বিনীতকণ্ঠে বলিলেন : "মা আপনার স্তোত্রগীতি।" মা যেন খুবই বিস্ময়াভিভূতা হইলেন এবং বলিলেন : "বাবা, আমার আবার কি স্তোত্র?" কিন্তু ভক্তপ্রবরের নির্বন্ধাতিশয্যে স্থিরভাবে শুনিতে লাগিলেন সেই প্রসিদ্ধ স্তোত্রগীতি 'প্রকৃতিং পরমাং' ইত্যাদি।"

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মে মাস থেকে অক্টোবরের মধ্যে কোনও একসময় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে এই স্তোত্র শুনিয়েছিলেন—যখন শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে ছিলেন।

যে-সকল গান শ্রীশ্রীমা শুনেছেন এবং প্রীতিলাভ করেছেন :

এক। ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাস। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে কিছুদিন পূর্বে মঠ স্থানান্তরিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমা একদিন মঠে এসেছেন। মঠে এসেই তিনি সোজা ঠাকুরঘরে গেলেন। শ্রীশ্রীমা পূজায় বসলেন। ঠাকুরের অস্থিভস্ম 'আত্মারাম'কে প্রাণভরে পূজা করলেন। তাঁর দুটি নয়ন থেকে দরবিগলিতধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হতে থাকল। হস্তদ্বয় কম্পিত হতে লাগল। বহুক্ষণ আত্মারামকে হৃদয়ে ধারণ করে রইলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এই আত্মস্থ হওয়ার সংবাদ সকলে জানতে পারলেন। সকলে আনন্দে অধীর হয়ে খোল-করতাল সহযোগে গাইতে ও নৃত্য করতে লাগলেন—

"বাবা সঙ্গে খেলে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে, ডাকি 'জয় মা' বলে ॥
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগলী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা ওরে দেখরে চেয়ে,
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছিরে, আমরা মায়ের ছেলে।"[১০]

দুই। শ্রীশ্রীমা আছেন বলরাম বসুর জমিদারি কোঠারে (উড়িষ্যায়)। তাঁর উপস্থিতিতে একবার শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা হল। বিসর্জনের জন্য প্রতিমা শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে শোভাযাত্রায় সকলেই একতানে গান গাইলেন :

"শ্রীদুর্গানাম ভুলো না;
ভুলো না রে মন, ভুলো না।"

তিন। শ্রীশ্রীমার নিকট এসেছেন প্রথিতযশা অভিনেত্রী তিনকড়ি। তিনি শ্রীশ্রীমার ও

লক্ষ্মীদিদির অনুরোধে গান গাইলেন—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
আমি যেখানে যাই, সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে॥
মুখখানি সে যতনে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়।
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে, কতই রাখে আদরে॥
আমি জানতে এলেম তাই, কে বলে রে আপন রতন নাই?
সত্যি মিছে দেখ্ না এসে—কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে॥"

শ্রীশ্রীমা ভাবস্থ। তিনি ভাবাবস্থায় বলছেন : 'আহা! আহা!' গান সমাপ্ত হলে শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ যাবৎ সেভাবে রইলেন—সাড়া নাই, শব্দ নাই। কিছুক্ষণ ওইভাবে থাকার পর অঞ্চলে চোখ মুছে তিনকড়িকে বললেন : "আজ কি গানই শোনালি, মা!"[১১]

চার। জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা আছেন। দেবীপক্ষ। জনৈক ভিখারি এসে শ্রীশ্রীমার বাড়ির খিড়কিদ্বারে 'আগমনী' গাইছেন। শ্রীমা শুনছেন। গায়ক গাইছেন—

"যাও যাও গিরি আনিতে, গৌরী, উমা বড় দুঃখে রয়েছে।"

গান শেষ হল। শ্রীশ্রীমা চুপ করে একভাবে বসে আছে। ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইল। শ্রীশ্রীমার উত্তর নেই। চারটি পয়সা ভিক্ষা দেওয়া হল। শ্রীশ্রীমা ভাবস্থ।[১২]

পাঁচ। শ্রীশ্রীমা আছেন উদ্বোধনে। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ নিচে বসে আছেন। এক পাগলি খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেল। সে কেবল গাইতে লাগল। চোখ বুজে গাইছে। দেখতে কদর্য—কিন্তু কণ্ঠ সুকণ্ঠ। পাগলি সুকণ্ঠে শ্রীশ্রীমাকে কীর্তন শোনাল—

"দে, দে, আমায় সাজায়ে দে—তোরা সাজায়ে দে,
আমি যোগিনী হব—প্রাণকানু লাগি আমি যোগিনী হব।
গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব—শঙ্খের কুণ্ডল পরি॥
(আমায় সাজায়ে দে—তোরা সাজায়ে)
(আমি) যাইব সেই দেশে, যোগিনীর বেশে যথায় নিঠুর হরি।
যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল,
(আমার) এ রূপযৌবন, পরশ রতন কাচের সমান ভেল॥
(আমায় সাজায়ে দে—আর ঘরে রইতে নারি—আমায় সাজায়ে দে)
(আমি) মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব প্রাণের হরি।
যদি রোধে কেউ, ত্যজিব এ জিউ, নারীবধ দিব তারে॥
(আর যে রইতে নারি—আমায় সাজায়ে দে)"[১৩]

ছয়। কালীঘাটে মায়ের দর্শনের পর শ্রীশ্রীমা চলেছেন নকুলেশ্বর দর্শনে। পথিমধ্যে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন এক গৈরিকবসনা, ত্রিশূল-হস্তে ভৈরবী। শ্রীশ্রীমার মুখের দিকে চেয়ে ভৈরবী গাইতে লাগলেন :

"কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা, বল মা তাই।"[১৪]

সাত। ১৮৯১ সালে ১০ নভেম্বরে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাকালে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী এসে বেহালা বাজিয়ে গান ধরলেন—

"কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)!"

গানটি যেন শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেরই অবিকল ছবি। তাই সকলেই মুগ্ধচিত্তে শুনলেন।

ভিতর হতে যোগীন-মা ও গোলাপ-মার অনুরোধ আসায় গানটি আবার গাওয়া হল।[১৫]

এই গানটি হরিদাস বৈরাগী আবার গেয়েছিলেন জয়রামবাটীতে ১৮৯১ সালে মে মাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী বোধানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে। এই গান শুনে শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর বিগলিত হয়েছিল।

আট। মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যালয়ের বিনোদবিহারী সোম নামক জনৈক ছাত্র তাঁরই অনুকম্পায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্য ও আশ্রয় লাভ করেন। ইনি পরে থিয়েটারে যোগ দেন এবং ভক্তদের নিকট 'পদ্মবিনোদ' আখ্যা প্রাপ্ত হন। সঙ্গদোষে তিনি পানাসক্ত হয়েছিলেন এবং অধিক রাত্রে গৃহে ফেরার সময় অনেক অসংলগ্ন কথা বলতেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে ইনি 'দোস্ত' বলে ডাকতেন। শ্রীমায়ের ২/১ নং বাগবাজারের ভাড়াটিয়া বাটীর পাশ দিয়ে গভীর রাত্রে গমনকালে তিনি 'দোস্ত'কে আহ্বান করতেন; কিন্তু শ্রীমায়ের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে বাড়ির কেউ সাড়া দিতেন না। এক রাত্রে ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ না পেয়ে পদ্মবিনোদ নেশার ঝোঁকে গান ধরলেন—

"উঠগো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর দ্বার।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে উপরে মায়ের জানালার পাখি খুলে গেল; ক্রমে বাতায়নটি সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হল। পদ্মবিনোদ তা দেখে তৃপ্তি সহকারে বললেন, "উঠেছ মা! ছেলের ডাক শুনেছ! উঠেছ তো পেন্নাম নাও।" তিনি রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন এবং অবশেষে পথের ধূলি মাথায় তুলে পুনর্বার গান গাইতে গাইতে চললেন।

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না দেখে।"[১৬]

আর একবার ওই প্রকার গভীর রাতে পদ্মবিনোদ এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমার ঘরের দিকে তাকিয়ে গেয়েছিলেন—

"শ্মশান ভালবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি।"

গানের প্রভাবে পূর্ববৎ শ্রীশ্রীমায়ের খড়খড়ি খুলবার শব্দ হল। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়ে পূর্বের মতো রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে পদ্মবিনোদ গানটি গাইতে গাইতে আর উৎপাত না করে চলে গেলেন।[১৭]

নয়। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ১২ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে 'পাণ্ডবগৌরব' অভিনয়কালে দেবীমূর্তির আবির্ভাব দেখে এবং 'হের হরমনমোহিনী' ইত্যাদি সুললিত গান শুনে তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন।[১৮]

পুরো গানটি হল—

"হের হর-মনমোহিনী
কে বলে রে কালো মেয়ে।
মোর মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোখ থাকে তো দেখ না চেয়ে
বিরল হাসি ক্ষরে শশী,
অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী:—
ভ্রমর ভ্রমে কমল ভ্রমে,

বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥"[১৯]

দশ। উদ্বোধন বাড়িতে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের বহু কাজ—মায়ের সেবা, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সম্পাদকীয় কর্তব্য, ঋণশোধ প্রভৃতির জন্য 'লীলাপ্রসঙ্গ'-প্রণয়ন, মায়ের দর্শনে আগত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদিগকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়ন ইত্যাদি। এরই মধ্যে তিনি আবার শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে সন্ধ্যার পরে ভজন-সংগীত শোনাতেন। সন্ধ্যারতির পর জপাদি সেরে শ্রীশ্রীমা ওপর থেকে কোনও কোনও দিন বলে পাঠাতেন, "শরৎকে বল দুটো গান করতে।" নিচে বৈঠকখানায় তানপুরা ও ডুগি তবলা থাকত; আদেশ পেলেই নিরলস সুকণ্ঠ গায়ক সারদানন্দ মহারাজ গান ধরতেন—

ক) এস মা এস মা ও হৃদয় রমা, পরাণ-পুতলী গো।
খ) শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দ-মগনা।
গ) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
ঘ) দনুজদলনী, নিজজন-প্রতিপালিনী শ্রীকালী।
ঙ) "নাচে বাহুতুলে, ভোলা ভাবে ভুলে, বববম্ বববম্ বাজে গালে
(কিবা) রজতভূধর নিন্দি কলেবর, শশাঙ্ক সুন্দর শোভে ভালে ॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল, ফণী ফন্ন জাহ্নবী কলকল
জটা জলদজাল মাঝে ॥"[২০]

এগারো। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রতিদিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে কাশীধামে 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ (এখানে শ্রীশ্রীমা সদলবলে ছিলেন ১৯১২ সালে নভেম্বরে) গিয়ে গোলাপ-মার কাছে শ্রীশ্রীমায়ের কুশলপ্রশ্নাদি করতেন ও পরে বালকের মতো রঙ্গ করতেন। এরকম একদিন নিচের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলে মাস্টার মহাশয় ঘর থেকে বাইরে এলেন, এবং ওপরের বারান্দা থেকে গোলাপ-মা বললেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞাসা করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।" এই বলে তিনি বাউলের সুরে গান ধরলেন—

"শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রওরে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে।
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে ॥
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে।
এ তো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে বাও রে ॥"

গীত গাইতে গাইতে তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন এবং তা শেষ হওয়ামাত্র 'হো, হো, হো' বলে সবেগে চলে গেলেন। এই অপূর্ব ভাব ও নৃত্য শ্রীশ্রীমা ওপর থেকে দেখে আনন্দ করছিলেন; আর নিচে দ্রষ্টা ছিলেন মাস্টার মহাশয় এবং অপর দু-একজন ভক্ত।[২১]

বারো। জয়রামবাটীতে একবার (১৩২২) সালে জগদ্ধাত্রী পূজার তৃতীয় দিনের রাত্রে সাধু-ব্রহ্মচারীরা দেবীর গান গাইতে লাগলেন—

"মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর।
সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবাকার ॥
মা যদি নিদয়া হত, তবে কি আর প্রসবিত,
পৃথিবী শুকায়ে যেত, অন্ন বিনা হাহাকার ॥
অস্পৃশ্য চণ্ডাল হতে ব্রাহ্মণাদি সকল জেতে,
মা বলে ডাকিলে কভু হয় না নিষ্ফল তার ॥
অঙ্গে দরদর ধারে, যবে স্বেদবিন্দু ঝরে।
বায়ুরূপে কে তোমারে বাতাস করে অনিবার ॥
ছেলের মুখে 'মা' 'মা' বাণী শুনবেন বলে ভবরানী,
আড়াল থেকে শুনেন পাছে দেখিলে না ডাকে আর ॥"[২২]

তেরো। উদ্বোধনে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার মহাশয়ের দীক্ষার পর তাঁর পত্নী দীক্ষা চাইলে শ্রীশ্রীমা দিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে বেলুড় মঠে কোনও সাধুর নিকট দীক্ষা নিতে বলেন। মহিলাটি খুব জেদ করতে থাকলে তিনি বিরক্তি সহকারে অস্বীকার করে পূজায় বসলেন। মহিলাটি তখন শোকে মুহ্যমান হয়ে তীরবিদ্ধা হরিণীর মতো মাটিতে পড়ে প্রাণের আবেগে গান ধরলেন :

"যে হয় পাষাণের মেয়ে, তাব হৃদে কি দয়া থাকে?
দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে?
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই মা তোমাতে
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা, মা বলে যত ডাক, শুনেও ত মা শুনে নাকো,
নবাই এন্নি লাথি খেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে ॥"

সুমিষ্ট গানে আকৃষ্টা শ্রীশ্রীমায়ের পূজা আরম্ভ হল না। তিনি তাঁর নিকট আরও কয়েকটি গান শুনে নিয়ে অবশেষে তাকে থামতে বললেন, কেননা তা নাহলে তাঁর পূজায় মন বসছে না। পূজার পরে মহিলাটি আবার দীক্ষার প্রার্থনা জানালে শ্রীশ্রীমা দীক্ষার দিন স্থির করে দিলেন এবং সাদরে তাঁব মুখে প্রসাদী পান গুঁজে দিলেন।[২৩]

চোদ্দো। আজ (১৩২১ কার্তিক) শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে (বাগবাজারে) কালীকীর্তন হবে। মঠের সন্ন্যাসী মহারাজেরাই কীর্তন করবেন। রাত প্রায় সাড়ে আটটায় কীর্তন আরম্ভ হল। মেয়েরা গান শোনার জন্য অনেকেই বারান্দায় গেলেন।... শ্রীশ্রীঠাকুর যেসব গান করতেন, মাঝে মাঝে যখন সেই গান দু-একটি হচ্ছে, শ্রীশ্রীমা সোৎসাহে বলতে লাগলেন, "এইগো, এইটি ঠাকুর গাইতেন।" তারপর যখন 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে'— গানটি আরম্ভ হল, তখন শ্রীশ্রীমা আর শয়ন করে থাকতে পারলেন না—চোখে দু-এক ফোঁটা অশ্রু, উঠে বসলেন, "চল, মা, বারান্দায় গিয়ে শুনি।"[২৪]

পনেরো। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যা গৌরী-মা ব্যারাকপুরে মেয়েদের শিক্ষার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৫ সালে। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহদৃষ্টি ছিল এই আশ্রমটির প্রতি। একদিন গৌরী-মার আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীমা এসেছিলেন ব্যারাকপুর আশ্রমে। সেদিন গৌরী-মা ভক্তিভরে মাতৃপূজা করার পর একটি স্বরচিত কীর্তন গেয়ে শ্রীশ্রীমাকে শুনিয়েছিলেন—

"জয় সারদা-বল্লভ দেহি পদ-পল্লব
দীনজন-বান্ধব, দীন জনে।
অশরণ-শরণ লক্ষ্যহীন-তারণ,
কে আছে ভুবনে তোমা বিনে॥
কিঙ্করী 'গৌরী' তনয়া তোমারি,
জানে জগজনে গাথা।
সে সব স্মরিয়ে বিদরয়ে হিয়ে,
পাই হে পরাণে ব্যথা॥"[২৫] ইত্যাদি

উদ্বোধনে দুর্গাপুরী তাঁদের আশ্রমের দুটি বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন (১৩২৫ সালের শ্রাবণ) শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। তাঁরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করে ছোটো মেয়েকে (বছর আট হবে) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি গান গাইতে জান?" মেয়েটি বলে, "জানি।"

শ্রীশ্রীমা—গাও তো, শুনি।

মেয়েটি গৌরী-মার রচিত ওই গান আবার গেয়েছিল—

"জয় সারদাবল্লভ, দেহি পদপল্লব দীন জনে।"

মেয়েটি গৌরী-মার শিক্ষিতা, অবিকল গৌরী-মার সুরে গাইল। শ্রীশ্রীমা বিস্মিতা হয়ে বললেন, "তাই তো, ঠিক যেন গৌরদাসী! সে বেঁচে আছে, তা নইলে বলতুম—তার প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে!" মেয়েটিকে আদর করে চুমো খেয়ে আর একদিন এসে গান শুনাতে বললেন।[২৬]

ষোলো। শ্রীশ্রীমা কাশীধামে 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ আছেন। সুধীরা দেবী কয়েকজনকে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসেছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সুধীরা দেবী চলে গেলেন। ওখানে আছেন সরলা দেবী। শ্রীশ্রীমা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বাড়ি প্রায় নিস্তব্ধ। সকলেই বিশ্রাম করছেন। এমন সময় বারান্দা হতে একটি গান শোনা গেল—

"আমার মা কোথায় গেলে?
অনেকদিন দেখি নাই, মা নে আমায় কোলে।
তুই গো কেমন জননী, সন্তানে হও এত পাষাণী
দেখা দে মা, আর কাঁদাস নে তনয়া বলে।"

গানটি এত মৃদুস্বরে শোনা যাচ্ছিল যে মনে হল যেন কেউ কাঁদছে। শ্রীশ্রীমা হঠাৎ উঠে বললেন, "কে গান গাচ্ছে, চল তো মা। বারান্দায় গিয়ে দেখি।"

এক ভিখারিনী মেয়ে গাইছে ও চক্ষুর জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীমা বসলেন। মেয়েটিও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বলল যে তার অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হয়েছে। দুজনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। শ্রীশ্রীমা তাকে আর একটি গান গাইতে বলায় সে গাইল :

"মা, আমারে দয়া করে
শিশুর মতো করে রাখ,
শৈশবের সৌন্দর্য ছেড়ে
বড় হতে দিও নাক।

সুন্দর সরল প্রাণ,
মান অপমান নাহি জ্ঞান,
হিংসা নিন্দা লজ্জা ঘৃণা,
কিছুই সে জানে নাক।"

শ্রীশ্রীমা শুনে বললেন—"আহা, কি চমৎকার গানটি!"[২৭]

সতেরো। কাশীধামের লক্ষ্মীনিবাস। একদিন বিকালে শ্রীশ্রীমা কয়েকজন বিধবার সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গেরুয়া পরা। তিনি শ্রীশ্রীমাকে একটি গান শোনালেন :

"থাকরে জবা, বনের শোভা,
বনের ফুল তুই বনে ফুটি,
তোরে হেরলে শিবের বক্ষে
মনে হয় মার চরণ দুটি।"

গোলাপ-মা—আহা, কি চমৎকার গানটি! আর একটি গাও।

মেয়েটি আর একটি গাইলেন।[২৮]

আঠারো। শ্যামপুকুরে আনন্দোৎসব। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য কালীপদ ঘোষের বাড়ির লোকেরা শ্রীশ্রীমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করলেন। তদনুযায়ী শ্রীশ্রীমা, সারদানন্দ মহারাজ এবং আরও কয়েকজন সাধু তাঁদের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হয়। বাড়ির কেউ কেউ গীতার অংশবিশেষ ও মোহমুদ্গর আবৃত্তি করেন। লক্ষ্মীদিদি পালাকীর্তন গেয়েছিলেন। ওই দিন তিনি বৃন্দারানীর অভিনয় করেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরা থেকে ফিরে আনতে যাবেন, বৃন্দারানী শ্রীরাধার উদ্দেশ্যে হাত দুলিয়ে বলছেন, 'আমি প্রভুকে আনতে যাই।' আবার শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে হাত দোলাতে দোলাতে বলছেন, 'আমি রামকৃষ্ণকে আনতে যাই।'

তারপর মথুরায় গিয়ে বিরহবিধুরা ব্রজমায়ীদিগের মর্মবেদনার বর্ণনা করে কৃষ্ণচন্দ্রকে কাতর মিনতি জানালেন—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর, দিনেক দুয়ের মত,
তোমার মা যশোদা পিতা নন্দ কেঁদে হল গত।"

লক্ষ্মীদিদির কীর্তন-শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে লক্ষ্মীদিদি যখন যেখানে যেতেন, এভাবে সকলকে আনন্দ দিতেন। কোনও কোনও দিন অলংকার ও বেশভূষায় সজ্জিত হয়েও কীর্তনাদি করতেন। অধিকন্তু, তিনি একাই বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকায় বিভিন্ন স্বরে অভিনয় করতে পারতেন।[২৯]

উনিশ। শ্রীশ্রীমায়ের সংগীতপ্রীতি ছিল বলে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ প্রায়ই উদ্বোধনের একতলায় সংগীতের অনুষ্ঠান করতেন। সারদানন্দ মহারাজ, পুলিন চন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং আরও অনেকে এতে যোগ দিতেন। কোনও কোনও দিন সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীশ্রীমা উপরের বারান্দায় এসে নিবিষ্ট-মনে গান শুনতেন। আবার কখনও কখনও উপরে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে মহিলাদেরও সংগীতানুষ্ঠান হত। তাঁদের মধ্যে লক্ষ্মীদিদি, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, নর্মদাদেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যে-সকল সংগীত শ্রীশ্রীমায়ের প্রিয় ছিল, তার কয়েকটি এখানে দেওয়া হল—

ক) গিরি গণেশ আমার শুভকারী

খ) বিপদবারণ তুমি নারায়ণ,

লোকে বলে তোমায় করুণানিধান।

গ) বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ, দিতেছ তারা।

সে কেবল দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা ॥[৩০]

কুড়ি। শ্রীশ্রীমা আসছেন বলরাম মন্দিরে। স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ (লাটু মহারাজ) ওই বাড়ির একতলায় বাস করতেন। প্রবেশদ্বারে শ্রীশ্রীমাকে দেখে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলতে লাগলেন, "মা ঠাকরুণ, বরমময়ী, এথিকে, এথিকে।" অবগুণ্ঠিতা শ্রীশ্রীমা গোলাপ-মাকে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলাপ, লাটু বলে কি?" ততক্ষণে লাটু মহারাজ নিকটে এসে শ্রীশ্রীমায়ের চরণযুগল জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ভাবে বিভোর হয়ে গুনগুন স্বরে গাইতে লাগলেন—

"তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি সে পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ॥
দশ মহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।
এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার ॥"

গাইতে গাইতে লাটু মহারাজ নির্বাক ও ভাবস্থ হলেন। শ্রীশ্রীমাও ভাবস্থা। ভক্তেরা কেউ রাস্তায়, কেউ বাড়ির ভিতর দণ্ডায়মান। তাঁদের ভাবাবস্থা দর্শনে সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে নারীভক্তগণ শ্রীশ্রীমাকে ধরে দোতলায় নিয়ে গেলেন। লাটু মহারাজও 'বরমময়ী, বরমময়ী' বলতে বলতে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, "বরমময়ী মাথাটা গরম করে দিলে।"[৩১]

একুশ। গিরিশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' শ্রীশ্রীমা দেখেছিলেন। সেখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গ উঠল। 'জগাই'-এর অভিনয় করেছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর, আর 'মাধাই'-এর গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। শ্রীশ্রীমা বলছেন : "ওদের মতো ভক্ত কে? রাবণের মতো ভক্ত কে? এই যে গিরিশবাবু ঠাকুরকে কত গালি দিতেন; তা ওঁর মতো ভক্ত কে? এঁরা সব ঐ ভাবে এসেছেন। ভক্ত হওয়া কি কম কথা? ভক্তি কি এমনিই হয়?" আবার লক্ষ্মীদির দিকে ফিরে বলছেন : "হ্যাঁ লক্ষ্মী, সেটা কি? মুক্তি দিতে কাতর নই?" লক্ষ্মীদিদি সুর করে বললেন—

"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই গো,
(শুদ্ধা) ভক্তি দিতে কাতর হই।"[৩২]

কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিচারণে। প্রত্যক্ষত কোনও বিশেষ গানের উল্লেখ সেখানে না থাকলেও যে পরিবেশ ও সংসর্গের কথা আমরা ওই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জানতে পারি, সেটাও ভক্তমানসে এক বিরাট প্রাপ্তি। দক্ষিণেশ্বরের কঠিনতম দিনগুলি শ্রীশ্রীমা হাসিমুখে অতিবাহিত করেছেন। মধ্যরাত্রে নহবতের বারান্দায় বসে একাকিনী সারদার গভীর সমাধিমগ্নতা যেমন তাঁকে সকল কষ্ট-বেদনার উর্ধ্বে নিয়ে যেত, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের উদ্দাম সঙ্গীত-নৃত্যাদিও তাঁর জীবনকে ভাবময় করে তুলত।

অন্য একটি অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ তাঁর 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে। ঘটনাটি বাগবাজারের ১ নং লক্ষ্মীদত্ত লেনের দত্তগৃহে সংঘটিত।

শ্রীমায়ের 'উদ্বোধন'-এর নবনির্মিত গৃহে শুভপদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত একটি কীর্তনানুষ্ঠানে শ্রীযতীন মিত্র মহাশয় কীর্তন পরিবেশন করেন। সেদিন মাথুরের বিরহ-সম্পৃক্ত কীর্তন পরিবেশনের শেষে তিনি 'বিরহে'ই অনুষ্ঠান শেষ করে চলে যাবেন, এমন

সময়ে মা বলে পাঠালেন, মিলনে কীর্তন শেষ করতে হয়। যতীনবাবু তাঁর অপূর্ব সুমিষ্ট-কণ্ঠে মিলনের গান গেয়ে পালা শেষ করলেন। তখন মা সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। গোলাপ-মা এমন অবস্থার সঙ্গে সুপরিচিতা ছিলেন। তিনি হাত ধরে মাকে উঠিয়ে নামমাত্র জলযোগ করিয়ে গাড়িতে উঠালেন। গোলাপ-মা লক্ষ্য করলেন, গাড়িতে ওঠার সময় মায়ের বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই। উদ্বোধনবাড়িতে পৌঁছে মাকে ঠাকুরঘরে আনা হল। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। মায়ের... চক্ষের পলকও পড়ে না। গোলাপ-মা বলে উঠলেন, "সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলুম, আর আজ এই দেখলুম।" সেরাত্রে কোনওক্রমেই মায়ের ভাব সংবরণ হচ্ছে না দেখে ভক্তগণ পরামর্শ করে ঠিক করলেন, 'মা' বলে আহ্বান করাই কর্তব্য। সন্তানের কল্যাণার্থে অবতীর্ণ জননী ছেলেমেয়ের ডাক অবশ্যই শুনবেন। কানের কাছে বারবার 'মা', 'মা' বলে ডাক শুনতে শুনতে ক্রমে মায়ের হুঁশ হল। মা বলে উঠলেন, 'কেন বাবা!' ভক্তগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।[৩৩]

যার গান ত্রিভুবনে কেউ শুনতে চায় না, মা তার গান ধৈর্য ধরে শুনতেন। সন্তান কিনা! ১৩২৪ বঙ্গাব্দে জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজায় মা উপস্থিত আছেন। সাতবেড়ের লালু জেলে এসে ধরেছে—"পিসিমা, আমি বাউল-গান কবব।" সে জানিয়ে দিল, নিজেই সামিয়ানা লণ্ঠন ইত্যাদি জোগাড় করবে, গান গাইবে। মায়ের সম্মতি নেই। মা বললেন, "কেন লোক হাসাবি লালু? তার চেয়ে অমনি বসে দু-একখানি গান জগদ্ধাত্রীকে শুনিয়ে পরে প্রসাদ পেয়ে যাস।" মায়ের উপদেশ লালুর মোটেই পছন্দ হল না। সে নিজেই সামিয়ানা টাঙিয়ে লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে সন্ধ্যার পরে আলখাল্লা চাপিয়ে ঢোলক-কাঁধে আসরে নামল। তারপর দু-চারটি হাস্যরসের গান গেযে সকলকে হাসিয়ে বিদায় নিল।[৩৪]

শ্রীশ্রীমায়ের সংগীতপ্রীতি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠনের আড়ালে অবস্থিত মানুষটির সঙ্গে সুর-জগতের কতটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল তা সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে বোঝা অসম্ভব। বাউলাঙ্গের গান মা বেশি শুনেছিলেন বলেই মনে হয়। কিন্তু অন্যান্য ভারি তালের রাগাশ্রয়ী গানও মা প্রচুর শুনেছেন। 'মাকে দেখব বলে ভাবনা...' ইত্যাদি ভীমপলশ্রী রাগের গান মায়ের খুব প্রিয় ছিল। দেখা যায় অনেক সাধকেরই প্রিয় রাগ ভীমপলশ্রী। আবার টপ্পা অঙ্গে যৎ-তালাশ্রয়ী 'বারে বারে যত দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা' গানটি মাযের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। মায়ের শোনা স্বামী তপানন্দ-রচিত গানগুলির প্রায সবকটি গানই রাগাশ্রয়ী। সুতরাং বাউলাঙ্গ বা কীর্তনাঙ্গ গানই মা বেশি পছন্দ করতেন একথা জোর করে বলা যাবে না। সারদারূপিণী সরস্বতীর অন্তর থেকেই তো সুর-প্রবাহের উদ্গম। সুতরাং গন্ধর্ব-বিদ্যার চরমসিদ্ধি মায়েব পদনখকণায় বিদ্যমান থাকলেও তিনি তাঁর অবগুণ্ঠনের বাইরে কখনও আসবেন না—এ তাঁর সিদ্ধান্ত। এই অঘটনঘটনপটীয়সী অনির্বচনীয়া মহাশক্তির অণুমাত্রও কি মানুষের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব? কখনওই নয়। তাই সন্তানের পক্ষে একটিমাত্র কর্তব্য হল মায়ের শ্রীচরণে নিঃশর্ত শরণাগতি।

পতিতোদ্ধারিণী

কৃষ্ণা সেন

পবিত্রতাস্বরূপিণী, পতিতোদ্ধারিণী নামে যে ছবিটি মনের ক্যানভাসে প্রথমেই ফুটে ওঠে, তা হল দেবী গঙ্গার। আচার্য শংকর তাঁর স্তবে মা গঙ্গাকে নির্দেশ করেছেন 'পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে' রূপে। দেবী গঙ্গার সেই মহিমা আমাদের হৃদিমানসে আজও সমভাবে উজ্জ্বল। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসী মায়ের বুকে ঝাঁপ দেয় অগাধ বিশ্বাসে—পতিতোদ্ধারিণী তাঁর অগাধ শক্তিতে সর্বপাপবিনাশিনী, সর্বতাপহারিণী! হে মা গঙ্গে, তোমার দ্রবীভূত করুণাধারায় অবগাহন করে আমরা যেন কুমতিকলাপমুক্ত হই, পুনর্বার জঠরযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই। হে ভাগীরথী, তুমি যেমন ভগীরথের প্রার্থনায় শ্রীহরির চরণ ত্যাগ করে তোমার মন্দাকিনী ধারাকে প্রবাহিত করেছিল মর্তে, ভূলোকবাসী তথা সগরবংশীয়দের উদ্ধারকল্পে, আমাদের প্রতিও যেন তোমার তেমনই দয়ার্দ্র দৃষ্টি থাকে।

মা গঙ্গার এই পতিতোদ্ধারিণী রূপটি আমরা কল্পনা করে নিই, সত্যাসত্যের বিচারের ভার আমাদের নয়, অগণিত ধর্মপিপাসু জনমনের। কিন্তু মাত্র দেড়শো বছর আগে, এই পৃথিবীর মাটিতে জয়রামবাটীর ছোট্টো গ্রামে যে চিন্ময়ী মাতৃমূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি এক অপার অহেতুকী করুণায় আদ্বিজচণ্ডালে প্লাবিত করেছেন। পারমার্থিক কৃপাকণায় চোখ খুলে দিয়েছেন কত সন্তানের। আবার কাছে এগিয়ে আসা শতেক সন্তানকে কোলে টেনে নিয়েছেন আপন করে। মা বলেই তো তিনি বলতে পারতেন : "ভয় কি?... তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। ...কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"[১] পতিতজনকে শোধন করে উদ্ধার করেছেন তিনি। ইহকাল পরকালে তার ভার নিয়ে মুক্ত করেছেন সন্তানকে—এ তাঁর সর্বব্যাপী মাতৃত্বের মহিমা।

শ্রীমা সারদা সত্যিকারের মা। পাতানো মা নন—একথা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করেছেন। ভক্তদের মনে হয়েছে গর্ভধারিণী মায়ের থেকেও তিনি বেশি আপন। দুঃখী, পতিত, পীড়িত, নির্যাতিত—সংসারতাপে ক্লিষ্ট মানুষের ব্যথা শ্রীমা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। যে অদৃশ্য নিয়ন্তা বাজীকরের মতো আমাদের জীবন পরিচালনা করে চলেছেন, তিনি পতিতোদ্ধারের জন্য, আর্তপরিত্রাণকল্পে বারবার সশক্তিক নেমে আসেন আমাদের এই মাটির বুকে। সেই অধরাকে কেউ বা ধরতে পারে, কেউ বা পারে না। সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মধ্যে আসন পাততে তাঁর বড়ো আনন্দ। জন্মাদিশূন্য হলেও বারে বারে আসা—এর শেষ নেই! শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে :

> "এবং ভগবতী দেবী নিত্যাপি সা পুনঃ পুনঃ।
> সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥"[২]

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনবীণায় যে সুরটি নিত্যকালের তা হল : "কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারবো না।" এখানেই মায়ের স্বাতন্ত্র্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেউ এলে ঠাকুর যাচাই করে নিতেন তাদের মন-মুখ এক কিনা, ভাবের ঘরে চুরি আছে কিনা। মায়ের কাছে মা বলে এসে দাঁড়ালেই হল—যে জন চায় সে তোমারে পায়/ যে জন না চায়, সেও তোমা পায়। এত স্নেহশীলা এত ক্ষমাশীলা মা যে, তাঁর কাছে সকলেই নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে আশ্রয় পায়। শ্রীমায়ের কাছে নহবতে একটি বুড়ি আসত। পূর্বজীবনে সে পতিতা ছিল এবং মায়ের কাছে তার আসা ঠাকুরের পছন্দ ছিল না—"ছি ছি! বেশ্যা! ওর সঙ্গে কি কথা? শত হোক রাম রাম!" ঠাকুরের একথা বলার পরেও প্রায় নিত্যই সে বুড়ি এসে 'মা' বলে দাঁড়াত। মায়ের পতিতোদ্ধারিণী ভাবটি জানা ছিল বলেই ঠাকুর আর মাকে বাধা দেননি।

আর একটি অতি পরিচিত ঘটনা কিন্তু প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ্য; রাতের আহার নিয়ে মা আসছেন ঠাকুরের ঘরে। সিঁড়িতে এক মহিলা মায়ের হাত থেকে থালা নিয়ে বললেন, "দিন মা আমায় দিন"—মা অম্লানবদনে নির্দ্বিধায় তার হাতে ভাতের থালা তুলে দিলেন। ঠাকুর মাকে বললেন, "তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? ওকে কি জান না?" মা মিনতি করে বললেন, "আজ খাও।" মায়ের বারবার মিনতির উত্তরে ঠাকুর বললেন, "আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল?" মা বললেন, "তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না।"[৪]

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ভক্তের কোনও জাত ছিল না; তারা সব একই শ্রেণীর। শ্রীমা সারদার কাছেও তাঁর ছেলেমেয়েরা কোনও পৃথক জাতিভুক্ত ছিল না। তারা ভক্ত বা অভক্ত যাই হোক না কেন, মা ছিলেন সতেরও মা, অসতেরও মা; সতীরও মা, অসতীরও মা।

পতিতোদ্ধারিণীর পতিত-উদ্ধারেব প্রাথমিক সূচনা সেই তেলোভেলোর অন্ধকার মাঠে, বাগদি ডাকাত বাবা-মাকে অকুতোভয়ে আপন করে নেওয়া। শ্রীমায়ের মধ্যে কালীরূপ প্রত্যক্ষ করেছিল ডাকাত বাবা-মা। শ্রীমায়ের স্নেহস্পর্শে, শিরোমণিপুরের তুঁতে চাষী মুসলমানেরা যারা পেটের দায়ে ডাকাত হয়েছিল, তারা হয়ে গেল অন্য মানুষ। তাদের নিরীহ ব্যবহারে গ্রামবাসীরাও অবাক হয়ে বলেছিল, "মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল রে!"[৫]—

"কত তপস্যা করেছিল তারা জনম জনম ধরি,
তাই পেয়ে গেল এ জন্মেতেই ভবার্ণবের তরী।
সরল মনের মানুষের কাছে তিনি যে প্রকট হন
কূটবুদ্ধির কাছ হতে তিনি চিরকাল দূরে রন।"

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসত মধুর ভাবের সাধিকা এক পাগলি। তার ভাবদর্শনে সর্বদা মাতৃভাবাচ্ছন্ন ঠাকুরের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অকথ্য তিরস্কারে পাগলি তখন কী করবে ভেবে পায় না, শ্রীমা গোলাপ-মাকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন পাগলিকে—"দেখ দেখি, সে যদি অবিবেচনার কথা বলেই থাকে তো আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। এভাবে গালাগালি করা কেন?"[৬] তিরস্কৃতা পাগলিকে মা স্নেহভরে কাছে টেনে নিলেন—"বাছা, উনি তোমায় দেখে যখন বিরক্ত হন, তখন নাই বা গেলে সেখানে, আমার কাছে এলেই তো পার।"[৭] মা কাউকে ফেলে দেন না কোল থেকে। সদাই সকলের জন্য

মার আশ্রয়ের অঙ্গীকার।

রাধুকে নিয়ে শ্রীমা আছেন কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে। রাতের বেলায় বর্ষার দিনে হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত শ্রীমায়ের অনুগত শিহড়ের এক ভক্ত প্াগল। পাগল বয়ে এনেছে এক বোঝা সজনে শাক। সকলে ভয়ে অস্থির। মা এই অবোধ ছেলেকে ফিরে যেতে বললেন, কিন্তু সে এসেছে বর্ষার ভরা নদী সাঁতরে মাতৃদর্শনে, ফিরবে কেন সে? মা অতি মিষ্টি কথায় তাকে বোঝালেন, "লক্ষ্মীটি, গোল করিস নে।" মায়ের কথায় শান্ত হয়ে পাগল বিদায় নিল। আমাদের কাছে যে অতি অবহেলার মানুষ, মা সারদার কাছে সেও আপন সন্তান।

ধূলা কাদা অঙ্গে ম্লানমুখে এসে দাঁড়িয়েছে তাপিত পতিত সন্তানের দল, ভিখারির মতো, অনুতপ্ত, শূন্য হৃদয়—চাই কৃপাকরুণাধারার অমৃতসিঞ্চন। এসেছে পরম আশ্বাসবাণী— "আমার ছেলেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও কিছু করতে পারবে না।" পতিতা মেয়েকে বক্ষোলগ্না করে বলেছেন, "এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেব—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি?" শুদ্ধসত্ত্বাভিমানী ভক্তেরা অভিযোগ করেছেন, "মায়ের কাছে অশুদ্ধ সন্তান যদি আশ্রয় পায়, তবে শুদ্ধাত্মাদের দূরে থাকাই ভালো।" পতিতপাবনী সারদা মা উত্তরে বলেছেন, "আমার কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছে, তারা আসবে। একজন এলে আর একজন যদি না আসে, আমি তার কী করব?" গ্রামের এক বালবিধবা। ক্ষণিক ভুলে তার জীবনে নেমে আসে কলঙ্কের ছায়া। গ্রামের সকলে যখন সমালোচনায় মুখর, মা তখন হতভাগিনীর জন্য প্রার্থনা করেছেন নীরবে। মায়ের কৃপাধন্য এক জমিদার ঘটনাটি মিটিয়ে দিলে মা তাকে প্রাণভরা আশীর্বাদদানে ধন্য করে বলেছিলেন, "বাবা দুঃখিনীকে বাঁচিয়ে দিয়েছ, রক্ষা করেছ, শুনে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়েছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদেশানন্দ বলেছেন, "যাহাদের আমরা অতি অধম বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদেরও ভালোবাসিয়া তাহাদের বিপদের সময় এই সমবেদনা, এই অপার স্নেহ জগজ্জননী ছাড়া, আর কে দেখাইতে পারে!" পাপীকে বুকে তুলে শ্রীমা তাকে পবিত্র পথের সন্ধান দিতেন।

করুণাপাথার জননী এবারে এসেছেন করুণাবারি সিঞ্চন করতে। ঘাটাল থেকে কয়েকটি সন্তান এসেছে কলকাতায় মাতৃদর্শনে। দীনহীন বেশ, অমার্জিত রুক্ষ কেশ। কিন্তু এসে দেখে দ্বার রুদ্ধ। মা কী প্রয়োজনে দোতলার বারান্দায় এসে দেখেন সামনের মাঠে বেশ কয়েকটি লোক তাঁর দোতলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। মাকে দেখে তারা বলে উঠল, "আজ্ঞে মা, আমরা বহুদূরদেশ থেকে এসেছি, জগজ্জননীর দর্শন কি মিলবে?" শ্রীশ্রীমা একটি সেবককে ওদের ভিতরে আনার নির্দেশ দিলেন। সঙ্কুচিত সেবক বলেন, "মা ওরা যে এক পঙ্গপাল, আর ভারি নোংরা!" ব্যথিতা মা বললেন, "পৃথিবীর সবাইকে আমি দেখা দিচ্ছি, আর কত কষ্ট করে ওরা এসেছে, ওদের দেখা দেবো না! নিয়ে এসো ওদের। বাইরে নোংরা হলে কি হবে বাবা, ওদের ভিতরটা পরিষ্কার।" মায়ের কাছে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে সেই পল্লীবাসীদের আনন্দ আর ধরে না। রামকৃষ্ণ বসুর মা সেদিন ঠাকুরের জন্য পানতুয়া আর শিঙাড়া পাঠিয়েছিলেন। মা ঠাকুরকে নিবেদন করে সব বিলিয়ে দিলেন এই পল্লীবাসীদের মধ্যে। তীর্থযাত্রার ফল তারা হাতে হাতেই পেল।

আর একটি ছবি। দীনভক্ত দূর থেকে জানাচ্ছে অনুতপ্ত হৃদয়ের কুণ্ঠিত প্রণাম।

বিষয়বিষে জর্জরিত হৃদয়ের প্রণাম মায়ের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না তো! কিন্তু মা সকলকলুষ-তামসহরা শরণাগত-দীনার্তের পরিত্রাণপরায়ণী—এগিয়ে এসে মা ছেলের মাথায় রাখেন আশীর্বাদের অভয়। মায়ের চোখে জল, সন্তানের চোখেও। অথচ শত শত মনের ভিন্ন ভিন্ন বাসনা কামনার ছোঁয়া দেবদেহে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে—"দয়ায় মন্ত্র দিই, ছাড়ে না কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কী লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক। ...এমন সব লোক আসে যারা না করেছে এমন কাজটি নাই। আমাকে এসে 'মা' বলে ডাকে, আমি ভুলে যাই—যে যার যোগ্য নয়, তার চেয়ে বেশি এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে যেন বোলতা কামড়ায়।" সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো মায়ের মনে পড়ে দ্বারে অতন্দ্র প্রহরারত স্বামী সারদানন্দের কথা। তাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, "তা হোক, তোমরা শরৎকে একথা বোল না, শরৎকে একথা বোল না।" শরৎ মহারাজ ঢুকতে না দিলে পাপী-তাপী ছেলেদের উদ্ধারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে যে!

সন ১৯১৯। বিশিষ্ট মাদ্রাজি ভক্ত শ্রীযুক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার মাকে দর্শন করতে এসেছেন কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমে। মাকে প্রণাম করতে গিয়ে তিনি বললেন, "আমরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে যদি ওঁদের ওইরূপ কষ্ট পেতে হয়, তবে তা নাই করলাম।" তাঁর কথা শুনে মা বলেছিলেন, "না বাবা, আমরা তো ওই জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপ-তাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপী তাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে? যারা ভালো ছেলে তারা পা ছুঁলে কিছু হয় না। এক একজন আছে, তারা ছুঁলে যেন পা একেবারে জ্বলে যায়। তোমরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে বই কি বাবা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ সারদানন্দ মহারাজ মায়ের যতটা স্নেহভাজন ঠিক ততটাই স্নেহপাত্র ডাকাত আমজাদ। চুরির অপরাধে আমজাদের জেল হত প্রায়ই। জেল থেকে বেরিয়েই আমজাদ আসত মায়ের কাছে। মায়ে-ছেলেয় সুখ-দুঃখের গল্প হত। মাতৃগৃহে আমজাদের অবাধ গতি। সারাদিন মাতৃসান্নিধ্যে কাটিয়ে একেবারে অন্য চেহারা নিয়ে আমজাদ বাড়ি ফিরত। স্নান করে খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বাড়ি যেত আমজাদ, মনে অশেষ তৃপ্তি নিয়ে—ভাল ঘুম হয় না বলে মা তাকে দিয়েছেন এক শিশি কবিরাজি তেল। একবার গরু চুরির দায়ে জেলখাটার ব্যাপারটাও বাদ গেল না; বললেন, "তাই তো ভাবছিলুম আমজাদ আসে না কেন?" প্রাণের টান যে সবচেয়ে বড়ো টান।

অশরণের শরণ মা সারদা—দীনের তরে সতত উন্মুক্ত মায়ের করুণার দেউল। চিরদিন নিত্য আকুল জাগ্রত দুটি চোখ, দিশাহারা পথহারা সন্তানের মঙ্গলচিন্তায়। কেন? কেন মায়ের এই কষ্টসাধন? মায়ের সন্তান যদি ধুলোকাদা মেখে আসে, মাকেই তো হবে সন্তানের ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতে। "ভালো ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে বাবা, মন্দটিকে কে নেয়? ...আমরা পাপ, তাপ না নিলে, আর নেবে কে? আমরাই পাপ তাপ হজম করতে পারি, আমরা ত সেইজন্যেই এসেছি বাবা।"

স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন, "যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, সব মার কাছে চালান করে দিচ্ছি। মা সকলকেই কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা। সর্ব আর্তি হরণের জন্যেই পতিতোদ্ধারিণী আকাশগঙ্গার মর্তে অবতরণ।

সমাজ যাদের পতিত ভেবে সমাজচ্যুত করে, অনুতপ্ত মন নিয়ে মায়ের কাছে এলে, মা

তাদের স্নেহে ও ভালোবাসায় কাছে টেনে নিতেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও মা তাই সারদা। গিরিশের আমন্ত্রণে শ্রীমা গিয়েছিলেন মিনার্ভা থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' ও 'পাণ্ডব গৌরব' অভিনয় দর্শনে। গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী শ্রীমায়ের পবিত্র চরণাম্বুজে অঞ্জলি দিয়ে জীবন সার্থক করেছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে 'রামানুজ' অভিনয় দেখে মা ডেকে পাঠিয়েছেন নীরজাসুন্দরীকে। অভিভূতা বিস্মিতা নীরজাকে মা সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। অভিনেতা অমৃতলাল মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "শক্তির সম্প্রচার করি, অলক্ষ্যে লেখনী ধরি/ শেখালে লীলার গীতি কত ভক্তজনে।" অভিনেত্রী তারাসুন্দরী এসেছিলেন উদ্বোধনে মায়ের কাছে। শ্রীমায়ের আদেশে তাঁকে শুনিয়ে গেছেন 'জনা' নাটকের সংলাপ। বিল্বমঙ্গলের পাগলিনী নটী তিনকড়িও আসতেন মাতৃগৃহে। মাকে শুনিয়ে গেছেন পাগলিনীর গান : "আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে/ যেখানে যাই, সে যায় পাছে, আমায় বলতে হয় না জোর করে।" গান শুনে মা আনন্দে বলেছিলেন, "আজ কি গানই শোনালি মা!" আর এক অভিনেত্রী মায়ের বাড়ি এসে সিঁড়ির রেলিংয়ে মাথা রেখে কাঁদছেন, ওপরে ওঠার সাহস নেই। ঠাকুরঘরে ভক্তসঙ্গে বসেছিলেন শ্রীমা। হঠাৎ বলে উঠলেন, "তোমরা একটু বোস, আমি এখুনি আসছি।" এসে মা প্রথমে হাত দিলেন তাঁর মাথায়, পরে ধীরে ধীরে তাঁকে টেনে নিলেন বুকে; স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "ঠাকুরের কাছে যখন এসেই পড়েছ, তখন আর কান্না কেন?" আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন মা—"যাও ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁকে হাসিমুখে প্রণাম কর।" অভিনেতা অপরেশচন্দ্র লিখেছেন, "মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই নিজে দেখিয়াছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী মা আমার এই দেশের রঙ্গালয়ের কোনও পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন, ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না, সে দয়ার পাত্র-পাত্রী নাই, সে দয়া বিচার করে না, ব্যবহারিক জগতের কোনও বিধিনিষেধ মানে না, সে কেবল জাতিনির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।"

একটি দীক্ষিত নিচু জাতের ভক্তকে তাঁর সমস্ত সঙ্কোচ দূর করে শ্রীমা ঘরের ছেলে করে নিয়েছেন, "তুমি যে ঠাকুরের গণ।" মহাষ্টমীর দিনে তাজপুরের এক বাগদি ভক্ত অপলকে তাকিয়ে আছে মায়ের চরণকমলের দিকে। সকলের মতো তারও মনে ইচ্ছা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার। শ্রীমায়ের নজর এড়াতে পারল না তার দ্বিধা; তাকে ডেকে বললেন, পায়ে ফুল দিতে। ভক্তের মুখে হাসি ফুটল। কামারপুকুরে শ্রীমায়ের কাজ করে দিত সাগরের মা। সে কাজে এলেই শ্রীমা বলতেন, "আগে মুখে কিছু দিয়ে একটু জল খেয়ে পরে কাজে লেগো।" এক ডোমের মেয়েকে তার উপপতি ত্যাগ করেছে। দিশেহারা সেই মেয়ে মায়ের কাছে বলল তার দুঃখের কাহিনি। শ্রীমা সেই লোকটিকে ডাকিয়ে এনে বললেন, "ও তোমার জন্যে সব ফেলে এসেছে; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান পাবে না।" মার এই কোমল-কঠোর কথায় সেই ডোমের চৈতন্য হল। মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে গেল সে। স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেন : "মায়ের বাড়িতে কুলি-মজুর, গাড়িওয়ালা, পালকি-বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনী-জেলে যেই আসুক, সকলেই মায়ের ছেলেমেয়ে। সকলেই ভক্তের মতো স্নেহ-আদর পায়। সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি ইহ-পরকালে

কেউই ভুলতে পারবে না। যদি বা কোনও সময় বিস্মরণ হয়, দুঃখকষ্টে পড়লেই মনে ভেসে উঠবে সেই স্নেহকোমল কৃপাদৃষ্টি।"

ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা মা—কত দহন সহ্য করেছেন নীরবে। মা যে, তাই দহন তো নিতে হবেই, একদিকে সেবককে বলছেন, "জ্বলে যাচ্ছে, হাওয়া দাও, জল দাও, গঙ্গাজল দাও", আবার অন্যদিকে অভয়া বরদা ক্ষমাস্বরূপিণী। মঠের একটি উড়িয়া চাকর মাঝে মাঝে চুরি করত। স্বামীজী তাকে তাড়িয়ে দেওয়ায় সে সোজা চলে গেল মায়ের বাড়িতে। তার দৈন্যের কথা শুনে মা করুণাময়ী তাকে তেল দিয়েছেন, নাইতে দিয়েছেন, ভালো কাপড় পবিয়ে পেটভরে খাইয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা স্বামী প্রেমানন্দ যাচ্ছেন মঠে, মা বলছেন, "দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলে! সংসারের বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বোঝ না! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" বাবুরামের সঙ্গে উড়িয়াটিকে ফিরতে দেখে স্বামীজী বললেন, "বাবুরামেব কাণ্ড দেখ—ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে!"

প্রেমানন্দ বললেন, "আমি না। মা পাঠিয়েছেন।" নীরবে স্বামীজী মায়ের আদেশ মাথা পেতে নিলেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে আবর্জনা পরিষ্কার করত যে রসিক, সে পেয়েছিল ঠাকুবের অসীম কৃপা। কিন্তু এই কৃপাপ্রাপ্তির মাধ্যম ছিলেন মাতাঠাকুরানী।

একদিন মা দেখেন কালীবাড়ির ঝাড়ুদাব একদৃষ্টে নহবতের দিকে তাকিয়ে আছে। মা বাইরে আসতেই রসিক দণ্ডবৎ হয়ে কুণ্ঠিত স্বরে নিবেদন করে, "আজ্ঞে মা ঠাকরুন, সারা মুল্লুকের লোক বাবার কাছে আসে, বাবার দয়া হলে নাকি ঈশ্বর দর্শন হয়। অধমের উপর যদি একটুখানি দয়া হয মা।" কাঙাল-সন্তানের কাতরতা দয়াময়ীব হৃদয় স্পর্শ করল। সুযোগ বুঝে মা রসিকের প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেছিলেন এবং ঠাকুরও যে রসিকের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত।

বাগবাজারে থাকতেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 'বাল্যবন্ধু' পদ্মবিনোদ। পদ্মবিনোদ সুরাপানে মত্ত অবস্থায মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে মায়ের বাড়ির সকলের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন। মা তখন ২/১ নং বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে। রাত প্রায় তৃতীয় প্রহরে পদ্মবিনোদ রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্রীমাকে ডাকতে থাকেন—"মা ছেলে এসেছে তোমার; ওঠ মা।" আব সঙ্গে সঙ্গেই সুকণ্ঠের গান .

"ওঠ গো, করুণাময়ী খোল গো কুটীর দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার ॥

গানের প্রথম কলির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমায়ের ঘরের খড়খড়ি যায় খুলে, আর চতুর্থ কলির সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ জানলা। সেই শব্দে পদ্মবিনোদ—"উঠেছ মা? সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো পেন্নাম নাও"—বলে রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে সেই ধুলো মাথায় ধারণ করে চলে গেলেন আবার গান গাইতে গাইতে—"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে/ (মন) তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে/ আমি দেখি,—দোস্ত না দেখে।" এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সুরাপায়ী জেনেও মা বলেছেন, "তা হোক গে বাবা। ওর ডাকে যে থাকতে পারি না তাই দেখা দিই।"

জগজ্জননীর অপার করুণা ও অনন্ত মহিমা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রতিই

প্রবাহিত। সে সাপুড়েই হোক, বা ডাকাতই হোক বা জীবজন্তু পশুপাখিই হোক। সাপের খেলা দেখে সাপুড়েদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন। কেউ প্রতিবাদ করলে উত্তর : "প্রণামই যদি করলে, আর আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর্‌বো নি? তোমাদের এ কেমনতরো কথা?" একদিন এক তুঁতে মুসলমান ঠাকুরকে নিবেদনের জন্য কয়েকটি কলা এনেছে। মা তার কাছ থেকে কলা নেওয়াতে কেউ মন্তব্য করেছে, "ওরা চোর, ওর জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া কেন?" মা সেকথার কোনও মূল্য দিলেন না; পরে বললেন, "কে ভাল কে মন্দ আমি জানি।" উদ্বোধনের বারান্দা থেকে মা দেখলেন, এক কুলি বেধড়ক মারছে তার স্ত্রীকে। রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি? আঃ মলো যা!" মায়ের এই জোরগলার আওয়াজে সকলে সচকিত। কুলির দৃষ্টি পড়ল মায়ের উপর। সাপের মাথায় যেন ওঝার ধুলোপড়া দিল কেউ। ছেড়ে দিল সে নির্যাতিতাকে। রাধুর পোষা বিড়াল শ্রীমায়ের কাছে নির্ভয়ে আশ্রয় পেত। তার জন্য নিয়মিত দুধের বন্দোবস্ত ছিল। বিড়ালের চুরি করে খাওয়া নিয়ে কেউ অনুযোগ করলে শ্রীমা বলছেন, "চুরি করা তো ওদের ধর্ম বাবা। কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে?" কলকাতা যাওয়ার সময় জ্ঞান মহারাজকে বলেছিলেন, "দেখ, জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না, ওদের ভিতরেও তো আমি আছি।"

লীলাময়ী লীলাপরা লীলাস্বরূপিণী মুক্তিদাত্রী পতিতোদ্ধারিণী মহাশক্তি শ্রীশ্রীমা সারদা। গোমুখ থেকে জাহ্নবীর করুণাধারা অবিরামগতিতে সকলেব উপর ঝরে পড়ে, শ্রীশ্রীমায়ের অপার করুণাধারায় তেমনই সকল সন্তান স্নাত ও তৃপ্ত। মা সর্বদা নিজেকে গোপনে রাখলেও একবার রাধুর মায়ের বিদ্রূপের উত্তরে বলেছিলেন, "আমার দয়া যার ওপর নাই, সে হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার পরে নাই, এমন তো দেখিনে, প্রাণীটি পর্যন্ত।"[৮] সর্বভূতে এমন করুণা, এমন দয়া একমাত্র মহামানবের পক্ষেই সম্ভব। যাঁর জগতের সকল প্রাণীতে আত্মজ্ঞান—"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি"—সর্বত্র আমার স্থিতি, আমার মধ্যে প্রাণি/ সদাদৃশ্যমান হয়ে তাঁকে দেখি আমি। ব্রহ্মজ্ঞ ভিন্ন এত দয়া এত ক্ষমা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। আজ জগতের কাছে শ্রীমা সারদার প্রধান পরিচয়—'মা'। 'বিশ্বজগতের মা'। জগতের ইতিহাসে এই মাতৃমূর্তি নিরুপমা। পাপমলিন সংসারে সন্তপ্ত সন্তানগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মাতৃভক্তির প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানগঠিতা মানসীপ্রতিমা। তাই সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে সম্পন্ন হবে মায়ের অভিষেক, ভরা হবে মঙ্গলঘট।

সতেরও মা অসতেরও মা

জীবন-মঞ্চ মঞ্চ-জীবনে মা সারদা

দেবজিত্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা সারদার সারা জীবন ঘিরেই যেন রঙ্গমঞ্চের প্রসার। লোকশিক্ষার প্রচারে স্বামী-অনুগামী তিনি। তাই জীবনের মঞ্চেও তাঁর প্রবেশ চমক-জাগানো। লোককাহিনির নাটকীয় সরলতায় মেলে ধরেছেন আপন জন্মকথা : "আমার জন্মও তো ওই রকমের (শ্রীরামকৃষ্ণের মতো)। আমার মা শিওড়ে (শিহড়ে) ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছা হওয়ায় দেবালয়ের এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হল না, কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদর-মধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারি হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে লাল চেলি পরা একটি পাঁচ-ছয় বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম মা।' তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই উদরে প্রবেশ করে; তা থেকেই আমার জন্ম।"[১]

তিন বছরের সারদা স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন এক যাত্রাগানের আসরেই। শিহড়ে হৃদয়রামের বাড়ি কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। ওই উপলক্ষে হৃদয়ের মামা গদাধর শিহড়ে আসেন। আসরে বসে তিনি কীর্তন-যাত্রাগান শুনছিলেন। শ্যামাসুন্দরীও কন্যা 'সারু'কে নিয়ে তাঁর পৈতৃক গ্রামে হৃদয়ের বাড়িতে এসেছেন কীর্তন শুনতে। কীর্তনের আসর ভেঙে যাওয়ার পরে জনৈকা বয়স্থা প্রতিবেশিনী সারদাকে কোলে নিয়ে রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই যে এত লোক এখানে রয়েছে, এদের মধ্যে কাকে তোর বিয়ে করতে সাধ যায়?" তৎক্ষণাৎ শিশু সারদা দু-হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন অদূরে উপবিষ্ট তরুণ গদাধরকে।[২]

দিনের পর দিন যায়। পালটি ঘরে বিয়ে হয়ে গেল ছ-বছরের সারদার। স্বামী চব্বিশ বছরের গদাধর। পরমেশ্বরীর জিয়ন-পরশে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর লীলাসঙ্গিনী হলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণি। সেই বিশ্বাসেই তিনি শ্রীশ্রীমার মানবী-দেহ-আধারে নির্বাহ করেছিলেন দেবী ষোড়শীর পুজো। প্রার্থনামন্ত্রে উচ্চারণ করেন : "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।"[৩] জগত-হিতে মাতৃজ্ঞানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল মা সারদার।

সারদার মা শ্যামাসুন্দরীর মনে বড়োই দুঃখ—"এমন পাগল জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘরসংসারও করলে না... 'মা' বলাও শুনলে না"[৪] শাশুড়িকে

জবাবে জামাই গদাধর বলেন, "আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন, 'মা' ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য অনন্ত ও অখেদ জীবনের সন্ধান দিয়েছিল সারদাকে। সন্ন্যাসের ঊষর কাঠিন্যে নয়, 'রসেবশে' থাকার সাধনে সাধিকা হয়েছিলেন সারদা। শ্রীশ্রীমায়েব জ্ঞানে ঠাকুর—কী সদানন্দ পুরুষই ছিলেন। হাসি, কথা, গল্প, কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত। ...আমি কখন তাঁর অশান্তি দেখিনি।[৫] তেমনই প্রকাশ মা সারদার। অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন . "গ্রামশুদ্ধ লোক একত্রে হইয়া পৌরাণিক আখ্যানমূলক যাত্রা ও কথকতা শুনিয়া ধর্ম ও নীতিবিষয়ক শিক্ষা লাভ কবিত। শ্রীমতী সারদাও মেয়েদের সঙ্গে বসিযা শুনিতেন, একাগ্রমনে শুনিবাব ফলে অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। পরিণত বয়সেও নৈতিক শিক্ষা দিবাব প্রয়োজন হইলে তিনি ওইসকল শ্লোক অবিকল আবৃত্তি করিতেন।"[৬] এছাড়াও ছিল লোকগান শোনার আগ্রহ। জয়রামবাটীতে থাকাকালীন হরিদাস বৈরাগীর কাছে মাঝে-মাঝেই শুনতেন সেসব গান। হরিদাসের গানে শিব-উমার কাহিনিবিস্তারে ফুটে উঠত রামকৃষ্ণ-সারদার জীবন।

"কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)
(ওমা) লোকমুখে শুনি, সত্য বল শিবানী... " ইত্যাদি।[৭]

রাধাভাবের গানে বিশেষ আগ্রহ ছিল মা সারদার। রামকৃষ্ণের কাছে শেখা এমন গান প্রায়ই তিনি গাইতেন আপনমনে।

"যদি কিশোর, তোমার কালাচাঁদের—
গোকুলচাঁদের উদয ঘুচল হৃদে।
দুঃখ কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার,
কৃষ্ণপক্ষে এখন থাকবি রাধে।
যাই আমাদের যথা আছেন মধুসূদন,
শুনব না তোর বারণ, মানব না তোর রোদন,
প্যারী গো, আমরা থাকব না তোর সদন,
কৃষ্ণত্যাগীর বদন দেখতে নিষেধ আছে পুরাণে বেদে।"[৮]

পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমা স্বামী তপানন্দের কাছ থেকেও সংগ্রহ করেছিলেন রাধাভাবের গান।

"হৃদি-বৃন্দাবনে আমাবি কারণে সর্বনাশা বাঁশী বেজেছে এবার। (তাঁরে)
জানি না তবু যে, ভুলি লোকলাজে পাগলিনী ধাই অভিসারে তাঁর।" ইত্যাদি।[৯]

একবার কাশীতে সেবিকা সরলাদেবীকে শ্রীমা বলেন, "যে একবার ঠাকুরকে ডেকেছে, আর তার ভয় নাই। ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে কৃপা হলে তবে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রেমটা অতি গোপনীয় জিনিস, মা। ব্রজগোপীদের প্রেমভক্তি হয়েছিল। তারা এক কৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই জানত না। নীলকণ্ঠেব গানে আছে, 'ও প্রেমরত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।' " এরপর শ্রীমা গানটি গাইলেন। সরলাদেবী লিখেছেন, "কি মিষ্ট গলায় মা এই গানটি গাহিয়াছিলেন তাহা আজ পর্যন্ত যেন কানে লাগিয়া আছে।"[১০] এমনকি বাগবাজারের কিরণ দত্তের বাড়িতে মাথুর-কীর্তন শুনেও মা ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন।[১১]

শুধু তত্ত্বগানেই নয়, সহজিয়াগানেও ছিল তাঁর সরল আগ্রহ। সাতবেড়ে গ্রামেব লালু জেলের বাউল গান শোনেন সঙ্গিনীসহ মা সারদা।

"সংসারকে সার ভাবে যে সেই তো মূঢ়।
এই ভবের মাঝে ভেবে দেখো কে কার বাবা,
কে কার খুড়ো॥
এখন আলবোলাতে টানছ তামাক,
শব্দ হচ্ছে গড়র গড়র।
যখন বৃদ্ধকালে দন্ত যাবে খেতে হবে
তখন মুড়ির গুঁড়ো॥"

প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণায় পাই : "এইভাবে দু-চারটি দেহতত্ত্বের ও হাস্যরসের গান গাহিয়া লালু সকলকে খুব হাসাইল ও আনন্দ দিল। শ্রীশ্রীমাও ওইসকল বেশ উপভোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে হাসিতেছিলেন।"[১২] সারদা রামকৃষ্ণকে কখনও নিরানন্দ দেখেননি। "পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে থাকতেন।"[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তাঁর যোগ্যা হয়ে উঠেছিলেন সারদা-মা। আশুতোষ মিত্র লিখছেন : "শ্রীমা রঙ্গরসে বিশেষ পটু ছিলেন। দুইটি চরিত্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া একসময় এমন পারদর্শিতার সহিত হাতমুখ নাড়িয়া বর্ণনা করেন, যেন বোধহয় সত্যিই অভিনয় করিতেছেন।"[১৪] অথচ এমত রসিকতার তারিফ করলে বলতেন "আমায় আর কি দেখছ? ঠাকুরকে তো দেখেছ? তাঁর কথা আর ফুরুতে চাইত না—এত কথাও জানতেন।"[১৫] জীবনের সব মঞ্চেই ঠাকুরের এমন অনুগত ছিলেন শ্রীশ্রীমা।

ধ্যান, জ্ঞান আর সাধনের ত্রিবেণীসঙ্গমে মানবসমাজ বারে বারে পেয়েছে পরমার্থের সন্ধান। এই জীবনপথযাত্রীদের পথদ্রষ্টা হয়েছেন যাঁরা—চিরন্তন প্রেরণা জুগিয়েছেন যাঁরা—তাঁদের পুরোধা পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। লীলাসঙ্গিনী, শ্রীমা সারদামণি।

রামকৃষ্ণ-সারদার পরমপরশে লোকশিক্ষার তথা জীবনশিক্ষার নতুন আধার হয়ে উঠল বঙ্গরঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চ তখন রুচিবাদী সমাজের কাছে ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনেরও সেই অভিমত : "যাত্রার পরিবর্তে নাটক অভিনীত হইতে দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এতদিনের পর বিশুদ্ধ আমোদ আস্বাদ করিবার উপায় হইল। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িল। বেশ্যা দ্বারা অভিনয় করাইলে, নাট্যমন্দির আর আমোদের স্থল রহিল না। ...বেশ্যার অভিনয়ে দুইটি দোষ। যে সকল পুরুষ বেশ্যার সঙ্গে অভিনয় করেন তাঁহাদের চরিত্র ভালো রাখা কঠিন। দ্বিতীয়ত যাঁহারা বেশ্যার অভিনয় দেখেন তাঁহাদেরও মন কলঙ্কিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। সুতরাং বেশ্যার অভিনয় অবাধে প্রচলিত হইলে ভারতের আর একটি সর্বনাশের দ্বার খোলা হইবে। ...কতকগুলি সুশিক্ষিত লোক নাকি বেশ্যার অভিনয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন, যে সুশিক্ষার ফল বেশ্যার আমোদ, সে সুশিক্ষার মুখে আগুন।"[১৬] রামকৃষ্ণপ্রবাহে সেই রঙ্গমঞ্চ আদৃত হল সর্বসাধারণের মাঝে। এমনকি তার গান ধ্বনিত হতে থাকে ভক্তসমাগমেও। ভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর মতে : "কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক আর বেশ্যাই মরুক শিব হবে। যখন হরি নামে, কালী নামে, রাম নামে, চক্ষে জল আসে, তখনই সন্ধ্যা-কবচাদির কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্মত্যাগ হয়ে যায়। কর্মের ফল তার কাছে যায় না।" তাই তিনি শ্রীচৈতন্যের নামভূমিকায় নটী বিনোদিনীর অভিনয়ে আত্মহারা হতেন, 'আসল-নকল এক' দেখতেন। অন্যদিকে তাঁরই সান্নিধ্যে বিনোদনী বিজ্ঞাপনে ঠাঁই পেল 'Soul dissolves Hari Sankirtan'-এর পাশাপাশি 'রামকৃষ্ণঃ

শরণম্' বা 'জয় রামকৃষ্ণ'। শুধু ঈশ্বর-উপলব্ধির নিভৃত সাধনা নয়, আত্মবিশ্বাস আর আত্মচেতনার শিক্ষায় হল ধর্মের নব রূপায়ণ। সে পথে সদা অনুসারী শ্রীশ্রীমা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একত্রে বসে অভিনয় দেখার সুযোগ ঘটেনি সারদার। যে-বছর শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করেন, সেই বছর গিরিশচন্দ্র মঞ্চস্থ করলেন (১২ জুন ১৮৮৬) ভক্তমাল-গ্রথিত 'বিল্বমঙ্গল'। রামকৃষ্ণবচনের কাহিনি হয়ে ওঠে গিরিশবচনের ভিত্তিভূমি। এমনকি কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর-সমীপে সুরেন্দ্রের গাওয়া (১৮ এপ্রিল ১৮৮৬) গিরিশগীতি :

"আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা
আমি তাদের পাগল ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা"...[১৭]

অঙ্গ হল এই নাটকের। ('পাগলিনী' চরিত্রের এ-গানে শুধু পাগল ছেলে হল—পাগলি মেয়ে।) গানে গানে মুখর হল সে মঞ্চরূপ। ভক্তসমাগমেও গীত হতে থাকে এ নাটকের গীতাবলি। মুখে মুখে ফিরতে থাকে নাট্যসংলাপ। এই নাটকের দর্শক হিসেবেই মা সারদার প্রথম মঞ্চ-প্রবেশ। সালটা ১৯০৫। দু-দশক বাদেও ঠাকুরের আশিসে মঞ্চে সমাদৃত হল 'বিল্বমঙ্গল'। বিভিন্ন মঞ্চ ঘুরে গিরিশ সদ্য ফিরেছেন মিনার্ভায়। এ-নাটক ঠাকুরকে না দেখাতে পারার ব্যথায় বুক বেঁধে মাকে নিয়ে এলেন মিনার্ভায়। যাত্রা দেখার অভ্যাস থাকলেও মঞ্চের ঘেরাটোপে নাট্যদর্শনের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিস্ময়মুগ্ধা শ্রীশ্রীমা দেখেন শব-আলিঙ্গন করে নদী পার হওয়া বিল্বমঙ্গলের দিব্যদৃষ্টি লাভ। শোনেন স্বগতোক্তি :

"এই পরিণাম! এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায়।
কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতা-ভস্ম পবন উড়ায়...।'

স্তম্ভিত হয়ে শোনেন বণিকগৃহে অহল্যার প্রতি ক্ষণিক মোহগ্রস্ত বিল্বমঙ্গলের আত্মধিক্কার :

"মন, এখনো কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু তোর শীঘ্র কর্ বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
'আমার' বলিয়ে তুলে নেবে কোলে
অন্য সব হেরিবে অসার।
যাও যাও নশ্বর নয়ন..."

সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা দিয়ে স্বনয়ন বিদ্ধ করা বিল্বমঙ্গলকে দেখে তিনি পাথরপ্রতিমা। আবার অন্ধ বিল্বমঙ্গল যখন সকাতরে 'গোপাল গোপাল' বলে দু-বাহু বাড়িয়ে বালকৃষ্ণকে ধরার চেষ্টা করে তখন যেন শ্রীশ্রীমার ঠাকুর-সন্নিধান। আত্মবিস্মৃত ও বিস্মিত মা 'বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেমদর্শনে' শুধু বলতে থাকেন 'আহা আহা'।[১৮] এ-নাটক তিনি আবার দেখেন ১৯১০-এ। দিনটা ১২ জুলাই। বেনারসের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য এই দিনের অভিনয় হয়। সঙ্গে অভিনীত হয় গিরিশরচিত ভিন্ন নাটক 'জনা'। এইসময় অভিনেত্রী তিনকড়ি বিভিন্ন থিয়েটারে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মাঝে মাঝে অভিনয় করতেন। 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকা (ভাদ্র, ১৩১৭) থেকে জানা যায়, এইদিন তিনকড়ি কোনও পারিশ্রমিক নেননি।[১৯] এই অভিনয়-রজনীতে বিল্বমঙ্গলের 'সাধক' এবং জনার 'বিদূষক' স্বয়ং গিরিশ।

সেই অভিনয়-অভিজ্ঞতায় জানা যায় : "বিদূষক দেখিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা হাসছেন যে, কেমন দেখছেন?', মা উত্তর করিলেন, 'যা দেখছি, তা তো ওরই (গিরিশের) চরিত্র। আমি তো জানি ওর, ওইরকমই বিশ্বাস—ঠাকুরকে ডাকলে ত্রাণ পাওয়া যাবে। আবার বকেও।' "[২০] ১৯১২ সালের জন্মমাসেই (ফেব্রুয়ারি) প্রয়াত হলেন গিরিশচন্দ্র। ওই বছর অক্টোবরে দুর্গাষ্টমীর রাতে বেলুড় মঠে অভিনীত হল 'জনা'। গিরিশ-বিহীন সে নাটক দেখতে আবার এলেন মা সারদা।[২১] গিরিশের এ-নাট্যরচনা মায়ের বিশেষ প্রিয় ছিল। প্রিয় ছিল এ-নাটকের গানও। শুনে শুনে শ্রীশ্রীমা দু-একখানি গান আয়ত্তও করেছিলেন। এক সেবককে স্বকণ্ঠে শুনিয়েছিলেন এ-নাট্যের কীর্তন-অঙ্গ 'কৃষ্ণলীলার গান'—

"হামা দে পালায়, পাছু ফিরে চায়
রাণী পাছে তোলে কোলে।
রাণী কুতূহলে, ধর ধর বলে,
হাম্মা টেনে তত গোপাল চলে ॥"... [২২]

গিরিশের নাট্যগীতি বিশেষ পছন্দ করতেন শ্রীশ্রীমা। দুর্গাপুরী দেবীর স্মৃতিতে পাই এক সন্ধ্যাবেলা রাধারানী মাকে আবদার জানায় তাহাকে গান শুনাইতে হইবে।...মা গান আরম্ভ করিলেন—

"কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন মোহন-মুরলীধারী ॥
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল মন আমার ॥"[২৩]

এ-গান গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য-লীলা' নাটকের। এ-নাট্যসূত্রেই ঠাকুরের আশিসধন্য হয়েছিলেন বিনোদিনী। এ-নাট্যসূত্রেই চৈতন্য-আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল মঞ্চকুল আর মঞ্চের আলোয় সমাধিস্থ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এ-গান বারে বারে শুনেছেন তিনি। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় গেয়েছেন তারাপদ (১১ মার্চ ১৮৮৫) আর গণুর মা-র বাড়িতে আখড়ার একদল ছেলে (২৮ জুলাই ১৮৮৫)। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান তাই বুঝি কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন মা সারদা। আশুতোষ মিত্রের বয়ানে জানা যায়, শ্রীমা 'চৈতন্যলীলা' নাটক দেখেছিলেন। সেদিন মায়ের জন্যই এই নাটক অভিনয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন গিরিশ। তিনি সেজেছিলেন মাধাই আর জগাই-এর ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। নিমাই আর নিতাই-এর ভূমিকায় মঞ্চে নামেন ভূষণকুমারী আর সুশীলা। নিমাই-এর অভিনয়ে মোহিত শ্রীমার মন্তব্য : "মেয়েটিকে [ভূষণ] দেখলুম, ভক্তিমতী—ভক্তি না থাক্‌লে কি হয় গা?"[২৪]

এই অভিনয়ের কোনও নিশ্চিত তারিখের উল্লেখ নেই। তবে ১৯০৬-এর ১৩ এপ্রিল, ২২ এপ্রিল, ২৯ এপ্রিল বা ২৭ মে-র মধ্যেই নির্দিষ্ট ছিল সে অভিনয়। কারণ এর আগে-পরে জগাই-মাধাই হননি অর্ধেন্দু-গিরিশ।[২৫] স্বামী শান্তানন্দের স্মৃতিকথায় জানা যায়, গিরিশের অনুরোধে শ্রীমা 'পাণ্ডব গৌরব'-এর অভিনয় দেখতে যান মিনার্ভা থিয়েটারে। দিনটা ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯। গিরিশ সেজেছিলেন 'কঞ্চুকী'। মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিনয় দেখছিলেন শ্রীমা। কঞ্চুকী-সজ্জায় চমকিত তিনি বলে উঠলেন "ও, এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু!" মঞ্চে কালীমূর্তির আবির্ভাবে যখন 'দেবতাদের সপ্ত বজ্র ও মহামায়ার শক্তি মিলে অষ্ট বজ্র একত্র' হল তখন শুরু হয়

দেবীসহচরী যোগিনীদের গান—

"হের হর-মনোমোহিনী কে বলেরে কালো মেয়ে।
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোখ থাকে তো দেখ্ না চেয়ে॥
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী..."

—ঠিক এই সময়টিতে তিনি ভাবে মগ্ন হয়ে স্থির হয়ে যান। এইভাবে সমাধিতে শ্রীশ্রীমা অনেকক্ষণ ছিলেন।[২৬] অক্ষয়চৈতন্যের স্মৃতিতে পাই গিরিশের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের অভিনয়-দর্শনেও মা ভাবাবিষ্টা হয়েছিলেন।[২৭]

গিরিশ শুধু মঞ্চে নয়, জীবনেও মা সারদার স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। সারদা-দর্শনের স্বপ্ন সত্য হয় গিরিশজীবনে, সদাজিজ্ঞাসু গিরিশের "তুমি কি রকম মা?" প্রশ্নে শ্রীমায়ের শাশ্বত উত্তর · "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী।"[২৮] তার প্রমাণ দিতেই শ্রীমা অসুস্থ শরীরেও গিরিশের দুর্গাপুজোয় উপস্থিত হয়েছিলেন। আর সারদাচরণে অঞ্জলিদানে সার্থক হয়েছিল গিরিশের সন্ধিপুজো।

গিরিশোত্তর যুগের প্রথম সারির নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। 'আলিবাবা' নাটকের খ্যাতিতে ছেড়েছিলেন অধ্যাপনার কাজ। সংগীত-প্রাধান্যে বারবার গড়ে তুলতেন আপন নাট্যরচনা। সে ধারাতেই লিখলেন 'কিন্নরী'। নাট্যকারের আগ্রহে সে নাটকের অভিনয় দেখতে যান মা সারদা মিনার্ভা থিয়েটারে (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৮)। এ-নাটক দেখার কালে শ্রীমায়ের সঙ্গী ছিলেন স্বামী সারদানন্দ।[২৯] শ্রীমায়ের জন্যই এইদিনের অভিনয় শুরু হয় বিকাল সাড়ে চারটেয়।[৩০]

গিরিশচন্দ্রেব অনুগামী অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অভিনেতা হলেও নাট্যকার হিসেবেই খ্যাতি পান বেশি। মূলত স্বামী ব্রহ্মানন্দের এবং স্বামী সারদানন্দের উৎসাহে তিনি রচনা করেন 'রামানুজ' নাটক। নির্দিষ্ট দিনলিপি না মিললেও শ্রীশ্রীমা দেখেছিলেন এ নাটকের মঞ্চায়ন। অভিনয়ে লক্ষ্মণের ঝগড়াটে বউ-এর ভূমিকা নেন নীরদাসুন্দরী। অভিনয় শেষে মা তাঁকে কোলে টেনে নিয়ে চুম্বন করেন সস্নেহে।[৩১] বিনোদিনীর মতোই নটী নীরদার জীবনের উত্তরণ ঘটল মাতৃপরশে।

মঞ্চের বেড়াজালে নয় মঞ্চের বাইরেও স্নেহের টান ছিল মা সারদার। মাতৃসন্নিধানে প্রায়ই আসতেন অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। "তখন মা অসুস্থ। তাই তারাসুন্দরী মাকে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে দরজার নিকট বসিয়া খুব ভক্তি (সহকারে) ও মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলিতেছেন। কিছুপরে মা বলিতেছেন, 'থিয়েটারে তো বেশ বলো। এমন সেজেগুজে আসো তখন তোমাকে চেনাই যায় না। এখানে এমনি একটু শোনাও দেখি।' তারাসুন্দরী অনেকসময় পুরুষের ভূমিকায়ও অভিনয় করিতেন। তারাসুন্দরী মায়ের আদেশে জোড়হাত করিয়া মাকে নমস্কার করিয়া বেশ বীররস-ব্যঞ্জক প্রবীরের অভিনয় করিয়া কিছু শুনাইলেন।"[৩২]

তেমনই অন্য এক স্মৃতি আশুতোষ মিত্রের : "প্রথিতযশা অভিনেত্রী তিনকড়ি একদিন মায়ের বাড়িতে এসেছেন। লক্ষ্মীদিদি তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁদের গান গেয়ে শোনাতে। কিন্তু তিনকড়ি সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'আপনাদের কাছে আমি কি গাইতে পারি?' তখন

শ্রীশ্রীমা বলেন, 'তাতে কি—গাও না—তোমার সেই পাগলীর (বিল্বমঙ্গল নাটকের চরিত্র) গানটা গাও।' অভিনেত্রীর সমস্ত সঙ্কোচ এবার দূর হয়ে যায়। গান ধরেন তিনি।... শ্রীশ্রীমার পূজা হইয়া গিয়াছে—ঠাকুরঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া গান শুনিতেছেন—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।

আমি যেখানে যাই, সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে,

" ...শ্রীমা একবার ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া চক্ষু বুজিলেন। কিছুক্ষণ বাদে চক্ষু চাহিলেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি আদৌ বাহ্যদৃষ্টি নহে বলিয়া আমাদের ধারণা হইল; চক্ষু উন্মুক্ত কিন্তু কিছুই দেখিতেছেন না।... " গান-শেষে ভাবস্থা মা চোখের জল মুছে সাধুবাদ দিলেন গায়িকাকে, "আজ কি গানই শোনালি, মা!"[৩৩]

ভিন্ন পরিস্থিতিতেও মা সদা স্নেহময়ী। অভিনেতা পদ্মবিনোদ, পোশাকী নাম বিনোদবিহারী সোম, মাতাল হয়ে রাতদুপুরে এসেছেন মায়ের দেখা পাবার আশায়। অসুস্থ মায়ের যাতে ঘুমে না ব্যাঘাত ঘটে তাই সতর্ক প্রহরায় সারদানন্দ। মাতালকণ্ঠে সুর খেলল গানে :

"ওঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর দ্বার

আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার

সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে।

(আমি) ডাকিতেছি মা মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙে না তোমার?"...

সতর্ক বেড়াজাল টপকে গান পৌঁছাল অন্তঃপুরে। মা এসে দাঁড়ালেন খোলা জানালায়। এমন ঘটত প্রায়ই। মাকে দেখলেই ধূলিপথে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে গানে গানেই বিদায় নিত সে তৃপ্তমনে।

যে মঞ্চ-জনের, মঞ্চ-জগতের সবসময় জুটেছে অবহেলা, অপমান, মায়ের স্নেহশিক্ষায় তা আবার উদ্ভাসিত রামকৃষ্ণ-আলোকে। তাঁর আপন কথায় : "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"[৩৪] তাই শুধু সেদিনের জগৎ নয়, কালান্তরের মানুষের কানে বাজবে তাঁর শাশ্বত আশ্বাস : "মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন 'মা' আছেন।"[৩৫] অপরেশচন্দ্রের উপলব্ধিতে ইতি টানা যাক : "মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন, আর ভিতরটা দেখেন বলিয়াই নিজে দেখিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তজননী মা আমার, এই দেশের রঙ্গালয়ের কোনও পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটাগাছকে বাছে না—সে দয়ার পাত্রপাত্রী নাই, সে দয়া বিচার করে না, ব্যবহারিক জগতের কোনও বিধিনিষেধ মানে না; সে কেবল জাতিনির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।"

রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলছেন গোলাপ-মাকে, "ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"[১]

পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'শ্রীমা সারদা দেবী'-তে লিখছেন, "সরলা, আধুনিক শিক্ষাবিহীনা ও আভিজাত্যাদিশূন্যা শ্রীমাকে চিনিতে পারা সহজ নহে। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

"তিনি জানিতেন, যে, ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ বর্তমান যুগে, শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রতায় পরিপূর্ণ এই চরিত্রখানি সম্যক উপলব্ধি করা আমাদের শক্তির বাহিরে। তাই তিনি শ্রীমা সম্বন্ধে রহস্যচ্ছলে বলিতেন, 'ছাই চাপা বেড়াল।' "

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ এক চিঠিতে লিখছেন—"শ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। একি মহাশক্তি! জয় মা!! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!!"

গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে আমেরিকা থেকে লিখছেন স্বামীজী (চিঠির সঠিক তারিখ পাওয়া গেল না। চিঠির মাথায় শুধু '১৮৯৪' লেখা আছে), "মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।"

শ্রীশ্রীমা তাঁর নরলীলা সাঙ্গ করে রামকৃষ্ণলোকে চলে গেছেন। তার পরের ঘটনা। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) তখন কাশীধামে। কয়েকজন প্রাচীন সাধু শরৎ মহারাজকে অনুরোধ করলেন : "আপনি মায়ের বিষয় লিখে রাখলে, পরবর্তী কালের মানুষ শ্রীশ্রীমা কী ছিলেন, তা সঠিক জানতে পারবেন।

"আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা লিখে জগতের মহা উপকার করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীও আপনি লিখলে ভাল হয়। আপনি লিখুন।"[২]

(উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে বিবৃত অংশ মূল গ্রন্থে সাধু ভাষায় ছিল। বর্তমান প্রবন্ধকার তাকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন।)

এর উত্তরে শরৎ মহারাজ কিছু বললেন না। শুধু এই গানটি আবৃত্তি করলেন মাত্র—

"রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর, অবাক হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব, তাই বসে ভাবিতেছি।
এতকাল রইলাম কাছে, ফিরলাম পাছে পাছে,
কিছু বুঝতে না পেরে, এখন হার মেনেছি।
বিচিত্র তাঁর ভবের খেলা, ভাঙেন গড়েন দুই বেলা,
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।"[৩]

এই গানটিই অন্য কোনও সময় গুন-গুন করে গেয়েছিলেন শরৎ মহারাজ। তবে, সে গানের কথায় পাঠান্তর আছে।

পূজ্যপাদ স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ তাঁর 'সারদানন্দচরিত' গ্রন্থে জানাচ্ছেন—

"জীবন-প্রান্তে দাঁড়িয়ে দার্শনিক কবি সারদানন্দজীকে দেখা যেত তিনি নির্লিপ্ত ও নিঃস্পৃহভাবে তাঁর সমগ্র জীবনখানি অবলোকন করতেন, কখনো বা শোনা যেত তিনি গুন্‌গুন্ করে গাইছেন একটি ব্রহ্মসঙ্গীত,

"তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি॥
বিচিত্র ভবের খেলা
ভাঙ্গ গড় দুটি বেলা;
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি॥
এতকাল রইলাম কাছে
বেড়াইলাম পাছে পাছে,
চিনিতে না পেরে এখন হার মেনেছি।"[৪]

এই প্রসঙ্গে পাদটীকায় পূজ্যপাদ স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ জানাচ্ছেন—

" 'স্বামী সারদানন্দের' জীবনীকারের মতে, স্বামী গঙ্গানন্দের একটি সন্দেহভঞ্জন করতে গিয়ে সারদানন্দজী এই গানটি গেয়েছিলেন। (পৃঃ ২৪৭) আবার 'মাতৃসান্নিধ্যে'-র লেখকের মতে, শ্রীমায়ের জীবনী লিখতে অনুরুদ্ধ হলে সারদানন্দজী তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন এই গানটি আবৃত্তি করে (পৃঃ ২১৪) দুজনের মতেই এই ঘটনা ঘটেছিল কাশী সেবাশ্রমে। আমাদের ধারণা এ-দুটি বর্ণনা একই ঘটনার দুটি ভিন্ন বিবৃতি মাত্র।"[৫]

যে রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদ এবং সেই রঙ্গময়ীর 'দ্বারী' স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পর্যন্ত 'অবাক' হন, এবং শ্রীশ্রীমার জীবনীগ্রন্থ রচনার কাজ থেকে বিরত থাকেন, সেই জগন্মাতাকে চেনবার, বা চিনিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা-প্রকাশ—এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—জগজ্জননীর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু ঘটনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া। এক আশ্চর্য অবগুণ্ঠনের আড়ালে, আশ্চর্যতর প্রযত্নে নিজের ঐশী-শক্তিকে সঙ্গোপনে রাখেন যিনি সেই ভগবতীর রঙ্গ দেখে অবাক হওয়া। এক সর্বগ্রাসী মাতৃত্বের সহস্রধারা স্রোতস্বিনীতে অবগাহন করতে করতে, সেই বিশ্বার্তিহারিণীর চরণে শরণাগত হওয়া।

মায়ের জীবনের আপাত-নিস্তরঙ্গ, অতি সাধারণ ঘটনাগুলির অন্তরালে কী মহতী লীলা চলছিল—তা শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান সরলপ্রাণ পাঠকের একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়। এই রচনা সেই উপলব্ধিকে স্পর্শ করতে প্রয়াসী এবং পাঠক-হৃদয়ের শ্রদ্ধার সরোবরে সেই উপলব্ধি-শতদলের নিঃশব্দ প্রস্ফুটনের প্রত্যাশী।

আমরা শুধু গল্প বলে যাব। কোনও ব্যাখ্যায় যাব না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যাঁর স্তব করে আনন্দ পান, সেই পরমানন্দময়ীর অনন্ত লীলার, অনন্ত রঙ্গের ব্যাখ্যা করার স্পর্ধা আমরা দেখাব না। সেই রঙ্গমঞ্চে আমরা দর্শক মাত্র। আমরা শুধু রঙ্গ দেখব।

'চিনিতে না পেরে শেষে হার মেনেছি'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শ্যামপুকুরে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুরে নিয়ে আসা হয়েছে। মা আছেন দক্ষিণেশ্বরেই। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় বঞ্চিতা মা দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

গোলাপ-মা একদিন কথায় কথায়, যোগীন-মাকে বললেন, "দেখো যোগেন, ঠাকুর বোধ হয় মার ওপর রাগ করে কলকাতা চলে গেছেন।"

যোগীন-মা কথাটা মার কানে তুললেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা মা গাড়ি করে চলে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। বললেন, "তুমি নাকি আমার ওপর রাগ করে চলে এসেছ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "না! কে তোমায় এ-কথা বলেছে?"

মা বললেন, "গোলাপ বলেছে।"

শুনে খুবই রেগে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভগবতীর এই অবমাননা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। বললেন, "হ্যাঁ! সে এমন কথা বলে তোমায় কাঁদিয়েছে? সে জানে না—তুমি কে! গোলাপ কোথায়? আসুক না!"

মা শান্ত হলেন। ফিবে এলেন দক্ষিণেশ্বরে।

কিছুদিন পরে। গোলাপ-মা এসেছেন শ্যামপুকুরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তীব্র ভর্ৎসনা করলেন গোলাপ-মাকে। বললেন, "তুমি কী কথা বলে ওকে কাঁদিয়েছ? জানো না, ও কে? এক্ষুণি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাও গে।"

গোলাপ-মা তখনই, হাঁটতে হাঁটতে শ্যামপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মা! ঠাকুর আমার ওপর ভয়ানক রাগ করেছেন। আমি না বুঝতে পেরে, অমন কথা বলে ফেলেছি।"

মা কোনও কথা না বলে, শুধু হাসলেন। আর 'ও গোলাপ' বলতে বলতে গোলাপ-মার পিঠে তিনটে চাপড় দিলেন। গোলাপ-মার সব দুঃখ নিমেষে উধাও![৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কাশীপুরে। যোগীন-মার ইচ্ছে হয়েছে—বৃন্দাবন যাবেন। তপস্যা করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করলেন সেকথা।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যোগীন-মাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "তুমি বৃন্দাবনে যাবে? বেশ হবে। যাও। সব সেখানে পাবে।"

মা তখন শ্রীরামকৃষ্ণের পথ্য নিয়ে ঘরে উপস্থিত। মায়ের দিকে তাকিয়ে, চোখ ফিরিয়ে,

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীন-মাকে বললেন, "ওকে বলেছ? ও কী বলে?"

মা তাড়াতাড়ি বললেন, "যা বলবার, তুমিই তো বললে। আমি আবার কী বলব?"

মায়ের সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ যেন শুনেও শুনলেন না। যোগীন-মাকে আবারও পরামর্শ দিলেন, "ওগো বাছা! ওকে রাজি করিয়ে যেয়ো। তোমার সব হবে।"

মা উচ্ছিষ্ট বাটি নিয়ে নিচে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হলেন। পরদিন। যোগীন-মা আবার এসেছেন। এসেছেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করার আগে ভগবান-ভগবতীর আশীর্বাদ নিতে। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে মার কাছে এলেন। মা যোগীন-মার মাথায় করজপ করে দিলেন। দুদিন পরেই যোগীন-মা বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন।[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলার অবসান হয়েছে। মা তখন কামারপুকুরে। একবার কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী চলেছেন মা। শিবুদাদাও চলেছেন মার সঙ্গে। শিবুদাদা তখন নেহাতই ছেলেমানুষ।

শিবুদাদা মানে, শ্রীরামকৃষ্ণের মেজদা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটো ছেলে শিবরাম চট্টোপাধ্যায়।

শিবুদাদার সঙ্গে কাপড়ের বোঁচকা। (সম্ভবত, তাঁর নিজেরই কাপড়ের বোঁচকা। জয়রামবাটীতে থাকবেন। তাই, বালক-বুদ্ধিতেই, নিজের কাপড়ের এক বোঁচকা সঙ্গে নিয়েছেন।)

জয়রামবাটীর কাছাকাছি এসে হঠাৎই শিবুদাদা দাঁড়িয়ে পড়লেন মাঠের মাঝখানে। শিবুদাদার কোনও শব্দ পাচ্ছেন না মা। পিছনে ফিরে তাকালেন। দেখেন, শিবুদাদা দাঁড়িয়ে আছেন।

মা তো অবাক! বললেন, "ও কী রে শিবু! এগিয়ে আয়!"

শিবুদাদা বললেন, "একটি কথা বলতে পারো, তা হলে আসতে পারি।"

মা বললেন, "কী কথা?"

শিবুদাদা বললেন, "তুমি কে—বলতে পারো?"

মা বললেন, "আমি কে? আমি তোর খুড়ি।"

শিবুদাদার এমন উত্তর পছন্দ নয়। একেবারে বালকোচিত অভিমানে বললেন, "তবে যাও। এই তো, বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।"

পড়ন্ত বেলা। এখনই আঁধার নেমে আসবে। বিব্রত বোধ করলেন মা। বললেন, "আমি আবার কেরে? আমি মানুষ। তোর খুড়ি!"

শিবুদাদা বললেন, "বেশ তো, তুমি যাও না।"

অন্তর্যামিনী মা জানেন—শিবুদাদা কী উত্তর চাইছেন। শিবুদাদা দাঁড়িয়েই আছেন। এদিকে সন্ধের আর বেশি দেরি নেই। শেষ পর্যন্ত, শিবুদাদাকে 'আধেক ধরা' দিলেন। বললেন, "লোকে বলে কালী।"

শিবুদাদা বললেন, "কালী তো? ঠিক?"

মা বললেন, "হ্যাঁ।"

শিবুদাদা খুশি। খুব খুশি। বললেন, "তবে চলো।" বলে, মার সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাটীতে এলেন।[৮]

এর পরেও একবার ফাল্গুন (১৩২৬ বঙ্গাব্দ) শিবুদাদা মায়ের চরণে মাথা রেখে, ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদছেন। বলছেন, "মা। আমার কী হবে বলো। তোমার কাছে শুনতে চাই।"

মা বললেন, "শিবু! ওঠ। তোর আর ভাবনা কী? ঠাকুরের অত সেবা করলি! তিনি তোকে কত ভালবেসেছেন! তোর আর চিন্তা কী? তুই তো জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস!"

শিবুদাদা ছাড়বেন না। বললেন, "না। তুমি আমার ভার নাও। আর, তুমি যা বলেছিলে, তুমি তাই কি না—বলো।"

মা শিবুদাদার মাথায়, চিবুকে হাত দিয়ে অনেক আদর করলেন। অনেক সান্ত্বনা দিলেন। শিবুদাদা মার কোনও কথাই শুনবেন না। কেঁদেই চলেছেন। বললেন, "বলো তুমি আমার সকল ভার নিয়েছ! আর সাক্ষাৎ মা কালী কিনা।"

শিবুদাদার কথা শুনে, আর ব্যাকুলতা দেখে, মার ভাবান্তর উপস্থিত হল। বরদা মহারাজ উপস্থিত ছিলেন পাশেই। তাঁর (বরদা মহারাজের) মনে হল, মা তখন আর মানবী নন। দেবী।

মা শিবুদাদার মাথায় হাত রাখলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ। তা-ই।"

শিবুদাদা তো আনন্দে আত্মহারা। হাতজোড় করে মানবী-দেবীর স্তব করতে লাগলেন—'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে'.. ইত্যাদি।[৯]

মা তখন জয়রামবাটীতে। জয়রামবাটীতে সেই তাঁর শেষবারের মতো থাকা। একদিনের কথা। রাত তখন নটা। পাচিকা ব্রাহ্মণী এসে বললেন, "কুকুর ছুঁয়েছি। স্নান করে আসি।"

মা বললেন, "এত রাতে স্নান কোরো না। হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়ো।"

এই বিধান ব্রাহ্মণীর পছন্দ হল না। বললেন, "তাতে-কি হয়?"

মা বললেন, "তবে গঙ্গাজল নাও।"

ব্রাহ্মণী মাত্র এই ব্যবস্থাতেও খুশি নন।

পবিত্রতাস্বরূপিণী মা বললেন, "তবে আমাকে স্পর্শ করো।"

চোখ খুলে গেল ব্রাহ্মণীর। অন্তত, তখনকার মতো।[১০]

আর একবার। কোয়ালপাড়ায় রাধুর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে মা বলছেন, "দেখো মা! এ শরীর (নিজের শরীরটিকে দেখিয়ে বলছেন) দেবশরীর জেনো। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ভগবান না হলে কি মানুষ এত সহ্য করতে পারে?... দেখো মা! আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না। পরে বুঝবে সব।"[১১]

মা তখন দক্ষিণেশ্বরে। একদিন মা যোগীন-মাকে বলছেন, "যোগেন! তুমি শুকনো বেলপাতায় পুজো করো কি?"

যোগীন-মা দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলপাতা নিয়ে যেতেন। বেলপাতা শুকিয়ে যেত। যোগীন-মা সেই শুকনো বেলপাতা দিয়েই পুজো করতেন।

যোগীন-মা বললেন, "হ্যাঁ মা। কিন্তু, তুমি তা কী করে জানলে?"

স্মিত হেসে মা বললেন, "আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম, তুমি শুকনো বেলপাতা দিয়ে আ..."(আমার?)

কথা শেষ করলেন না মা। একটু যেন কথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে, বললেন, "পূজা করছিলে।"

যোগীন-মা স্তম্ভিত। লজ্জা পেলেন মা। যোগীন-মাকে জড়িয়ে ধরলেন।[১২]

মা তখন জয়রামবাটীতে। স্বামী তন্ময়ানন্দ মায়ের শ্রীচরণ দুখানির পুজো করলেন। তারপর, মাথায় তুলে নিলেন মায়ের শ্রীপাদপদ্ম দুটি।

মা বাধা দিয়ে বললেন, যে, (ভক্তের) মাথার ওপর (তাঁর, অর্থাৎ, শ্রীশ্রীমা-র) পা রাখতে নেই। কারণ, সেখানে ঠাকুর থাকেন। ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান। মাথার সহস্রদল পদ্মে বসে আছেন।

তন্ময়ানন্দ বললেন, "মা! ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে?"

একটুও ইতস্তত না করে, মা বললেন, "আমি আর কে, আমিও ভগবতী।"[১৩]

ব্রহ্মচারী বিমল (স্বামী দয়ানন্দ)•উদ্বোধনে, মায়ের বাড়িতে। ঠাকুরের নিত্য পূজা এবং সেবা করেন। একদিন বিমল এসেছেন মাকে প্রণাম করতে। মা কালীর ছবি, শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এবং নিজেকে দেখিয়ে মা বললেন, "এঁরা এক।"[১৪]

কেদার (স্বামী কেশবানন্দ) একদিন বলছেন, "মা! আপনাদের পরে ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাকে আর কেউ মানবে না।"

মা বললেন, "মানবে না কেন? তারা তো আমারই অংশ।"[১৫]

লীলাময়ীর রঙ্গ

'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়'—অনন্ত লীলাময়ী মায়ের অনন্ত রঙ্গলীলার বর্ণনা দেওয়া তো দূরস্থান, সামান্য ধারণা দেওয়াও এই পরিসরে সম্ভব নয়। যিনি প্রলয়কালে বিষ্ণুর 'যোগনিদ্রা', যিনি মধু-কৈটভকে নিজের হাতে বধ না করেও 'মধুকৈটভঘাতিনী', যিনি 'মহিষাসুরমর্দিনী', যিনি চণ্ড-মুণ্ড-শুম্ভ-নিশুম্ভ-বিনাশিনী, সেই দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী-গঙ্গাস্বরূপা, সর্বদেবীস্বরূপার জীবন-রঙ্গের মাত্র কয়েকটি ছবি গল্পের আকারে তুলে ধরা হল। কোথায় কোন রঙ্গের প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে—তা উপলব্ধির বিষয়। তাই বিশদ ব্যাখ্যাকে এই প্রবন্ধের বাইরে রাখা হয়েছে। ব্যাখ্যার চাবি আছে অনুভবের ঘরে।

মা তখন জয়রামবাটীতে। রামময় তখন ছেলেমানুষ। বদনগঞ্জের স্কুলে পড়েন। রামময় শনিবারে, স্কুলের ছুটির পর, মায়ের বাড়িতে চলে আসেন। মায়ের বাড়ির কিছু কাজকর্ম করে দেন। আবার সোমবার বাড়ি ফিরে যান। মা রামময়কে দীক্ষা দিয়েছেন। খুব স্নেহ করেন।

একদিন অনেক ভক্ত এসেছেন মায়ের কাছে। মা এবং রামময় রুটি বেলছেন। নলিনীদিদি সেঁকছেন। যাঁর চরণপ্রান্তে উপনীত হয়ে জীবনকে ধন্য করে নেওয়ার জন্য ভক্তরা এসেছেন, সেই জগন্মাতা স্বয়ং রুটি বেলছেন। বেলছেন তাঁর 'স্নেহের-আঁচল-দিয়ে-

আগলে-রাখা' সন্তানদের জন্যই!

রামময়ের খুব হাত চলে। একসঙ্গে তিনখানা রুটি বেলতে পারেন। আবার, হাত না লাগিয়েই, শুধু বেলন ঘোরাবার কৌশলেই, রুটি চাকির ওপর ঘোরাতে পারেন। এভাবেই রুটি-বেলা চলছে।

নলিনীদিদি হঠাৎই বলে উঠলেন, "পিসিমা! তোমার চেয়ে রামময়ের রুটি ভাল ফুলছে।"

ছোটো মেয়েটির মতো অভিমান করে চাকি-বেলন ঠেলে সরিয়ে দিলেন মা। বললেন, "তবে আমি বেলব না। ও-ই বেলুক। আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলুম। আর ও দুধের ছেলে। গলা টিপলে দুধ বেরোয়। ও আমার চেয়ে ভাল বেলেছে!"

মায়ের এই মিষ্টি অভিমানকে মর্যাদা দিলেন বুদ্ধিমান ছোট্টো রামময়। তিনিও বেলন-চাকি সরিয়ে দিয়ে বললেন, "মা! আপনি না বেললে, আমিও বেলব না।"

নলিনীদিদিকে রামময় বললেন, "আপনি কী করে বুঝছেন—কোনটা আমার, আর কোনটা মার?"

'ছোটো মেয়ে'-র অভিমান ভাঙল। আবার রুটি বেলতে বসলেন মা।[১৬]

মা তখন উদ্বোধনে। নিবেদিতা আব কৃস্টিন এসেছেন। নিবেদিতা দু-চারটে বাংলা শব্দ শিখেছেন। সেই বাংলা-জ্ঞানকেই কাজে লাগিয়ে, নিবেদিতা মাকে বললেন, "মাতৃদেবি! আপনি হন আমাদিগের কালী।" কৃস্টিনও একই কথা বললেন ইংরেজিতে।

মা তাঁব এই দুই বিদেশিনী-তনয়ার কথা শুনে খুব হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "না বাপু, আমি কালী-টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তা হলে।"

মায়ের কথাগুলোকে ইংরেজিতে তর্জমা করে নিবেদিতা এবং কৃস্টিনকে বুঝিয়ে দিলেন কেউ।

নিবেদিতা এবং কৃস্টিন ইংরেজিতে বললেন, "মাকে অত কষ্ট করতে হবে না। আমরাই তাঁকে জননীরূপে দেখব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব।"

মাকে নিবেদিতাদের কথা বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়া হল। মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা না হয় দেখা যাবে।'[১৭]

মায়ের জ্বর হয়েছে। মা তখন জয়রামবাটীতে। মাকে সাবু দেওয়া হয়েছে। সাবু খেতে খেতেই রঙ্গময়ী তাঁর ভক্তসন্তানদের বলছেন, "কি গো, আজ যে প্রসাদে ভক্তি নেই?"[১৮]

মা প্রসন্নমামার ঘরের ভেতরে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। প্রকাশ মহারাজ পদ্মফুল দিয়ে মার চরণ-বন্দনা করলেন। বললেন, "মা! আমাকে আর ঘুরোবেন না।"

মা মজা করে বললেন, "আমাকে ছেড়ে এতদিন ঘুরতে পারলে, আমি একটু ঘুরোব না?"[১৯]

মা নিজে রঙ্গরস পছন্দ করতেন। উপভোগও করতেন। কখনও সে রঙ্গরসের সৃষ্টিকারিণী তিনি স্বয়ং। কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ। কখনও বা অন্য কেউ। কিন্তু কারও সরলতা বা বোকামির

সুযোগ নিয়ে, কাউকে উপহাস করা তিনি সমর্থন করতেন না। এরকম ক্ষেত্রে, মা উপহাসের পাত্রটির পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর সহানুভূতির পাত্র উজাড় করে দিতেন।

মা তখন জয়রামবাটীতে। এ-ই তাঁর শেষবারের জন্য জয়রামবাটীতে থাকা।

বড়োদিনের ছুটি চলছে। রাঁচির কয়েকজন ভক্ত মার জন্যে প্রচুর ফল নিয়ে এসেছেন।

মায়ের এক দূর সম্পর্কের বোন তখন মায়ের কাছেই আছেন। তাঁর নাম ভাবিনী দেবী। ভাবিনী দেবী বিধবা। মায়ের বাড়িতে সকলেই তাঁকে 'ভাবিনী মাসি' বলেই ডাকেন।

ভাবিনী মাসির মা বৃদ্ধা এবং অসুস্থা। মা সেই বৃদ্ধার জন্য দুটি বেদানা, রাঁচির ভক্তদের আসার আগেই দিয়েছিলেন ভাবিনী মাসির হাতে। এরপরেই রাঁচির ভক্তরা এলেন। তাঁদের আনা ফল দেখে, ভাবিনী মাসির আরও ফল পাওয়ার ইচ্ছে হল।

মাসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন, "আহা! পরমহংসদেবের সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। বাবা তখন (পরমহংসদেবকে) পাগল ভেবে, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন না। সেই বিয়ে হলে, এসব জিনিস আমারই ঘরে আসত।"

ভাবিনী মাসির কথা শুনে, উপস্থিত সকলেই হাসতে লাগলেন। মাও যে একটু হাসলেন না তা নয়। কিন্তু সে হাসি বিদ্রূপের নয়। সহানুভূতির। সৌহার্দ্যের।

মা মাসিকে বললেন, "তা নে না—তোর আর কী কী চাই।" মা তাঁর সেবক হরিকে আদেশ করলেন, "ও হরি! ঠাকুরের জন্য তুলে রেখে পেঁপে, বেদানা, আরও কিছু ফল ভাবিনীকে দাও তো!"

পরে মাসিকে মা খুবই সহানুভূতির সুরেই বললেন, "পেঁপে যেন তোর মাকে খাওয়াসনে। বড় ঠাণ্ডা।"[২০]

শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা, ধাতু ইত্যাদি ছুঁতে পারতেন না। কেউ টাকা বা গয়না দিলে, মা তৎক্ষণাৎ তা মাথায় ঠেকাতেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে কেউ বৈকুণ্ঠের নারায়ণের সেই টাকা বা ধাতু ছুঁতে না পারার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মা বললেন, "ঠাকুর আর আমি! আমি যে, বাবা, মেয়েমানুষ! ঠাকুর যে আমায় সোনার গয়নাও পরিয়েছেন!" লক্ষ্মীর প্রতীক টাকা বা সোনাকে লক্ষ্মী স্বয়ং উপেক্ষা করেন কী করে?[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন মায়ের নহবতে। দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের জগদ্বিখ্যাত ঘর থেকে কতটুকুই বা। গৌরী-মাও আছেন সেখানে। রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ রঙ্গচ্ছলে রঙ্গময়ীর প্রকৃত পরিচয় জানাবেন জগতকে। হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন। তাই যেন একটি নাটকের আশ্রয় নিলেন। গৌরী-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল তো গৌরদাসী, তুই কাকে বেশি ভালবাসিস?"

রঙ্গময়ের রঙ্গের তরঙ্গ-বিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গত করতে গৌরী-মাও কম যান না। তাই মধুর গলায় গান ধরলেন—

"রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী!
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে, বাঁশিতে বলো, 'রাই-কিশোরী'।"

লজ্জায়-রাঙা-হয়ে-যাওয়া মা গৌরী-মার হাত চেপে ধরলেন। স্বেচ্ছায় হার মেনে, হাসতে হাসতে চলে গেলেন রসরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ।[২২]

মা তখন দক্ষিণেশ্বরে। কালীপদ ঘোষের ('দানা কালী'-র) স্ত্রী এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর স্বামী কালীপদ কুসঙ্গে পড়ে সংসারের পরিবেশ বিষময় করে তুলেছেন। তাই তিনি এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি কোনও ওষুধ দেন—এই প্রার্থনা তাঁর।

শ্রীরামকৃষ্ণকে 'ভগবান' বা 'অবতার' বলে বোধ নেই সেই সরলপ্রাণার। ভেবেছেন, এই সাধুর অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে। কিছু জড়ি-বুটি দিলেই স্বামীর মতি ফিরবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কলকাতার মানুষ তখনও খুব পরিষ্কারভাবে তেমন কিছু জানেন না। ঘোষ-জায়ার না জানাটাও তাই খুবই স্বাভাবিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু মজা করার জন্য, অথবা কালীপদর স্ত্রীর ব্যাকুল প্রার্থনায় দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে অথবা, কোনও অজ্ঞাত দৈবপ্রেরণায় চালিত হয়ে, সেই অসহায় ভদ্রমহিলাকে নহবতে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সেখানে এক স্ত্রীলোক আছেন। তাঁকে তুমি সব খুলে বললে, তিনি ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন। তাঁর এসব মন্ত্রৌষধি জানা আছে। এ-বিষয়ে তাঁর শক্তি আমার চেয়ে বেশি।"

ঘোষ-জায়া এলেন 'ভগবান-জায়া'-র কাছে। মা তখন পুজোয় বসেছেন। ঘোষ-জায়ার কথা সব শুনলেন। বুঝতে পারলেন, ঠাকুর রঙ্গ করছেন।

মা বললেন, "আমি আর কী জানি বাছা, তিনিই ওষুধ জানেন। তুমি তাঁরই কাছে যাও।"

(এ যেন অনেকটা শূর্পণখাকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের ঠেলাঠেলি। শূর্পণখা রামকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। রাম পাঠালেন লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণ পাঠালেন রামের কাছে।)

অসহায় ঘোষ-জাযা ফিরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন, রঙ্গ জমেছে। তিনি ঘোষ-জায়াকে আবার পাঠালেন নহবতে। এভাবে বার তিনেক ঘোষ-জায়া এ দিক—ও-দিক করলেন।

করুণাময়ীর প্রাণ ব্যথায় অধীর হয়ে উঠল। এই রঙ্গরসের খেলা আর চালাতে চাইলেন না। খেলা ভেঙে দিলেন তিনি। মা ঘোষ-জায়ার হাতে পুজোর একটি বেলপাতা তুলে দিলেন। বললেন, "বাছা! এইটি নিয়ে যাও। এতেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।"

মায়ের কাছ থেকে এমন মহা আশ্বাস পেয়ে, মায়ের দেওয়া বেলপাতা মাথায় তুলে নিলেন ঘোষ-জায়া। 'ভগবতীবাক্য' কখনই বিফল হওয়ার নয়। দানা-কালী আমূল বদলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুচরবৃন্দের একজন হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃহৃদয়কে মাতৃস্নেহে জারিত করে জগতের সেবায় উৎসর্গ করলেন।[২৩]

মা তখন কাশীতে। রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) রোজ সকালে বেড়াতে বেড়াতে 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ (এখানেই মা ছিলেন) যেতেন। গোলাপ-মায়ের কাছ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের খোঁজখবর নিতেন। সেইসঙ্গে একেবারে শিশুর মতো রঙ্গও করতেন।

এমনই একদিন। রাজা মহারাজ এসেছেন লক্ষ্মীনিবাসে। মাস্টারমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ওপরের বারান্দা থেকে গোলাপ-মা বললেন, "রাখাল! মা জিজ্ঞেস করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?"

রাজা মহারাজ বললেন, "মা-র কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর

না খুললে যে, আর উপায় নেই।" এই বলেই রাজা মহারাজ, বাউলের সুরে গান ধরলেন—

"শঙ্করী চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
মগ্ন হয়ে রওরে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে।·
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াও রে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে॥
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামা মায়ের গুণ গাও রে।
এ তো সুখের নদী নিরবধি, ধীরে ধীরে বাও রে॥"

গাইতে গাইতে রাজা মহারাজ ভাবোন্মত্ত। নৃত্য করছেন। গান শেষ হল। 'হো. হো, হো' করে সবেগে চলে গেলেন। রঙ্গময়ী মা ওপর থেকে সবই দেখলেন। আনন্দে ভেসে গেলেন সদানন্দময়ী। নিচে সেই আনন্দসুধা তখনও পান করে চলেছেন কথামৃতকার 'শ্রীম' এবং অন্য দু-একজন।[২৪]

রঙ্গময়ীকে চিনেছিলেন যাঁরা, তাঁদেরই একজন, দেশড়ার হরিদাস বৈরাগী। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে মা তখন জয়রামবাটীতে। একদিন হরিদাস এলেন। বেহালা বাজিয়ে শিব-দুর্গার গান গাইলেন। কিন্তু, এ কোন শিব-দুর্গা? এ যেন 'কামারপুকুরের শিব' আর 'জয়রামবাটীর দুর্গা'র কথাই বলা হয়েছে গানের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে!

হরিদাস গাইলেন—

"কী আনন্দের কথা উমে (গো মা)!
(ওমা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টির ভিখারি।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী—
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে?
'খ্যাপা খ্যাপা আবার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে;
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,
দরশন পায় না ইন্দ্র-চন্দ্র-যমে।" ইত্যাদি।

গান শুনে সকলেই মুগ্ধ! এ যে মায়েরই জীবনের ছবি! ভেতর থেকে যোগীন-মা এবং গোলাপ-মার অনুরোধ এল—আবার গানটি গাওয়া হোক। হরিদাস আবার গাইলেন। গান শেষ হলে, হরিদাস পয়সা আর 'সিধে' নিয়ে চলে গেলেন।

দিদিমা (শ্রীশ্রীমায়ের মা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী) বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ গো, তখন সকলেই জামাইকে খ্যাপা বলত। সারদার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। আমায় কত কথা শোনাত। মনের দুঃখে মরে যেতুম। আর আজ দেখো, কত বড় ঘরের ছেলে-মেয়েরা দেবী-জ্ঞানে সারদার পা-পূজা করছে।"[২৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের 'গিরিশ' এসেছেন জয়রামবাটীতে। মাতৃদর্শনে। সদ্য পুত্রশোক পেয়েছেন

গিরিশ। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর (গিরিশের) প্রার্থনা মতো, তাঁর (গিরিশের) ছেলে হয়ে জন্মেছেন। সেই ছেলেকে হারিয়ে, শোকে উন্মাদ গিরিশ। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের পরামর্শে, পুত্রশোক ভুলতে, গিরিশ এসেছেন মায়ের কাছে।

স্নান করে, ভিজে কাপড়েই গিরিশ চলেছেন। মাকে প্রণাম করবেন। মাকে দর্শন করবেন—সেই আনন্দে এবং উত্তেজনায় সারা শরীর কাঁপছে তাঁর।

মায়ের চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে মুখ তুলতেই চমকে উঠলেন। মনে মনে বললেন, 'অ্যাঁ! মা! তুমি!'

এই বিস্ময়ের সঙ্গত কারণ ছিল। গিরিশ তখন যুবক। 'বিসূচিকা' (কলেরা) রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। বাঁচার কোনও আশাই নেই।

একদিন স্বপ্ন দেখলেন, এক মাতৃমূর্তি, মহাপ্রসাদ এনে তাঁর (গিরিশের) মুখে দিয়ে বলছেন, 'খাও।' সেই মাতৃমূর্তির পরণে লাল কস্তা-পেড়ে শাড়ি। দেহে অপার্থিব জ্যোতি! সারা মুখমণ্ডল থেকে মাতৃস্নেহ আর অপার করুণার ধারা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

সেই মাতৃমূর্তির দেওয়া প্রসাদেরই বা কী স্বাদ! প্রসাদ খেতে খেতেই গিরিশের স্বপ্ন ভেঙে গেল। স্বপ্ন নেই। কিন্তু সত্য আছে। সেই দেবীমূর্তি গিরিশের চোখের সামনে তখনও ভাসছে। মুখে সেই প্রসাদামৃতের স্বাদ। গিরিশ সুস্থ হয়ে গেলেন।

গিরিশ আগে কখনও মাকে দেখেননি। মাকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনিই সেই দেবী—যিনি সেদিন তাঁর (গিরিশের) জীবনরক্ষা করেছেন। আরও বুঝতে পারলেন—এই দেবীই সদাসর্বদা তাঁকে (গিরিশকে) রক্ষা করে চলেছেন।

মাকে আর কিছু বললেন না। বলতে সাহস পেলেন না। একজনকে দিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন—মা-ই কি সেদিনের সেই দেবী?'

মা স্বীকার করলেন। জানালেন, গিরিশের ধারনাই ঠিক। তবু গিরিশ অন্য একদিন মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী রকম মা?'

মা, কোনও দ্বিধা না করে, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়। পাতানো মা নয়। কথার কথা মা নয়। সত্য-জননী।'[২৬]

শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা। ৩১ আষাঢ়, ১২৯২। ১৪ জুলাই, ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে আছেন। রথের সামনে কীর্তন করেছেন। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে নেচেছেন। এবার এসে বসেছেন ঘরে। মাস্টারমশাই এবং অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের পদসেবা করছেন।

নরেন গান গাইছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "দূর! এখন ওসব গান কী? এখন আনন্দের গান—'শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী'।" নরেন তাই গান ধরলেন—

"কখন কী রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী...॥"

নরেন ভাবোন্মত্ত হয়ে বার বার গাইতে লাগলেন—

"কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।"

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে নাচতে লাগলেন। আর মুখে গান—'ও মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।'[২৭]

সেই পূর্ণব্রহ্মসনাতনীর আশ্চর্য-অবগুণ্ঠনের আড়ালে কত রঙ্গের রূপ লুকানো আছে, আমরা জানি না। আমরা শুধু ভগবান ব্রহ্মার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, পরমেশ্বরীর স্তব করে বলতে পারি—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া ॥"

অর্থাৎ কিনা—

হে বিশ্বরূপিণী! যে-কোনও স্থানে যা-কিছু চেতন বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হবে—সেই সবকিছুর যা শক্তি, তা আপনিই। সুতরাং কীভাবে আপনার স্তব করব?[২৮]

সেই বিশ্বার্তিহারিণীর চরণে একবার অভিমানী কণ্ঠে প্রশ্ন করব—'মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল?' আবার পরক্ষণেই প্রার্থনা জানিয়ে বলব—'লোকানাং ববদা ভব'। সকলের প্রতি বরদা হও মা। সকলকে শুভবুদ্ধি দাও মা! তোমার ওই শ্রীপাদপদ্মদুটিতে শুদ্ধা ভক্তি দাও মা! শরণাগত করো মা! •

জয়রামবাটী ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে মায়ের প্রভাব

মিতা মজুমদার

জয়রামবাটীর একজন একদিন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমাকে দেখতে কত লোক কত দূর দেশ থেকে আসছে; অথচ আমরা তোমাকে বুঝতে পারছি না কেন?" মা উত্তর দিয়েছিলেন, "তা নাই বা বুঝলে, তোমরা আমার সখা, তোমরা আমার সখী।" গ্রামের চৌকিদার অম্বিকা বাগদি বলতো, "লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কি বলে; আমরা তো কিছুই বুঝতে পারি না।" শ্রীশ্রীমা বলতেন, "তোমার বুঝে দরকার কি? তুমি আমার অম্বিকা দাদা, আমি তোমার সারদা বোন।"[১]

ঈশ্বরী তাঁর ঐশ্বর্য গোপন করে মাটির পৃথিবীতে এসে প্রাকৃতজনের মতো ব্যবহার করলেও মাধুর্যটি লুকোন না বা লুকোতে পারেন না। মহাশক্তির বাইরের দিক, তাঁর বিস্তারের দিকটি হল ঐশ্বর্য, আর তাঁর কেন্দ্রবিন্দুটি হল মাধুর্য। এই মাধুর্যই 'মা'—যা আমাদের চিত্তকে দ্রবীভূত করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে অজ পাড়াগাঁ জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘরে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী আর পাঁচটি সাধারণ গ্রাম্যবালার রূপ ধারণ করেই এসেছিলেন, তাদের মতোই ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মানুষ অসাধারণত্ব দেখেছিল তাঁর চরিত্রে, তাঁর জীবনযাপনে। সেই অমল দৈবী চরিত্রমাধুর্যে তিনি যেন শতদল পদ্মের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন। আর সেই কমলগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভক্তভ্রমর দূর-দূরান্তর থেকে ছুটে এসেছিল।

কলকাতা থেকে প্রায় ষাট মাইল পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে আসা তখনকার দিনে মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। গোমো প্যাসেঞ্জারে বিষ্ণুপুর এসে, সেখান থেকে সারা রাত গরুর গাড়ি চড়ে সকালে কোয়ালপাড়া, তারপর পায়ে হেঁটে জয়রামবাটী। তারকেশ্বর ও চাঁপাডাঙা থেকে গরুর গাড়িতে, পালকিতে বা পায়ে হেঁটেও জয়রামবাটী আসা যেত; তবে এই পথে আসতে তিন-চারদিন সময় লাগত। পথ খুব দুর্গম ও ভয়সংকুল ছিল। দলবদ্ধ হয়ে না গেলে অনেক সময় দস্যুদের হাতে সর্বস্বান্ত হতে হত, এমনকি প্রাণহানির আশঙ্কাও ছিল। আবার কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটী আসাও খুব সহজ ছিল না। কাঁটাজঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু রাস্তা, মাঝে মাঝে সাপ দেখা যেত। বর্ষাকালে বন্যার জন্য এবং শীতকালে চাষের জন্য নদীতে বাঁধ দেওয়ার দরুন আমোদর নদী পেরোতে হত ডোঙায়। কখনও কখনও নদীতে কুমিরও চোখে পড়ত। তাই পথশ্রমে ক্লান্ত যোগেন-মা জয়রামবাটীতে স্বামী সারদানন্দকে একদিন বলছেন, "বাপু! এখানে আসা লোকের পক্ষে গয়া কাশী যাওয়া অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার!!" মহারাজ গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, এ কি

গয়া কাশীর চেয়ে ছোটো তীর্থ?[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ জয়রামবাটীর মাহাত্ম্য বুঝলেও গ্রামের সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। তারা দেখত নানা জায়গা থেকে বহু মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসছে আর সামনে যাকে দেখছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে—মায়ের বাড়ি আর কতদূর—তখন তারা অবাক হয়ে যেত। দর্শনার্থীরা অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত—এও তাদের নজর এড়াত না। এইভাবেই ধীরে ধীরে হয়তো তারা তাদের গ্রামের মেয়েটির দিকে বিস্ময়ের চোখে ফিরে চাইল। দু-চারজন শিক্ষিত মানুষ ছাড়া গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই তখন চাষবাস করে। উচ্চ সংস্কার, তীক্ষ্ণ মননশীলতা, সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা তাদের মোটেই ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তত্ত্ব না বুঝলেও জীবনে তত্ত্বের প্রতিফলন কিছুটা বোঝে। কোনও মানুষের মধ্যে সততা, নম্রতা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ইত্যাদি দেখলে তারাও তাকে ভালোবাসে। মা এদের জানতেন, চিনতেন। তাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে, তাদের ভিতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে অপার ভালোবাসার জাদুস্পর্শে মা জাগালেন। সেই ভালোবাসা শুধু জয়রামবাটীকে নয়, তার আশেপাশে কোয়ালপাড়া, কামারপুকুর, কোতলপুর, আনুড়, শিরোমণিপুর, শিহড়, দেশড়া, কয়াপাট, বদনগঞ্জ, নবাসন ইত্যাদি গ্রামকেও স্পর্শ করল। মার কৃপায় তাদের জীবনে অভ্যুদয় শুরু হল; রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ অল্পবিস্তর লাগল। এত বড়ো একটা বিপ্লব মা কিন্তু ঘটালেন নিঃশব্দে। উপদেশ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, বক্তৃতা, বই লেখা, সভা-সমিতি কিছুই করেননি তিনি। শুধু একটি দিব্য, আদর্শ, অচিন্তনীয় জীবনযাপন করে বুঝিয়ে দিলেন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কী, ধর্ম কী। ধর্ম মানে আচার-সর্বস্বতা নয়, জাতিবিচার নয়, ধর্মমত নয়, আত্মম্ভরিতা নয়, ধর্ম মানে সত্যনিষ্ঠা, অদোষদর্শিতা, ঈশ্বরনির্ভরতা, করুণা, ক্ষমা, প্রেম, পবিত্রতা, উদারতা, সকলের প্রতি প্রত্যাশাহীন অপার ভালোবাসা। আধ্যাত্মিকতা যে জীবনের মূল সুর, মা তা বুঝিয়ে দিলেন। দিব্যজ্যোতিতে ভাস্বর এই অনন্য জীবনের আলোয় জয়রামবাটী ও সংলগ্ন গ্রামগুলির মানুষ তো বটেই, অন্যান্য জায়গার মানুষও জীবনে নতুন পথে চলা শুরু করল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার বুকে এক গণ জাগরণ শুরু হয়, যা স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত। পরাধীন দেশের মানুষ স্বাধীন হওয়ার জন্য তখন মরণপণ সংগ্রামে মেতেছেন। সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে গ্রামবাংলার বুকেও, লেগেছে কোয়ালপাড়ার কেদার, কিশোর, রাজেন নামে তিনটি ছেলের মনেও। বয়োজ্যেষ্ঠ কেদারবাবু কোতলপুরের একটি বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং কোয়ালপাড়ায় কয়েকটি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতেন। মানুষটির মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রবণতা ছিল। নিজে জপধ্যান করতেন, শুদ্ধ সংস্কারবান গ্রামের কিছু ছেলেদেরও ওই পথে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। কিন্তু বাড়িতে থেকে ওপথে চলা সহজ নয়, তাই তাঁরা ঠিক করেন বাড়ি ছেড়ে আলাদা কোথাও থাকবেন এবং স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করবেন। এই উদ্দেশ্যে কেদারবাবুর স্কুলের একটি ঘরে আশ্রমের জন্ম হল। ওখানে থেকে তাঁরা গীতা, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, কথামৃত ও স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়তেন। কেদারবাবুর সঙ্গে প্রথমে কিশোর এবং

রাজেন থাকতেন। পরে রাধামাধবপুর থেকে অমূল্য ও কোয়ালপাড়ার দিবাকরও যোগ দিলেন। কিছুদিন পর মতি এবং বিনোদ নামে দুজন তরুণও সেখানে থাকতে শুরু করলেন। কিন্তু দেশ তখন পরাধীন। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সাধনের অনুকূল নয়। দেশের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন এই কয়েকটি তরুণ। তাঁদের মনে হল ভারত স্বাধীন না হলে দেশে শান্তি আসবে না, অধ্যাত্মসাধন তো দূরের কথা। এই ভেবে পড়াশোনা ছেড়ে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁরা দেশসেবা শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে 'পরমহংসদেবের সহধর্মিণী' পাশের গ্রামেই থাকেন শুনে তাঁরা ক্রমে ক্রমে মাকে দর্শন করতে এলেন। মা তাঁদের ভালোবেসে আপনার করে নিলেন। কী এক অজ্ঞাত দুর্নিবার প্রাণের টানে তাঁরা তখন থেকে ঘন ঘন মায়ের কাছে আসতে লাগলেন। মা একদিন তাঁদের আশ্রমের জন্য একটি ফল কাটার বঁটি ও সদ্যপ্রকাশিত স্বামীজীর 'দেববাণী' বইটি কিশোরকে দিলেন। ইতিমধ্যে কিশোরের আগ্রহে আশ্রমে ঠাকুর ও মায়ের পুজো শুরু হয়েছে। কিছুদিন পরে মা কৃপা করে রাজেন, কিশোর, কেদার এবং আরও দু-তিনজনকে মন্ত্রদীক্ষাও দিলেন। ওদিকে তখন দেশ জুড়ে বিদেশি জিনিস বয়কট করা, দেশীয় শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কোয়ালপাড়াব সংগ্রামীরাও বিলিতি জিনিস পোড়ানো ইত্যাদি নানারকম কাজে মেতে উঠলেন। স্বদেশি আন্দোলনের তাপে তখন কোয়ালপাড়া আশ্রম সরগরম। আশ্রমের ওপর স্বভাবতই পুলিশের নজর পড়ল। নতুন কেউ সেখানে এলেই পুলিশ তার নামধাম সব লিখে নিয়ে যেত। মা এসব নীরবে লক্ষ্য করছিলেন। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ লিখছেন, একদিন মা তাঁদের বললেন, "বাবা, তোমরা এরকম ক'রে বেড়িও না, দেখ না ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেল। তাঁত কর, চরকা কর, আগে তো তাঁতের কাপড়ই সবাই প'রত; চরকা পেলে আমিও সুতো কাটি।"[৩] এইভাবেই মা তাঁদের খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁরাও মায়ের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁতে একখানা কাপড় বুনে মাকে পরতে দিলেন। বোনা ভাল না হলেও মা শাড়িটি পরে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। বুঝিয়ে দিলেন 'স্বদেশি' কবা মানে নেতিবাচক কাজ করে বেড়ানো নয়, গঠনমূলক কাজ করে দেশবাসীর কল্যাণ করা।

১৯০৯ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত জয়রামবাটী-কলকাতা যাতায়াতের পথে মা কোয়ালপাড়ায় কিছু সময় বিশ্রাম নিতেন কারণ ওখানে মাকে পালকি থেকে গরুর গাড়ি অথবা গরুর গাড়ি থেকে পালকিতে উঠতে হত। এইভাবে ধীরে ধীরে কোয়ালপাড়া মায়ের 'বৈঠকখানা' হয়ে ওঠে। গ্রামের কয়েকটি যুবক ও বালককে অসীম স্নেহ, অপাধ ভালোবাসা দিয়ে মা এইসময় চিরকালের মতো আপনার করে নিয়েছিলেন। মায়ের সেবা করার সুযোগ পেয়ে এঁদের জীবনও ধন্য হয়ে গিয়েছিল। পরে এঁদের দিয়ে মা কোয়ালপাড়ায় একটি আলাদা বাড়ি তৈরি করিয়ে সেখানে বেশ কিছুকাল বাস করেছিলেন। সেই আশ্রমের নাম হয়েছিল 'জগদম্বা আশ্রম'।

পূর্বোল্লিখিত কয়েকজন ভক্ত ছাড়াও বরদা ও গগন নামে দুটি ছেলে এইসময় আশ্রমের স্কুলে পড়তেন। এঁবাও মার কাছে মন্ত্রদীক্ষা পান এবং মায়ের সেবা করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হন। ১৩১৮ সালে মা কলকাতা রওনা হবেন। পথে কোয়ালপাড়ায় কখন আসবেন, কী ব্যবস্থা করতে হবে এইসব বিষয়ে কথা বলার জন্য কেদারবাবু বরদাকে নিয়ে মার কাছে যান। কথাবার্তা শেষ হলে মা বলেন, "দেখ বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও

আমাদের পথের বিশ্রামের স্থান একটু করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। সব আয়োজন ক'রে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে। শুধু স্বদেশী ক'রে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ। যা কিছু করো না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে, কোন বেচাল হবে না।"

বস্তুত কেদারবাবুকে উপলক্ষ করে মা বোঝাতে চাইলেন, রাজনৈতিক আন্দোলন, দেশসেবা সবকিছুর মূল সুরটি হবে আধ্যাত্মিক। ঈশ্বরকে ভালোবেসে তাঁর কাজ করছি, এই ভাব নিয়ে কাজ করতে পারলে তবেই নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব। নইলে পরে দলাদলি, নামের মোহ, সংকীর্ণতা এইসব গোলযোগে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। মা আরও বোঝালেন, নিজের দেশকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বকে ভালোবাসতে হবে, তবেই মানুষের হৃদয়ের বিস্তার হবে। আর এই হল ভারতের আদর্শ।

১৩১৮ সালের ৭ অগ্রান মা স্বয়ং কোয়ালপাড়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সশক্তিক ভগবানের পূজাই বিধি। তাই কোয়ালপাড়ার স্বাধীনতাপ্রেমী ছেলেরা ঠাকুর ও মায়ের দুটি ফটো পূজার জন্য রেখেছিলেন। মা ঠাকুরঘরে ছোটো সিংহাসনে নিজের হাতে দুটি ছবি পাশাপাশি বসিয়ে ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করলেন, সংক্ষিপ্ত হোমও হল। এইভাবে ধীরে ধীরে কোয়ালপাড়া ও তৎসন্নিহিত গ্রামীণ যুবকদের জীবনপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হল; করুণাময়ী মা তাঁদের দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও কালক্রমে সন্ন্যাস দিয়ে ভূমার পথে পরিচালিত করেন।

বাংলায় সহিংস আন্দোলন তখন পুরোদমে চলছে। মেয়েরাও সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কোয়ালপাড়া এবং অন্যান্য স্থান থেকে সন্তানরা মার কাছে নিয়মিত আসেন। সম্ভবত এইসব নানা কারণেই মায়ের বাড়ির ওপর পুলিশের নজর পড়েছিল। পুলিশের কাছে মায়ের বাড়ি 'মাতাজীর আশ্রম' নামে পরিচিত ছিল।

মায়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাব এইসব পুলিশের ওপরেও অল্পবিস্তর পড়ে। নিম্নলিখিত দুটি ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করে। 'মাতাজীর আশ্রম' সম্বন্ধে পুলিশের ধারণা যাতে একটু পালটায় সেই উদ্দেশ্যে মায়ের ভক্ত বাঁকুড়ার বিভূতিবাবু সেখানকার ডি.এস.পি-কে একবার জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে যাওয়ার আগে তিনি হাসিমুখে মাকে পুলিশের নজরদারি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইসবে ভয় করে না তো?" বিভূতিবাবু সম্ভবত পরিস্থিতি সামাল দিতেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "ভয় করবেন কেন? কিসের ভয়?" সরলতার প্রতিমূর্তি মা কিন্তু মধুরস্বরে ছোট্টো একটি মেয়ের মতো বলে উঠলেন, "হ্যাঁ বাবা! আমার ভয় করে!" মায়ের কথার সুরে কঠোর প্রকৃতির মানুষটির হৃদয়ও যেন গলে গেল। কোমলকণ্ঠে মাকে খুব সাহস দিয়ে তিনি বললেন, "কোন ভয় নাই, মা, আমি সব ঠিক ক'রে দিয়ে যাব।"[৫] মায়ের কাছে খাওয়া-দাওয়া করে, মায়ের ভালোবাসায় তৃপ্ত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে প্রসন্নমনে পালকিতে উঠলেন ডি.এস.পি সাহেব।

মা দেশকে খুব ভালোবাসতেন। জয়রামবাটীর মাটিকে একবার প্রণাম করে বলেছিলেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'[৬] ইংরেজদের তাঁর সন্তান বলে স্বীকার করলেও, তাদের অপশাসনকে, তাদের অত্যাচারকে মা কখনও ভালো চোখে দেখেননি। দেশের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব ইত্যাদি সঙ্কটে কান্নায় ভেঙে পড়তেন, ঠাকুরের কাছে দেশের মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য আকুল প্রার্থনা করতেন। কোয়ালপাড়ায় থাকাকালীন বদনগঞ্জ

হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ভক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মায়ের কথা হচ্ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা, রেলপথ প্রভৃতির কথা বলতে গিয়ে মা বললেন, "এই দেখ না, রাসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে আজ এখানে পৌঁছে গেল। আমরা তখন কত হেঁটে, কত কষ্ট করে তবে দক্ষিণেশ্বরে গেছি।" মায়ের কথা শুনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রবোধবাবু বললেন, "ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি করেছেন।" মা সেকথা মানলেন না। প্রতিবাদ করে বললেন, "কিন্তু, বাবা, ঐসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।"[৭]

আর একদিন পরনের কাপড়ের অভাবে মেয়েরা আত্মহত্যা করছে শুনে এই সর্বংসহা মা-ও বলে উঠেছিলেন, "ওরা (ইংরেজরা) কবে যাবে গো? ওরা কবে যাবে গো?"[৮] ইংরেজ শাসকের এমন অনেক অত্যাচারের ঘটনা মার কানে আসত।

একবার তাঁর এক দীক্ষিত ভক্তকে একদিন পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। ভক্তসন্তানটি সবে ভোরবেলার জপ-ধ্যান ও পূজা শেষ করে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েছেন—মুখে একটু জলও দেননি। এই অত্যাচারের সংবাদে বিচলিত হয়ে মা বলেছিলেন, "দেখ দিকি, ইংরেজের কি অন্যায়! আমার ভাল ছেলে, তাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে, মুখে একটু ঠাকুরের প্রসাদ দিতেও দিলে না! এই ইংরেজের রাজ্য কি থাকবে?"[৯]

সরল সাদাসিধে গ্রামের মেয়ে হলেও মায়ের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল মহাশক্তি। তাঁর প্রসন্ন সান্নিধ্যে এলে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা যেমন জেগে উঠত, তেমনি জাগ্রত হত বিশ্বাত্মক মনোভাব। ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ধর্মের মানুষকে দিব্য মাতৃস্নেহাঞ্চলছায়ায় এনে নিঃশব্দে জাতিভেদ, ছুৎমার্গের শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে তিনি তাদের হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের বীজ ছড়িয়ে দিতেন। কোয়ালপাড়া এবং সন্নিহিত গ্রামের কয়েকজন স্বদেশি ছেলে তাই রূপান্তরিত হয়েছিলেন স্বামী কেশবানন্দ, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী বিদ্যানন্দ এবং আরও বহু গৈরিক-চরিত্রে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মায়ের প্রভাব

কথাপ্রসঙ্গে মায়ের মেজোভাই কালীমামা একবার বলেছিলেন, "দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কি না করেছেন! ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজই তো দিদি করেছেন।"[১০] জয়রামবাটীর মুখোপাধ্যায় পরিবারকে লক্ষ্য করে কথাটি বললেও কালীমামার মন্তব্যটি ব্যাপক অর্থেও সত্য। জয়রামবাটী এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলিও মায়ের আবির্ভাবের ফলে আজ শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক, আজকের জয়রামবাটী আর মায়ের সময়কার জয়রামবাটীর আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখন ওখানে দোকানপাটের নামগন্ধই ছিল না বলা যায়। কিছু কিনতে হলে ছুটতে হত হয় কোতলপুরের হাটে, নয়তো কয়াপাট-বদনগঞ্জ বা কামারপুকুরের হাটে। জয়রামবাটীর এক মাইল পশ্চিমে শিহড়ের হাটতলায় তখন কয়েকটা ছোটো দোকান এবং তারও মাইল দেড়েক দূরে পুকুরে-গ্রামে মাত্র একটা মুদির দোকান ছিল। কিন্তু আজ শুধু জয়রামবাটীই নয়, দূরের ওই গ্রামগুলি দেখলেও বোঝা যায় গ্রামের

মানুষের অবস্থা আগের তুলনায় অনেক স্বচ্ছল হয়েছে। তাদের চেহারাই পালটে গেছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সার্বিক উন্নতির সঙ্গে গ্রামগুলির আর্থিক পটপরিবর্তনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কিন্তু শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীকে কেন্দ্র করেই সেই অর্থনৈতিক উন্নতি যে বেশ কিছুটা ত্বরান্বিত হয়েছে, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। মায়ের আবির্ভাবেই এই উন্নতির সূচনা।

বাঁকুড়া জেলাটি দরিদ্র এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষকবলিত হলেও তার দক্ষিণ-পূর্বদিকে জয়রামবাটী অন্য আর পাঁচটা গ্রামের তুলনায় সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের উত্তর সীমায় প্রবাহিত আমোদর নদ যা কখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় না। জয়রামবাটীর মাটিও বেশ উর্বর, সেখানে ধান এবং নানারকম শস্য ফলে। তবে শোনা যায়, মায়ের জন্মের আগে গ্রামে তত প্রাচুর্য ছিল না।

মা সর্বদাই গ্রামের মানুষের ভালোমন্দের খবর রাখতেন। একবার বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সেখানে সেবা করছেন। সেখান থেকে এসে এক সন্ন্যাসী মাকে মানুষের কষ্টের কথা বলছিলেন। মা সব শুনে চারদিকে হাত ঘুরিয়ে বললেন, "দেখ, বাবা, মা সিংহবাহিনীর কৃপায় এইটুকুর মধ্যে (জয়রামবাটী গ্রামে) ওসব কিছু নেই।" সাধুটি বললেন, "মা সিংহবাহিনী তো বুঝি না; আপনি আছেন বলেই এখানে কিছু নেই।"[১১] একথা শুনে মা চুপ করে রইলেন।

এক বছর অনাবৃষ্টি হওয়ায় জয়রামবাটী প্রভৃতি গ্রামের সব ফসল জ্বলে যেতে শুরু করল। উপায়ান্তর না দেখে চাষীরা মাকে এসে ধরল। বলল, "এবার, মা, আমাদের ছেলেপিলের বাঁচবার আশা নেই—সকলকে না খেয়ে মরতে হবে।" চাষীদের দুঃখে মায়েব প্রাণ কেঁদে ওঠে। চাষীদের সঙ্গে স্বয়ং ক্ষেত দেখতে চললেন তিনি। অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে চারদিকে তাকিয়ে আকুলভাবে তিনি বলতে লাগলেন, "হায়, ঠাকুর, একি করলে! শেষটায় কি সব না খেয়ে মরবে?"[১২] করুণাময়ীর কৃপায় সেই রাতেই এমন অঝোরধারে বৃষ্টি হল এবং সেবার এত ফসল হল যে বহু বছর তেমন ফসল হয়নি। যুক্তিবাদীরা ঘটনাটিকে কাকতালীয় মনে করতে পারেন। কিন্তু ভক্তের কাছে এটি অকাট্য, বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই কিছুদিন আগেও জয়রামবাটীর এক বৃদ্ধা বলেছেন, "এক বছর জল হয়নি, সিংহবাহিনীকে মা বললেন জল দিতে, ছেলেরা কাঁদবেক, পিসিমা, ধান হলোনি ব'লে। মা পূজা করতে বসতেই গুড়গুড় ক'রে কি জল এসলো, খুব ধান হলো, মা-র খুব সন্তোষ!"[১৩]

এইসব ঘটনা দেখে মায়ের প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধা (সত্যভামা মণ্ডল) তাঁর নাতিকে (গোপালচন্দ্র মণ্ডল) বলেছিলেন, "ওরে, মুখুজ্যেদের সারু যে-সে লয়, পরে দেখবি। ও হলো দেবতা!"[১৪]

অন্য আর একবারের ঘটনা। স্বামী বাসুদেবানন্দ লিখেছেন, "বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের সময় কিছুতেই আর বৃষ্টি হয় না। বাঁকুড়ার কালো বিভূতির (ঘোষ) মারফৎ মাকে বলে পাঠানো হল : "প্রায় দু-বছর (১৯১৫-১৯১৬) বৃষ্টি নেই, সমস্ত দেশ জ্বলে গেল; ভাল ভাল কুয়োর জল সব ফুরিয়ে আসছে। বাঁধগুলোর জলও হু-হু করে কমতে আরম্ভ হয়েছে। রাস্তার দুধারে গাছগুলোয় পাতা নেই; এখন একটু ব্যবস্থা করুন!" মা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন : 'তাই তো, ঠাকুর এ কী করলেন!' তারপর কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন : 'ওদের পদ্মফুল দিয়ে ঠাকুরের পুজো করতে বল, বৃষ্টি হবে'খন।'... তারপর হেসে বললেন: 'মা সিংহবাহিনীর
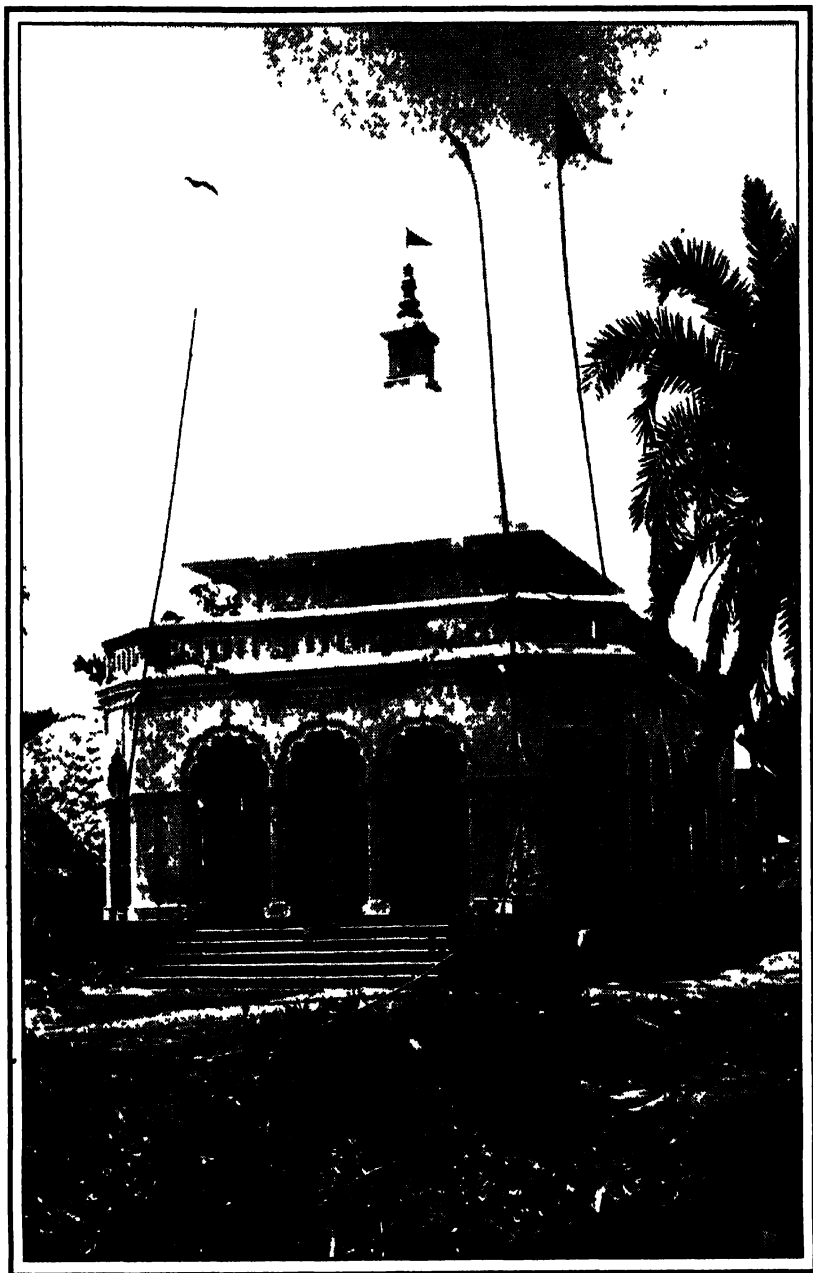
জয়রামবাটীর সদ্যনির্মিত মাতৃমন্দির (নাটমন্দির হওয়ার আগে)

কৃপায় এ-দেশটুকুতে কিন্তু অনাবৃষ্টি নেই।'

"আমরা পুরুলিয়া থেকে প্রায় সহস্রাধিক পদ্ম এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো করলাম। আর সেইসঙ্গে বাণেশ্বর শিব এনে তাঁর মাথায় জল ঢালা হতে লাগল। সকালে বহু লোক একত্রিত হয়ে দারকেশ্বর নদীর ধারে শিবের মাথায় জল দিয়ে আসতে লাগল। দুপুর অতিক্রান্ত হওয়ার কিছু পরেই আকাশে কালো কালো মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হল। তারপর প্রায় বিকেল সাড়ে চারটায় প্রবল বৃষ্টি ক্রমাগত প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা; পরের দিন সকালে দেখা গেল কুয়ো, খাল, নদী, নালা, বিল সব জলপূর্ণ; মাঠে যে বিরাট বিরাট ফাটল ধরেছিল, সেগুলো সব জোড়া লেগে গেছে।

"এই খবর চারপাশে ব্যাপ্ত হল। দূর দূর থেকে, যেখানে বৃষ্টি হয়নি, লোক আসতে লাগল সেখানে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো করবার জন্য। আমরা যথাসাধ্য সাইকেল করে গিয়ে অনেক জায়গায় ঐভাবে পুজো করতে লাগলাম। আর সেইভাবেই বৃষ্টি হতে লাগল। অনেক জায়গায় লোকেরা ঠাকুরের ছবি কিনে নিয়ে গিয়ে বামুন দিয়ে পুজো করালে এবং সেই একই ফল হলো।"[১৫]

বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষকে মা বলেছিলেন, "বিভূতি, আমোদর নদীতে বাঁধ বেঁধে ঐ জল আহেরে (বর্তমানে মায়ের দীঘিতে) এনে দিলে গ্রামের গরীব চাষীরা উপকৃত হবে। প্রায়ই খরাতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তুমি চেষ্টা করে জলেব ব্যবস্থা করে দিলে অনেকে উপকৃত হবে।"[১৬]

গ্রামে তখন পানীয় জলের কোনও ভালো বন্দোবস্ত ছিল না। যে পুকুরে লোকে স্নান করত, সে পুকুরের জলই খেত। সেজন্য মা স্বামী সারদানন্দকে বলে সেখানে একটা পাকা কুয়ো করানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

জয়রামবাটীতে মা জন্মেছিলেন। তাই এখন জয়রামবাটী এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠ। যে-গ্রামের নাম মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ জানতেন, আজ সারা বিশ্বের বহু মানুষ সেই জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে ছুটে আসছেন। ফলে শত শত স্থানীয় লোকের নানাভাবেই রুটি-রুজির সংস্থান হচ্ছে। মায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে জয়রামবাটী অভিমুখী সমস্ত পথ পাকা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হওয়ায় ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সর্বোপরি জয়রামবাটী এবং কোয়ালপাড়ায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র থেকে কত যে গ্রামোন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ফলে জয়রামবাটীর তো বটেই, সন্নিহিত অন্যান্য গ্রামগুলিরও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আজ স্পষ্ট।

এখানে বলা প্রয়োজন, শ্রীমা আধুনিক কেতায় অর্থনীতির পাঠ নেননি। বড়ো বড়ো অর্থনীতিবিদরা অর্থ থেকে 'নীতি' বিদায় দিয়ে উত্তরোত্তর ব্যক্তির উপার্জনের সামর্থ্য বাড়ানোর পথ দেখাতেই ব্যস্ত, যাতে ভোগেচ্ছার অগ্নিতে আরও বেশি ঘৃতাহুতি দেওয়া সম্ভব হয়। এই অর্থ প্রবৃত্তিকে উস্কানি দিয়ে আজ অনর্থের রূপ দিয়েছে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'-র পারমার্থিক শিক্ষা। টাকা 'লক্ষ্মী' বলে মা সারদা মাথায় ঠেকাতেন। কাঞ্চনকে তিনি অশ্রদ্ধা করেননি। গৃহস্থকে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করার পরামর্শ দিতেন। তিনি অর্থের অপচয় পছন্দ করতেন না। কিন্তু হিসেব-নিকেশ করা বা টাকা ঘাঁটাঘাঁটি করা—এ তাঁর ধাতে ছিল না। মা বলতেন, 'টাকার আওয়াজ শুনলে গরিব

লোকের মনে লোভ জন্মায়।" কিছু কিনতে গেলে গরিব মানুষদের সঙ্গে অযথা বেশি দরদস্তুর করাও তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি আর্থিক দিক দিয়ে দরিদ্র হলেও সর্বদাই ছিলেন মুক্তহস্তা, অর্থের প্রতি অনাসক্ত।

জয়রামবাটীতে ভক্তরা যেসব খাবার-দাবার, ফল-মিষ্টি তাঁর জন্য বা ঠাকুরের ভোগের জন্য নিয়ে আসতেন, সরলা পল্লীবালাদের সতৃষ্ণ নয়নে সেসব জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি তাঁদের সেসব জিনিসের কিছুটা দিয়ে দিতেন।

জয়রামবাটী এবং আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে যেসব দীক্ষিত ও অদীক্ষিত সন্তানরা তাঁর কাছে দিনের পর দিন আসতেন, তাঁরা মায়ের এই অসামান্য ব্যবহারিক জীবন লক্ষ্য করেছেন এবং এই উদার ভাবকে নিজেদের সাধ্যমতো আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। আবার তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও সেই উন্নত ভাবধারায় ভাবিত হয়ে গ্রামাঞ্চলের সংকীর্ণ বাতাবরণকে অন্তত কিছুটাও পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। লৌকিক ও অলৌকিক উভয় দিক দিয়েই স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ছিল শ্রীমায়ের নীরব অবদান।

সামাজিক ক্ষেত্রে মায়ের প্রভাব

মায়ের পিতৃবংশ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদেব আত্মীয় বন্দ্যোপাধ্যায়রা ছাড়া আর কোনও ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল না। এছাড়া বিশ্বাস, মণ্ডল, ঘোষ ও সামুই পদবির কয়েকটি সদ্‌গোপ পরিবার, কয়েক ঘর গোয়ালা, একঘর নাপিত, একঘর ময়রা, একঘর কামার এবং দু-তিন ঘর বাগদি মিলে প্রায় একশোটি পরিবার সেখানে থাকতেন। তখনকার জয়রামবাটীর সামাজিক বাতাবরণ কতটা সংকীর্ণ, কতটা অনুদার ছিল তা এযুগে দাঁড়িয়ে কল্পনাও করতে পারব না। সেখানে তখন গ্রামের মানুষদের ভেতর দলাদলি, হিংসা-বিদ্বেষ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির প্রবল প্রতাপ। সেই সামাজিক পরিবেশে বড়ো হয়েও, প্রচলিত দেশাচার ও লোকাচারকে অবজ্ঞা না করেও, সহজ-সরলভাবে বিনা আড়ম্বরে তিনি যেন ওই অঞ্চলের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই একেবারে আমূল পালটে দিলেন, ঘটালেন এক নীরব বিপ্লব।

ব্রাহ্মণবিধবা হয়েও মা সরু লালপেড়ে ধুতি পরতেন, হাতে বালা পরতেন। এসব গ্রামের অনেকেই প্রথম প্রথম পছন্দ করতেন না। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে মা যে দীক্ষা দিতেন, এটাও তাঁরা সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু সন্তানের কল্যাণের মুখ চেয়ে মা সব বিধিনিষেধ ভাসিয়ে দিতেন। ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথার নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে ধীরে ধীরে মা ওখানকার মানুষের সামনে উদার, উন্মুক্ত এক সমাজের নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে গ্রামের মানুষ স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় তখনকার শহরের মেয়েরাই পড়াশোনার সুযোগ ও সময় পেতেন না, গ্রামের মেয়েদের আর কথা কি! সমাজপতিদের চোখে ওই ব্যবস্থাই আদর্শ ছিল! মা কিন্তু তা মনে করতেন না। এই বিষয়ে তাঁর মতামত, তাঁর আচার-আচরণ সেই সাক্ষ্যই দেয়। মায়ের সব কাজের, সব চিন্তার মূল সুরটি ছিল আধ্যাত্মিক। যেসব দেশাচার ও লোকাচারের সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নেই, যা মানুষকে ধর্মের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, মা নির্দ্বিধায় সেইসব আচাবের বিরোধিতা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে তাদের লঙ্ঘনও করেছেন। সুস্থ

সমাজ তখনই গড়ে ওঠে যখন মানুষকে হেয় না করে, ছোটো না করে প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়। এর উলটোটি করা হত বলেই তখনকার সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মা নিজে সকলকে সম্মান দিয়ে গ্রামের মানুষকে অন্যদেরও সম্মান দিতে শিখিয়েছিলেন, ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের বিস্মৃত আত্মমর্যাদা। ফলে ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষ সেই উদার ভাবে রঞ্জিত হয়েছিল, বহুলাংশে ব্যাধিমুক্ত হয়েছিল সমাজশরীর।

'মায়ের বাড়ি', 'মায়ের ভক্ত', এইসব শব্দগুলি ক্রমশ ওদেশে পরিচিত হয়ে গেল। একদিন মা বাড়ির সদর দরজার সামনে রকে বসে আছেন, সামনে ছোটো ছোটো কয়েকটি ছেলে দল বেঁধে খেলছে। দূরাগত কয়েকজন নতুন ভক্তকে তাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে একটি ছেলে তার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করল, "ওঁরা কারা?" বন্ধুটি বিজ্ঞের মতো উত্তর দিল, "কেন, ওঁরা ভক্ত, জানিসনি?" পরে তাদের জাত সম্বন্ধে জানার জন্য ছেলেটি বলল, "ওঁরা কি লোক?" ছেলেটি উত্তর দিল, "কেন, জানিসনি ওঁরা ভক্ত?" কোয়ালপাড়ার ছেলে স্বামী ঈশানানন্দ লিখছেন, "বাস্। সকলে বুঝিয়া লইল—'ভক্ত' একটি জাতি।"

"এই সময় হইতে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি গ্রামের লোকেরা সকলেই জয়রামবাটী আশ্রমের কোন জিনিসটি পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়া বলে, 'ওটা ভক্তদের।' সাধুদিগকেও বলে, 'ভক্তরা' এবং আমাদের নিকট হইতে কোন জিনিস চাহিবার প্রয়োজন হইলে বলে, 'ভক্তদের গিয়ে বলো না।'"[১৮]

কোয়ালপাড়ার ভক্ত কেদারবাবুর (পরবর্তী কালে স্বামী কেশবানন্দ মহারাজ) সঙ্গে স্বামী ঈশানানন্দের (বরদা মহারাজ) বাবা একদিন স্নান করে নতুন একটি সরু লালপেড়ে ধুতি, বাড়ির তৈরি গাওয়া ঘি, সরু চাল ও চাষের তরিতরকারি নিয়ে জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করতে গেলেন। তিনি কোয়ালপাড়ায় থাকতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি বাড়ি ফিরে মা এবং তাঁর ভক্তসন্তানদের সম্বন্ধে অভিভূত হয়ে বলতে লাগলেন, "আহা! আহা! মায়ের কথা কি বলবো! সাক্ষাৎ দেবী—কি স্নেহ, কি ভালবাসা, কি অমায়িক সরল ব্যবহার!... সব যেন স্বর্গের দেবতা! মানুষের এত বিনয়, নম্র ব্যবহার দেখিনি। আর কি শ্রদ্ধাবান্! আমার মতো লোকের প্রতিও কত শ্রদ্ধা ও সেবার ভাব! মায়ের সঙ্গে ওঁরা যাঁরা আছেন, সব দেবতা।"[১৯] তখন থেকে জয়রামবাটী যাওয়ার পথে ভক্তরা কোয়ালপাড়ায় এলে তিনি সর্বদা তাঁদের সঙ্গ করতে আশ্রমে যেতেন আর নিজেদের জমির তরিতরকারি মা ও ভক্তদের জন্য পাঠাতেন।

একবার জগদ্ধাত্রীপুজোর তৃতীয় দিন রাতে সাধু ব্রহ্মচারীরা মায়ের গান গাইতে লাগলেন : "মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর।/ সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার"—এই গানটি তাঁরা সমস্বরে হাততালি দিয়ে মহানন্দে গাইতে লাগলেন। গানটিতে এক জায়গায় আছে, "অস্পৃশ্য চণ্ডাল হ'তে ব্রাহ্মণাদি সকল জেতে, মা বলে ডাকিলে কভু হয় না নিষ্ফল তার॥" মা স্থির হয়ে ভক্তিপূর্ণ সেই গান শুনছেন। রাতে মা বরদা মহারাজকে বললেন, "আহা, গানটি বেশ জমেছিল। তাইতো, ভক্তের আবার জাত কি? সব ছেলেই তো এক। আমার ইচ্ছে হয় সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতের বড়াই আবার আছে। যাই হোক, মুড়িতে তো আর দোষ নেই, কাল এক কাজ করো। খুব সকালে কামারপুকুরে গিয়ে সত্য ময়রার দোকান থেকে বড় বড় জিলিপি দুই সের নিয়ে এসো।"[২০]

পরের দিন খুব সকালে কামারপুকুর থেকে জিলিপি নিয়ে বরদা মহারাজ বেলা নটা নাগাদ ফিরলেন। ওই জিলিপি ঠাকুরকে নিবেদন করে মা একটি বড়ো থালায় অনেক মুড়ি চুড়ো করে তার চারপাশে জিলিপিগুলি সাজিয়ে ভক্তদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ ভক্তরা সবাই মিলে মনের আনন্দে সেই প্রসাদ খেতে লাগলেন এবং পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে জননী সস্নেহে সেই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করলেন।

জয়রামবাটী থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে মায়ের মহিমার কথা শুনে তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু তখনকার সামাজিক বিচারে তিনি নিচু জাতি এবং অস্পৃশ্য। মায়েব এক সন্ন্যাসী সন্তানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। মা তাঁর ব্যাকুলতার কথা শুনে খুব খুশি হন। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন গ্রামের লোকেরা একথা জানলে বিরাট গণ্ডগোল বাধাবে। তাছাড়া ছেলেটির স্বজাতীয় কয়েকজন জয়রামবাটীতে থাকেন। এ-খবর কানে গেলে তাঁরাও হয়তো ছুটে আসবেন। শেষে মায়ের অনুমতিক্রমে ঠিক হয, ছেলেটি বাতে জয়রামবাটী এসে অদূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকবেন এবং ভোরে মায়ের কাছে আসবেন। সকালে তিনি আসামাত্রই মা তাঁকে কৃপা করলেন, নিজের হাতে প্রসাদ দিলেন। তথাকথিত হীন জাতি বলে প্রথমটা সঙ্কুচিত হলেও মায়ের স্নেহে, উপস্থিত সন্তানদেব সঙ্গে সমান ব্যবহার দেখে তাঁর সব সঙ্কোচ ভেঙে যায় এবং পূর্ণমনোরথ হয়ে তিনি বিদায় নেন।

জাতে বাগদি ভূষণচন্দ্র পুইল্যা তাঁব মামা শিবদাস দলুই ও মামার কাকা যতীন্দ্রনাথ দলুই-এর সঙ্গে বিকেলে মায়ের বাড়িতে এসে মায়ের কাছে দীক্ষা চান। মা প্রথমটা রাজি না হওয়ায় প্রাণের আবেগে বললেন, "তোমার তো এক বাগদী-বাবা ছিল, বাগদী-ছেলে কেন হবে না?" মা তাঁকে প্রসাদ খেতে বললেন। কিন্তু তাঁর দাবি, "যদি আমাদের মন্ত্র না দাও, আমরা খাব না।" রাতে সত্যিই তাঁরা খেলেন না, মা-ও কিছু খেলেন না। পরদিন সকালে প্রসন্নমামা এসে বললেন, "দিদি বলছেন, 'আমার ছেলেদের স্নান করে আসতে বল, তাদের মন্ত্র দেব'।"[২১]

এইভাবে মা তথাকথিত নিচু জাতের মানুষের সুপ্ত দেবত্বকে জাগিয়ে তাঁদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করেছেন। ব্রাহ্মণকুলের বউ হয়েও তিনি বৈদ্য, শূদ্র ইত্যাদি জাতের মানুষের তৈরি খাবার নির্দ্বিধায় খেয়ে বোঝাতে চেয়েছেন ভাতের হাঁড়িতে ধর্ম নেই। তেলোভেলোর মাঠে সেই ভয়ংকর দস্যুদম্পতিকে ভালোবেসে, বিশ্বাসের ছোঁয়ায় আপনার করে নিয়ে তাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

মায়ের ডাকাত-বাবার নাম ছিল সাগর সাঁতরা আর ডাকাত-মায়ের নাম ছিল মাতঙ্গিনী। স্বামী পরমেশ্বরানন্দ বলেছেন যে, জয়রামবাটীতে একবার এক বাগদি যুবক এসে মাকে ধরে, আমাকে দীক্ষা দাও। মার শরীর ভালো না থাকায় মা তাঁকে তখনই দীক্ষা দিতে রাজি হলেন না। সে ভাবল নিচু জাতি বলে মা বোধহয় তাকে দীক্ষা দিচ্ছেন না। তাই অভিমান করে বলল, "বুঝেছি, বাগদীর মেয়ে হতে পার, কিন্তু বাগদীর মা হতে পার না। আমি তেলো থেকে আসছি। তুমি কি জান, তোমার ডাকাত-বাবা আমার বাবা?"[২২] সেকথা শুনে মা খুব খুশি হয়ে অসুস্থ শরীরেই তাকে সেদিন দীক্ষা দিলেন।

সাগর সাঁতরার নাতি কৃষ্ণপদ সাঁতরা জানিয়েছেন যে, তাঁর কাকা মেহারী সাঁতরা মার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছিলেন। সাগর সাঁতরা ছিলেন তেলো বা তেলুয়া গ্রামের অধিবাসী।

ভেলো বা ভালিয়া তোলোর সংলগ্ন গ্রাম। মায়ের ডাকাত-বাবা ও ডাকাত-মা সেই রাতে মাকে তেলোর যে চটিতে রেখেছিলেন, বহু বছর পর সেইখানেই তেলো গ্রামের বাসিন্দাদের উৎসাহে এবং স্বামী পরমেশ্বরানন্দের উদ্যোগে মায়ের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মায়ের মূর্তিও আছে। শুধু তাই নয়, ১৪ মার্চ ১৯৬৫ তে সেখানে স্থাপিত হয়েছে 'তেলুয়া রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম'। প্রতি বছর সেবাশ্রমে মায়ের জন্ম মহোৎসব উপলক্ষে ধর্মসভাও হয়।

শিহড়ের পাশে শিরোমণিপুর এবং তার পাশে পরমানন্দপুরে বহু মুসলসান থাকত। ওই দুই গ্রামে তখন তুঁতের চাষ হত। ইংরেজরা জমিদারদের মাধ্যমে চাষিদের তুঁত-চাষে বাধ্য করত। ওই জমিতে অন্য ফসল তারা ফলাতে পারত না। নিরুপায় চাষিরা তাই পেটের জ্বালায় চুরি ডাকাতি ধরল। 'তুঁতে ডাকাত' তখন গ্রামের লোকদের কাছে এক বিভীষিকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়ের নতুন বাড়ি তৈরির সময় ওই অঞ্চলের বহু দুর্ভিক্ষপীড়িত মুসলমানকে মায়ের ইচ্ছায় সাধুরা বাড়ি তৈরির কাজে লাগালেন। জয়রামবাটীর গোঁড়া বামুনরা এতে ঘোর আপত্তি তুললেন। মাকে ম্লেচ্ছও বলা হল। দু-একদিন ঘরের কাজও বন্ধও থাকল। কিন্তু মা নির্বিকার, অটল। সমাজের অহেতুক আবদারের কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করলেন না। ফলে কয়েকদিন পরই তারা আবার কাজে লেগে গেল। এই বাড়ি তৈরি উপলক্ষেই বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে এই গরিব মুসলমানদের ঘনিষ্ঠতা হয়।

এদেরই একজন আমজাদ মিঞা। সবকিছু জেনেও মা তাকে খুব ভালোবাসতেন। সেও মাকে ভক্তি করত, ভালোবাসত। বাড়ির ফল, তরকারি মায়ের জন্য আনত। মায়ের কাজ, সে যতই কঠিন হোক না কেন, আপ্রাণ চেষ্টায় সে সেই কাজ করে দিত। অন্যের আপত্তি সত্ত্বেও মা তাকে বাড়ির ভেতরে আসার অধিকার দিয়েছিলেন। আপন সন্তানের মতো তাকে জিনিসপত্র দিতেন, আদরযত্ন করতেন। মার কাছে শিশুর মতো সেও তার মনটি মেলে ধরত। আমজাদ জানত এই মায়ের মতো আপনজন এ-জগতে তার আর নেই। জয়রামবাটী গ্রামকে তাই সে চুরি-ডাকাতির হাত থেকে রক্ষা করত। সে জেল খাটতে গেলে বা কোনও কারণে গ্রামে না থাকলে তার মা ফতেমা বিবি ও স্ত্রী মতিজান বিবি অভাবে পড়লেই মার কাছে ছুটে আসত। মা তাদের পেটভরে খাইয়ে, চাল, তেল, কাপড়, নানাবিধ জিনিস দিয়ে বাড়ি পাঠাতেন।

ওই অঞ্চলের হামেদি শেখ, মফেতি শেখ, রমজান পাঠানের গরুর গাড়িতে চড়েই মা জয়রামবাটী থেকে অন্যত্র যেতেন। হামেদি শেখের স্ত্রী নাফিজান বিবি ও মফেতি শেখের স্ত্রী মজিরন বিবিকেও মা খুব ভালোবাসতেন। শিহড়, জিবটা, জয়রামবাটী, ফুলুই, শ্যামবাজার গ্রামগুলির ধনী বা মধ্যবিত্তদের কারও প্রাণই এদের দুঃখে কাঁদেনি, কেঁদেছিল মার প্রাণ। মায়ের কাছে মুসলমান নারী-পুরুষ সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার।[২৩]

শিরোমণিপুরের দুদু ফকির ও সেলিম ফকির মায়ের বাড়ি যেতেন। নবান্নের সময় চামর দুলিয়ে ভিক্ষে করতেন। মা তাঁদের খুব ভালোবাসতেন, ভক্তি করতেন। শিরোমণিপুরের পীরের দরগায় তিনি মানত করতেন। হামেদি শেখ ও মফেতি শেখ, সম্পর্কে রসন আলী খাঁর চাচা। তিনি জানিয়েছেন, "হামেদি-চাচা ও মফেতি-চাচা বলত : 'মায়ের কী ভক্তি! আমাদের পাল-পরবে মা সিন্নি মানত করে, বাতাসা দেয়।' মফেতি-চাচা মাকে জিজ্ঞেস করেছিল: 'মা, মুসলমানদের পরবে আপনি সিন্নি-বাতাসা পাঠান কেন? আপনারা তো হিন্দু।'

"মা বলতেন : 'বাবা! ঠাকুর কী আলাদা হয়? সবই এক। তোমরা তো জান বাবা, তোমাদের ঠাকুর ইসলামধর্মও সাধনা করেছিলেন। সেসময় নামাজ পড়তেন মুসলমানের মতোই। সবই এক বাবা! নামেই শুধু ভিন্ন।' "[২৪]

অনেক বছর আগে মায়ের মন্দিরে একবার বাজ পড়েছিল। সেই প্রসঙ্গে রসন আলী খাঁ বলেছেন, "কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) মফেতি চাচাকে বলেছিলেন: 'হ্যাঁরে মফেতি, মায়ের মন্দিরে যে বাজ পড়ল! একবার আজান দিস তো!' মফেতি-চাচা মহারাজের কথামতো মন্দিরের কাছে আজান দিয়েছিল। কিশোরী মহারাজ মায়ের কাছেই মানুষ। সত্যি! মায়ের শিক্ষায় ওঁরাও ছিলেন সব-ধর্মেরই লোক। আমরা ঠাকুর-মাকে পীর-পয়গম্বররূপেই দেখি। হামেদি-চাচা ও মফেতি-চাচাকে দেখেছি, ওরা মনে-প্রাণে ঠাকুর আর মাকে তা-ই ভাবত। ওঁদের মতো মানুষ কি আর আসবে? ওঁরা তো আল্লার দূত—বেহেস্তের ফেরেশতা!"[২৫]

এই উদার মনোভাবের জন্য গ্রামের গোঁড়া মাতব্বরদের কাছে মাকে কতবার অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। জয়রামবাটী অঞ্চলের কয়েকটি ছেলেকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী হতে দেখে কেউ কেউ আশঙ্কিত হয়ে ভাবলেন যে মায়ের প্রভাবে দেশের ছেলেরা সব বুঝি সাধু হয়ে যাবে। দীক্ষিত গৃহী সন্তানেরা তাঁদের স্ত্রীদের মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁদের সামাজিক শাস্তির ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করা হত। কিন্তু মা যেহেতু গ্রামের মানুষদের ভালোবাসতেন, তাঁদের বিপদে-আপদে অন্নপূর্ণার মতো সাহায্য করে সকলের হৃদয়-দেবতা হয়ে গিয়েছিলেন সেইজন্য এই মাতব্বররা প্রকাশ্যে মার বিরুদ্ধাচরণ করতেও সাহস পেত না।

ঠাকুরের পাঠশালার সহপাঠী কামারপুকুরের গণেশ ঘোষাল মাকে দর্শন করতে এসে মার প্রণাম তো নিলেনই না, উপরন্তু নিজেই মাকে প্রণাম করলেন। বললেন, মা সন্তানকে প্রণাম কবলে তার অকল্যাণ হয়। ওই অঞ্চলের মানুষ মাকে এত শ্রদ্ধা করতেন!

মা চাইতেন মেয়েরা শিক্ষিত হোক। কোয়ালপাড়া ও পাশের গ্রামগুলির মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুব আগ্রহী হলেও উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবে মায়ের ইচ্ছে তখন পূর্ণ হয়নি। জয়রামবাটীর মেয়েদের লেখাপড়া এবং কিছু কাজকর্ম শেখানোর ব্যাপারে মা তাঁর এক সন্তানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভাইঝি রাধু ও মাকুকেও মা মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মেয়েদের শাস্ত্রপাঠ, পূজার্চনা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের অধিকার মা স্বীকার করতেন। মাকে কেন্দ্র করে কোয়ালপাড়া আশ্রমে কয়েকজন মহিলা ব্রহ্মচারিণীভাবে সেখানে থেকে পূজার্চনা করতেন। ছেলেমেয়েদের বাল্যবিবাহ প্রথারও বিরোধী ছিলেন তিনি।

মায়ের নতুন বাড়িতে 'সতুর মা' নামে এক পরিচারিকা ছিলেন। তাঁর নাতি সুধীরচন্দ্র সামুই বলেছেন, "তখন গ্রামে পাঠশালা ছিল না। সেজন্য শ্রীশ্রীমা গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করান। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বেতন দেবার ব্যবস্থাও তিনি করেন।" পড়াশোনা না জানায় ওঁর বাবাকে লোকে ঠকাত বলে শ্রীমা ওঁর ঠাকুরমাকে বলেছিলেন, "সতুর মা, তোমার নাতিকে লেখাপড়া শিখিও। ওর লেখাপড়া হবে।" এই বলে তিনি সুধীরচন্দ্রের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর অসীম আশীর্বাদ না পেলে নিরক্ষর পিতার পুত্র হয়েও যে আমি জয়রামবাটী গ্রাম থেকে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তা কোনদিনই সম্ভব হতো না।"[২৬]

মায়ের শরীর অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় ১৩২৬ সালের (১৯২০) ফাল্গুন মাসে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই যাওয়াই মায়ের শেষ যাওয়া। যাত্রার সময় স্বামী ঈশানানন্দ দেখলেন, গ্রামের বহু নরনারী মায়ের কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, "পিসীমা, শরীর সেরে শীগগির চলে এসো, আমাদের বেশী দিন ভুলে থেকো নি।" শ্রীমাও আবেগাপ্লুত স্বরে বলছেন, "সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। তোমাদের কি ভুলতে পারি?"[২৭] শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সে এক মধুর করুণ দৃশ্য! মায়ের পালকি শিহড়ের দিকে রওনা হলে গ্রামবাসীরা জলভরা চোখে পালকির দিকে চেয়ে রইল—যতদূর দেখা যায়!

শ্রীমায়ের কাছে একটি মেয়ে তরকারি বিক্রি করত। দেখা গেল মায়ের দেহত্যাগের পরও সে মাঝে মাঝে এসে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "এখন আর তুমি কি জন্যে আস?" সে বলল, "মায়ের এত ভালবাসা পেয়েছি যে, তাঁকে আর কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাই এখানে আসি, কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যাই। এতেই আমার খুব আনন্দ হয়।"[২৮]

ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। মানুষ নিয়েই সমাজ। জাত-পাত, ধর্ম ও কুসংস্কারে শতধা-বিদীর্ণ সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লিসমাজকে মা অসীম মাতৃত্বের উদারতা, ভালোবাসা আর সেবা দিয়ে অনেকটা একসূত্রে বেঁধে দিয়েছিলেন, বহু মানুষের হৃদয়-দেউলে জ্বেলে দিয়েছিলেন স্বচ্ছ সমাজচেতনার এমন একটি বিমল আলো যা আলেয়ার মতো পথিককে দিগ্‌ভ্রান্ত না করে সম্প্রীতি ও একত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মাতৃপ্রভায় জয়রামবাটী ও সন্নিহিত গ্রামগুলি এখনও আলোকিত হয়ে আছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মায়ের প্রভাব

মনের শক্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন মনের শক্তি অসীম, স্থূলকর্মের মাধ্যমে সেই শক্তির যতটুকু প্রকাশ ঘটে, তার চাইতে বহুগুণ বেশি প্রকাশিত হয় সূক্ষ্ম চিন্তার মধ্য দিয়ে। চিন্তা যত মহৎ হয়, তার কল্যাণশক্তিও ততই বিপুল আকার ধারণ করে; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সেই চিন্তাতরঙ্গ বহু যুগ ধরে শূন্যে ভেসে বেড়ায়। উপযুক্ত আধার পেলে সেই ভাবতরঙ্গ তাকে স্পর্শ করে এবং নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে। আকস্মিক কোনও মহৎ প্রেরণার কারণ আমরা তখনই বুঝতে পারি না। রহস্যজনক মনে হলেও তা আসে ওই অদৃশ্য অতীত বা বর্তমান শক্তিশালী চিন্তাকম্পন থেকে। এইজন্য স্বামীজী বলেছেন—একটি গুহাতেও যদি কোনও মহাত্মা দীর্ঘকাল শুভচিন্তা করে থাকেন, কঠিন পাথর ভেদ করে সেই চিন্তাতরঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং জগতের কল্যাণ করে যাবে। এইটি শ্রীমার জীবনে আধ্যাত্মিক প্রভাব সম্পর্কেও সত্য। পরমা প্রকৃতি যিনি নিত্য-মুক্ত পরব্রহ্মের চিৎশক্তি, যিনি নীরবে জীবের চৈতন্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরমকরুণায় মানবশরীরে জয়রামবাটীতে অবতীর্ণা, তাঁর কল্যাণচিন্তার কে ইয়ত্তা করতে পারে? সেই শুভচিন্তার বেগ ও শক্তির বিশালতার কে পরিমাপ করতে পারে? দু-দশ বছরের মধ্যে সে-চিন্তার প্রভাব উপলব্ধি করা যায় না, সংখ্যাতত্ত্বের মাপকাঠিতে তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ধরা পড়ে না। দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে আমরা যদি পূর্ণিমার দীপ্তি কল্পনা করতে যাই, সে বাতুলতা হবে। তবু আমরা যদি সেই দুর্বল মানদণ্ডেও জয়রামবাটী ও তৎসন্নিহিত

গ্রামাঞ্চলগুলির উপর শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক প্রভাবকে বিচার করি তাহলে দেখব, কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার তিনি জীবদ্দশাতেই ঘটিয়ে গেছেন।

যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখি এক বাঁকুড়া জেলাতেই শ্রীমা ১১১ জনকে দীক্ষা দিয়েছেন। তার মধ্যে তাঁর প্রভাবে সন্ন্যাসজীবনকে বরণ করেছেন ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে আছেন স্বামী ঈশানানন্দ, ঋতানন্দ (গগন), কেশবানন্দ, চন্দ্রেশ্বরানন্দ, তারকেশ্বরানন্দ, ধ্রুবানন্দ, পরমেশ্বরানন্দ, বিদ্যানন্দ, ভবেশানন্দ, মহাদেবানন্দ, মহেশ্বরানন্দ, সান্দ্রানন্দ, স্বরূপানন্দ, হরিপ্রেমানন্দ এবং ব্রহ্মচারী বিনোদবিহারী। সন্নিহিত হুগলী জেলার প্রায় ৯০ জন মানুষ তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ত্যাগের জীবন বরণ করেছেন ১৬ জন। এঁদের নাম—স্বামী অবধূতানন্দ, গৌরবানন্দ, তত্ত্বানন্দ, তন্ময়ানন্দ, নিত্যানন্দ, নিশ্চলানন্দ, প্রজ্ঞানন্দ, বেদানন্দ, বিমলানন্দ, বরদানন্দ, বোধানন্দ, ভাগবতানন্দ, সৎস্বরূপানন্দ, ব্রহ্মচারী প্রকাশ, গোবর্ধন ও প্রসন্নকুমার। দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তখনকার দিনের বিচারে অতি উচ্চশিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে যেমন ডাক্তার, উকিল এবং শিক্ষক ছিলেন, তেমনই ছিলেন পদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদার। তাঁদের কারও নিবাস ছিল খাতড়া, ইঁদপুর, দেউলী, মলিয়ান, বেলেতোড়, বিষ্ণুপুর, ময়নাপুর, কোতলপুর, কোয়ালপাড়া, জয়রামবাটী, তাজপুর, শিহড়, জিবট্যা-য়, আবার কারও নিবাস ছিল হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে, যথা—শ্যামবাজার, জনাই, মশাট, কলাছড়া, চন্দননগর, গুড়াপ, ডহরকুণ্ড, তিরোল প্রভৃতি। এইসব গ্রামের দীক্ষিত মানুষ ছাড়াও পিঁপড়ের সার দিয়ে কত যে অগণিত মানুষ তাঁর কাছে নিত্য ছুটে আসতেন দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তার হিসাব নেই। শ্রীমা নির্বিচারে তাঁদের ভালোবেসেছেন, তাঁদের সংসারে থেকেও ভগবানলাভের উপায় বলে দিয়েছেন। তাতে বহু মানুষের জীবন ও চরিত্রের আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে। বিশ্বাস, ভক্তি, ভগবৎ-নির্ভরতা যেমন তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনই জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁদের বহুলাংশে বদলে গিয়েছে। তাঁদের স্মৃতিচারণা পড়লেই বোঝা যায় তাঁদের জীবনে শ্রীশ্রীমার আধ্যাত্মিক প্রভাব কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছিল। সকলেই কমবেশি অনুভব করেছিলেন—"মা আমার, আমি মা'র।" অথবা "মা আছেন আর আমি আছি, ভাবনা কি আছে আমার!"

কয়েকটি শিশু ও শ্রীমা

প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা

শ্রীমা এক সময় বলেছেন, "যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমার ইচ্ছা হল, আমিও যাই। কিন্তু তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না, তুমি থাক, অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।"—এই 'বাকি কাজ' যে ঠিক কী, কতখানি তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা তার পরিমাপ এখনও হয়নি। বহুযুগ ধরে হতে থাকবে। শ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায় : "এই লোকাতীত জীবনে গুরু, দেবী ও মাতা—এই ত্রিবিধ রূপই অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট।" ভক্তের আকুল আকৃতিতে সাড়া দিয়ে মা তাঁর দেবীত্ব কখনও কখনও প্রকাশ করেছেন। তেমন ভাগ্যবান ভক্তের সংখ্যা কম না হলেও নিশ্চয় সীমিত। অধ্যাত্ম-পথের পথিক কেউ কেউ তাঁকে চৈতন্যদায়িনী, অজ্ঞাননাশিনী, মোক্ষদাত্রী গুরুরূপে লাভ করে ধন্য হয়েছেন, একথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলের ইতিহাসে রয়েছে। তবু আমরা বেশি করে জানি, মাতারূপেই সারদা দেবী তাঁর প্রকট লীলায় প্রত্যক্ষদর্শীদের হৃদয় জয় করেছিলেন। স্নেহ ও সেবার অনুপম শক্তিতেই তিনি তাঁর জীবনকালে এবং পরবর্তী সময়ে জগতের সর্বশ্রেণীর মানুষের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর আপাতসাধারণ অথচ অলৌকিক মহিমান্বিত আবির্ভাব আজ অনেক সাধক ও বিদগ্ধ মানুষের গবেষণার বিষয়। অথচ আমাদের অতিপরিচিত সাংসারিক ক্ষেত্রকে অবলম্বন করেই মা যাপন করেছিলেন তাঁর দিব্যজীবন। কয়েকটি ছোটো ছেলেমেয়ের প্রতি শ্রীমায়ের স্নেহ-ভালোবাসার কথা স্মরণ করে আমরা তাঁর চরিত্রমাধুর্যের আর এক প্রকাশ লক্ষ্য করে ধন্য হতে পারি।

রাধুর পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীতে অজানা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 'যোগমায়া' বলে নির্দেশ করেন এবং রাধুকে অবলম্বন করেই এই জগতে শ্রীমাকে থাকতে নির্দেশ দেন। মা রাধুকে অশেষ স্নেহে ও যত্নে পালন করতেন। তাঁর সেবা, পরিচর্যা, উদ্বেগ ও প্রার্থনাতেই সে লালিত,—এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। রাধুর স্বাস্থ্য ও স্বভাব ছেলেবেলায় বেশ ভালো ছিল। তার বালিকাসুলভ সরল ব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হত। এই রাধু বা রাধারাণীর কথা ভগিনী দেবমাতার স্মৃতিচারণে আছে। তিনি লিখেছেন : "গঙ্গার অপর তীরে, কিছু দক্ষিণদিকে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্রীয় মঠ। সর্বোপরি রয়েছে বাগবাজারের সেই অনাড়ম্বর বাড়িটি, যেখানে বাস করতেন এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধিকা। তাঁর নাম সারদামণি দেবী, কিন্তু সচরাচর তিনি শ্রীমা বা মাতাদেবী বলেই পরিচিতা।...

"তাঁকে ঘিরে থাকে আনন্দ-স্নিগ্ধ এক মধুরতা। সেইসঙ্গে ছিল এমন এক প্রচ্ছন্ন রসবোধ যে, তাঁর সঙ্গে যে-কোনও বিষয়ে আলাপ করা যেত। তুচ্ছতম বিষয়েও ছিল তাঁর কৌতূহল। তাঁর সঙ্গে থাকত আট বছরের ভাইঝি রাধু। তার মতোই শিশুর খেলায়, রঙ্গে তিনি মেতে উঠতে পারতেন। একবার আমি রাধুর জন্য ইংরেজি দোকান থেকে 'বাক্সের মধ্যে জ্যাক' (Jack in the Box) খেলনাটি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটি নিয়ে তাঁর খুশির দৃশ্যটি আমি এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। যতবার পুতুলটি শব্দ করে বাক্স থেকে লাফিয়ে উঠছে ততবারই তিনি শব্দটির নকল করে হেসে লুটিয়ে পড়ছেন।

"আর একদিন আমি গিয়ে দেখি তিনি কাচের পুঁতির মালা গাঁথছেন। রাধুই কারণটা জানাল : 'মন্দিরের ঠাকুরদেবতার মতো আমার গোপালের কোনও গয়না নেই।' কিন্তু মায়ের কাজে কোনও ছলনা ছিল না। এই ছোট্টো খেলনা-পুতুলটিকেই তিনি প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন, এবং যেমন করে একজন ভক্তিমতী সন্ন্যাসিনী শিশু যিশুর জন্মদিনে তাঁকে আচ্ছাদনে ভূষিত করেন তেমনি করেই তিনি সেটিকে আভরণে ভূষিত করছিলেন।"

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীমা দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রা করেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাগ্রহ ও ভক্তিপূর্ণ উদ্যোগে। সেবার রামেশ্বর মন্দির দর্শন প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বেই রাধারাণীর কথা। ওই মন্দিরটি তখন ছিল বামনাদের রাজার অধীন। রাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য—ভক্তিমান মানুষ। রাজা তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা তাঁর গুরুর গুরু,—পবমগুরু মাতা শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন পূজা ও মন্দির দর্শনাদির। রাজা ওই সঙ্গে নির্দেশ দেন, শ্রীমন্দির-সংলগ্ন কোষাগারখানি যেন মাকে প্রদর্শন করানো হয় এবং শ্রীমা কোনও কিছু চাইলে তাঁকে তখনই যেন তা দেওয়া হয়। কর্মচারীদের মুখে শ্রীমা এই প্রসঙ্গ শুনে তো ভেবেই পেলেন না যে সেখানে তাঁব চেয়ে নেওয়ার মতো কী জিনিস থাকতে পারে। আবার তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন ভেবে সৌজন্যময়ী মা বলেন, "আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।" রাধুকেও মা বললেন, "দেখ, তোর যদি কিছু দরকার হয় নিতে পারিস।" শ্রীমা ভদ্রতা করে এমনটি বললেও যখন কোষাগার খুলতেই হীরে জহরৎ সব ঝকঝক করে উঠল--তখন তাঁর বুক দুর দুর করতে লাগল। তিনি ঠাকুরেব চরণে আকুল প্রার্থনা জানালেন, যেন রাধুর মনে কোনও বাসনা না জাগে। ঠাকুর শুনেছিলেন সে-কথা। সব দেখে রাধু বলল—"এ আবার কি নেব? ওসব আমার চাই না। আমার লেখবার পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে, একটা পেন্সিল কিনে দাও।" শ্রীমা একথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাইবে এলেন। রাস্তার দোকান থেকে তাকে একটা দুপয়সার পেন্সিল কিনে দিলেন। তখন রাধুর বয়স দশ। রাধুর পুত্রের কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

কোয়ালপাড়ার বনে রাধুর পুত্র জন্মেছিল, তাই শ্রীমা তার নাম রাখেন বনবিহারী। সংক্ষেপে বনু। শ্রীমা সুর করে গান গেয়ে তার ঘুম ভাঙাতেন—

"উঠ লালজী, ভোর ভয়ো
সুর-নর-মুনি হিতকারী।
স্নান করো, দানদেহ
গো-গজ কনক-সুপারি ॥

শ্রীমায়ের আর দুই ভাইঝি—নলিনী ও মাকু। নানাকারণে এঁরাও মায়ের পরিবারভুক্ত ছিলেন। মাকুর পুত্র ন্যাড়া মায়ের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। সে মাকে বলত 'সীতা'। শ্রীমায়ের দাঁত পড়ে গেছে দেখে সে বলত তাঁকে, "আমার দুটি দাঁত নাও।" অনেক আগের কথা। ন্যাড়া তখন মাত্র এক বছরের শিশু। শ্রীমা নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন শ্রীঠাকুরের পূজার। ন্যাড়া হামা দিয়ে এগিয়ে আসছে, মায়ের ছাড়িয়ে রাখা মর্তমান কলাগুলি নিতে। শ্রীমা মিষ্টি করে বলেন, "একটু রোসো, বাবা; ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেলে পাবে।" সে থামে না দেখে মা তাকে হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন। তাতেও সে তাঁর হাত ঠেলে আসতে চায়। সেবক চাইলেন ওকে তুলে নিয়ে যেতে। শ্রীমা বাধা দিয়ে নিজের হাতেই ন্যাড়ার মুখে কলা ধরে বলছেন, "খা, গোপাল খা।" মায়ের মুখখানি তখন যেন দিব্য স্নেহের আভায় উজ্জ্বল।

একবার নলিনীদিদি রাধুর প্রতি মায়ের স্নেহ লক্ষ্য করে ঈর্ষান্বিত হন, আর নিজ কনিষ্ঠা ভগিনী মাকুকে কোয়ালপাড়া থেকে পাঠাতে উদ্যত হন জয়রামবাটীতে। তাঁর ধারণা শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় তাঁদের দেখেন না, কেবল রাধুর জন্য ব্যস্ত। মাকু তখন সন্তানসম্ভবা; ন্যাড়া ও মাকুকে নিয়ে তিনি হঠাৎ মাকে না জানিয়েই পালকি ডাকিয়ে জয়রামবাটী যাত্রা করেন। শ্রীমা সব শুনে জেনে কেবল দুঃখ প্রকাশ করলেন, "যাবার সময় ছেলেটাকে পর্যন্ত প্রণাম করিয়ে নিয়ে গেল না। যা হবার তাই হবে, আমি আর কি করি বল?"

ইতিপূর্বে জনৈক জ্যোতিষী মাকুর হাতের রেখা দেখে বলেছিলেন যে মাকুর সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে দেখা হবে না। এর প্রতিকার হিসেবে যে যা শান্তি-স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দেন তা সব মা যথাসাধ্য করিয়েছিলেন, কিন্তু নিয়তি কারও বাধ্য নয়। জয়রামবাটীতে গিয়ে ন্যাড়া অসুস্থ হয়। তখন তার বয়স আড়াই বছর। সে খুব বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান শিশু, সবার প্রিয়। এদিকে মাকুর দ্বিতীয় সন্তানের জন্মকাল সমাগত। মাত্র তিনদিন ডিপ্‌থেরিয়ায় ভুগে ন্যাড়া দেহত্যাগ করে।

শুভসংস্কারযুক্ত শিশুটি মায়ের বড়োই স্নেহের পাত্র ছিল। ন্যাড়ার মৃত্যুসংবাদে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছিলেন। সেরাত্রে আহারের ইচ্ছাও তাঁর ছিল না, শুধু সকলের স্বস্তির জন্যই সামান্য কিছু খেলেন। কয়েকদিন ধরে তাঁর মন ওই বালকের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত ছিল, চোখদুটি অশ্রুসিক্ত, কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। মা বলেছিলেন, "ছেলেটা কোনও যোগভ্রষ্ট সাধক বা মহাপুরুষ ছিল। সামান্য বাকি ছিল, সেটুকু ভোগ হয়ে গেল—শেষ জন্ম! এই বয়সের ছেলের মধ্যে অত সংস্কার দেখা যায় না। কোথা থেকে রোজ গুলঞ্চ ফুল এনে আমার পায়ে দিয়ে পূজা করত। শরৎকে 'লাল-মামা' বলত। লিখতে পড়তে কিছুই শেখেনি—মাত্র আড়াই-তিন বৎসর বয়স। শরতের অনুকরণে একটা কাঠের ভাঙা বাক্স সামনে নিয়ে রোজ শরতকে চিঠি লিখতে বসত—কি কি লিখছে এখানের সংবাদ, সব মুখে বলত।" ন্যাড়ার প্রয়াণের পরদিন আরামবাগের ভক্তদের কাছে শ্রীমা তার কথা সজলনয়নে বলেছেন। বললেন—"সে বলতো ফুল লাল করেছে কে? আমি বলতুম—ঠাকুর করেছেন। 'কেন'? 'তিনি পরবেন বলে।' " তার বেশ কয়েকদিন পরেও শ্রীমাকে শোকার্ত দেখে এক ভক্ত বলেন, "সংসারী লোকের ছেলেমেয়ের মরণে তাদের কিরকম কষ্ট হয়, তা বোধহয় আপনিও বুঝতে পেরেছেন?" মা উত্তর দেন, "তা কি আর বলতে? যে কষ্ট হচ্ছে মাকুর ছেলেকে মানুষ করে, তা ভুলতে পারছি না।"

শ্রীমায়ের ভাই বরদা ও তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতী। এঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষুদিরাম। শ্রীমা তাঁর শ্বশুরের নাম একই বলে এই বালককে ডাকতেন ফুদি বলে। সে ফল খেতে ভালোবাসে। মা কলকাতা থেকে তার জন্য পার্শেল করে ফল পাঠাতেন। নিজের খাওয়ার পর মা দুধ-ভাত মেখে বসে থাকতেন, আর বালকও 'পিসিমা' বলে এসে দাঁড়াত। মা সস্নেহে বলতেন, "এস বাবা, আমি তোমাকেই ডাকছিলুম।" ইন্দুমতী অনুযোগ করতেন এই ভেবে যে, এতসব দেওয়া ঠিক নয়, গরিবের ছেলে, কোথায় এসব বরাবর পাবে। শ্রীমা উত্তর দেন : "তোরা বুঝিসনি গো! যে খায় চিনি, তারে যোগায় চিন্তামণি।"

শ্রীমা কলকাতায় আসবেন দেশ থেকে। ক্ষুদি ধরে বসল, সে সঙ্গে আসবে। মা তাকে ভোলানোর জন্য নিজের আঙুলের আঙটি পরালেন আর কিছুটা মিছরি দিয়ে বললেন যখনই তার শ্রীমাকে মনে পড়বে, সে যেন মিছরি খায়। তাহলেই সে তাঁকে ভুলে যাবে। পরে ক্ষুদি কলকাতায় এলে মা তাকে তার পছন্দমতো নূপুর গড়িয়ে দেন।

একদিন শ্রীমা ক্ষুদিকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে সে মাগুর মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছে। সে দু-হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বলল যে তার মা একটি মস্ত মাগুর মাছ কিনেছেন। কিন্তু তাকে একখানি মাত্র দিয়েছেন। আর সবাইকে দিয়ে দিয়েছেন। শ্রীমা সহাস্যে বলেন, 'ইন্দু আসুক, তাকে বলছি আমি।" পরে ইন্দুমতী দেবী এলে মা জানলেন যে মাছ মোটে কেনাই হয়নি। শ্রীমা হেসে বলেন, "ওলো, আমার মেজোভাই উমেশ অমনি বলত। ফুদি আজ তাই বললে।" আমরা জানি শিশুমনস্তত্ত্বে আছে—তারা গল্প করতে ভালোবাসে, আর বিষয় খুঁজে না পেয়ে কখনও কখনও অকারণ কল্পনা করে কথা বলে। ভক্তেরা মায়ের পাদপদ্ম পূজা করেন দেখে সেও করবে। একদিন সে শ্রীমায়ের পায়ে একহাত রেখে অন্য হাতে মুঠো মুঠো ফুল দিতে লাগল। মা তাকে কোলে টেনে নিয়ে বলছেন, "বাবা, তোরা যে আমার মুক্ত হয়ে এসেছিস। আর ফুল দিতে হবে না।"

ভক্তবর গিরিশচন্দ্র ঘোষের শিশুপুত্রটি তিনবছরের হয়েও কথা বলেনি। আকারে ইঙ্গিতে ভাব বুঝিয়ে দেয়। একদিন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে সে উপস্থিত হয়ে শ্রীমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়। শিশুটি মাকে আগেও দেখেছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তখনও সে সৌভাগ্য হয়নি। কথা না বললেও সে অস্থির হয়েছে উপরে যেতে. যেখানে শ্রীমা রয়েছেন। সেদিকে যাবারই ইচ্ছা প্রকাশে সে ব্যাকুল। প্রথমে কেউ বোঝে না, সে কী চাইছে। পরে বুঝতে পেরে সেবক তাকে উপরে নিয়ে যায়। সে শিশুটি মার চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করে, এরপর নেমে এসে পিতার হাত ধরে টানতে থাকে—চায় তাঁকে মায়ের চরণপ্রান্তে উপস্থিত করাতে। গিরিশচন্দ্র কেঁদে উঠে বলেন—"ওরে আমি মাকে দেখতে যাব কি? আমি যে মহাপাপী।" বালক কিন্তু তাঁকে ছাড়বে না। তখন নিরুপায় মহাকবি তাকে কোলে নিয়ে, কম্পিত দেহে, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে উপরে যান। শ্রীমায়ের পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে বলেন—"মা এ হতেই তোমার শ্রীচরণে দর্শন হল আমার।"—এই শিশু কিন্তু তিনবছর বয়সে লোকান্তরিত হয়। নিদারুণ শোকে গিরিশচন্দ্র মুহ্যমান, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ তাঁকে শ্রীমায়ের কাছে জয়রামবাটীতে গিয়ে কিছুকাল বাস করতে অনুরোধ করেন। সেখানে শ্রীমায়ের স্নেহে-যত্নে-আশীর্বাদে গিরিশচন্দ্রের শোক যেমন প্রশমিত হয়, তেমনই জগজ্জননীকে তিনিও একান্তভাবে আশ্রয় করেন।

আমরা মনে করি শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র 'শিবুদাদা'র প্রসঙ্গটি। ঠাকুর ও মায়ের স্নেহে,

তাঁদের কোলেপিঠে সমাদৃত হয়েছেন এই দেবশিশুরা। 'শিবুদা'র ভিক্ষামাতা ছিলেন শ্রীমা স্বয়ং। শিবুদাদাকে মা বিশেষ স্নেহ করতেন। শ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর মা একবার কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী আসছেন। ছেলেমানুষ শিবুদাদা কাপড়ের পুঁটুলি মাথায় করে সঙ্গে চলেছেন। জয়রামবাটীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ শিবুদার কী মনে হল দাঁড়ালেন। মা দেখেন পিছন ফিরে যে শিবুদাদা দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মা বলেন, "ও কি রে, শিবু এগিয়ে আয়।" শিবুদাদা বলেন, "একটি কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।" মা বলেন, "কি কথা?" শিবুদাদার প্রশ্ন : "তুমি কে বলতে পার?" মা বলেন, "আমি আর কে? আমি তোর খুড়ি।" শিবুদা বলেন, "তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।" তখন বেলা শেষ হয়ে আসছে। বিব্রত-কণ্ঠে মা বলেন, "দেখ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ। তোর খুড়ি।" শিবুদার উত্তর : "বেশ তো তুমি যাও না।" শিবুদাকে নিশ্চল দেখে মা শেষে বললেন, (বলতে বাধ্য হলেন) "লোকে বলে কালী।" শিবুদা আবার বলেন—"কালী তো? ঠিক?" মা বললেন, "হ্যাঁ"।

এই বালকমনের আবদারে তিনি নিজের স্বরূপের কথা নিজের মুখে বলেছেন। শ্রীমায়ের বিচিত্র সংসারে এরাই ছিল দেবশিশু, তাঁর অতি স্নেহের পাত্র। সেইসব শিশুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল কখনও মা, কখনও সরলা বালিকার মতন। মায়ের চরিত্রে এও এক মধুর হৃদয়স্পর্শী দিক।

মাতৃসান্নিধ্যে তিন কন্যা

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমার জীবনীর সঙ্গে তাঁর তিন ভাইঝি নলিনী, সুশীলা (মাকু) ও রাধারাণীর (রাধু) নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর নরলীলার অনিবার্য শরিক তাঁরা। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী-পাঠকদের জানা আছে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর মা যখন শরীরত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন স্বয়ং ঠাকুর রাধুকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "একে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।"[১] স্বামী গম্ভীরানন্দ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে লিখেছেন, "শ্রীভগবান শ্রীশ্রীমায়ের সদা উর্ধ্বগামী মনকে ব্যবহারিক জগতে বাঁধিয়া রাখিয়া স্বীয় যুগধর্মপ্রবর্তনকার্য সুসম্পাদিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র স্নেহনিগড় রচনা করিতেছিলেন।"[২] বস্তুত ঘটেও ছিল তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর প্রায় চৌত্রিশ বৎসর কাল শ্রীমা এই ধরাধামে বিরাজ করেছেন। এই সময়কালে তিনি লোকশিক্ষায় নিয়ত ব্যাপৃত থেকেছেন—হাজার হাজাব নরনারীর হৃদয়ে সমাজ-বোধ, জীবন-বোধ ও ধর্ম-বোধ জাগ্রত করেছেন এবং সেইসঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করেছেন, ভাবী সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘেরও একটি পরিকাঠামো গড়ে দিয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীমার কর্মকাণ্ড ধীরচিত্তে বিশ্লেষণ করলে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পরে তাঁর জীবদ্দশায় অবস্থানের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হয়। তাঁর মতো সাধ্বী সন্ন্যাসিনী তাপসীর সংসার-জালে আবদ্ধ থাকার কথা কল্পনাই করা যায় না; অথচ সামান্য এক বালিকাকে অবলম্বন করে লৌকিকজীবনের গ্রন্থিতে তাঁকে আবদ্ধ করলেন ঠাকুর স্বয়ং! শুধু রাধারানী নয়, ঘটনাক্রমে অন্যান্য ভাইঝিরাও সংসারে তাঁর সঙ্গে থেকেছেন, তাদের সকলকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে মায়ের জীবনযাত্রা। শ্রীশ্রীমার এই অবস্থিতির সুযোগে তাঁর মহাশিক্ষা, মহাসান্নিধ্য ও আশীর্বাদলাভের সুযোগ পেয়েছেন অগণিত সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী! শ্রীশ্রীমার উর্ধ্বগামী মনকে লৌকিক জীবনে নিবদ্ধ করে রাখার দাবিদার ওই তিন বালিকা—নলিনী, সুশীলা ও রাধারাণী। রাধু তথা রাধারাণী সেই আখ্যায়িকার মূলচরিত্র হলেও নলিনী ও সুশীলার (মাকু) ভূমিকা কোনও অংশে লঘু নয়। মার লৌকিক লীলার যথার্থ রূপায়ণে তাঁরা নিজ নিজ ভূমিকা সুচারুরূপে পালন করে গেছেন। ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, হিংসা, কলহ, বিবাদ, শুচিবায়ুগ্রস্ততা, সংকীর্ণতা প্রমুখ সীমাবদ্ধ মানবিক প্রবৃত্তির পসরা নিয়ে তাঁরা শ্রীশ্রীমার নিবিড় সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। ভক্তহৃদয় তাঁদের উপস্থিতিকে উৎপাত মনে করেছে,—অনেকে মনে মনে বিরক্তি বোধও করেছেন। কিন্তু বিশ্লেষণী হৃদয় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। কারণ, তাঁরা কোনও একক

ব্যক্তি নন। তাঁরা হলেন এই মাটির পৃথিবীর শোক-তাপ জর্জরিত, লোভ-লালসা পুষ্ট, স্বার্থ-সংকীর্ণতা আবিষ্ট গণচেতনার প্রতিভূ! তাঁরা যেন কোটি কোটি সীমাবদ্ধ সংসারী মানুষের হয়ে—সংসারী মানুষের জন্যই—শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন—মাকে আবদ্ধ করে রেখে—মানবমুক্তির নিশানা বের করে নিয়েছেন। সংসার-জীবনের শত সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের দিগ্‌দর্শন ওই শ্রীমুখ থেকে কি নির্গত হত যদি এঁরা তাঁদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে শ্রীমাকে সর্বদা উদ্‌ব্যস্ত করে না তুলতেন। তাই শ্রীশ্রীমার জীবনচিত্রে আবির্ভূত তিন রমণী নলিনী, সুশীলা ও রাধারাণী আমাদের প্রণম্যা। এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তাঁদের জীবনীর চালচিত্র রচনা করা আর তার মধ্যে লক্ষ্য করা শ্রীশ্রীমার লোকশিক্ষার অমেয় বাণীধারা!

নলিনীদিদি

শ্রীশ্রীমার বড়ো ভাই প্রসন্নমামার প্রথমপক্ষের স্ত্রী রামপ্রিয়া দেবী দুই কন্যা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন ১৯০৫ সালে। এই দুই কন্যার জ্যেষ্ঠা হলেন নলিনীদিদি এবং কনিষ্ঠা হলেন সুশীলাদিদি (মাকুদি)। নলিনীদিদি ছোটোমামী সুরবালার (রাধুর মা) প্রায় সমবয়সী ছিলেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের আরম্ভে রাধুর জন্মের অল্প পরেই বড়ো মামার অল্পবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনীর বিবাহ হয়।[৩] জামাতার নাম প্রমথনাথ ভট্টাচার্য—বাড়ি কামারপুকুরের নিকটস্থ গ্রাম গোঘাটে। নলিনীর বিবাহের সময় শ্রীশ্রীমার স্নেহধন্য সন্তান আশুতোষ মিত্র জয়রামবাটীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর 'শ্রীমা' গ্রন্থে সমকালীন সমাজ-প্রথা ও নলিনীর বিবাহকালীন ঘটনা বিবৃত করেছেন। সেই অংশ উদ্ধৃত কবা হচ্ছে : "প্রথমবার জয়রামবাটীতে আমাদের থাকিতে থাকিতে শ্রীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীর বিবাহ হয়। পাত্রটি হুগলী জিলার গোহাট (গোঘাট) গ্রামনিবাসী। নাম—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। ..মামারা (শ্রীমার ভ্রাতৃবর্গ) শ্রীমাকে দিয়া আমাদের উভয়কে (আমাকে ও মোক্ষদাচরণকে) আদেশ করাইলেন, যাহাতে আমরা বিবাহ-আসরে বরযাত্রীদের সহিত তর্ক করি।

"আমরা আসিয়া আসরে বসিয়া বরযাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরেজীতে তর্ক করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা? উত্তরে জানা গেল, তাঁহাদের কেহই ইংরেজী জানেন না। সংস্কৃতের বিষয় মোক্ষদাচরণের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ একই উত্তর পাওয়া যায়। অগত্যা তাঁহাদের অনুরোধে মোক্ষদাচরণ 'বিবাহ' অর্থে কি বুঝায়, শাস্ত্রানুসারে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন।"[৪]

শ্রীশ্রীমার ব্যবস্থাপনায় সুচারু রূপে নলিনীর বিবাহ সম্পন্ন হলেও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সুসম্পর্ক তিনি গড়ে তোলেননি। তিনি প্রায়শই শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতেন বাপের বাড়িতে (জয়রামবাটীতে)। যদিও সে ঘটনা বেশ কিছুদিন পরে। তার আগেই আমরা জানাই নলিনীদিদির বিবাহের কিছুদিন পরেই তাঁর স্বামী প্রমথনাথ ভীষণ অসুস্থ হন। "প্রসন্নমামা তখন সিমলা স্ট্রীটে একখানি ছোট খোলার বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করেন।... মামার পরিবারে তখন বড়মামী এবং তাঁহাদের দুই কন্যা—নলিনী ও মাকু ছিলেন; জামাতাও সেখানে বাস করিতেছিলেন। এই সময় প্রমথ অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—রোগ ডবল নিউমোনিয়া বলিয়া নির্ণীত হইল। শ্রীমা সর্বদা জামাতার সংবাদ লইতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। প্রমথের চিকিৎসাব্যপদেশে একজন ডাক্তার

মাতাঠাকুরানীর পদাশ্রয় লাভ করেন।"[৫]

প্রথম পর্বে নলিনীদিদির শ্বশুরবাড়ির প্রতি উল্লাস ও উৎসাহ থাকলেও অচিরেই সে পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইত্যবসরে ১৯০৫ সালে তাঁর গর্ভধারিণী রামপ্রিয়া দেবী কলেরা রোগে মারা যান। দুই কন্যার দায়িত্ব এসে পড়ে শ্রীশ্রীমার উপর। এর আগেই ১৯০০ সালে মার ছোটো ভাই প্রয়াত অভয়চরণের কন্যা রাধারাণী ভূমিষ্ঠ হলে তার দায়িত্ব শ্রীশ্রীমা নিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের পর তিন ভাইঝির (নলিনী, সুশীলা ও রাধারাণীর) দায়িত্ব তাঁর উপরেই বর্তায়। এখন বিশেষভাবে নলিনীদিদির শ্বশুরবাড়ির প্রতি মমত্বের নমুনা উপস্থাপনে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের লেখনীই অনুসরণ করা হচ্ছে: "শ্বশুরবাড়ির দারিদ্র্য ও অনাদরের জন্য নলিনীদিদির সেখানে থাকা সম্ভব হইত না; তাঁহার জননীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি পিসীমার সহিত বাস করিতেছিলেন। ...শ্বশুরালয়ে স্নেহে বঞ্চিতা নলিনীদিদির প্রতি মায়ের একটা স্বাভাবিক স্নেহ ছিল; সুতরাং দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই তিনি এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিজ সকাশে রাখিতেন। একরাত্রে যখন সকলে ঘুমাইতেছেন, তখন নলিনীদিদির স্বামী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য নিজবাটী গোহাট হইতে গরুর গাড়ি লইয়া জয়রামবাটীতে আসিলেন—উদ্দেশ্য, নলিনীদিদিকে লইয়া যাইবেন। দিদি শ্বশুরবাটীর আতঙ্কে দরজায় খিল দিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, আত্মহত্যা করিবেন। শ্রীমা দ্বার খুলিতে অনেক সাধাসাধি করিলেন; পরে কথা দিলেন যে, এবারে তাঁহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠানো হইবে না; তখন দিদি বাহিরে আসিলেন। গোলমালে সারারাত্রি কাটিয়া গেল; শ্রীমা ততক্ষণ লণ্ঠন জ্বালিয়া দিদির দরজায় বসিয়া কাটাইলেন। প্রভাত হইলে আলো নিবাইয়া তিনি ঠাকুরদের নাম করিতে লাগিলেন। 'গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী; ভাগবত, ভক্ত, ভগবান; ঠাকুর ঠাকুর।' পরে কথায় কথায় বলিলেন, 'ওর পিসীর বাতাস লেগেছে, বাবা, তাই যেতে চায় না'।"[৬]

নলিনীদিদির প্রকৃতি: নলিনীদিদির শুচিবায়ুগ্রস্ততা ও কলহপ্রিয়তা তাঁর চরিত্রের এক বৈশিষ্ট্য। সেসম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদেশানন্দের বিবরণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: "নলিনী-দিদির ভীষণ শুচিবাই, কখন কি অশুচি স্পর্শ হইয়া যাইবে সেই ভয়ে সদা সর্বদা সন্ত্রস্তা। আর কে কখন ছুঁইয়া দিবে, এই ভাবনা সদাসর্বদা। মাতাঠাকুরানীর এইসব ছোঁয়াছুঁয়ি নাই; সেজন্য নলিনীদিদি আপসোস করিয়া বলেন, 'পিসিমা তো এঁটো পাতা মাড়িয়েই চলে যাবেন; আব যেদিন বলেন, 'নলিনী, হাতে একটু গঙ্গাজল দাও তো', সেদিন আমি বুঝতে পারি ঠিক, খুব অশুচি কিছু মাড়িয়েই এসেছেন।' নলিনীদিদির এই শুচিবাই লইয়া মাকে অনেক সহিতে হয়। এক একদিন মাত্রা এমনি বাড়ে যে, বাড়ি শুদ্ধ সকলে অস্থির! আবার কেহ কেহ কটাক্ষ করিয়া বলে, 'আজ নলিনীদিদির পিসিমার কাছ থেকে কিছু একটা বড় দাঁও মারার মতলব, তাই এই আয়োজন!' মা যেমন করিয়াই হউক তাহাকে শান্ত করিবেনই।... একদিন সন্ধ্যায় নলিনীদিদি আসিয়া পিসিমাকে দুঃখের সহিত কাঁদো-কাঁদো স্বরে জানাইলেন যে, তিনি ময়লা ছুঁইয়া ফেলিয়াছেন, এখন ঠাণ্ডায় স্নান করা অসম্ভব, আর স্নান না করিয়া ঘরে যাওয়াও চলে না, কাজেই রাত্রে খাওয়াও চলিবে না, শোয়াও যাইবে না, ঠাণ্ডায় বারান্দায় বসিয়াই রাত কাটাইতে হইবে। মা অনেক বুঝাইলেন—গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে বা কাপড় ছাড়িয়া হাত পা ধুইয়া আসিলেই হইবে। কিন্তু নলিনীদিদি মানিলেন না; দুঃখে অভিমানে নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া রহিলেন, যেন মায়েরই সকল দোষ!... সকলে খাইয়া শুইতে গেল এবং নলিনীদিদির প্রতি বিরক্ত হইয়া মাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিয়া গেল, তিনি যেন

নলিনীদিদির জন্য আর কষ্ট না করেন, তাহাকে সাধ্য-সাধনা না করেন, তাহাকে একটু শিক্ষা দেওয়া ভালো। নলিনীদিদির দুঃখ অভিমান বাড়িতেছে; এবার থাকিয়া থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্না আর বিলাপ আরম্ভ হইল—'সংসারে কেউ দেখবার নেই, স্বামীর ঘরে স্থান হল না, বাপের ঘরে এলাম; বাপের দ্বিতীয় সংসার, বিমাতা আছেন, তাঁর সঙ্গে কি থাকা যায়? পিসিমা আছেন, স্নেহ করেন, স্থান দিয়েছেন। অন্যেরা হিংসা করে, এখানেও থাকা কঠিন হচ্ছে। ভগবান এমনি নির্দয়। দুঃখে-দুঃখেই আমার জীবন যাবে।'[৭] এহেন ঘটনাকালে বাড়ির সকলে নিদ্রামগ্ন। মায়ের ঘুম নেই। তিনি আবার নলিনীর কাছে হাজির হলেন। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করলেন। নলিনীর অসহায়ত্ব ও নির্বুদ্ধিতা মা প্রতিনিয়তই ক্ষমা করে যেতেন। নলিনীদিদির শুচিবাইয়ের নমুনা অনেক—বাড়িতে ডোমেরা বিড়া, কুলো, চ্যাঙারি প্রমুখ জিনিস নিয়ে বিক্রির জন্য হাজির হলে, চাষবাসের জন্য নিম্নজাতের মজুররা হাজির হলে বা ঘর তৈরির মুসলমান মজুররা ঘরে খাওয়া-দাওয়া করলে (সবই মায়ের ব্যবস্থাপনায়) নলিনীদিদির শুচিবাই প্রবণতার উৎকট প্রকাশ মাকে প্রতিনিয়তই সামাল দিতে হত।

নলিনীদিদির কলহপ্রবণতার কথা শ্রীশ্রীমার জীবনী পাঠকের জানা। ছোটো মামী সুরবালার সঙ্গে তাঁর অহি-নকুল সম্বন্ধ। প্রতিনিয়তই ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে দুজনের কলহ লেগে থাকে। মা প্রয়োজনে নলিনীদিদিকে মুরুব্বি বানিয়ে কখনও-সখনও তাঁর পরামর্শ চান। সে-মুহূর্তে নলিনীদিদি একটু মর্যাদা পেয়ে সঠিক কথা বলতে থাকেন। নবাসনের বৌদির (মন্দা/ মন্দাকিনী রায়) সঙ্গেও মাঝে মাঝে কলহে লিপ্ত হতেন। সর্বোপরি শ্রীশ্রীমার সঙ্গেও সে কলহের সীমারেখা থাকত না। উদ্বোধনে থাকাকালে কম্বলওয়ালীর সঙ্গে দুপয়সা নিয়ে তুমুল বাদানুবাদেও প্রবৃত্ত হতেন।[৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বামীর জীবদ্দশায় নলিনী স্বাভাবিকভাবে শ্বশুরবাড়িতে থাকেননি এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁর স্বামী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য প্রয়াত হলে শ্বশুরালয়ে আর কোনওদিনই পদার্পণ করেননি। শ্রীশ্রীমার সংসারের অন্যতম পরিজন হিসেবেই বসবাস করেছেন, এমনকি তাঁব বিমাতা (প্রসন্নমামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) সুবাসিনী দেবীর সংসারেও থাকেননি। শ্রীশ্রীমার কলকাতা গমনাগমনে প্রায়ই সঙ্গিনী হয়ে তাঁর সঙ্গে থেকেছেন। কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে এবং মায়ের নতুন গৃহ নির্মিত হলে সেখানেও থেকেছেন। শ্রীশ্রীমার মহাপ্রয়াণকালে উদ্বোধনে ছিলেন এবং তারপর কিছুকাল ছিলেন জয়রামবাটীতে। জয়রামবাটীতেও বেশিদিন সুস্থির থাকতে পারেননি। কিছুদিন জয়রামবাটীতে থাকার পর কিশোরী মহারাজকে অনুরোধ জানান যে তিনি কলকাতায় মায়ের গৃহে থাকবেন। কিশোরী মহারাজের অনুরোধে এবং শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় নিবেদিতা স্কুলে কিছুকাল বসবাস করেন এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৯]

১৯২৮-২৯ সালে প্রায় তিরিশ বছর বয়সে নলিনীদিদি ধরাধাম ত্যাগ করে শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করেন। তাঁর অন্তিমকালের প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন : জীবদ্দশায় নলিনীদিদি প্রতিনিয়ত যেমন শ্রীমাকে ব্যস্ত রাখতেন, অতিষ্ঠ করে তুলতেন, অন্তিমকালেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি—তখনও তিনি প্রতিনিয়তই পিসিমা, পিসিমা রবে তাঁর কুঠুরি মুখরিত রেখেছিলেন। রোগ-যন্ত্রণা মুক্তির জন্য নলিনীদি বলতেন, পিসিমা নিয়ে যাও... আমায় ফেলে গেলে তুমি সেই... সবাই হেনেস্তা করছে... এসব দেখেও তুমি চুপ করে আছ? শেষদিন

সকালে নলিনীদির মুখ থেকে পিসিমা শব্দের বদলে 'মা' নিয়ে যাও, 'মা' নিয়ে যাও... এই শব্দই উত্থিত হয়েছিল।[১০]

নলিনীদিদি ও আমাদের প্রাপ্তি : শ্রীশ্রীমার জীবনীতে বিবৃত নলিনীর প্রসঙ্গ যেমন বেমানান, তেমনই আড়ষ্টতাক্লিষ্ট। শ্রীশ্রীমায়ের আলোকমণ্ডিত জীবনে নলিনীদিদির সংকীর্ণতা, শুচিবায়ুগ্রস্ততা এবং কলহপ্রবণতা পাঠককুলের বিরক্তির উদ্রেক করে। অথচ মহিমান্বিতা মা তা হেলায় হাসিমুখে বরণ করেছেন। বিশ্লেষণী চেতনায় বিচার করলে দেখা যাবে ওই সীমাবদ্ধতা-জর্জর নলিনীদিদি আমাদের অনেক-কিছু উপহার দিয়েছেন, যা শ্রীশ্রীমার জীবদ্দশায় অপর কোনও ভক্ত বা সেবক দ্বারা আহৃত হয়নি। সেই মহাপ্রাপ্তির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন নলিনীদিদি! নলিনীদিদির সঙ্গে কথোপকথনে শ্রীশ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্যগুলি স্মরণ করি :

* শ্রীশ্রীমা বলেন, "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।" এখানে মার অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও সর্বজনীন মাতৃত্বের অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই।

* নলিনীদিদির মাধ্যমে ঠাকুরকে পূজা ও ভোগনিবেদন করার আন্তরিক ভাবটি মায়ের মুখ থেকে জানার সুযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন স্বামী ঈশানানন্দ : "নলিনীদি ঠাকুরকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে সাহস পান নাই। মা তাঁহাকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বিশেষভাবে বলায় নলিনীদি বলিতেছেন, 'পিসিমা, তুমি তো ভোগ দেবার সময় ঘর থেকে পঞ্চপাত্রে জল ও তুলসীপাতা নিয়ে রান্নাঘরে ঠাকুরকে, 'রান্না হয়েছে, খাবে এসো',—বলে পেছনে পেছনে ডেকে নিয়ে যাও; তা আমি ঠাকুরকে কি বলে ও-রকম ক'রব? আমি পারব নি।... মা... নলিনীদিকে দিয়াই আজ ভোগ দেওয়াইবেনই এবং একটু রহস্য করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'কেন তুইও আমার মতন ঠাকুরকে চিন্তা করে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে যাবি। তুইও বলবি, 'পিসেমশাই, ভাত খাবে চলো'! এই বলে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভাতের পাথর দেখিয়ে দিয়ে ঐ পঞ্চপাত্রের জলের ছিটে দিয়ে দিবি। ঐ করলেই তিনি খুব খুশী হয়ে খাবেন'খন! তোকে অতশত ভাবতে হবেনি।'"[১১]

ঠাকুরের মুহুর্মুহু ভাবসমাধি হত, শ্রীশ্রীমায়েরও একবার ভাবসমাধি হয় কোয়ালপাড়ায়। সেই মহাদৃশ্য দর্শনের অন্যতম সাক্ষী হলেন নলিনীদি এবং ভাবসমাধিক্ষণে মা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে নলিনীদিদি তা লক্ষ্য করেন এবং অতি সন্তর্পণে মায়ের মাথায় ও চোখে জল দিয়ে এবং বাতাস করে তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। পরে নলিনীদি মাকে ওইরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মা তাঁদের অন্য কথা বলে ভাবসমাধির কথা চেপে যান। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি নিজমুখে ওই দিনের ভাবসমাধির কথা স্বামী ঈশানানন্দ মহারাজের কাছে স্বীকার করেছেন : "... কোয়ালপাড়াতে অত জ্বর হতো, বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়তাম কিন্তু হুঁশ হলে শরীরটার জন্য যখনই তোমাদের কষ্ট হবে মনে করে তাঁকে স্মরণ করতাম, তখনই তাঁর দর্শন পেতাম—সেবার জয়রামবাটী থেকে দুর্বল শরীর নিয়ে কোয়ালপাড়ায় এসে একদিন দুপুরে বারান্দায় বসে আছি; নলিনীরা একটু দূরে বসে কি সব সেলাই করছে; খুব রোদ, চারদিক রোদে খাঁ খাঁ করছে। দেখি যেন দরজা দিয়ে ঠাকুর এসে ঠাণ্ডা বারান্দায় বসেই শুয়ে পড়ছেন। আমি তা দেখে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলটা পেতে দিতে গেছি। পেতে দিতে গিয়ে ঐ অবস্থায় কেমন হয়ে গেলাম।

রাধারাণী

নলিনীদিদি

মাকুদিদি

কেদারের মা-টা সব নানারকম গোলমাল করতে লাগলো। তাই তাদের তখন বলেছিলাম, 'ও কিছু নয়, বোধ হয় তোদের সূচে সুতো দিয়ে মাথাটা কেমন হয়ে গেল!"[১২]

* নলিনীদিদির সঙ্গে সুবাসিনীদেবীর ঝগড়া হয়েছিল; চিঠিতে সেকথা জেনে মা সুবাসিনীদেবীকে লিখেছিলেন, "সময়ে সবই সহ্য করতে হয়; সময়ে ছাগলের পায়েও ফুল দিতে হয়; তুমি ঠাকুরের সন্তান, তুমি শত্রুর সঙ্গে মিত্র ব্যবহার করবে, তাতে ঠাকুরই তোমার মঙ্গল করবেন।"[১৩]

* নলিনীদি, মাকুদি প্রমুখ কয়েকজন বাড়ির মেয়েরা গল্প করছেন মা নিকটেই বসে আছেন। হঠাৎ মা নলিনীদিকে সম্বোধন করে বললেন, "বল দেখি নলিনী, কোন্ জিনিসটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়?" তখন নলিনীদি বললেন, "কেন পিসিমা, মানুষ যাতে সুখে থাকতে পারে, আর এই জ্ঞান, ভক্তি—এইসব প্রার্থনা করতে হয়।" শ্রীশ্রীমা ধীরে ধীরে বললেন, "নলিনী, সে তো হলো, কিন্তু এক কথায় বলতে গেলে তাঁর কাছে অন্তর থেকে 'নির্বাসনা' প্রার্থনা করতে হয়। কেন না, বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্ম মৃত্যুর কারণ আর মানুষের মুক্তিপথের অন্তরায়, বুঝলি—নলিনী?"[১৪]

* নলিনীদিদি মাকে প্রশ্ন করেন : "আচ্ছা পিসিমা, লোকে যে তোমাকে অন্তর্যামী বলে, সত্যিই কি তুমি অন্তর্যামী?" মা একটু হাসলেন মাত্র। কিন্তু নলিনীদিদি আবার শক্ত করে ধরলে মা বলিলেন, "ওরা বলে ভক্তিতে। আমি কী মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—আমার আমিত্ব যেন না আসে।"

সুশীলাদিদি (মাকুদি)

প্রসন্নমামার দ্বিতীয় কন্যা (প্রথম পক্ষের) সুশীলাদিদির জন্ম ১৮৯৬ সালে। ১৯০৫ সালে বড়ো মামী রামপ্রিয়া দেবী পরলোকগমন করলে, নলিনীদিদি ও সুশীলাদিদির (মাকুদি) দায়িত্বও মার ওপর এসে পড়ে। প্রসন্নমামা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে পুনরায় সংসার গড়ে তুললে তাঁর দুই কন্যা বড়োই অসহায় বোধ করেন। শ্রীশ্রীমা সে-মুহূর্তে তাঁদের চির আশ্রয় দেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহ এবং আত্মীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখার দায়িত্বও নিতে হয়েছিল মাকে। মায়ের স্নেহযত্নে বেড়ে ওঠার সময় বারো বছর বয়সে ১৯০৮ সালে (রাধুর বিয়ের তিনবছর আগে) তাজপুরের বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রমথনাথের সঙ্গে সুশীলাদির (ওরফে মাকুদি) বিবাহ হয়।[১৫] যেহেতু মাতৃহারা সন্তান এবং বাবা উদাসীন, শ্রীমাকেই সুশীলাদির বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হয়।

বিবাহ হওয়ার পর সুশীলাদি শ্বশুরবাড়ি তাজপুরে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এসে থাকতেন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার কাছে। সেই কারণে শ্রীশ্রীমার কলকাতা যাতায়াতের সময় নলিনীদি, মাকুদি ও রাধুকে প্রায়ই উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। কেবল মাকুদিই নয়, তাঁর স্বামী প্রমথনাথও অনেকসময় থাকতেন জয়রামবাটীতে।[১৬] কলকাতায় অবস্থানকালে "তিনি সুশীলা ও রাধারাণীকে নিকটস্থ একটি মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করাইয়াছিলেন। তারা মধ্যে মধ্যে মায়ের পত্রাদি লিখিয়া দিত এবং তাঁহার নির্দেশমত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াও শুনাইত।"[১৭]

মায়ের কাছে গর্ভধারিণী মায়ের তুল্য আবদার ও দাবি নিয়েই বসবাস করেছিলেন মাকুদি। পূজার সময় নতুন বস্ত্র আনার ব্যবস্থা করেছিলেন মা তাঁদের জন্য। বরদা মহারাজ স্বদেশি বস্ত্র আনলে তাঁদের তা পছন্দ হয়নি; তাঁরা চান বিলাতি বস্ত্র। তাঁদের খুশি করতে মা পুনরায় আবার অন্য সেবক মারফত দামি বিলাতি বস্ত্র আনিয়ে ভাইঝিদের দিয়েছিলেন।[১৮]

কেবল রাধুর নয়, মাকুদির মনকেও সদা আনন্দময় রাখতে মা তাঁদের কোনও সাধ অপূর্ণ রাখেননি। ১৯১৯ সালে মা বিষ্ণুপুর থেকে তাঁর অন্যান্য ভাইঝি-সহ জয়রামবাটী যাত্রা করলেন। বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে এক জ্যোতিষীর সঙ্গে মাকুদি ও মায়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী ও তার ক্রিয়া-পারম্পর্য নিচে দেওয়া হল : "ইনি একজন ভাল জ্যোতিষী। এখানেই বাড়ি, কলকাতায় থাকেন। এঁর গুরু কলকাতায় একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। নাম নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ। ইহা শুনিয়া অনেকেই হাত দেখাইতে উৎসুক হইল এবং রাধু ও মাকুদিও আসিয়া হাত দেখাইবে জিদ ধরিল। যুবক জ্যোতিষী... মাকুদির হাত দেখিয়া বলিলেন, 'ইহার পর পর কয়েকটি সন্তানের পরস্পর (কাহারও সহিত কাহারও) দেখা হইবে না।' জ্যোতিষীর এইসকল কথা শুনিয়া মাকুদি ভীত ও শশব্যস্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়া সকল কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। মা মাকুদিকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া কিছু পরে জ্যোতিষীকে নিকটে ডাকাইয়া তাহার মুখে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'বাবা তুমি ছেলেমানুষ, এরূপ কোন গ্রহের অরিষ্ট যোগ আছে দেখলে তোমার মাকুকে না বলে গোপনে আমাদের বললেই ভাল হত। যাই হোক, এখন তোমাদের জ্যোতিষী বিধানে এর কোন প্রতিকার থাকলে বলো। তার ব্যবস্থাদি না করলে এদের সান্ত্বনা দেবো কি ভাবে? ...জ্যোতিষী মাকে বলিলেন, 'আমাদের মতে এখন সংকল্প ক'রে তিনদিন নিজে চণ্ডীপাঠ অথবা শুদ্ধভাবে পাঠ শ্রবণ ক'রে, তারপর হোম, স্বস্ত্যয়ন এগুলি বিধিপূর্বক করতে হয়।' মাকুদির তখন আড়াই তিন বৎসরের সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুলক্ষণযুক্ত সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র পুত্রসন্তান বর্তমান, এদিকে মাকুদি আসন্ন সন্তানসম্ভবা। জ্যোতিষীর হঠাৎ ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণীতে সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। মা কোয়ালপাড়ায় আসিয়া জ্যোতিষীর নির্দেশমত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদির যথাযথ অনুষ্ঠান করাইলেন।"[১৯]

এই কালপর্বে (যখন মায়ের দুই ভাইঝিই রাধু ও মাকু আসন্নপ্রসবা) শ্রীশ্রীমা তাঁর পরিবারের সকলকে সঙ্গে নিয়ে কোয়ালপাড়ায় প্রায় আটমাস (জানুয়ারি থেকে আগস্ট) অবস্থান করেন। এইসময়ের মাকুদি-সংশ্লিষ্ট দুটি ঘটনা বিশেষ স্মরণীয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের লেখনী থেকে তা উদ্ধৃত হচ্ছে: "মাকুর দায়িত্ব শ্রীমা নিজের উপর লইয়াছিলেন। তাহার কল্যাণের জন্য তিনি তাহার শ্বশুরবাড়ির লোককে পর্যন্ত সন্তুষ্ট রাখিতেন; বলিতেন, 'তাহাদের খুব আদর-যত্ন না করলে একটুতেই ফোঁস করে।' মাকু রাধু অপেক্ষা কিছু বড়। শ্রীমা যখন কোয়ালপাড়ায় রাধুকে লইয়া বাস করিতেছিলেন (ইং ১৯১৯) তখন নলিনীদিদির মনে এই ভাবিয়া ঈর্ষার উদয় হইল যে, শ্রীমা রাধুর জন্য অযথা অর্থব্যয় করিতেছেন, অথচ আসন্নপ্রসবা মাকুর দিকে দৃষ্টি দিতেছেন না।... তিনি কারণে-অকারণে পাগলিমামীর সহিত ঝগড়া বাধাইতে লাগিলেন; অবশেষে মাকুকে পরামর্শ দিলেন যে, এই অনাদরের মধ্যে তাহার ওখানে না থাকিয়া জয়রামবাটী চলিয়া

যাওয়া উচিত। শুধু তাহাই নহে, মায়ের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি নিজেই পালকি ডাকাইয়া মাকু ও তাহার পুত্র ন্যাড়াকে লইয়া তথায় চলিয়া গেলেন।... দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমা দুঃখ করিয়া বরদা মহারাজকে বলিলেন, 'যাবার সময় ছেলেটাকে পর্যন্ত প্রণাম করিয়ে নিয়ে গেল না। যা হবার তাই হবে, আমি আর কি করি বল?' "[২০]

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের বৈশাখ মাস। বরদা মহারাজ জয়রামবাটীতে এসে মাকুদি প্রভৃতির সংবাদ নিয়ে কোয়ালপাড়া ফিরলেন এবং মাকে জানালেন যে, সকলে ভালোই আছে কেবল ন্যাড়ার একটু সর্দি লেগেছে। অন্তর্যামিনী মা নিশ্চয় কিছু বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সামান্য সর্দির কথা শুনেও অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বরদা মহারাজকে বারবার জানালেন যে, বৈকুণ্ঠ মহারাজ (বাঁকুড়ার ডাক্তার তখন কোয়ালপাড়ায় অবস্থান করছেন) যেন কাল একবার দেখে আসেন। যথারীতি বরদা মহারাজ ডাক্তার মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে ন্যাড়াকে দেখে এলেন। ডাক্তার মহারাজ ন্যাড়ার গলার ভিতর দেখেই বুঝেছিলেন ওই রোগ মারাত্মক ডিপথেরিযা। সংবাদ মাকে জানালে তিনি চিন্তিত হলেন। এই রোগের ওষুধ তখন ওই অঞ্চলে পাওয়া যেত না। ওষুধের জন্য বরদা মহারাজ পায়ে হেঁটে আরামবাগে এসে শরৎ মহারাজকে টেলিগ্রাম করলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ ওষুধটি কিনে রাত্রের ট্রেনে বিষ্ণুপুরের সুরেশ্বর সেনের মেজোভাই ভূপেশ্বর সেন মারফত সেটি পাঠিয়ে দেন। ন্যাড়ার রোগের চিকিৎসার জন্য মায়ের নির্দেশে বরদা মহারাজ আবামবাগের ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়কেও সংবাদ দিয়েছিলেন এবং তিনি রাত্রেই জয়রামবাটী হাজির হয়ে ন্যাড়ার রোগ উপশমে নানা চিকিৎসা শুরু কবেছিলেন। পরদিন বেলা ন-টা নাগাদ ওষুধ হাজির হল, কিন্তু রোগ তখন চরম পর্যায়ে। ওষুধ প্রয়োগ করা হল। তথাপি ন্যাড়াকে বাঁচানো গেল না। বেলা পাঁচটা নাগাদ ন্যাড়া মারা গেল। ন্যাড়ার মৃত্যুসংবাদ কোয়ালপাড়ায় পৌঁছালে মা ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলেন এবং দীর্ঘদিন তার শোক বহন করেছিলেন।[২১]

শ্রীশ্রীমার জীবনী-পাঠক মায়ের জীবনী অনুসরণকালে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, মায়ের কাছে রাধুর দাবি প্রথম হলেও পরবর্তী স্নেহধন্যা হিসেবে মাকুদি এসেছেন। শ্রীশ্রীমার নির্দেশমতো মাকুদি লেখাপড়া শিখেছিলেন, মাকে বই ও পত্রিকা পড়ে শোনাতেন এবং বিভিন্ন ভক্তদের চিঠির উত্তর দিতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে মাকুদির সম্পর্ক প্রসঙ্গে যা তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তার আলোকে মাকুদির কিছু সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছে। নিচে তা দেওয়া হল :

"মাকুদি জয়রামবাটী ও কলকাতায় শ্রীশ্রীমার কাছে যখন থাকতেন, তখন তাঁর স্বামী প্রমথনাথও মাঝেমাঝে সেখানে এসে বাস করতেন। মাকুদি শ্রীশ্রীমাকে পিসিমা বলে সম্বোধন করলেও, তাঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও আবদার জানাতেন। তাঁর বিশেষ আবদার ছিল, মার আহারের পর তাঁর প্রসাদ-গ্রহণ। সেই কারণে কোনও দিন আহারের শেষে মাকুদিকে কাছে দেখতে না পেলে মা ডাকতেন, 'মাকি, কোথা গেলি, তাড়াতাড়ি আয়!' মাকুদির একবার শরীর খারাপ হয়। বেশ কিছুদিন জ্বর ভোগ করেন, জ্বরের ঘোরে মা, মা বলে ডাকতে থাকেন। শ্রীশ্রীমা তার বিমাতা সুবাসিনী দেবীকে বললেন, মাকুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে। সুবাসিনী দেবী মাকুদির কপালে হাত বোলাতে থাকলে, মাকুদি বললেন, 'মা কোথায় গেল? মা কোথায় গেল?' শ্রীশ্রীমা বুঝতে পারলেন মাকুদি তাঁকেই খুঁজছেন। তিনি মাকুদির শিয়রে বসে কপালে হাত বোলাতে থাকলে মাকুদি বলেন, 'মা তুমি কোথাও

যেওনি; মা, তুমি কোথাও যেওনি।' মা বলেন, 'না রে, তোদের ছেড়ে যাব কোথায়?' শ্রীশ্রীমার ছোঁয়া পেয়েই পরদিন মাকুদি সুস্থ হয়ে উঠেন। মাকুর প্রথমপুত্র ন্যাড়ার মৃত্যুর পর মাকুদি একদিন মাকে ধরে বসলেন, 'আচ্ছা পিসিমা, সবাই তোমার কাছে দীক্ষা নিচ্ছে, তাদের শোকতাপ চলে যাচ্ছে, আমাকেও দীক্ষা দাও না, তাহলে আমারও ফাঁড়া কেটে যাবে;' মা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আচ্ছা হবে।' মাকুদি নাছোড়বান্দা! পরের দিন মা যখন পূজায় বসেছেন, তখনই মাকুদি মার কাছে বসে জোর করে বলেন, পিসিমা দীক্ষা দাও নইলে তোমাব কাছেই মাথা ঠুকে মরব। শ্রীশ্রীমা তখনও তাঁর বাড়ির স্বজনবর্গের কাউকেই দীক্ষা দেননি; মাকুদি জোর করেই শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পরে সুবাসিনী দেবী, রাধু, মন্মথ, ভূদেব ও তাঁর স্ত্রী (প্রভাবতী) শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নেন।''[২২]

শ্রীশ্রীমা শেষবারের মতো যখন জয়রামবাটী ত্যাগ করে কলকাতামুখে যাত্রা করেন, তখন বিধির বিধানে, মার পালকিতে মার সঙ্গে ছিলেন মাকুদি। শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য বোঝাতে সংক্ষেপে সেই যাত্রার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে : "১২ই ফাল্গুন বেলা ৭/৮টার সময় যাত্রাকাল স্থির হইয়াছে।... যাত্রার পূর্বদিন হঠাৎ রাত্রে রাধু বায়না ধরিল, সে তাহার খোকাকে লইয়া পালকিতে যাইবে না।... মা তখন বলিলেন, 'রাধু তা হ'লে খোকাকে নিয়ে গরুর গাড়িতে যাবে, এবং মাকু তার খোকাকে নিয়ে ঐ পালকিতে আমার সঙ্গে যাবে।' জয়পুরে মা পালকি নামাইতে বলিলেন।... মা মাকুর খোকার দুধ গরম করিয়া দিয়া নিকটের পুকুরে হাত-পা ধুইয়া আসিয়া বলিতেছেন, 'আমার জন্য দু'টি মুড়ি এনে দাও। আমিও দুটি চিবুই। আর তোমার (বরদা মহারাজ) ও মাকুর জন্য কিছু তেলে-ভাজাটাজা পাও তো মুড়ির সঙ্গে নিয়ে এসো।''[২৩] উদ্বোধনে মা যখন লীলাসংবরণে উদ্যত, সেদিন বলে উঠলেন, "রাধু, নলিনী এরা সব সেদিন হরির সঙ্গে দেশে চলে গেল না কেন? তুমি (বরদা মহারাজ) ওদের সবাইকে জয়রামবাটীতে রেখে এসো। এখানে থাকার দরকার নেই।" একথা শুনে নলিনীদি প্রমুখরা নীরব হলেন আর মাকুদি অসহায় অবস্থায় নীরবে কাঁদতে থাকলেন। পুনরায় মা তাঁদের রাখতে সম্মত হলেন।

মাকুদির স্বামী ও সন্তানগণ : মাকুদির স্বামী প্রমথনাথের নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আগেই হয়েছে কিন্তু তাঁর চরিত্রচিত্রণ হয়নি। তিনি তাজপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র (অন্যান্য পুত্রগণ হলেন প্রভাকর, রমেন্দ্র ও কালীপদ)। প্রমথনাথের সঙ্গে তাঁর সেজভাই রমেন্দ্র প্রায়ই জয়রামবাটীতে মাতৃসান্নিধ্য উপভোগ করতেন। প্রমথনাথ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তবে তাঁর ডান-পা আঘাতে জখম হওয়ায় একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। একটু গম্ভীর ও রাশভারি ব্যক্তি ছিলেন। পঠন-পাঠনে মেধাবীই ছিলেন এবং ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তাঁর পড়াশোনার সাফল্যের জন্য শ্রীশ্রীমা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। শ্রীশ্রীমার এক কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান রেলের বড়ো অফিসার ছিলেন। বিবাহের কিছুদিন পর প্রমথদের অবস্থা পড়ে যাওয়ায় এবং জামাতা শিক্ষিত দেখে মা তাঁর ওই ভক্তসন্তানকে তাঁর তিন স্নেহধন্য সন্তান প্রমথ, মন্মথ ও রমেন্দ্রকে রেলে চাকুরির ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। মার সেই সন্তান মার নির্দেশমতো প্রমথনাথ, মন্মথ ও রমেন্দ্রের রেলে চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। মন্মথ চাকুরিতে যোগদান করেননি, রমেন্দ্র কিছুদিন কাজ করার পর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন এবং প্রমথনাথ বরাবর সুনামের সঙ্গে চাকুরিতে বহাল ছিলেন। তিনি রাণীগঞ্জে স্টেশনমাস্টারের পদে কর্মরত

বাধুব স্বামী মন্মথ

নলিনীব স্বামী প্ৰমথ

মাকুব স্বামী প্ৰমথ

ছিলেন। মাকুদি যেহেতু মায়ের কাছে অধিকসময় থাকতেন সেই কারণে তিনি প্রায়ই চাকরিতে ছুটি নিয়ে মায়ের কাছে আসতেন। শ্রীশ্রীমার প্রয়াণের পর মাকুদি রাণীগঞ্জে স্বামীর কাছেই থাকতেন এবং সেখানেই ১৯৩০ সাল নাগাদ চৌত্রিশ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর কন্যা ও পুত্র নাবালিকা ও নাবালক। প্রমথনাথ আনুড় নিবাসিনী অন্নপূর্ণাদেবীকে বিবাহ করেন। অন্নপূর্ণা দেবীও তিনপুত্র রেখে অকালে চলে যান। প্রমথনাথ কর্ম থেকে অবসর নিয়ে তাজপুরে বসবাস করেন এবং ১৯৫৬ সালে বাহাত্তর বছর বয়সে প্রয়াত হন।

মাকুদির প্রথম সন্তান ন্যাড়ার প্রসঙ্গ প্রায় সকলের জানা। ন্যাড়া ১৯১৯ সালে ডিপথিরিয়া রোগে মারা গেলে মা শোকাতুর হন। তিনি ন্যাড়া প্রসঙ্গে বলতেন, "ছেলেটা যোগভ্রষ্ট সাধক বা মহাপুরুষ ছিল। সামান্য একটু বাকি ছিল; সেটুকু ভোগ হয়ে গেল—শেষ জন্ম। এই বয়সের ছেলের মধ্যে অত সৎ সংস্কার দেখা যায় না। কোথা থেকে রোজ গুলঞ্চ ফুল এনে আমার পায়ে দিয়ে পূজো করতো। শরৎকে সে লালমামা বলতো। লিখতে পড়তে কিছুই শেখেনি—মাত্র আড়াই তিন বছর বয়স। শরতের অনুকরণে একটা ভাঙ্গা কাঠের বাক্সের সামনে রোজ শরৎকে চিঠি লিখতে বসতো—কি কি লিখছে এখানের সংবাদ—সব মুখে বলতো।"[২৪] ন্যাড়ার মৃত্যুর বছরই মাকুদির দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। সে সন্তানও শ্রীশ্রীমার স্পর্শলাভে ধন্য হয়েছে। সেও কয়েক বছরের মধ্যে মারা যায়। তৃতীয়জনও শৈশবেই মারা যায়। চতুর্থ সন্তান হলেন আনন্দময়ী (১৯২৩) এবং পঞ্চম সন্তান শম্ভুচন্দ্র (১৯২৮)। প্রমথনাথের দ্বিতীয় স্ত্রীও অকালে প্রয়াত হওয়ায় আনন্দময়ী দেবী শম্ভুচন্দ্র ও অন্যান্য ভাইদের প্রতিপালন করেন। মাকুদির পুত্রগণ পরপর মারা যাওয়ায় মাকুদির অনুরোধক্রমে প্রমথনাথ বিশেষ হোম-যজ্ঞ করে ঠাকুরের পুষ্পার্ঘ্য সমন্বিত অষ্টধাতুর এক বিশালায়তন মাদুলি শম্ভুচন্দ্রের হাতে দিয়েছিলেন এবং শম্ভুচন্দ্র সেটি আজীবন ধারণ করে রেখেছিলেন।

মাকুদি ও মার আশীর্বাণী : মাকুদির সঙ্গে মার কথোপকথনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমার বিশেষ নির্দেশ ও উপদেশ আমরা পেয়েছি, যা সকলের পক্ষেই শিক্ষাপ্রদ।

মনসা নামে জয়রামবাটীর জনৈক তরুণ সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে, মাকুদি শ্রীশ্রীমার উদ্দেশ্যে বলেন, "পিসিমার যেমন কাজ! অমন সব ভালভাল ছেলেদের সাধু করে দিচ্ছেন! বাবা-মা কত কষ্ট করে মানুষ করে মুখ চেয়ে আছে, তাদের কত আশা। সে সব চুরমার হয়ে গেল!... বে-থা করা—সেও তো একটা সংসার-ধর্ম। পিসিমা, তুমি যদি ও-রকম সাধু ক'রে দাও, মহামায়া তোমার উপর চটে যাবেন। সাধু হতে হয় নিজেরা হোক গে। তোমার নিমিত্ত হতে যাওয়া কেন?"

শ্রীশ্রীমা তার উত্তরে বলেন, "মাকু ওরা সব দেবশিশু, সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের আর কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ, তা তো সব দেখছিস।.... ভগবানকে ডাকুক আর না ডাকুক যে বে না করে, সে তো অর্ধমুক্ত। তার যে-

সময়ে একটু ভগবানে মন হবে, সেই সময়েই সে হু হু ক'রে এগুতে থাকবে।"[২৫]

কথাপ্রসঙ্গে মাকুদিকে বলেছিলেন, "মেয়েদের লজ্জা সরম মেনে চলতে হয়; যার আছে ভয়, তার হয় জয়।" আরও বলেছিলেন, "যদি শান্তি চাস, কারো দোষ দেখবি না—শান্ত থাকতে চেষ্টা করবি। নিজের থেকে না পারলে ঠাকুরকে জানাবি আর বলবি ঠাকুর সদ্‌বুদ্ধি দাও, সৎচিন্তা দাও।"

রাধারাণী

রাধারাণী বা রাধু শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীর নিকট একটি পরিচিত নাম। শ্রীবামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীশ্রীমায়ের যে সংসার তা মূলত রাধুকে আশ্রয় করেই। শ্রীশ্রীমার স্নেহের ছোটো ভাই অভয়চরণ ডাক্তারি পড়তে পড়তে প্রয়াত হলে তিনি অন্তিম মুহূর্তে শ্রীশ্রীমার কাছে তাঁর পত্নী সুরবালা ও ভাবী সন্তানের (সুরবালা সেসময় আসন্নপ্রসবা) দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান এবং মা তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ২৬ জানুয়ারি, ১৯০০-তে রাধু ভূমিষ্ঠ হন। তারপর থেকেই তিনি শ্রীশ্রীমার কাছে প্রতিপালিত। কার্যত শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর শ্রীশ্রীমা স্থূলশরীরে থাকতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তা চাননি; সেই কারণে এই রাধুকে অবলম্বন করে শ্রীশ্রীমাকে ধরাধামে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠাকুর স্বয়ং। রাধুর বিষয়ে জনৈক ভক্তের কাছে মা বলেছিলেন : "ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হু হু করছে, আর প্রার্থনা করছি, আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে?—সেই সময় হঠাৎ দেখলাম, লাল কাপড়-পরা দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর অমনি মনে হলো ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয করে থাকো। তোমার কাছে কত ছেলেরা এখন আসবে।' পরক্ষণেই তিনি অন্তর্ধান করলেন। মেয়েটিকেও আর দেখতে পাইনি। তার কিছুকাল পবে, একদিন এই জয়রামবাটীতে পশ্চিমদিকে মুখ করে বসে আছি, ছোট বউ (সুরবালা) তখন বদ্ধপাগল, কতকগুলো কাঁথা-কাপড় বগলে করে টানতে টানতে ঐ দিকে যাচ্ছে; আর রাধু হামাগুড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে। তাই দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। ছুটে গিয়ে রাধুকে কোলে তুলে নিলাম। মনে হলো, আহা! তাইতো, একে আমি না দেখলে কে আর দেখবে? বাবা নেই, মা ওই পাগল। এই মনে করে যেই ওকে কোলে তুলে নিয়েছি, অমনি ঠাকুরকে সামনে দেখলাম। তিনি বলছেন, 'এই সেই মেয়েটি, ওকে আশ্রয় করে থাকো। এটি যোগমায়া!' "[২৬]

রাধু সারদা দেবীকে মা বলে ডাকতেন এবং গর্ভধারিণী সুরবালাকে 'নেড়ী-মা' বলে ডাকতেন; কারণ মাথা গরমের জন্য সুরবালার মাথার চুল সব উঠে গিয়েছিল। ছেলেবেলায় রাধুর স্বাস্থ্য ও স্বভাব বেশ ভালো ছিল এবং সকলকে ব্যবহারে মুগ্ধ করতেন। কলকাতায় থাকাকালীন রাধুকে শ্রীশ্রীমা একটি মিশনারি বালিকা বিদ্যালয়ে উচ্চ প্রাথমিক অবধি পড়িয়েছিলেন।[২৭] সে কারণে রাধু মায়ের বিভিন্ন ভক্তদের চিঠির উত্তর লিখে দিতেন এবং মাঝে মাঝে মাকে উদ্বোধন পড়ে শোনাতেন। শরৎ মহারাজ রাধুকে তাঁর সরলতার জন্য

খুব ভালবাসতেন।

রাধুর বিবাহ হোক—এ ইচ্ছা শ্রীশ্রীমার ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাধু কুমারী থেকে ঠাকুরের সেবায় জীবন অতিবাহিত করুক। কিন্তু রাধুর মা সুরবালা রাধুর বিবাহের জন্য শ্রীশ্রীমাকে অতিষ্ঠ করেন। রাধুর তখন বারো বছর বয়স। মাকে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয়। সেইসময় (১৯১১) গৌরী-মা জয়রামবাটীতে এসেছিলেন। তাজপুরের জমিদার মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মন্মথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়। "মায়ের নির্দেশে গৌরী-মা তাজপুরে গেলেন। পথিমধ্যেই মন্মথনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই কিশোর তখন গাছ হইতে আম সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিল। মন্মথনাথ এবং তাহার আত্মীয় পরিজনের সহিত গৌরী-মা পরিচয় করিয়া আসিলেন।"[২৮] যে গৃহে রাধুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সেই বংশেই মাকুর (সুশীলার) বিবাহ হয়েছিল। মাকুদির স্বামী প্রমথনাথ, রাধুর ভাবী বর মন্মথনাথের জ্ঞাতি দাদা।

১০ জুন, ১৯১১ মন্মথনাথের সঙ্গে রাধুর বিবাহ হল। শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ অলংকারে সুসজ্জিত (সোনার মুকুট সহ) রাধুর বিবাহানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছিল। মায়ের বড়ো ভাই প্রসন্নকুমার 'কন্যা সম্প্রদান' করেছিলেন। রাধুর বিবাহানুষ্ঠান সম্পর্কে দুর্গাপুরী দেবী এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন : "রাধারাণীর বিবাহোৎসবটি ছিল বৈচিত্র্যময়। একদিকে বিবাহের ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছে, অন্যদিকে প্রভুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা-বন্দনা চলিতেছে, মাতাঠাকুরাণী সমবেত সন্তানগণের দণ্ডবৎ গ্রহণ করিতেছেন। বিবাহের পর মঙ্গলময়ী পিসিমাতা কল্যাণীয়া রাধারাণীকে আশীর্বাদ করিলেন—'রাধি, গয়না-শাড়ী পেয়ে যেন ঠাকুরকে ভুলিসনি। ঠাকুরই সব, আর সবই মিছে।' "[২৯]

রাধুর বিবাহ স্থির হওয়ার পর জনৈক জ্যোতিষী কোষ্ঠী বিচারে মন্তব্য করেছিলেন যে, রাধুর বৈধব্যযোগ আছে।[৩০] একথা শুনেও মা রাধুর বিবাহ-সম্পর্কে পূর্বসিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেননি। মায়ের আশীর্বাদেই সে বিঘ্ন তিরোহিত হয়েছিল তা পরে আলোচিত হবে।

রাধু শ্রীমায়ের ছায়াসঙ্গিনী হয়ে তাঁর সঙ্গে কলকাতা, কাশী, কোঠার, দক্ষিণভারত, পুরী, বৃন্দাবন, সর্বত্রই ভ্রমণ করেছেন। শ্রীশ্রীমা তার চাহিদা কিছু অপূর্ণ রাখেননি, তবু মাকে রাধুর অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়। পদে পদে তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলেন রাধু। সন্তানপ্রসবের পর রাধু বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে শ্রীশ্রীমাকে গালি দেয় এবং একদিন একটি বড়ো বেগুন দিয়ে মায়ের পিঠে সজোরে আঘাত করে। পরমকল্যাণময়ী জননী, ব্যথা সহ্য করে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রাধুর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন : "ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ!"[৩১]—এই বলে নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে রাধুর মাথায় দিলেন।

মন্মথনাথ : রাধুর স্বামী মন্মথনাথ রাধুর সঙ্গে প্রায়ই জয়রামবাটীতে এবং কলকাতায় অবস্থান করতেন। জমিদার বংশের সন্তান হওয়ায় কোনও জীবিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না। পরবর্তী কালে জমিদারি বিনষ্ট হওয়ায় অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি সংগীতপ্রিয় এবং রসিক ছিলেন। তাস খেলতে ভালোবাসতেন। তাঁর সংগীত-চর্চার জন্য মা তাঁকে একটি হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন। জমিদার বংশে জন্মানোর ফলে মন্মথর স্বেচ্ছাচারী ভাবও ছিল। কোয়ালপাড়ায় থাকাকালে মঠের নিয়মকানুন না মানায় মঠাধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হলে, তিনিও রেগে আহার না করেই তাজপুর অভিমুখে রওনা দিতে চেয়েছিলেন। পরে মা তাঁকে শান্ত করেন। কেবল মন্মথনাথকেই নয়, রাধুর কল্যাণের জন্য মা মন্মথনাথের পরিবারবর্গকে

মাকুর কন্যা আনন্দময়ী
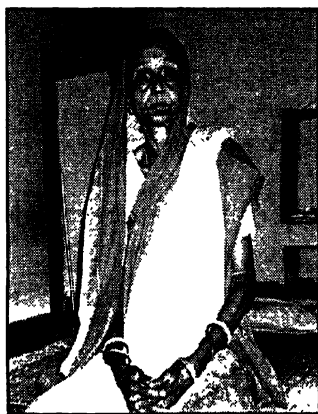
রাধুর কন্যা নির্মলাদেবী

মাকুর পুত্র শম্ভু

খুশি রাখতেন। প্রায়ই তাঁদের নিমন্ত্রণ করে অতিযত্নে আহারাদি করাতেন। রাধুর খুড়শ্বশুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমার চেয়ে বয়সে প্রবীণ হলেও (সম্পর্কে তিনি মায়ের বেয়াই) তিনি শ্রীমাকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।[৩২] তিনি মন্মথনাথকে বারবার সংযত হয়ে চলতে নির্দেশ দিতেন। মন্মথনাথ অত্যন্ত আবেগ-প্রবণ হলেও খুব সৌখীন ও রসিক ছিলেন। তরুণ বয়সে যখন পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট, তখন ঘরের মধ্যে ছোটো চিড়িয়াখানা বানিয়েছিলেন এবং সেখানে ময়ুর, কাকাতুয়া, খরগোস, নেউল, সাদা ইঁদুর, পায়রা প্রভৃতি রেখেছিলেন।[৩৩] গোলাপের বাগানও তৈরি করেছিলেন। পরিণত বয়সে ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে রসিকতা করতেন। দু-হাতের আঙুল নিয়ে বিভিন্ন কৌতুক নক্‌শা দিতে পারতেন এবং তাতে বাচ্চা ছেলেরা খুব আনন্দ পেত।[৩৪] জমিদারি পড়ে যাওয়ার পর অর্থকষ্ট দেখা দিলে শ্রীশ্রীমা প্রমথনাথ (মাকুর স্বামী) ও মন্মথনাথকে (রাধুর স্বামী) রেলে চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন কিন্তু মন্মথনাথ খামখেয়ালিপনায় সে জীবিকা গ্রহণ করেননি।[৩৫]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জ্যোতিষী-মতে রাধুর বৈধব্যযোগ ছিল। রাধুর বিবাহের বেশ কিছুদিন পর, জামাতা মন্মথনাথ মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে চাইলে মা তাঁকে দীক্ষা দেন এবং তিনি মন্মথকে বলেন, "বিধির বিধানে হাত দেওয়া অনুচিত হলেও, এই দীক্ষার প্রভাবে রাধুর বৈধব্য খণ্ডিত হতে পারে।"[৩৬] ১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমা লোকান্তরিতা হলে তাঁর দেহত্যাগের নয় মাস পরে রাধুর স্বামী মন্মথ এপ্রিল, ১৯২১ সালে হিরণ্ময়ী দেবীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা রাধু জয়রামবাটীতে অবস্থান করলেও মন্মথ আর্থিক অনটনের জন্য রাধুর নিকটে যেতেন। রাধু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না।[৩৭]

শ্রীশ্রীমার প্রয়াণের পর মন্মথনাথ শ্রীশ্রীমার বিশেষ স্নেহধন্য সন্তান বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষের নিকট প্রায়শই যাতায়াত করতেন এবং পরিচিত ডাক্তার মহারাজের (স্বামী মহেশ্বরানন্দ) নিকট বাঁকুড়া আশ্রমে একাদিক্রমে বহুদিন বাস করতেন। সময়ে অসময়ে বিভূতিবাবু তাঁকে বিশেষ অর্থসাহায্যও করতেন। তাঁর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি তাঁকে বাঁকুড়ায় একটি বইয়ের দোকান করে দিয়েছিলেন কিন্তু সেটি তিনি চালাতে পারেননি।[৩৮] পরবর্তী কালে রাধুর অনুরোধে শরৎ মহারাজের আর্থিক সহায়তায় তাজপুরে মন্মথনাথ একটি দোকান করে তার আয় থেকে দিন গুজরান করতেন।[৩৯] ১৯৬১ সালে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে মন্মথনাথ মারা যান।
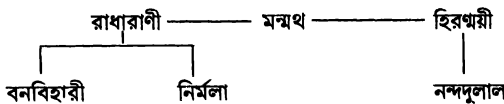
রাধারাণীর সন্তান-সন্ততি : শ্রীশ্রীমার জীবনী-পাঠক রাধুর সন্তানপ্রসব ও শ্রীশ্রীমার ব্যস্ততা ও অতিচিন্তা প্রসঙ্গ অবগত আছেন। রাধুর আসন্নপ্রসবা অবস্থায় তিনি বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বর সেনের গৃহে জনৈক জ্যোতিষীর (নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ) মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে রাধুর 'সুখপ্রসব হইবে না'।[৪০] সেই চিন্তায় শ্রীশ্রীমা তার সহজ প্রসবের ও দেহের সুস্থতার জন্য তিরলের ক্ষ্যাপাকালীর বালা পরানো, তান্ত্রিক মাধ্যমে চণ্ড নামানো

ও নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান করেছিলেন। কোনও কিছুতেই কিছু উপশম হয়নি। প্রসবের দিন নিকটবর্তী হলে কোয়ালপাড়ায় রাধুর জন্য বাঁকুড়ার ডাক্তার মহারাজ (স্বামী মহেশ্বরানন্দ) ও কলকাতা থেকে ধাত্রীবিদ্যাকুশলা সরলা দেবী উপস্থিত ছিলেন। রাধু স্নায়বিক অবসাদে দীর্ঘদিন ভোগায় চিকিৎসকগণ ভেবেছিলেন যে, এই প্রসবে অস্ত্রোপচার আবশ্যক। বস্তুত রাধুর সন্তান প্রসবকালে (মে, ১৯১৯) কোনওরূপ অস্ত্রোপচার আবশ্যক হয়নি। রাধুর এই সন্তানের নাম 'বনবিহারী' (ডাক নাম বনু)। যেহেতু সে অরণ্যাকীর্ণ কোয়ালপাড়ায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সেই কারণে শ্রীশ্রীমা তার ওইরূপ নামকরণ করেছিলেন। ওই পুত্রের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থাও করেছিলেন শ্রীশ্রীমা।

রাধুর পুত্র বনবিহারীর সামগ্রিক পরিচিতি পাওয়া যায় স্বামী পরমেশ্বরানন্দের বিবরণীতে : "রাধুর ছেলেটিকে (বনবিহারী) শ্রীশ্রীমা গোপালের মতো চোখে কাজল দিয়া কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া সাজাইতেন এবং গোপাল বিগ্রহের ন্যায় খাওয়াইতেন, চুলগুলিও চূড়া করিয়া বাঁধিয়া দিতেন। বাস্তবিক সুন্দর ছেলেটিকে ঠিক গোপালের মত বোধ হইত।"[৪১]... "শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির পর রাধুর ছেলেটির অবস্থা এরূপ হইল যে, উহাকে আর চেনাই যাইত না। ছেলেটি ক্রমশ কৃশকায় ও অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা ছেলেটিকে গোপালের ন্যায় চন্দন ও কাজল দিয়া সাজাইতেন। ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া চলিত, তখন এবং পরে যখন হাঁটিতে শিখিল তখন তাহাকে ঠিক গোপালের মতো সুন্দর দেখাইত। ঐ ছেলেটি সম্পর্কে শ্রীশ্রীমাকে একদিন বলেছিলাম, 'মা, আপনি গোপালের পুজো করে সাক্ষাৎ গোপাল এনেছেন।' তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ, বাবা, তাই বটে। সাধকই তো দেবতা আনেন।"[৪২] বাস্তবিক তাই ঘটেছিল। শ্রীশ্রীমার মহাপ্রয়াণের পর রাধু যখন তাঁর পুত্রকে নিয়ে জয়রামবাটী ফিরলেন তখন তাঁর পুত্র বনবিহারীর ভগ্নস্বাস্থ্য, বিকৃত শরীর। কিছু কাল রোগে ভুগে সে ইহলীলা সাঙ্গ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মন্মথনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ দ্বারা নতুন সংসার গড়লেও রাধুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। শ্রীশ্রীমার মহাপ্রয়াণের পর জয়রামবাটী ফিরে রাধু মায়ের নতুনবাড়িতে (দক্ষিণদ্বারী) সপুত্র অবস্থান করতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ রাধুর মাসিক খরচের টাকা পাঠিয়ে দিতেন। জয়রামবাটী থেকে রাধু পুনরায় তাজপুরে স্বামীর ঘরে যান। যথারীতি সেখানে অশান্তির শিকার হন এবং মানসিক কষ্ট পেতে থাকেন। রাধু জানতেন শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষের স্নেহের সম্পর্কের কথা। শ্রীশ্রীমার তিরোভাবের পর রাধু বিভূতিবাবুর কাছে তাঁর অভাব-অভিযোগ, নানাবিধ সমস্যার কথা ব্যক্ত করতেন। ১৯২০ সালে ৩০ আগস্ট ও ১৪ ডিসেম্বরের দুটি চিঠি রাধুর শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান সম্পর্কে এক বেদনাদায়ক চিত্র প্রকাশ করে। চিঠি দুটি নিচে উদ্ধৃত :

শ্রীহরি

তাজপুর

পরমপূজনীয়,

পরে বিভূতিদাদা,

তুমি কেমন আছো লিখিবে। তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যদিও মাসে ১ বার আসতে পাল্লে ভাল হয়। ও আসিয়া বড়ো মারামারি করিয়াছে। আমায় প্রত্যহ মারিতেছে ও

গালাগালি দিইতেছে। যদি পার ১ দিনের কি ২ দিনের ছুটী লয়ে এসে নিয়ে যেওো। না হলে কোনদিন মারিয়া ফেলিবে। আপনাদের আমি মা, বাবা মনে করিয়া (থাকি) তাই জানাই। আপনি শত কাজ ফেলিয়া দয়াকরে নিয়ে যাবেন। মনে রাখিবেন। মনে করিবেন। যেন ভুলিও নাই। বড় ব্যস্ত হইয়াছিলাম। রোজ শাস্তি পাইয়াছি। বেশ শাস্তি পাইয়াছি। অতি অবশ্যই নিয়ে যাবেন। তুমি প্রণাম জানিবে।

ইতি তোমার ভগিনি রাধারাণী

পত্রপ্রাপকের ঠিকানা পরম পূজনীয়া শ্রীমান বিভূতি ভূষণ ঘোষ বাঁকুড়া জেলা, বাঁকুড়া হিন্দুস্কুল। ঘোটকপাড়া।

পোস্টকার্ডটিতে ডাকঘরের যে ছাপ রয়েছে তা হল BANKURA 31 AUG, 1920, 7 AM.

২ নং চিঠি

শ্রীশ্রীহরি স্বহায়

রবিবার
২৮শে অঘ্রাণ।
তাজপুর

পরমপূজনীয়

প্রণাম শতকোটি নিবেদনমিদং পরে বিভূতি দাদা, তুমি আমার প্রণাম জানিবে। পত্র দিয়াছি, বোধ হয় পাইয়াছ। তুমি যে তুমি যে বলেছিলে, আমাকে লিখিবে; আমি যাইব; যেয়ে আনিব। কই তাতো এলে নাই। বোধ হয় শ্রীচরণে অপরাধ হইয়াছে বলিয়াই আসিবে নাই? দয়া করে এসো একবার। আমি বড় কষ্টে কাল যাপন করিতেছি। দয়া করে একখানি পত্রও দাও নাই। মা গেছে বলে এ তো আমাব ফেলে দিয়াচো? আমি তোমাদের মা-বাপ্ মনে করে পত্র দিই। তোমরা আর আমায় দেখবে নাই? দুঃখিনি ভগিনিকে দয়া করে একবার পত্র দিও। আসবে কিনা আমাকে জানাবে। বৌকে (কমলা ঘোষ) পত্র দিতে বলবে। শতকাজ ফেলে একবার আসবে। এর (মন্মথ) পাঠাবার খুব মত, বলে কে নিয়ে যাবে বলো? আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মহারাজ দাদা (কিশোরী মহারাজ) বলেছেন, 'নিয়ে এনে কোথায় রাখিব? মানিয়ে চলো না।' তুমি দয়া করবে নাই? তোমার দুটি পায়ে পড়ি। একবার আসিবে। দয়া কর, পত্রপাঠ উত্তর দিবে। পথপানে চেয়ে রইলাম।

ইতি
তোমাদের শ্রীচরণে রাধু

পত্রপ্রাপকের ঠিকানা শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতি ভূষণ ঘোষ বাঁকুড়া হিন্দুস্কুল। ঘোটকপাড়া। বাঁকুড়া, Bankura

পোস্টকার্ডটিতে যে ছাপ রয়েছে তা হল :
ANUR, HOOGHLY : 12 DEC, 1920
BANKURA : 14 DEC, 1920, 7 AM.

চিঠি দুটিতে বানান ও অন্যান্য সবই অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অর্থবোধের জন্য প্রয়োজনমতো কমা, পূর্ণচ্ছেদ ও জিজ্ঞাসা চিহ্ন সংযোজন করা হয়েছে। ওই চিহ্নগুলি মূল চিঠিতে ছিল না। প্রথম বন্ধনীর মধ্যস্থিত বিষয়গুলিও সংযোজন করা হয়েছে।

বর্ণিত চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীশ্রীমার প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই রাধু শ্বশুরবাড়ি যায় এবং নিগ্রহের শিকার হয়। আমাদের অনুমান, নিশ্চয় বিভূতিবাবু তারপর রাধারাণীকে জয়রামবাটীতে মায়ের ঘরে রেখে যান। এ-সমস্ত ঘটনা ১৯২০ সালের শেষের দিকে। ১৯২১ সালের এপ্রিলে মন্মথনাথ দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। অর্থের প্রয়োজনে মন্মথনাথ রাধুর কাছে জয়রামবাটীতে আসতেন এবং অবস্থান করতেন। রাধুর দ্বিতীয় সন্তান নির্মলা দেবীর জন্ম হয় ১৯২৬ সালে। নির্মলা দেবী (বর্তমান বয়স সাতাত্তর বয়স) জানান যে, তিনি তাঁর অভিভাবক হিসাবে জানেন জয়রামবাটীর কিশোরী মহারাজ আর উদ্বোধনের সত্যেন মহারাজকে। তাঁরাই তাঁকে মানুষ করেছেন। তাঁর শৈশব কেটেছে নিবেদিতা স্কুলের হস্টেলে। পড়াশোনা সেখানেই। তিনি সরলা মাসিমার স্নেহ পেয়েছেন। একটু বড়ো হলে রঘুবাটী গ্রামের বৈদেহীনন্দন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন কিশোরী মহারাজ। মন্মথনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেন, তার নাম নন্দদুলাল। কুড়ি বছর বয়সে নন্দদুলাল টাইফেয়েড রোগে মারা যান। মন্মথনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে আমরা পরবর্তী পর্বে দেখব রাধুর সেবায় নিয়ত ব্যাপৃতা।

রাধুর শেষ অধ্যায় : রাধুর শেষ অধ্যায়ের প্রত্যক্ষদর্শী বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) যে বিবরণ দিয়েছেন তারই অংশবিশেষ উদ্ধৃত হচ্ছে :

"১৩৪৭ সালের (১৯৪০) ভাদ্রমাস। শ্রীশ্রীমায়ের পরম আদরের রাধু জয়রামবাটীতে মায়ের ব্যবহৃত ঘরখানিতেই বাস করিতেছে। কিছুদিন হইল ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া খুবই অসুস্থ হইয়া রাধু কলিকাতা নিবেদিতা স্কুল বাড়িতে আসিয়াছে। স্বামী আত্মবোধানন্দজী ডাক্তার দেখাইলে তাঁহারা 'টি.বি' সন্দেহ করিলেন। কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীকে (প্রিয় মহারাজ) জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেবাশ্রমের নিকটেই একটি বাড়ির দোতলাটি ভাড়া লইয়া রাধুকে পাঠাইবার জন্য তার করিলেন। আত্মবোধানন্দজী আমাকে অনুরোধ করিলেন, নির্দিষ্ট দিনে নিবেদিতা স্কুলের একটি সেবিকাসহ রাধুকে কাশী লইয়া যাইতে।"

রাধুর কাশীতে চিকিৎসা চলতে থাকে। বরদা মহারাজ কলকাতা ফিরে আসবেন; রাধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে রাধু জানায় : "বলি গোপালদা, আমার কি অসুখ হয়েছে তা আমি জানি, তোমরা যতই গোপন কর না কেন। আমার যক্ষ্মা হয়েছে। এ রোগে বুঝি আবার কেউ বাঁচে নাকি?... তুমি কাশীতে রেখে যাচ্ছ, কারণ কাশীতে মরলে আমার মুক্তি হবে। এতদিন মায়ের কাছে থেকে এই বুদ্ধি হলো তোমার? যিনি জন্মাবধি আমার সব ভার নিয়ে সকল ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর সেই ঘরখানিও আমার ব্যবহারের জন্য জীবনস্বত্ব করে গেছেন, আমি তাঁর চির আশ্রিত! তিনি কি আমার 'মুক্তির' ব্যবস্থা করেননি? আমি যদি আঁস্তাকুড়েও পড়ে

মরি, আমার মুক্তি তাঁর কৃপায় আমার হাতের মুঠোয়, সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না দাদা!"[৪৩] সকলের অনুরোধে রাধু কিছুদিন কাশীতে অবস্থান করে জয়রামবাটী ফিবে আসেন। জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে মন্মথনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। রাধুর কন্যা নির্মলাকে তিনি শৈশবে পরিচর্যা করেছিলেন। রাধুর ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মারোগে তিনি আন্তরিকভাবে রাধুর সেবা করেছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী পঁচাত্তর বছর বয়সে (১৯৪০) তাজপুরে প্রয়াতা হন।

রাধু দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে একদা বিভূতি ঘোষের স্ত্রী কমলা ঘোষকে জানিয়েছিলেন : "আমি দীক্ষার কথা মাকে কিছুই বলিনি। হঠাৎ একদিন মা পুজোর আসনে বসে, রাধী শোন, বলে আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, গায়ে গঙ্গাজল নে, আসনটা পেতে পাশে বোস। তারপর আমায় মন্ত্র দিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম সেরে উঠতে উঠতে বলতে লাগলেন, 'অনেক তো হলো, এবার একটু দেখো!' আমি কিছুই বুঝিনি বৌদিদি; তবে দীক্ষার পর থেকেই শরীরটা অনেক সেরে গেছিল।"[৪৪] ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ রাধারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে রাধু বলেছিলেন, "আমি তো তাঁকে (শ্রীশ্রীমাকে) নিজের পিসিমা বলেই জানতুম। আমি কি জানতুম যে, তিনি মানুষ নন, দেবতা!—এই কথাগুলি বলেই রাধু অজ্ঞান হয়ে যান।"[৪৫]

রাধুর অন্তিম মুহূর্তের কিছু সংবাদ জানিয়েছেন কিশোরী মহারাজ : "রাধু এখানে (জয়রামবাটীতে) আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। দেখিলাম, কতকগুলি কিশোরী বালিকা শ্রীমন্দিরের কাঠের রেলিং-যুক্ত পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! তাহাদের মধ্যে লাল টুকটুকে চেলীপরিহিতা একটি সুন্দরী মেয়ে। তাহার কানে কুণ্ডল। তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হইল। মেয়েটির দিকে আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? মেয়েটি উত্তর দিল, আমি রাধু! আমি তাহাতে আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি রাধু? মেয়েটি আবারও উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমি রাধু! তখন কে যেন অন্তরাল হইতে আমাকে বলিয়া উঠিল, 'ইনিই যোগমায়া! এঁকে আশ্রয় করেই মা এতদিন স্থূল দেহে ছিলেন।' "[৪৬]

কিশোরী মহারাজের এই স্বপ্ন-দর্শনের কয়েক দিন পর রাধু জয়রামবাটী এসেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শধন্য দক্ষিণদ্বারী সেই ঘরটিতেই অবস্থান কবতে লাগলেন। কয়েকদিন কাটানোর পর সেই ঘরটিতেই সজ্ঞানে চল্লিশ বছর বয়সে (২৩ নভেম্বর, ১৯৪০) শ্রীশ্রীমার পাদপদ্ম চিন্তা করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন। ধন্য মা! ধন্য তোমার রাধু।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীম পরিবার

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর শ্রীম 'ঠাকুর ও মা অভেদ'—এই জ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং মায়ের ধ্যানচিন্তা ও সেবায় মগ্ন থাকেন। শ্রীশ্রীমাকে নিজ বাটীতে এনে তাঁরই সেবায় মগ্ন হন—কখনও কখনও তাঁর ভাড়াবাড়িগুলিতে—যেমন কলুটোলার বাড়িতে, কম্বুলিয়াটোলা লেনের বাড়িতে, ২ নং হেমকর লেনের বাড়ি প্রভৃতিতে। আবার শ্রীশ্রীমা অন্যত্র কোথাও থাকলে—কোনও ভক্তগৃহে বা জয়রামবাটী-কামারপুকুরে—শ্রীম হয় সস্ত্রীক (অর্থাৎ নিকুঞ্জদেবীকে সঙ্গে নিয়ে) বা একাকীই সেখানে উপস্থিত হতেন বা অন্য কোনও উপায়ে মায়ের জন্য আর্থিক সেবা পাঠাতেন। মা তীর্থে গেলে সময় সময় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী ও সেবিকা হিসেবে নিকুঞ্জদেবীকেও পাঠাতেন, আবার নিজেও যেতেন। এই সময়কালে শ্রীশ্রীমা শ্রীম ও তাঁর সমগ্র পরিবারের লোকজনদের কাছে গুরুশক্তিরূপে আবির্ভূতা হন। এঁদের মধ্যে শ্রীম-পত্নী নিকুঞ্জদেবীই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। মন্ত্রদীক্ষার আগেই নিকুঞ্জদেবীর স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীম-র প্রথম পুত্র (নির্মল)-এর শৈশবে মৃত্যু হলে শ্রীম-র স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসায় এবং ঠাকুরের নির্দেশে নবতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকায়, অনেকটা শান্ত হন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতেও নিকুঞ্জদেবী বেশ কিছুকাল শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ছিলেন—ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, তাঁদের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অবিশ্রান্ত কৃপা ও আশীর্বাদে ধন্যা হন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' বর্ণিত ৭ মার্চ ১৮৮৫ এবং ২৪ এপ্রিল ১৮৮৬-র দুইটি সপার্ষদ রামকৃষ্ণলীলার চিত্রপটে এর পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন শ্রীশ্রীমা তো নিকুঞ্জদেবীকে বলেছিলেন, "বৌমা, তুমি ওঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখেছো, তোমার আর ভাবনা কি? তোমাকে উনি কত ভালবাসতেন। তিনি আমায় বলেছেন : মাস্টারের স্ত্রী কি উদার, কেমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।" ঠাকুরের মহাসমাধির পর ১৮৮৮ সালের ৩০ অক্টোবর নিকুঞ্জদেবী শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে। মনে রাখতে হবে শ্রীম যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তিনি আবার শ্রীশ্রীমায়েরও মন্ত্রশিষ্য ছিলেন—১৮৯১ সালের মে-জুন মাসে যখন তিনি নিকুঞ্জদেবীকে সঙ্গে নিয়ে টানা দুইমাস জয়রামবাটীতে ছিলেন, তখন ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীম শ্রীশ্রীমায়ের কাছেও মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তাই বুঝি শ্রীম শরীরত্যাগের মুহূর্তে, 'গুরুদেব, মা আমায় কোলে তুলে নাও'—এই শেষবাক্য উচ্চারণ করে ঠাকুর-মায়ের চরণে লীন হন। মনে রাখতে হবে যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনন্ত শক্তি ও কৃপায় পরিপুষ্ট হয়ে এবং শ্রীশ্রীমায়েরই প্রাণঢালা আশীর্বাদ

ও অবিরাম প্রেরণাতেই শ্রীম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' (পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত) রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রীম-র তিন পুত্র—নির্মলচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র ও চারুচন্দ্র। নির্মল শৈশবেই ঠাকুরকে একাধিকবার দর্শন করেন এবং ঠাকুরের জীবদ্দশায়ই আট বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শোনা যায়, দেহত্যাগকালে তিনি সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পান। প্রভাস ও চারু যেমন শৈশবে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হন, তেমনি বড়ো হয়ে উঠলে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। প্রভাসের ডাকনাম ছিল নটী, তাই শ্রীশ্রীমা নিকুঞ্জদেবীকে প্রায়শই 'নটীর মা' বলতেন। প্রভাস বা নটীর একটি মজার উক্তি আছে। একবার নিকুঞ্জদেবী শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন—"নটী (প্রভাস) বলে, ভাগ্যিস তুমি (নিকুঞ্জদেবী) এই পরিবারে এসে পড়েছিলে, তাই তো শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা উভয়কেই পেলে।" শুনে শ্রীশ্রীমা খুব হাসতে থাকেন। প্রভাস ও চারু শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ স্নেহ, ভালোবাসা, কৃপা ও আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন। শ্রীম-র চার কন্যা—হাঁদু, মৃণালিনী, রাধারানী ও মানময়ী—সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ স্নেহ ও কৃপাধন্যা ছিলেন। বিশেষ করে হাঁদুকে শ্রীশ্রীমা খুবই স্নেহ করতেন এবং প্রায়শই নিজের কাছটিতে রাখতেন। মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে হাঁদুকে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "খুব ধ্যান করবি, আর মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে থাকবি।"

হাঁদুর চোখের দৃষ্টি খুব কম ছিল এবং তার দেহমন খুবই পবিত্র ও শুদ্ধ ছিল। বিবাহ হয়েছিল বটে কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই নিঃসন্তান হাঁদুর মৃত্যু ঘটে। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে হাঁদুর মৃত্যু হলে শ্রীশ্রীমা বড়োই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েন। শ্রীম, নিকুঞ্জদেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সামনে শ্রীশ্রীমা বলে উঠেছিলেন—"হাঁদুর জন্য প্রাণটা বড় কাঁদে; ভাবি হাঁদু নেই, তো কি নিয়ে থাকব!" আবার একদিন নিকুঞ্জদেবীকে বলেছিলেন—"সকালে গুরুদেব বলতে হাঁদুরে বলে ফেলেছি।" শ্রীম-র সর্ব কনিষ্ঠা কন্যাকে শ্রীশ্রীমা 'মানময়ী' বলে ডাকতেন—ইনিও মায়ের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। অতি শৈশবে ইনি ঠাকুরেরও দর্শনলাভে ধন্যা ছিলেন। শ্রীম-র দ্বিতীয় পুত্র প্রভাস বা নটীর স্ত্রী কমলিনীদেবীও (ভবানীপুরের সুপরিচিত মল্লিকবাড়ির ৺প্রিয়নাথ মল্লিকের কন্যা) শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ কৃপাধন্যা ছিলেন। শ্রীশ্রীমা কমলিনীদেবীকে একটি স্বর্ণ গিনি উপহার দিয়ে শ্রীম-র একমাত্র পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করেছিলেন, এবং পরে কমলিনীদেবীও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। কমলিনীদেবীর ছিল 'মা-অন্তপ্রাণ।' ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর শেষরাত্রে 'মা, কৃপা কর'—এই বাক্য বারবার উচ্চারণ করতে করতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চির আশ্রয় লাভ করেন। শ্রীম-র কনিষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র ছিলেন অবিবাহিত।

আবার শ্রীম-র পাঁচ নাতি এবং এক নাতিনির (শ্রীম-পুত্র প্রভাসচন্দ্রের সন্তান-সন্ততি) মধ্যে—অরুণ, অজয়, অজিত, অনিল ও শোভারানী শৈশবে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁর অশেষ স্নেহ-কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করেন। শ্রীম-র সর্বকনিষ্ঠ নাতি রামচন্দ্রের জন্মের বেশ কিছু আগেই শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধিলাভ হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণে শেষযাত্রাকালে অশ্রুসিক্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীম-র সঙ্গে অরুণ ও অজয়ও ছিলেন।

মহাতীর্থ কথামৃত-ভবনের তেতলার ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীশ্রী ঠাকুরের পট' এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বপ্নাদিষ্টে শ্রীশ্রীমায়ের স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত 'দুর্গা ঘট', ও শ্রীম-র স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীশ্রীমায়ের পট' শতাধিক বছর ধরে আজও নিত্য পূজিত ও আরাধিত। শ্রীম-র সমগ্র পরিবার ও তাঁর ভাগ্যবান বংশধরগণ কত যে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ-ধন্য, তা যেন বর্ণনাতীত।

অ-ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে মা সারদা

'যতনে হৃদয়ে রেখো'

প্রায় বছর পনেরো আগে বিশিষ্ট রাশিয়ান ভারততত্ত্ববিদ আর. বি. রিবাকভ পূজ্যপাদ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজকে বলেছিলেন, "আপনারা মায়ের প্রতি সুবিচার করেননি।" অধ্যাপক রিবাকভ যা বলতে চেয়েছিলেন তা এই : "এমন শক্তিময়ী, অনির্বচনীয়া মা সারদাকে আপনারা সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন; তাঁকে যদি আমরা পাশ্চাত্যের মানুষ আগে জানতে পেতাম, তাহলে আমাদের কতই না কল্যাণ হত! আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দকে প্রচার করেছেন—খুব ভালো কথা। কিন্তু মায়ের কথা প্রচার করেননি কেন? মাকে আজ আমাদের বড়োই প্রয়োজন।"

খুবই সঙ্গত প্রশ্ন এবং এ প্রশ্ন শুধু রিবাকভেরই নয়, এ প্রশ্ন পাশ্চাত্যের অনেকেই করে থাকেন। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা সুপরিচিত তাঁরা জানেন, মঠ-মিশনের প্রথম দিকের প্রাচীন দিকপাল সন্ন্যাসীদের অনেকেই এই প্রশ্নটির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সেই ব্যাখ্যা কিছু পড়ে, কিছু শুনে এবং কিছু অনুধ্যান করে আমাদের এই ধারণাই হয়েছে যে, প্রথম দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের অনেকেই শ্রীশ্রীসারদা দেবীর ঐশী মহিমা উপলব্ধি করতে পারেননি। খেদ করে 'তাই স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে লিখেছিলেন, "মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।"[১] মা সারদা সম্পর্কে দীর্ঘ নীরবতার এটিই প্রথম কারণ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের কৃপায় ও তাঁদের অতুলনীয় সাধন-সঞ্জাত অন্তর্দৃষ্টির ফলে যখন ক্রমশ তাঁরা উপলব্ধি করলেন 'মা' কে, তখনও তাঁরা চুপ করে ছিলেন কেন? তার উত্তর এই, উপলব্ধির পর আপ্তকাম-সাধক চুপ হয়ে যান; তখন অনুক্ষণ অন্তরে রসাস্বাদন চললেও অনুভূতির ব্যাপ্তি ও প্রগাঢ়তার জন্য তাকে কথার সীমায় টেনে আনতে সংকোচ হয়, বুঝি বা ভয়ও হয়, পাছে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী অনন্ত চিৎশক্তির মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়! তাই স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজকে লিখেছেন, "(শ্রীমার বিষয়ে) একটা কিছু লিখবো মনে করি; কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে যাই। যাক, তাঁর ইচ্ছা হয় তো কালে কালে হবে।"[২] সেই শ্রদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রিত সম্ভ্রমের জন্যই সারদা-সন্দর্শনে যাওয়ার সময় সপ্তর্ষির নর-ঋষি স্বামীজীকেও আঁজলা আঁজলা গঙ্গার জল খেতে হয়, গুরুভাই তুরীয়ানন্দের উদ্দেশ্যে বলতে হয়, "না ভাই, ভয় করে। আমাদের তো মন—মার কাছে যাচ্ছি, ভয় করে।"[৩] ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজকেও মাতৃসান্নিধ্যে গিয়ে দুর্দান্তভাবের আবেশে রোমাঞ্চিত ও ঘর্মাক্তকলেবর হতে হয়। যাঁরা

মায়ের কথা জনসমক্ষে বলতে পারতেন, তাঁদেরও মৌন থাকার এই হল দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ ত্যাগী সন্তানদের কাউকে কাউকে এমন আভাস বোধ করি দিয়ে থাকবেন যে, যখনই দেখা যাবে বহু মানুষ মা সারদাকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজা করছে, তখনই বুঝতে হবে, তাঁর মানবলীলা সংবরণের আর বেশি দেরি নেই। তাই শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে স্বামীজী যখন স্ত্রীমঠের গোড়াপত্তন করতে লেগেছিলেন, তখনই আপত্তি তুলে স্বামী যোগানন্দ বলেছিলেন, "সমাজের কল্যাণের জন্য যা-কিছু করা প্রয়োজন মনে করছ, তাই কর। কিন্তু দোহাই, মাকে এখন জনসাধারণের সামনে তুলে ধরো না। ঠাকুর কি বলতেন স্মরণে আছে তো—জনসমাজে তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] প্রচার শুরু করলে তাঁর শরীর থাকবে না? একই কথা মায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ... তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, মাকে এখন ব্যস্ত করো না।"[৪] যোগানন্দ মহারাজের কথা শেষ হওয়া মাত্র স্বামীজী তাঁকে প্রাণ থেকে ধন্যবাদ দিয়ে সহাস্যে বলেছিলেন, "মন্ত্রী, তুই আমাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছিস। ঠাকুরের সতর্কবাণীকে মনে করিয়ে ভালোই করেছিস। আমি মাকে ব্যস্ত করব না। তাঁর অভিপ্রায় তিনিই ভাল জানেন, তাকে তিনিই সিদ্ধ করবেন। সেখানে কথা বলার আমরা কে?"[৫] এইপ্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন, মা রাধু-রূপী যোগমায়াকে আশ্রয় করে দীর্ঘকাল শরীরধারণ করুন এবং আপন মায়ার আবরণে স্বরূপ আবৃত রেখে জগতে বিশুদ্ধ মাতৃভাবের বিকাশ ঘটান। মাকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করলে ঠাকুরের সেই আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে হয়তো বা বিঘ্ন সৃষ্টি হত।

চতুর্থত, মা নিজে বলতেন, 'যে যত গুপ্ত, সে তত পোক্ত।' সুতরাং শ্রীমা নিজের মহিমাকে আমৃত্যু গোপন রাখতেই চেষ্টা করেছেন। শ্রাবণেব জলভরা আকাশের বুকে বিদ্যুল্লতার মতো চকিতে কোনও কোনও ভাগ্যবানের কাছে হয়তো বা কৃপাপরবশ হয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন কিন্তু আত্মপ্রচার কখনও করেননি। 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' মা রামকৃষ্ণের মধ্যেই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন, মিলিয়ে দিয়েছেন আরতির কর্পূরের মতো, সমুদ্রের বুকে শান্ত গঙ্গাপ্রবাহের মতো। সত্য এই, তিনি ইচ্ছাময়ী—তিনি চাননি বলেই জীবদ্দশায় তাঁর প্রকাশ্য প্রচার হয়নি, তাঁর সন্তানরাও তাঁকে প্রচার করতে অনুপ্রাণিত বা সাহসী হননি। তাই স্বামীজী বারবার বলছেন, "তাঁর ইচ্ছা হয় তো কালে কালে হবে", অথবা "তাঁর অভিপ্রায় তিনিই ভালো জানেন, তাকে তিনিই সিদ্ধ করবেন।" মায়ের কথা জগৎ-ময় প্রচারিত হওয়ার বিলম্বের এই হল নিগূঢ় কারণ। সন্তানেরা যে তাঁকে বাৎসল্যভাবে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন—সেও তাঁরই ইচ্ছা। তিনি যতদিন চাননি, হয়নি। যখন থেকে চেয়েছেন, তখন থেকেই হাটে হাঁড়ি ভাঙা শুরু হয়েছে। কে তাঁর প্রচার করবে? কে তাঁকে প্রচার করতে পারে? ক্ষীরভবানী দর্শন করতে গিয়ে বিধর্মীর আক্রমণে বিধ্বস্ত মন্দিরের দুর্দশা দেখে মাতৃভক্ত বিবেকানন্দ যখন ক্রোধে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন, তখন জগজ্জননী কি তাঁকে বলেননি, "যদিই বা ম্লেচ্ছরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কী? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?"[৬] বাস্তবিক, তিনিই ইচ্ছা করে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, সকলকে ভুলিয়ে রাখেন। আবার সময় হলে আপন ইচ্ছাতেই তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেন, জগতের কাছে মেলে ধরেন, জানিয়ে দেন তিনি কে। এই ভুলিয়ে রাখা আর স্মরণ করিয়ে দেওয়া, দুটিই তাঁর অনুপম লীলার দুটি দিক, যা মন, বুদ্ধি বা কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। কঠোপনিষদ একটু অন্যভাবে সেই কথাই

বলেছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"[৭]—পরমাত্মা অনুগ্রহ করে যাঁকে বরণ করেন, সেই অনুগ্রহের দ্বারাই সাধক তাঁকে লাভ করেন।

শ্রীশ্রীমার সেই অনুগ্রহ বিদেশি ভক্ত ও অধ্যাত্মপিপাসুদের কাছে সাগর পেরিয়ে এসেছিল বিবেকানন্দের মাধ্যমেই। দু-দফায় প্রায় ছ-বছর পাশ্চাত্যে কাটান স্বামীজী। যদিও সেইসময় প্রধানত তিনি বেদান্ত তথা সার্বজনীন হিন্দুধর্মের উদার ও সর্বগ্রাহ্য তত্ত্বগুলির দিকেই পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তবু প্রতিক্ষণেই তাঁর বাণীর মধ্যে বিচ্ছুরিত হত শ্রীরামকৃষ্ণের অলোকসামান্য শিক্ষার আলোক, ঝংকৃত হত শ্রীগুরুর অভিনব ধর্মানুভূতির বর্ণাঢ্য মূর্ছনা, যা বৈদিক সত্যের রাগ-রাগিণীকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নাম না করেই তাঁর শিক্ষা ও উপলব্ধিগুলিকে স্বামীজী আপন প্রাণের অগ্নিতে তপ্ত করে পাশ্চাত্যবাসীদের হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা, উদারতা এবং চারিত্রিক দীপ্তিতে শত শত বিদগ্ধ-মানুষ আকৃষ্ট হলেও ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারির 'মদীয় আচার্যদেব' নামক বক্তৃতা ছাড়া প্রকাশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি। ওই বক্তৃতায় তিনি সংক্ষেপে সারদা দেবীর প্রসঙ্গও এনেছেন। অবশ্য ২৭ জানুয়ারি, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে প্যাসাডেনার শেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত 'আমার জীবন ও ব্রত' নামক বক্তৃতায় তিনি মা সারদা সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। শ্রীমতী এডিথ এল্যান স্যানফ্রানসিস্‌কোয় কয়েকটি ক্লাসের কথাও বলেছেন যেখানে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ করেছিলেন।[৮] ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর আমেরিকার কেমব্রিজে 'The Women of India' নামক বক্তৃতাতেও তিনি আপন গুরুর উল্লেখ করেছেন।[৯] ২৬ মে, ১৯০০, ক্যালিফোর্নিয়ায় গীতার উপর প্রথম বক্তৃতাতেও শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লেখ পাই।[১০] ভক্তিযোগের উপর কয়েকটি ক্লাসেও (১৮৯৫-৯৬) শ্রীরামকৃষ্ণের কথা এসেছে। সহস্রদ্বীপোদ্যানের ধ্যানগম্ভীর ক্লাসগুলিতে এবং 'রিজলি ম্যানরে' থাকার সময়েও ঘনিষ্ঠ কোনও কোনও শিষ্য-শিষ্যার কাছে যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ (এবং সম্ভবত মা সারদার) কথা উল্লেখ করেছেন, তার প্রমাণ আছে।[১১] এই শিষ্যমণ্ডলী ও অনুরাগীদের কেউ কেউ পরবর্তী কালে মুখ্যত তাঁরই আকর্ষণে এক বা একাধিকবার ছুটে এসেছেন ভারততীর্থে, যে দেশ রামকৃষ্ণ ও মা সারদার জন্মভূমি। এসেছেন সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী কৃস্টিন, ভগিনী দেবমাতা, বেটী লেগেট, আর্ল অব্ স্যান্ডউইচ, জর্জ মন্টেগু এবং তাঁর স্ত্রী আলবার্টা, কর্ণেলিয়াস জে হেইব্রম (পরে স্বামী অতুলানন্দ), মিস্টার জনসন (পরে স্বামী অমৃতানন্দ) এবং আরও অনেকে। এঁরা প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেছেন এবং আপন আপন ভাব অনুযায়ী অপার্থিব আনন্দে পূর্ণ হয়েছেন। তাঁদের লেখা চিঠিপত্র এবং রচনায় তাঁদের কৃতার্থ হওয়ার অনুভব ফুটে উঠেছে। নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁদের সেসব মন্তব্যগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকলেও বর্তমান নিবন্ধের প্রথম পর্বে আমরা সেগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করব, কারণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে সেগুলি মূল্যবান দলিল। তাদের মূল্য আরও বিশেষভাবে এই কারণে, আজ রামকৃষ্ণ-অনুরাগীরা শ্রীশ্রীমাকে যে-দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, পাশ্চাত্যের ওইসব ভক্তদের তখন সেই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার কোনও সুযোগই ছিল না। ভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশে, ভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষায় লালিত হওয়ায় তাঁদের মনের গঠন ছিল একেবারেই আলাদা। তবুও, আশ্চর্যের বিষয়, সারদা দেবীর মধ্যে জগৎ-জোড়া মাতৃত্বকে চিনে নিতে তাঁদের এতটুকু ভুল হয়নি। মা যে

সকলেরই 'মা'—এ-সত্য তাঁরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিলেন। তাঁদের সেই অনুভবের সঙ্গে আমাদের অনুভবকে মিলিয়ে নেওয়া এবং মায়ের মহিমাকে কিঞ্চিৎ আস্বাদন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'এবার অবগুণ্ঠন খোলো'

সারা বুল : নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের স্ত্রী ছিলেন সারা বুল। স্বামীজী তাঁকে 'ধীরা মাতা' বলে ডাকতেন। ফ্রান্সিস এইচ. লেগেটের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, 'রিজলি ম্যানরে'তে স্বামীজী তাঁকে গেরুয়া কাপড় দেন এবং নিবেদিতা ও তাঁর ভিতর শক্তি সঞ্চার করেন। ধীর-স্থির, কর্মতৎপর, বিচক্ষণ, বিদুষী, উদারচেতা ও ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্না সারা স্বামীজীর দৃষ্টিতে ছিলেন 'সেন্ট' বা তপস্বিনী। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর তাঁর কেমব্রিজের বাড়িতে স্বামীজী অতিথি হয়ে গেলে সারা শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর সন্ন্যাসী সন্তানদের কথা এবং বিশেষভাবে মা সারদার কথা জানতে পারেন। সারার জীবনে এটি ছিল একটা 'turning-point' বা সন্ধিক্ষণ।[১২] মায়ের কথা শুনে তিনি আপ্লুত হয়েছিলেন।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা প্রথম কলকাতায় আসেন। ১৭ মার্চ স্বামীজীর উদ্যোগে জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম মাতৃদর্শন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন :

> বিবেকানন্দের ঐশী-শক্তিকে বুঝতে সময় লাগলেও প্রথম দর্শনের দিন থেকেই মায়ের দিব্যতাকে নিঃসংশয়রূপে চিনে নিতে সারার অসুবিধা হয়নি। জাগতিক ব্যাপারে বাস্তব খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্ক করেছেন, যেমন মা ছেলের সঙ্গে করে থাকেন; কিন্তু মা সারদার ঘরে ঢুকেই তিনি যেন দেখতে পেলেন—এ এক অন্য জগৎ! শ্রীসারদাকে ঘিরে আছে এমন এক পবিত্রতা, গা ছমছম-করা নিবিড় স্তব্ধতা যা সম্ভ্রম জাগায়, অথচ কী উষ্ণতা ও আন্তরিকতার স্পর্শ সেই পরিমণ্ডলের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত! বয়সে সারা সারদারই কাছাকাছি, তিরিশ বছর বয়স থেকে বৈধব্য-জীবন যাপন করছেন। মা এমন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তাঁকে আপনার করে নিলেন যে, সারা নিজের হৃদয়টিকে মায়ের কাছে খুলে ধরতে এতটুকু সংকুচিত হলেন না।[১৩]

পাঁচ মাস পর, ১১ জুলাই, ম্যাক্সমুলারকে তাঁর মাতৃদর্শনের অভিজ্ঞার কথা জানাতে গিয়ে সারা লিখেছিলেন :

> "আমরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদা দেবীকে দর্শন করার অনুমতি পেয়েছি। তিনি 'আমার মেয়েরা' বলে আমাদের গ্রহণ করলেন। বললেন যে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ। আমাদের একেবারেই অপরিচিতভাবে দেখলেন না। গুরুর কাছে আনুগত্য বলতে কী বোঝায়, একথা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, [একথা জিজ্ঞাসার কারণ সারা স্বামীজীর সঙ্গে অনেক ব্যাপারেই একমত হতে পারতেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতে এসে তবে কি তিনি গুরুর অবাধ্য হয়েছেন? সারদা দেবীর উত্তরে সারা আশ্বস্ত হন।]—তাঁর ক্ষেত্রে আবার নিজ স্বামীই গুরু—তিনি জানালেন, 'কাউকে গুরু নির্বাচন করলে

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে, কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে কাজ করলেই, সে কাজ যদি কোনও ক্ষেত্রে গুরুর অননুমোদিত হয় তবু—গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।'

"স্বামীর সঙ্গে বাল্যেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ তিনি। স্বামীকে যখন সানন্দে সন্ন্যাসীর জীবন-যাপনে অনুমতি দিলেন, তখন স্বামীর গভীর বন্ধুত্ব পেলেন, ও তাঁর শিষ্যারূপে গৃহীত হলেন। স্বামী তাঁকে দিন-দিন শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুললেন। অপরপক্ষে পতি-সান্নিধ্যে অতিবাহিত বছরগুলিতে ইনি স্বামীর পরামর্শদাতা ছিলেন। ইনি নিরন্তর প্রার্থনা করেছেন, আমার বাসনাকে শুদ্ধ করে তোলো, যাতে চিরদিন তোমার যোগ্য হতে পারি। দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্রত তিনি নিয়েছেন, ত্যাগ করেছেন গর্ভধারিণী জননীর সাধারণ আনন্দ, কিন্তু হয়ে উঠেছেন বহু সন্তানের আধ্যাত্মিক জননী।"[১৪]

উপরের চিঠি থেকেই অনুমান করা যায়, প্রথম দর্শনেই চারটি জিনিস সারাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল—মায়ের মাতৃত্ব, দারিদ্র্য, পবিত্রতা এবং তাঁর ত্যাগের জীবন। তিনি এই দর্শনটিকে তাঁর জীবনে ভগবানের দেওয়া পরম আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। ভেবেছিলেন ভারতবর্ষে তিনি একমাস থাকবেন, কিন্তু থেকে গেলেন এক বছরেরও বেশি। মায়ের শক্তি, স্বাধীনতাপ্রিয় অনন্যনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তববুদ্ধিপ্রসূত উপদেশ তাঁকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করেছিল।

২৮ মার্চ অন্নপূর্ণা পূজার দিন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে স্থানান্তরিত অস্থায়ী মঠে শ্রীশ্রীমা এলে শ্রীমতী বুল, নিবেদিতা এবং মিস ম্যাকলাউড তাঁকে বাড়িটি ও মঠের নতুন জমি ঘুরিয়ে দেখান। শ্রীমা বলতেন—যাদের নব অনুরাগ, তাদেব দিয়ে সেবার কাজ ভালো হয়। পাশ্চাত্যের এই তিন সম্ভ্রান্ত মহিলা সেদিন এইভাবেই শ্রদ্ধাসহকারে মায়ের সেবা করেছিলেন এবং জননী তাতে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। তাঁরা তখন মঠের জমির উপর পুরোনো বাড়িটি সংস্কার করে সেখানেই থাকতেন।

এরপর ১১ মে সারা কলকাতা ত্যাগ করে স্বামীজী, নিবেদিতা, ম্যাকলাউড প্রভৃতির সঙ্গে আলমোড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সেখান থেকে নৈনিতাল হয়ে দীর্ঘ কাশ্মীরভ্রমণ। ৬ নভেম্বর তিনি ও ম্যাকলাউড জয়পুর ঘুরে কলকাতায় ফেরেন। বেলুড়ে তাঁদের কটেজটিতে এখন সাধুরা থাকায় তাঁরা নিবেদিতার সঙ্গে ১৬ নং বোসপাড়ায় কয়েকদিন কাটালেন। মায়ের বাড়ি কাছেই। তাই তাঁরা এইসময় প্রায়ই মাকে দর্শন করতে যেতেন। সারা আক্ষরিক অর্থেই এইসময় এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটালেন। যে-কাজ শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও সন্ন্যাসী-শিষ্য বা ভারতীয়-ভক্ত পারেননি, সেই অসম্ভব কাজটিকেও তিনি বিদেশিনী হয়ে সম্ভব করে তুললেন। উত্তরভারত ভ্রমণ করে ফেরার পর থেকে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁর ভক্তি এমনই প্রবল আকার ধারণ করে যে, তাঁর মনে হয়, ইনি মানবী নন, সাক্ষাৎ দেবী। এঁকে পূজা করা দরকার। কিন্তু পূজা করতে গেলে প্রতিমা তো চাই। তাই তিনি জেদ ধরলেন যে মায়ের ছবি তোলাতে হবে। কিন্তু লজ্জাপটাবৃতা মা রাজি নন। শ্রীরামকৃষ্ণের সামনেও যিনি অবগুণ্ঠন সরাতেন না, তিনি পুরুষ ফোটোগ্রাফারের সামনে বসে ছবি তোলাবেন কেমন করে। তখন ঠিক হল একজন মহিলা-ফোটোগ্রাফার আনানো হবে। কিন্তু সেযুগের কলকাতায় মহিলা ফোটোগ্রাফার কোথায়? শেষে অনন্যোপায় হয়ে হ্যারিংটন সাহেবকে আনানো হয়, আর যাই

হোক তিনি ইউরোপীয়ান । কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতেও মা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে রইলেন। কিছুতেই তিনি মাথার অবগুণ্ঠন সরাবেন না। শেষে স্বভাবগম্ভীর সারার কণ্ঠেও ঝরে পড়ল আত্মনিবেদনের আর্তি, "মা, এ-ছবি নিয়ে গিয়ে আমি পুজো করব।" তখন মা রাজি হলেন। সারা ও নিবেদিতা মায়ের কাপড় আর চুল ঠিকঠাক করে দিলেন। নিবেদিতা মার হাত-পা যথাযথভাবে গুছিয়ে দিলেন। মা সমাধিস্থা! এই অবস্থায় প্রথম ছবিটি তোলা হল। বাহ্যজ্ঞান ফিরলে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "গোলাপ, হয়ে গেছে?" এই সেই ছবি যা আজ ঘরে-ঘরে পূজিত। সারার অনুরোধে দ্বিতীয় আর একখানি ছবিও তোলা হয়। তোলা হল নিবেদিতা আর মার মুখোমুখি সেই তৃতীয় ছবিটিও। তাই মায়ের অবগুণ্ঠন সারাই সরালেন। ভাগ্যিস সরিয়েছিলেন! নাহলে আমরা মায়ের মুখ দেখতে পেতাম কি করে? ভক্তের কাছে ভগবান সত্যিই পরতন্ত্র। এই তাঁর করুণা! শত গ্রন্থ লিখেও যে কাজ করা যেত না, মায়ের ছবি তুলিয়ে সারা সেই কাজ সারলেন। মায়ের প্রতি তাঁর মনোভাবের এই শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। সারা ঠিক করেছিলেন, এই ছবি মহাপবিত্র, তাই যাকে-তাকে দেওয়া হবে না। যাঁরা এর মর্ম বুঝবেন এবং পূজা করবেন, কেবল এমন বন্ধুদেরই এই ছবি উপহার দেওয়া হবে।

শ্রীশ্রীমার প্রতি সারা বুলের ভক্তির আর একখানি চিত্র। নভেম্বর মাসেই বেলুড় থেকে দু-মাইল দূরে বালীর একটি বাড়িতে সারা এবং জো বাস করতে থাকেন। ২০ ডিসেম্বর তাঁদের ভক্তি-ভালোবাসার টানে কৃপাময়ী জননী তাঁদের দর্শন দিতে সেই বাড়িতে যান। প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার বর্ণনায় : সাবা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মাকে সাদর সম্ভাষণ করলেন। সারার দৃষ্টিতে মা আদর্শ নারী—উদার, গভীর অথচ যাঁর প্রখর বাস্তববুদ্ধি এবং রসবোধ। মাকে দেখে সারা আত্মহারা, তাঁর ভালোবাসার উষ্ণ ও একান্ত স্পর্শে অভিভূত! মাকে বাড়ির চারপাশ ঘুরিয়ে দেখালেন তিনি এবং মায়ের শ্রীচরণ পূজা করলেন। বিদায় নেওয়ার আগে মা দুজনকে আশীর্বাদ করলেন। মা সারদাকে বিদায় জানাতে বোধ করি সারার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল; তিনি তাঁর সঙ্গে নেমে বাড়ির নিচ পর্যন্ত গেলেন। সামনেই গঙ্গা। সেখানেই মার নৌকা অপেক্ষা করছিল। তাঁর নৌকা ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেও অশ্রুপূর্ণনয়নে মা তাঁর দুই বিদেশিনী কন্যার দিকে চেয়ে রইলেন বহুক্ষণ।[১৫]

২৭ ডিসেম্বর সারা বুল জোর সঙ্গে কলকাতা ত্যাগ করে ৫ জানুয়ারি বম্বে থেকে স্বদেশের পথে পাড়ি দেন। সারা আরও দুবার ভারতে এসেছিলেন। শেষবার আসেন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে। শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে অসুস্থ। স্বামী সারদানন্দ তখন কলকাতায় মায়ের থাকার জন্য একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে চাইছিলেন। এ-ব্যাপারে তিনি সারার সঙ্গেও পরামর্শ করেন। সারা মায়ের এই বাড়ির জন্য কিছু অর্থ দেন। তাছাড়া ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১০ আগস্টে লেখা সারদানন্দ মহারাজের চিঠি থেকে জানা যায়, মায়ের জন্য তিনি নিয়মিত সাহায্য পাঠাতেন। সারা বুলই পাশ্চাত্যের প্রথম মানুষ যিনি তাঁর স্বাভাবিক ও সহজ মাতৃত্বের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, "স্ত্রী (সারদা দেবী) না থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনওই শ্রীরামকৃষ্ণ হতেন না।"[১৬] সেপ্টেম্বরের শেষদিকে শ্রীনগরে স্বামীজী একদিন যখন তাঁর পাশ্চাত্যের শিষ্যাদের বলেছিলেন যে, নারীর আকর্ষণই পুরুষদের পতনের কারণ, তখন সারা সগর্বে ওই কথা বলে উঠেছিলেন। সে কথা মেনে নিয়ে

স্বামীজীও বলেন, "... তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে আমিও তাঁকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তাঁকে [শ্রীশ্রীমাকে] ছাড়া তিনি যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না। আমি বলেছিলাম, 'আপনার স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল।' তিনি বলেছিলেন, 'ও আমার স্ত্রী নয়, ও আমার প্রকৃতি!' "[১৭]

'একবার হেরিলে ও কায়, সব দুখ যায়, এই গুণ শ্যামা মার রে'

মার্গারেট নোবল : স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশি শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে মিস নোবল বা ভগিনী নিবেদিতাই ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে পরিচিত ও প্রিয় নাম। ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এই আইরিশ শিক্ষাবিদ ভারতের পদদলিত নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়াব জন্য স্বামীজীর প্রেরণায় ইংল্যান্ড থেকে এদেশে এলেও উত্তাল ভারত-প্রেমের প্রভাবে ক্রমশ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এ দেশ হয়ে ওঠে তাঁর স্বদেশ। ভারতের মানুষকে জাতীয়চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তিনি শিক্ষা, ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, রাজনীতি—সর্ব স্তরেই দশপ্রহরণধারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন—দেশপ্রেমের যে প্রসুপ্ত বহ্নি বিবেকানন্দের গৈরিক হৃদয়ে ধিকিধিকি জ্বলত, তা যেন নিবেদিতার চিন্তা, বাক্য ও কর্মে লেলিহান হয়ে আত্মপ্রকাশ কবেছিল। নিবেদিতা নিছক ধর্মের আকাশ থেকে খসে-পড়া উল্কাব মতো রূপান্তরিত হয়েছিলেন 'লোকমাতা নিবেদিতা'-য়। ভূমিকার পটপরিবর্তনে আত্মসচেতন ও গুরুগতপ্রাণ নিবেদিতা মাঝে মাঝেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, কিন্তু তবুও তিনি স্বভাবসুলভ 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব বিসর্জন দিতে পারেননি—বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর ভালোবাসাই যে ভারতপ্রেমে মূর্ত হয়েছে, এই বিশ্বাস ও সান্ত্বনাই তাঁকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত স্থির রেখেছিল।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় নিবেদিতার প্রথম পদার্পণ। দেহত্যাগ ১৯১১-ব ১৩ অক্টোবর, দার্জিলিং-এ। এই তেবো বছরেরও বেশি দীর্ঘ সময়ে রণক্লান্ত নিবেদিতার জুড়োবার জায়গা ছিল দুটি—এক, বিবেকানন্দের স্নেহস্মৃতির অন্তর্লোকে; দুই, মা সাবদার স্নেহচ্ছায়ায়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু যথার্থই লিখেছেন : "... নিবেদিতার কাছে তিনি চিরজননী মেবীমাতাব দেহধারিণী প্রতিনিধি। শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে শান্তিসায়রে অবগাহন করে নিবেদিতার জ্বালাময় সংঘর্ষ-ক্ষুব্ধ জীবন পরমের আনন্দস্পর্শ পেত। নিবেদিতা তাঁর ধাবমান জীবনেব নানা পর্যায় থেকে বারবার ফিরে আসতেন শ্রীমায়ের কাছে—আলোকের, আনন্দের ও শান্তির সন্ধানে।"[১৮]

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তিনি থেকেছেন, দিনের পর দিন কথা বলেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, আত্মীয়পবিজন ও সাধু-ভক্ত-পরিবৃত তাঁর অলৌকিক দৈনন্দিন জীবন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছেন, তাঁর সঙ্গে শিশুর মতো রঙ্গকৌতুক করেছেন এবং সেইসব আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বন্ধু ও প্রিয়জনদের চিঠিপত্রে জানিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন অন্যান্য রচনায়। বস্তুত শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে তাঁর বিচ্ছিন্ন মন্তব্যগুলি থেকে যেমন আমরা মায়ের মানবিকতা, সহনশীলতা, অনবদ্য অনুভূতি, মর্যাদাবোধ, মাধুর্য ও সৌন্দর্যবোধের আভাস পাই, তেমনি অন্যদিকে তাঁর ধ্রুব ইচ্ছার কথা, সর্বপ্লাবী ভালোবাসার কথা, তাঁর অনুপম নারীত্বের কথাও জানতে পারি। মায়ের জীবনী রচনা না করেও তিনি যেন মায়ের প্রথম জীবনীকার, যাঁর শব্দের রঙ ও

রেখার টুকরো টান-টোনের মধ্যে আমরা সারদা-চরিত্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি আবিষ্কার করি। সেই ছবির মধ্যে যেমন ধরা পড়েছে মায়ের প্রতি তাঁর ভাব-দৃষ্টি, তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রতি মায়ের দুর্বার ভালোবাসার মধুরিমা।

নিবেদিতার জীবনে 'Day of days' বা চিরস্মরণীয় দিনটি ছিল ১৭ মার্চ, ১৮৯৮। ওইদিনই ১০/২ নং বোসপাড়া লেনে সারা বুল ও জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে তিনি সারদা দেবীকে প্রথম দর্শন করেন। তিনজনের মধ্যে নিবেদিতার উপরই প্রথম দর্শনের প্রভাবটি গভীরতম হয়েছিল সন্দেহ নেই। তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ও সংবেদনশীল মন দিয়ে প্রথম দিনেই তিনি মাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছেন যার কিছু পরিচয় পাই ২২ মে, ১৮৯৮, নেল হ্যামন্ডকে লেখা একখানি অসামান্য চিঠিতে। চিঠিখানি মায়ের অন্তরঙ্গ জীবনের সচল, বর্ণাঢ্য চিত্র। নিবেদিতা লিখছেন :

"অনেকবার ভেবেছি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা নাম্নী মহিলাটির বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখব। শুরুতে বলি, তিনি পঞ্চাশ-পেরোয়নি এমন হিন্দু বিধবার মতো সাদা কাপড় পরেন। পরার ধরন : কাপড় প্রথমত কোমরে স্কার্টের আকারে জড়ানো থাকে, তারপর শরীরের উপর দিয়ে গিয়ে মাথা ঢেকে রাখে—অনেকটা nun-দের অবগুণ্ঠনেব মতো। পুরুষ মানুষ কথা বলতে এলে তাঁকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়; তিনি সাদা কাপড়ের ঘোমটায় সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে নামিয়ে নেন; সরাসরি কথা বলেন না; বেশি বয়সী কোন মহিলাকে মৃদুস্বরে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কিছু বলে দেন, সেই মহিলাটি তাঁর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করেন জোরে। এইজন্য মনে হয় আচার্যদেব (স্বামীজী) কখনও এঁর মুখ দেখেননি। এইসঙ্গে কল্পনায় দেখে নাও, ইনি সবসময় মেঝেয় ছোট একটি মাদুরে বসে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হচ্ছে না নিশ্চয়; কিন্তু এঁকে একটু ভালোভাবে জানলেই দেখা যাবে, সহজ বুদ্ধি ও বাস্তবতাবোধ এঁর চূড়ান্ত, প্রতিক্ষেত্রে তার পরিচয় মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কিছু করার আগে এঁর পরামর্শ সর্বদা নিতেন। রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা এঁর উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন। অসীম ঐশ্বর্যে ভরপুর ইনি। কী স্নিগ্ধ ভালবাসা এঁর! অথচ বালিকার মতোই হাসি-খুশী। সেদিন যখন আমি জোর করে বললুম, স্বামীজীকে এখনি এখানে আমাদের মধ্যে আসতে হবে, নইলে আমরা চলে যাব—সেই শুনে তাঁর কী হাসি, তুমি যদি দেখতে! আচার্যদেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন, এই খবর নিয়ে যে সন্ন্যাসীটি এসেছিলেন, তিনি আমাকে সত্যই চলে যাওয়ার জন্য জুতো পরতে উঠতে দেখে রীতিমতো ভড়কে গেলেন, এবং দ্রুত স্বামীজীকে ডেকে আনতে ছুটলেন—তখন সারদার উচ্ছ্বসিত হাসির রূপ যদি দেখতে। আর কী যে মিষ্টি তিনি। আমাকে বলেন, 'আমার খুকি'। আচারবিচারে বরাবরই রক্ষণশীল—সবকিছু সরিয়ে দিলেন যখন প্রথম দুটি বিদেশী মেয়ে, মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড তাঁর কাছে এলেন। এঁদের সঙ্গে তিনি খেলেন পর্যন্ত! আমরা গেলেই ফল খেতে দেওয়া হয়; তাঁকেও দেওয়া হল—সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি গ্রহণ করলেন!! এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না। খুব মজার না! তাঁর মহিমার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত দিই—কলকাতায় তিনি যখন থাকেন, তখন সদাসর্বদা চোদ্দো-পনেরোটি উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলা তাঁকে ঘিরে থাকেন, যাঁরা রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি করে সকলকে অস্থির করে মারতেন, যদি না তিনি তাঁর অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং প্রফুল্লতার দ্বারা এঁদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করে

চলতেন! তাই বলে সত্যই আমি ওইসব মহিলার স্বভাবের বিরুদ্ধে কোনও কটাক্ষ করছি না, আমি নারীজাতির সাধারণ স্বভাব অনুমান করে এই কথা বলছি।

"তাঁর সম্বন্ধে সন্ন্যাসীদের বীরোচিত সম্ভ্রম দেখবার মতো। তাঁকে সর্বদা 'মা' বলে ডাকা হয়, তাঁর বিষয় উল্লেখের সময় বলা হয় 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী', প্রতি ব্যাপারে তাঁকে স্মরণে রাখা হয়, সবসময় তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে দু-একজন হাজির থাকেন; তাঁর ইচ্ছাকে স্থায়ী আদেশতুল্য জ্ঞান করা হয়। এ এক দর্শনীয় অপরূপ সম্পর্ক। তুমি যদি তাঁকে কিছু লেখো, আমি আনন্দ করে সেকথা তাঁকে জানাবো। একজন সন্ন্যাসী একদিন আমার হয়ে বাংলা করে তাঁকে Magnificat (যীশুজননী মেরীর গান) পড়ে শোনালেন—তিনি কীভাবে না তা উপভোগ করলেন—দেখবার মতো। সত্যি করে বলতে গেলে তিনি অনাড়ম্বর সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী!"[১৯]

সারদা দেবী সম্পর্কে নিবেদিতার তিন মাসের যে ধারণা, তা উপরের চিঠিতে বিধৃত। লক্ষণীয়, এখনও সারদা নিবেদিতার কাছে 'শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী'—'মা' হয়ে ওঠেননি। ৪ জানুয়ারি, ১৮৯৯, নেল হ্যামন্ডকে যে চিঠি লিখেছেন সেখানেও দেখি : "তাঁরা (সারা বুল ও ম্যাকলাউড) শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর ফোটো তোমাকে দেখাবেন। ইনি আমাদের 'নিজের মেয়ে' বলে দেখেন আর সদাসর্বদা আশীর্বাদ করেন। তাঁর ফোটো কিন্তু সকলের মধ্যে বিতরণের জন্য নয়।"[২০] নিবেদিতার স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় মিস ম্যাকলাউডই তাঁকে 'মা' ডাক শিখিয়েছিলেন। ৯ মার্চের চিঠিতে তাই সম্বোধনের ক্ষেত্রে গভীরতর আন্তরিকতার সুর। নেলকে লিখেছেন নিবেদিতা :

"...তোমার জন্য শ্রীমার কাছে একটু আশীর্বাণী প্রার্থনা করলাম। মা তাঁর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন তোমাকে। তিনি তোমাকে সত্যিই তাঁর মেয়ে বলে মনে করেন। কিন্তু এর থেকে বেশি অভিব্যক্তি কিছু আশা কোরো না। ভাবকে চিন্তার জগতে আনার প্রয়োজনীয়তা এঁদের কাছে ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এঁদের অনুভূতি অত্যন্ত গভীর কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ কম। কোনও ভিনদেশির মনে সাড়া জাগানোর মতো নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করার অভ্যাস এঁদের নেই।

"কিন্তু অনুভূতিতে শ্রীমা অনবদ্য। জেনে রেখো, তাঁর ঐ ফটো তোলার অর্থ এক্ষেত্রে তিনি জীবনে প্রথম নিজ পরিবারের বাইরে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দিকে সরাসরি তাকালেন, বা তেমন কেউ তাঁর মুখ দেখলেন। তাই বলে এর জন্য কোনও আত্মসচেতনতা তাঁর ছিল না—একবিন্দুও নয়। স্বামীজী এমনকি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে তাঁর বিবাহের পরে (বিবাহকালে বয়স মাত্র পাঁচ!) অবগুণ্ঠনহীন দেখেননি। পুরুষেরা তাঁকে পূজা করবার জন্য অন্তঃপুরের দরজা পর্যন্ত কিংবা কখনও তার ভিতর পর্যন্ত এলেই অবিলম্বে তাঁর মুখের উপর লম্বা ঘোমটা নেমে আসে, যদিও কখনও কখনও প্রান্তে একটু ফাঁক থাকে, যাতে নিম্নচোখে তাকানো যায়। এই নিয়ে আমি এত মজা করেছি যে পুরুষেরা বাইরে অপেক্ষা করার কালে সারাক্ষণ তিনি হেসে লুটোপুটি; কিন্তু কোনও চাকর কিংবা সন্ন্যাসী যেমনি সিঁড়ির উপরে এসে চেঁচিয়ে জানালেন—অমুকচন্দ্র অমুক শ্রীমাকে প্রণাম জানাতে আসছেন—অমনি সমস্ত ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে ঘনীভূত, সমস্ত কথা স্তব্ধ, হাত-পাখার নাড়াচাড়াও বন্ধ, ঘোমটা মুখে নেমে আসে নিঃশব্দে, সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢেকে যায়, ঘরের মাঝখানে বসে থাকলে আধখানা শরীর দরজার দিকে ঘুরে যায়—সবকিছু ঘটে যায় নীরবে। তারপর

আগন্তুক বাইরে এসে দাঁড়ায়, চৌকাঠে মাথা ঠেকায়, কিংবা ভিতরে এসে শ্রীমার চরণ স্পর্শ করে এবং বলে : সে এই এই কাজ করতে যাচ্ছে। লোকটি হয়তো সদ্য কলকাতায় এসেছে, মায়ের জন্য প্রণামী এনেছে, কিংবা সে কলকাতার বাইরে যাচ্ছে, তাই মায়ের আশীর্বাদ চায়। শ্রীমা তখন পার্শ্ববর্তিনীর কাছে অতি মৃদুস্বরে সস্নেহে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন, সেগুলি উচ্চতরস্বরে লোকটির কানে শোনানো হয়। সবশেষে লোকটি আবার প্রণত হয়, শ্রীমা হাতজোড় করেন, যার দ্বারা বোঝা যায় তিনি আশীর্বাদ করলেন। তখন লোকটি চলে যায়। এতক্ষণে আবহাওয়ার ভার কমে। আগেকার ভাবভঙ্গি ফিরে আসে, কথা শুরু হয়, পাখা নড়তে থাকে, ঘোমটা খসে পড়ে—।

"তাঁর মতো স্বামীকে পূজা করেছেন অথচ স্বামীকে মুখ দেখতে দেননি—এমন কাউকে ভাবতে পারো! মুখ দেখতে দিলে স্বামীর মনে বা চিন্তায় তিনি কখনও কখনও উদিত হবেন, এই লোভ তো থাকতে পারত! না, অপরূপ তাঁর আত্মবিলয়—ইনি তা-ও চাননি। ভাবতেও শিহরিত হয়ে উঠি!"[২১]

১২ মার্চ, ১৮৯৯, জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখছেন নিবেদিতা : "আগামী সোমবার সকালে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের আসল জন্মোৎসবের (অর্থাৎ জন্মতিথির) জন্য মঠে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি 'না' বলায় স্বামীজী খুশি হলেন। তখন ভাবলাম, যদি মাকে দিয়ে [প্রিয়তমা য়ুম (ম্যাকলাউড), তুমিই ওঁকে মা ডাকতে শিখিয়েছ, আমার ছেড়ে আসা বাড়ির ছোট্ট মায়ের সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের একটা টানাটানি ছিলই] বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য (জগদীশ বসুদের জন্য) বিশেষ পূজা করিয়ে নিতে পারি, সেটাই আমার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের চেয়ে অনেক বড়ো কিছু হবে।...

"আগামী কাল সেন্ট প্যাট্রিক দিবস। ...এক বছর আগে ঐ দিনটিতে আমরা সকলে শ্রীমাকে দর্শন করেছি, তুমিই আমাকে ঐ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলে।..."[২২]

স্বামী যোগানন্দের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: "যোগানন্দের মৃত্যু শ্রীমা ও যোগীন মার কাছে দারুণ বেজেছে। মৃত্যু কথাটি শ্রীমা যেন সইতে পারছেন না—এমনই মানবিক বেদনা।—'জানি জানি সে আমার প্রভুর কাছে গেছে—সেকথা জানি আমি কিন্তু সে যে আমার যোগীন, তাকে প্রভু কেড়ে নিলেন!' "[২৩]

১৮ জুন, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে লেখা আর একটি চিঠিতে পাই মায়ের দৃঢ়তার ছবি। নিবেদিতা লিখেছেন : "... মা যে কী সবে বুঝতে পারছি। সেদিন সদানন্দ সম্বন্ধে বিকট মিথ্যা দুর্নামের বিরুদ্ধে সদানন্দকে সমর্থন করতে যদি তাঁকে দেখতে! আর আমার 'জেনানা' প্রবন্ধ প্রকাশের পরে তিনি যখন শান্তভাবে বললেন সন্তোষিণীর মা (প্রবন্ধের জন্য) তাঁর ছবি তুলতে দিয়ে আসলে তাঁকেই সাহায্য করেছেন—তখন এর মূল্য আমার পক্ষে কতখানি ছিল নিশ্চয় বুঝবে।"[২৪]

৪ নভেম্বর, ১৮৯৯, ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, মেরী হেল ও সারদা দেবী একই ধারার নারী। তারপর বলেছেন : "দু-জাতীয় নারী আছে। এক ধরনের নারীতে অপ্রতিরোধী সহন, যেমন সারদা দেবী, যেমন (মনে হয় ঠিকই বলছি) পুণ্যবতী মেরী। মেরী হেলও এই ধারায়।..."[২৫]

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন, নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যে যান। কলকাতায় ফেরেন ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি। এই দীর্ঘ আড়াই বছর আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি

দেশে কাটিয়ে তিনি যেমন সুন্দর কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তেমনি আবার জীবনব্রত সফল করে তোলার পথে অজস্র বাধাবিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে ক্ষতবিক্ষতও কম হননি। এইসব অসহায় মুহূর্তে তাঁর মনে হত শ্রীশ্রীমায়ের অপার্থিব স্নেহ-সান্নিধ্যের কথা। বিভিন্ন চিঠিতে ম্যাকলাউডকে তিনি লিখেছেন: "শ্রীমায়ের কাছে ফিরে যেতে সমস্ত মন-প্রাণ ব্যাকুল।" "সারদা দেবীর আবাসে ফিরে যেতে কী যে ব্যাকুল, কী করে বোঝাব? যতসব আজেবাজে কাজ নিয়ে আছি।" "কী কাণ্ড! তুমি ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে মাতাঠাকুরানীকে দেখবে! ভাবতেও অপূর্ব লাগে।" "শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে পারলে খুশি হব। তোমার মতোই আমিও অনুভব করি, শ্রীমায়ের ইচ্ছা সবসময়ই ধ্রুব।"

শ্রীমার আশীর্বাদের উপর নিবেদিতার কতখানি বিশ্বাস ছিল, তা 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মি. র‍্যাটক্লিফের সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট। ২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯-এ তিনি লিখেছেন : "খুকী যখন জন্মাবে, আমি প্রথম তাকে নিয়ে যাব সারদা দেবীর কাছে আশীর্বাদের জন্য। সারদা দেবীকে আমরা 'হোলি মাদার' বলি; খুব সাদাসিধে হিন্দু রমণী তিনি, কিন্তু তবু আমার ধারণায় তিনি বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।"[২৬]

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪, ম্যাকলাউডকে লিখছেন :

"মাতাঠাকুরানী এখন এখানে আছেন। কী ছোট্টো, রোগা আর কালো হয়ে গেছেন—গাঁয়ে থাকার কষ্টে শরীর যেন একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বের মতোই সেই স্বচ্ছ বুদ্ধি, উন্নত মর্যাদা, নারীত্বের মহিমা—অবিকল। তাঁকে কতরকমের আরামে রাখতে যে সাধ আমার হচ্ছে! একটি নরম বালিশ, জিনিস রাখার একটি তাক, একটি কম্বল, আরও কত কী দরকার। সবসময় ভিড়—লোকজন ঘিরে আছেই।... কৃস্টিন তাঁকে তেমন বুঝতে পারে না। এতে আমি মজা পাই, কারণ কৃস্টিন আন্তরিকভাবেই সেকথা বলে। তবে কৃস্টিনের এ মনোভাব স্থায়ী হবে না। একদিন নিশ্চয় সে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে...।"[২৭]

৩ মার্চ, ১৯০৪, আর একখানি পত্র ম্যাকলাউডকে লিখছেন : "মা-ঠাকরুন এসে গেছেন। তেমনি আছেন আমাদের মা। যখন তিনি এখানে থাকেন—আমাদের আশ্রয় থাকে।"[২৮] ২৪ মার্চ, সম্ভবত ম্যাকলাউডকেই লিখেছেন : "মা-ঠাকরুন আমাদের সেই চিরকালের মা-ই অছেন—সেই অবর্ণনীয় মহিমা আর মাধুর্যের নির্ঝর।"[২৯] ১৩ নভেম্বর, ১৯০৪-এর চিঠিতে : "শ্রীমা আমার—মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি—কী যে মিষ্টি!"[৩০]

মায়ের পূজারতা মূর্তির দিকে নিবেদিতা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। পূজ্য-পূজারিণীর নিবিড় একাত্মতাই কি তাঁর মুগ্ধ হওয়ার কারণ? নাকি মায়ের আত্মনিবেদনের সৌন্দর্য-সৌরভ তাঁকে আপ্লুত করত? তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন, "শ্রীমা যখন পূজা করিতে বসেন, তাঁহাকে কী সুন্দর দেখায়! সেই মুহূর্তে অমি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসি।"[৩১] ৫ মার্চ সারা বুলকে এই প্রসঙ্গেই নিবেদিতা লিখেছিলেন : "...সন্ধ্যা, তারার আলো, চাঁদের উদয়, আর প্রার্থনার সুর—এসব কিছুই যেন আমাদের শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। প্রদোষের সঘন মধুরিমার মতোই তাঁর সঙ্গ—বিশেষত যখন তিনি পূজার আসনে। আহা অপরূপ! অপরূপ!"[৩২]

১৯০৫-এর মার্চের শেষ দিকে নিবেদিতা অসুস্থ হলে শ্রীমা তাঁকে দেখতে আসেন। ৫ এপ্রিল ম্যাকলাউডকে লিখছেন নিবেদিতা, "গতকাল শ্রীমা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমার বিপদ-মুক্তিতে কত না খুশি। এমন ভালোবাসায় ভরা মুখ আমি

কোথাও দেখিনি।"[৩৩]

নিবেদিতা দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যান ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯০৯-এর ১৮ জুলাই তিনি তাঁর প্রিয় বোসপাড়া লেনের বাড়িতে ফিরে আসেন। ১ সেপ্টেম্বর তিনি সারা বুলকে লিখলেন, "ওঃ, নিজের লেখার টেবিলে ফিরে আসতে পারা যে কী আনন্দের—এবং তার সঙ্গে মাতৃসান্নিধ্য। এ আনন্দের স্বাদ আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। জুড়োবার জায়গা যদি কোথাও থেকে থাকে, হৃদয়ের অবিশ্বাস্য স্বপ্নলোক যদি বাস্তব মূর্তি ধরে কোথাও নেমে এসে থাকে তো সে এইখানে।"[৩৪]

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯, ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ : "সন্ধ্যায় মাকে ঘিরে যখন মেয়েরা সব বসে থাকেন, তখন তাঁর কাছে যেতে বড় ভালো লাগে। তাঁকে শেষবার যখন দেখেছিলাম তার থেকে একটি দিনও যেন তাঁর বয়স বাড়েনি। ঠিক সেইরকমই আছেন। তাঁর গলার স্বর এগারো বছর আগে যেমন শুনেছি এখনও ঠিক তেমনই তারুণ্যময়, হাসিটিও তেমনই মধুক্ষরা। সত্যি বলতে কি, প্রতিটি ভাবভঙ্গিই মনোমুগ্ধকর। চুলে এখনও পাক ধরেনি। "[৩৫]

২৮ জুলাই, ১৯১০, আর একটি চিঠিতে ম্যাকলাউডকে মায়ের মহিমা বর্ণনা করেছেন এইভাবে : "শ্রীমা এখন এখানে আছেন। ...আহা, গোটা বাড়িটা যেন মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে! দিনের কাজ শুরু করার আগে যদি কেউ সেখানে কোনও প্রয়োজনে হাজির হয়, তাহলে সেখানে সে কতই না উষ্ণ ভালোবাসা আর আশীর্বাদ পায়। 'তোমার কাছে কিছু চাই না—তুমি এসেছ, তাতেই খুশি'—এই ভাবটিই সেখানে জমাট বেঁধে রয়েছে! এই ভাবটি বর্ণনা করা আমার অসাধ্য।"[৩৬]

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯১০, মি. ও মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা চিঠিতে করুণাময়ী মায়ের প্রতি নিবেদিতার ভালোবাসা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। লিখছেন : "যদি কখনও দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে যাই তাহলে আমার বন্ধুরা যেন দুঃখ না করেন, কেননা আমি অবিলম্বে ধ্যান শুরু করে দেব, আর চেষ্টা করব—শ্রীশ্রীমা যে অপূর্ব ঊর্ধ্বলোকে বিরাজ করেন সেখানে পৌঁছাতে। আহা! তাঁর মতো মধুরিমা আর স্নিগ্ধশান্তি, সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার গহন গভীরতা ও স্নেহ—কল্পনাতীত! কী অসাধারণ জীবন তাঁর—পূজার ব্যাপক বিধিব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান—যে পূজা তাঁরই স্বামীর—যার আয়োজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যরা করে দেন। স্বামীকে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। তবুও সে-পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর জন্য গভীর মানবিক স্নেহ-কোমলতা। এই তো সেদিন রাতে তিনি বলছিলেন, 'তাঁকে দেখেই ছিল আমার পরম তৃপ্তি।' আর এমনভাবে জীবনযাপন করে তিনি ক্রমশই যেন পদ্মপাতার ওপর জলবিন্দু হয়ে উঠেছেন—সর্বত্র, সমভাবে জগতকে স্পর্শ করেও, তাতে লিপ্ত বা তার দ্বারা প্রভাবিত এবং প্রতারিত নন—দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ। সন্দেহ নেই তিনি আশ্রমের কর্ণধার, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন শিশুর মতো, এত মিষ্টি—অথচ বিবাহের আদর্শরক্ষার ব্যাপারে আপোসহীন!...

"সর্বদা হিন্দুদের আদর্শ সহধর্মিণীর দৃষ্টান্ত তিনি! আহা, তিনি কী নিখুঁত—কত গভীর এবং প্রাণঢেলেই না তাঁকে ভালোবাসতে হয়।"[৩৭]

কেবল চিঠিপত্রেই যে মা সারদার চরিত্রটি তিনি শব্দরেখায় এঁকেছিলেন তা নয়, 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থেও (১৯১০) লেখনীমুখে অনিবার্যভাবে মায়ের প্রসঙ্গ

এসেছে। সেখানেও মা সারদা সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ মূল্যায়ন রয়েছে। তিনি লিখেছেন : "...আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির কর্ত্রী সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা বলেই মনে হয়। তাঁর কথা সকলেই জানেন। ...একাধারে ধর্মপত্নী ও সন্ন্যাসিনী, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের মধ্যে তিনিই সর্বদা সর্বশ্রেষ্ঠ।

"তিনি তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণ] এত প্রিয় ছিলেন! তা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে, তাঁর আরাধ্য পতির সম্পর্কে কথা বলার সময় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখেন—তিনি যেন কেউ নন! ...তাঁর কথাবার্তায় এমন একটি শব্দ কখনও থাকে না, যাতে 'আমি তাঁর অমুক' এই বলে কোনও আত্ম-অধিকার প্রকাশ পায়। তাঁর পরিচয় জানে না, এমন কেউ তাঁর কথাবার্তা থেকে বিন্দুমাত্র অনুমান করতে পারবে না যে, উপস্থিত অন্যান্য সকলের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর অধিকতব স্বত্ব বা দাবি আছে, অথবা তাদের চেয়ে তাঁর সম্পর্ক নিকটতর। ...তাঁর উপস্থিতিই সকলের কাছে পরম পবিত্রতাস্বরূপ।

"আমার সবসময় মনে হয়েছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু তিনি কি একটি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, অথবা কোনও নতুন আদর্শের অগ্রদূত? তাঁর মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও মাধুর্য। তবুও আমার কাছে তাঁর শিষ্টতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁর দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কোনও প্রশ্ন, তা সে যতই নতুন বা জটিল হোক না কেন, উদার ও সহৃদয় মীমাংসা করে দিতে তাঁকে ইতস্ততঃ করতে দেখিনি। তাঁর সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁর সব অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস। তবুও তিনি সবরকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন। তাঁর পরিবারের কেউ যদি দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাঁকে পীড়ন করে, তবে তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত শান্তি ও প্রগাঢ়ভাব প্রকাশ পায়। তাঁর বুদ্ধির অতীত কোনও নতুন সামাজিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত জটিল চক্রে আবর্তিত অথবা উৎপীড়িত হয়ে কেউ যদি তাঁর কাছে আসে, তিনি তখনই অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করে প্রশ্নকর্তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের পথনির্দেশ করেন। যদি কোনও কারণে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন হয়, অর্থহীন ভাবপ্রবণতার দ্বারা তিনি কখনও বিচলিত হয়ে ইতস্ততঃ করবেন না।...

"তবুও তাঁর জনৈকা শিষ্যা সঙ্গীতে তাঁর সহজাত ক্ষমতা সম্বন্ধে যা বলেন, বাস্তবিক তাঁর প্রকৃতি সেইরকম 'সঙ্গীতে ভরপুর', কোমলতা ও কৌতুকে পূর্ণ। আর তাঁর পূজার ঘরটি সত্যিই মাধুর্যে পূর্ণ।...

"শ্রীশ্রীমা পড়তে জানেন এবং তাঁর অধিকাংশ সময় রামায়ণ-পাঠে অতিবাহিত হয়। তিনি লিখতে পারেন না। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন, তিনি অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক মাত্র। ... মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে ব্যক্তিগত চরিত্রে যতখানি উৎকর্ষ লাভ সম্ভব, তিনি তাঁর পূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি অজ্ঞাতসারে এই মহাপুরুষ-সংসর্গের পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু কোনও নতুন ধর্মীয়ভাব বা অনুভূতিকে মুহূর্তের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই এর যে রকম সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই নয়।

"কয়েক বছর আগে একবার ইস্টারের অপরাহ্ণে তিনি যখন আমাদের গৃহে পদার্পণ

করেন, তখন আমি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মধ্যে এই শক্তির প্রথম পরিচয় পাই।...

"আর এক সন্ধ্যায় তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্ত পরিবৃতা হয়ে তিনি বসেছিলেন, এমন সময় আমাকে ও আমার সঙ্গিনী কৃস্টিনকে ইউরোপের বিবাহ-অনুষ্ঠান বর্ণনা করতে বলেন। যথেষ্ট হাসি ও কৌতুকের সঙ্গে তাঁর নির্দেশমতো আমরা একবার পুরোহিতের, পরক্ষণে বরকন্যার ভূমিকা অভিনয় করে দেখালাম। কিন্তু বিয়ের শপথবাক্য শুনে মাতাঠাকুরাণীর মনে যে ভাবের উদয় হল, তার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না।"[৩৮]

শ্রীশ্রীমার প্রতি নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গির আরও একটু পরিচয় আমরা সরলাবালা সরকারের 'নিবেদিতা' (বর্তমানে 'নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি') গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করতে চাই।

তিনি লিখেছেন : "বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতাদেবী.... কখনও কখনও আসিয়া বাস করেন। ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ানা দিনের মধ্যে একবারও অন্তত তথায় গিয়া তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকে আনন্দে চাহিয়া থাকে, নিবেদিতাও ওই সময় সেইরূপভাবে মাতাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চমবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ-হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরের বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ওইসময় চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবাব পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতিযত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ওইটুকু সেবা করিতে পারিয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছেন।

"মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, ঐ কথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই।... তাহার পর মা যে দিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সে দিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মত অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের এবং কখনও দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।"[৩৯]

পাশ্চাত্যে একটা কথার খুব চল আছে। সেখানে রহস্য করে বলা হয়—আমাকে যদি আপনি ভালোবাসেন তাহলে আমার কুকুরটিকেও আপনার ভালোবাসতে হবে। নিবেদিতা জন্মসূত্রে পাশ্চাত্যের মানুষ। তাই মাকে ভালোবেসে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলকে এবং সবকিছুই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

নিবেদিতার চোখ দিয়ে মাকে দেখা যেন আর আমাদের ফুরাতে চায় না! বাস্তবিক, সন্তানের দৃষ্টিতে মায়ের সৌন্দর্য কি কখনও নিঃশেষিত হয়? নিবেদিতারও হয়নি। সারা

বুলের অসুখের সময় মাকে লেখা কেমব্রিজ থেকে ১১ ডিসেম্বর, ১৯১০-এর চিঠিটিই তার প্রমাণ। লিখেছেন নিবেদিতা :

"আদরিণী মা,

সারার জন্য প্রার্থনা করবো বলে আজ খুব ভোরে আমি গির্জায় গিয়েছিলাম। সবাই ওখানে যীশুজননী মেরীর কথা চিন্তা করছে, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার সেই মনোরম মুখখানি, সেই স্নেহভরা চাহনি, পরনের সাদা শাড়ি, তোমার হাতের বালা—সবই যেন তখন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠলো। আমার মনে হল, তোমার এই ভাব-সত্তাই যেন বেচারী সেন্ট সারার রোগকক্ষে নিয়ে আসবে শান্তি ও আশীর্বাদ। আমি আরও কি ভাবছিলাম, জানো মা? ভাবছিলাম শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধ্যারতির সময তোমার ঘরে বসে আমি যে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আমার কী নির্বুদ্ধিতাই হয়েছিল! আমি কেন বুঝিনি যে, তোমার বাঞ্ছিত চরণতলে ছোট্রো একটি শিশুর মতো বসে থাকতে পারাটাই তো যথেষ্ট। মাগো, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ তুমি! আর তাতে নেই আমাদের বা জগতের ভালোবাসার মতো উত্তেজনা ও উগ্রতা। তোমাব ভালোবাসা হচ্ছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি যা প্রত্যেককে দেয় কল্যাণস্পর্শ; ও যেন বিলাসবিচিত্র একটি স্বর্ণদীপ্তি! কয়েকমাস আগেকার সেই রবিবারটা কী আশিসই না বয়ে এনেছিল। গঙ্গাস্নানে যাবার ঠিক আগে আমি তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, আবার স্নান করে ফিরে এসেই মুহূর্তের জন্য দৌড়ে তোমার পাশে গেলাম। তোমার ঘরখানির স্বাগত পরিবেশে তুমি সেদিন আমায় যে আশীর্বাদ করলে, তা আমায় দিয়েছিল একটি অদ্ভুত মুক্তির অনুভূতি। প্রেমময়ী মা, চমৎকার একটি স্তোত্র বা প্রার্থনা যদি তোমার উদ্দেশ্যে লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু তাতেও মনে হয় বড্ড বেশি শব্দ করা হবে, সেটা শোনাবে কোলাহলের মতো। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম-সুধা-ধারণের পাত্র!—এই সঙ্গহীন দিনে তুমিই রয়েছ তাঁর সন্তানদের কাছে তাঁর প্রতীক; আর আমাদের উচিত তোমার কাছে অত্যন্ত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে থাকা—অবশ্য কখনও কখনও একটু মজা করবার সময় ছাড়া। বাস্তবিকই, ভগবানের যা-কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই হচ্ছে অতি শান্ত। ধীর পদক্ষেপে অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদেব জীবনে—যেমন বাতাস, সূর্যের আলো, যেমন বাগানের সৌন্দর্য-সুবাস, গঙ্গার স্নিগ্ধতা, এইসব শান্ত নীরব জিনিসই তোমার তুলনা।

বেচারী সেন্ট সারার জন্য তোমার শান্তির আঁচলখানি পাঠিয়ে দিও। রাগদ্বেষের উর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনও মলিন হয় না?

বড় সোহাগের মা আমাব—

তোমার চিরদিনের নির্বোধ খুকী,

নিবেদিতা"[৪০]

'অতি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষনাশিনী'

জোসেফিন ম্যাকলাউড : স্বামীজী যাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, "ও পবিত্রতার মতোই পবিত্র, ভালোবাসার মতোই ভালোবাসাময়", সেই জোসেফিন ম্যাকলাউড বা ট্যান্টিন-এর কথা যখন শ্রীশ্রীমার প্রসঙ্গে ভাবি, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথাই মনে হয়—'মায়াব কার্য কিছু বুঝা যায় না'! যে-স্বামীজী ছিলেন তাঁর প্রাণের প্রাণ, যাঁর প্রতি গভীর অনুরক্তিতে তিনি করতে পারতেন না বোধ হয় এমন কোনও কাজই ছিল না, স্বামীজীর আদেশে ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে গিয়ে যিনি বারবার ভারতে এসেছেন এবং বহু বছর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একান্ত সুহৃদ হয়ে মঠে কাটিয়েছেন, যিনি নিবেদিতার চোখ খুলে দিয়ে শ্রীমাকে চিনতে এবং 'মা' বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন, সেই মা সাবদা সম্পর্কে 'জয়া'র অভিব্যক্তি খুবই সীমিত। মনে হয় তাঁর হৃদয় এমন সম্পূর্ণভাবে বিবেকানন্দময় হয়েছিল যে, সেখানে আর কারও ভাবনা তেমন কবে স্থান পায়নি। অথচ জো-কে লেখা নিবেদিতার চিঠির পর চিঠিতে মায়ের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা ও ব্যাকুলতা ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে। জো-কে তা স্পর্শ করে থাকলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত চিঠিপত্রে প্রতিফলিত হয়নি। সম্ভবত বিবেকানন্দেব মধ্য দিযেই তিনি বামকৃষ্ণ-সারদাকে আত্মসাৎ করেছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সঙ্গে তিনি এবং সারা বুল আমেরিকা থেকে কলকাতা এসে পৌঁছেছিলেন ১৮৯৮-এব ১৪ ফেব্রুয়ারি। মা সারদাকে প্রথম দর্শন ১৭ মার্চ, সঙ্গে ছিলেন সারা ও নিবেদিতা। জো স্পষ্ট করে এই প্রথম দর্শনের স্মৃতিচারণ কোথাও করেছেন কিনা আমরা জানি না। বোন শ্রীমতী লেগেট এবং বোনঝি আলবার্টা যাঁদের তিনি নিয়মিত চিঠি দিতেন এবং মনের কথা বলতেন, তাঁদের কাছে এ-বিষয়ে কিছু লিখেছিলেন কিনা তা গবেষণার বিষয়। তবে আমেরিকান ও ইউরোপীয় এই ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার মিলনের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণটিতে জো-র একটা মস্ত ভূমিকা ছিল—তিনিই তাঁদের সঙ্গে মাকে কিছু খেতে অনুরোধ কবেছিলেন। তখনকার জাতপাতের নিয়ম অনুযায়ী ভারতীয় অ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও যাঁর খাওয়া চলে না, সেখানে বিদেশিদের সঙ্গে খাওয়া তো ছুঁৎমার্গীদের দৃষ্টিতে ঘোর অনাচার। কিন্তু মায়ের কাছে তো ভক্তের কোনও জাত ছিল না; তাই তিনি খেয়েছিলেন। জো-র জীবনীকার লিখেছেন, "তাই সেদিন পাশ্চাত্যবাসীদের তরফ থেকে জো-রই জয় হল।"[৪১] শ্রীমার এই আচরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা মন্তব্য করেছেন, "এই পশ্চিমা ভক্তদের হিন্দুসমাজে গ্রহণ ও অঙ্গীভূত করে নেওয়ার অনুমোদনই মা সেদিন দিয়েছিলেন।"[৪২] যাহোক, এই দর্শনের পর নৌকা করে তাঁরা সকলে বেলুড় ফিরলেন। প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা অনুমান করেছেন, মায়ের পূতসান্নিধ্যের সুগন্ধে, গঙ্গার পরিমলে সকলের মন তখন মাতাল, ভরপুর। সকলেই যেন অনুভব করছিলেন, আজ তাঁরা এক অতি দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন। ফেরার পথে জো-ও হয়তো বা মনে মনে তাঁর প্রিয় শব্দটি বারবার উচ্চারণ করে নিজের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, 'ধন্য!' 'ধন্য'!

১৮৯৯, ৫ জানুয়ারি, জো সারার সঙ্গে ভারত ত্যাগ করেন। এরপর তিনি আবার কলকাতায় আসেন ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সেইসময় তিনি সারদা দেবীকে পুনরায় দর্শন করেন। ১০ মার্চ, কলকাতা থেকে কলম্বো হয়ে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সেখান থেকে আবার ৬ জানুয়ারি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে আসেন। তারপর স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আগেই মায়াবতী ঘুরে ইউরোপ চলে যান। তারপর ক্রমশ সেখানে স্বামীজীর কাজে ডুবে যান। দীর্ঘ চোদ্দো বছর এভাবে কাটানোর পর মায়েরই আহ্বানে তিনি আবার ১৯১৫-তে স্বামীজীর ভারতে ফিরে এলেন। এইসময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে যার মধ্য দিয়ে জো-র মায়ের প্রতি মনের প্রচ্ছন্নভাবটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ঘটনাটি এই :

একদিন স্বামী নির্ভয়ানন্দ জোসেফিনকে নৌকা করে বেলুড় মঠ থেকে উদ্বোধনে মায়ের কাছে নিয়ে যান। সন্ধ্যায় মঠে ফিরে জো যখন ঠাকুরঘরে প্রণাম ও একটু ধ্যান করে অতিথিভবনে যাবেন, তখন স্বামী ধীরানন্দ একজন ব্রহ্মচারীকে আলো নিয়ে পথ দেখিয়ে দিতে বলেন। জো একটু এগিয়ে গিয়েছিলেন; ব্রহ্মচারী তাঁর কাছাকাছি যেতেই শুনতে পেলেন ভাবের ঘোরে জো ইংরেজিতে বলছেন, 'আমি তাঁকে দেখেছি!' আমি তাঁকে দেখেছি!' হঠাৎ ব্রহ্মচারীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গেলেন জো এবং কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন : "পবিত্রতা-স্বরূপিণী মা! আমি তাঁকে দেখেছি!"[৪৩] তারপর একটা দিব্যভাবের আবেশে জো টলতে টলতে চললেন, কোথায় পা পড়ছে হুঁশ নেই, আর মাঝে মাঝেই বলছেন, 'মা! মা! পবিত্রতাস্বরূপিণী!'

বাইরে প্রকাশ না করলেও জো-র সঙ্গে শ্রীশ্রীমার যে অতি মধুর এক ভালোবাসার সম্বন্ধ ছিল তা বলাই বাহুল্য। নিবেদিতা একবার জো-কে লিখেছিলেন, "মা বললেন, আজ রাতে ধ্যান করার সময় তাঁর বাঁদিকে সারাকে এবং সামনে জোকে সারাক্ষণ দেখেছেন।"[৪৪]

১৫ নভেম্বর, ১৯১৬-র এক চিঠিতে বোন বেটী লেগেটকে মঠের নতুন অতিথিভবনে থাকার আনন্দ বর্ণনা করে লিখেছেন জো, "শ্রীমা আর আমি এক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটালাম, ঠিক আগের মতো—কত হাসি, কত কথা; যেন দুটি বালিকা নিজেদের অভিজ্ঞতা আদানপ্রদান করছি! সত্যিই মা আনন্দের মূর্তি! আমার চুল সাদা, তাঁর কালো—যেন বয়সই হয়নি। আর আমার চেয়ে বয়সে তিনি অনেক বড়ো!"[৪৫]

১৬ নভেম্বর, ওই একই দর্শনের বর্ণনা দিয়ে স্যান্ডউইচের কাউন্টেস, আলবার্টাকে জো লিখেছেন, "[শ্রীমা] সারদা দেবীর সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটালাম। কাল আবার যাব। যেন তোমার সঙ্গে অথবা মায়ের [বেটীর] সঙ্গে কথা বলছিলাম। বহুদিন পর অবশেষে একত্রিত হতে পেরে উচ্ছ্বাস ও আনন্দের আতিশয্যে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে আমরা দ্রুত চলে যাচ্ছিলাম এবং পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করছিলাম।"

এরপর ওই চিঠিতেই এসেছে এ-পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত এক অপূর্ব প্রসঙ্গ। জো লিখেছেন : "তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধ্যান কীভাবে করতে হয়। তিনি স্বামীজীর মধ্যেই ঈশ্বরকে চিন্তা করতে বললেন। বললাম—দৈনন্দিন জীবনে এমনিতেই তো তিনি আমার মন জুড়ে থাকেন; তাই ধ্যানের সময় আমি সচেতনভাবেই তাঁকে চিন্তার বাইরে রাখি। আমার কথায় তিনি আশ্চর্য হলেন। তিনি বললেন, [শ্রী] রামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, স্বামীজীকে সৃষ্টি করতে সাতজন ঋষির শক্তি লেগেছিল এবং [ঋষিদের সেই শক্তি] রামকৃষ্ণের মাধ্যমে তাঁকে এই মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিল!

"ব্রহ্মচারী এবং অল্পবয়সী সব ছেলেই তাঁর শিষ্য। তাঁরা মনে করেন তিনিই সঙ্ঘজননী! [ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস, কোনও দীক্ষাই দেন না।] শুধু [হাতে করে] গেরুয়া কাপড় দেন।"[৪৬]

শ্রীমা জোকে একটি কলসি দিয়েছিলেন। কলসিটি জো স্ট্রাটফোর্ড-অন-এ্যাভন-এর

স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন। ব্রিনেত ভার্তিয়ার জো-র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "শ্রীমা সারদা দেবী গঙ্গা থেকে প্রতিদিন যে-তাম্রকলসে জল আনতেন, সেটি ট্যান্টিনের কাছে ছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কীভাবে এটি পেলেন, তিনি বললেন, 'আমি তাঁর [অর্থাৎ শ্রীমার] কাছে চেয়েছিলাম'। যখন আমি কলসিটি প্রথম দেখি, তখন ওটি কোনও একটি শোবার ঘরে বিরাট টেবিলের ওপর আর পাঁচটা ঘর-সাজানোর শৌখিন জিনিসের মধ্যে রাখা ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে এর মধ্যে ফুল দিই।' "[৪৭]

মা সারদা লীলাসংবরণ করেন ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ জুলাই। ১৫ আগস্ট জো স্বামী সারদানন্দকে লিখলেন, "সেই নির্ভীক, শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তাহলে নির্বাপিত হল—আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ! আমার কাছে তাঁর জীবন হল অসীম উৎসাহের জীবন—যা আমাদের সবাইকে সেই শরণদায়ী সহানুভূতিভরা জীবনতলে একত্র করেছে, যা নতুন প্রয়োজনের অনুরূপ আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ ঋজু প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠিত নতুন নতুন আদর্শের নজির সৃষ্টি করেছে! ওঃ, তাঁর জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখাতে পারি! তিনি আদর্শের নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে গেছেন—আমাদেরও অবশ্য তাই-ই করতে হবে—তাঁর নয়, আমাদের স্বকীয় (জীবনের নজির সৃষ্টি)! আর অন্য কোনও উপায়ে জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না।"[৪৮]

আত্মপ্রত্যয়ী জো, চিরকর্মচঞ্চল উৎসাহী জো, এই চিঠিতেই সুষ্ঠুভাবে মায়ের মূল্যায়ন করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর দৃষ্টিতে মা কী ছিলেন, তা এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১৯২৬ সালের জুন মাসে বেলুড় মঠে প্রথম সাধু-সম্মেলন হয়। জো তখন সেখানেই ছিলেন। তাঁর চিঠি থেকে জানা যায় ওইসময় গরমের দিনে টানা দু-ঘণ্টা তিনি ফণী মহারাজ [স্বামী ভবেশানন্দ]-এর সঙ্গে মায়ের বিষয়ে কথাবার্তা বলেছেন ও শুনেছেন। সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বসেও আবার সেই প্রসঙ্গই চলছে। তখন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন গোপালচৈতন্য [পরবর্তী কালে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ]। এর থেকে বোঝা যায় মা সারদার কথা শোনার কী কৌতূহলই তাঁর ছিল! ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "সারদা দেবীর কয়েক হাজার শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যসংখ্যা মুষ্টিমেয়, আর স্বামীজীর ছিল কয়েকশো। এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ সারদা দেবী স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরও কুড়ি বছর [আঠারো বছর] মনুষ্যদেহে ছিলেন। নিজের পরিবারে তাঁকে অনেক দুঃখকষ্ট, দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয়েছিল। এক ভাইঝিকে নিয়ে তাঁকে কি কম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে! ..এই মহীয়সী মা সারদা, যিনি জীবদ্দশাতেই পূজিতা হয়েছিলেন; তাঁর একান্ত ঘরোয়া জীবন, পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক আমাকে বড়োই টানে।"[৪৯]

মিস ম্যাকলাউড ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেন এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে লেখনী ধরতে তাঁকে উৎসাহিত করেন। কথাবার্তার সময় তিনি সারদা দেবীর প্রসঙ্গও করতেন। রোলাঁর 'জার্নাল'-এর নোট থেকেই তা বোঝা যায়। ১৩ মে, ১৯২৭-এর একটি নোটে রোলাঁ লিখেছেন, "মিস ম্যাকলাউড একবার সারদা দেবীকে বলেছিলেন, "আপনার স্বামী এর [রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের] শ্রেষ্ঠ ভূমিকায়

অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই (তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই) তাঁর নতুন বাণী প্রচার করতে হয়েছিল। তাঁর কাছে এ-কাজ ছিল আনন্দের। তুলনামূলকভাবে বিবেকানন্দের দায় ছিল অনেক কঠিন। তাঁকে ভারতবর্ষের চিন্তা ও ভাবটি বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল বিদেশী এবং প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে। তাঁর বীরত্ব আরও বেশি।" এ-কথা শুনে সারদা দেবী শুধু বলেছিলেন, "তা সত্যি। ও আরও বড়ো। আমার স্বামী বলতেন, তিনি শরীর আর বিবেকানন্দ হল মাথা।"[৫০]

১৬ মে, ১৯২৭-এর নোটে লিখছেন, "মিস ম্যাকলাউড সারদা দেবীকেও খুব ভালোভাবে জানতেন। .. শ্রীমার সম্বন্ধে মিস ম্যাকলাউড বললেন, তিনি ছিলেন এক অসাধাবণ মহিলা—পাশ্চাত্যের মেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে এবং যে-কোনও বিষয়ে তাদেব সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারতেন। সবই করতেন এমন সরল, স্বাভাবিক মাধুর্যের সঙ্গে যে, সকলেই মুগ্ধ হত। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতো তিনিও অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং ওঁদেরই মতো ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে থাকতেন। পাশ্চাত্যের যেসব দর্শনার্থীরা তাঁর কাছে আসতেন, তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তিনি শিশুর মতো আনন্দ করতেন। তাঁব গ্রামের কেউই তাঁর অপার মহিমা বুঝতে পারেননি, কাবণ তাঁর অসাধারণত্ব গোপন করে তিনি সাধারণেব মতোই চলাফেরা করতেন।"[৫১]

'আপনাতে আপনি থেকো মন'

ভগিনী কৃস্টিন : মাতৃবন্দনায় মুখর নিবেদিতার পাশে যখন মিস ম্যাকলাউডকে দেখি, তখন তাঁকে সতর্ক ও সংযতবাক্ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন ম্যাকলাউডের পাশাপাশি ভগিনী কৃস্টিন (গ্রীনস্টীডেল)-কে দেখি, তখন তাঁকে মনে হয় মূর্তিমতী নীরবতা। একদা ডেট্রয়েট-নিবাসী পাশ্চাত্যের এই সর্বত্যাগী কন্যাটিকে স্বামী বিবেকানন্দ জগজ্জননীর কাছে সমর্পণ কবেছিলেন, যেমন নিবেদিতাকে অর্পণ করেছিলেন শিবের হাতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমার অত কাছাকাছি থেকেও, কৃস্টিন কেন যে মা সারদার কাছে মনটি খুলতে পারেননি, তা বুঝে ওঠা যায় না। বোঝা যায় না, মায়ের মহিমাকে তিনি, নিবেদিতার ভাষায় প্রথমদিকে কেন বুঝতে পারেননি। পরেও কী তেমন পেরেছিলেন? প্রশ্নটি কৃস্টিনের জীবনীকার প্রব্রাজিকা ব্রজপ্রাণাকেও ভাবিয়েছে।[৫২]

অথচ শ্রীশ্রীমার স্নেহ তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন। কৃস্টিন ছিলেন একেবারে মাতৃমূর্তি। মা আদর করে তাঁকে 'কৃষ্ণ মাতা' বলে ডাকতেন।[৫৩] মা উদ্বোধনে থাকলে কৃস্টিন যে নিবেদিতার সঙ্গে দিনের মধ্যে একটিবারও তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসতেন, একথা প্রত্যক্ষদর্শী সরলাবালা ও শ্রীদুর্গাপুরী দেবী উভয়েই লিখেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও কখনও কখনও কৃপা করে ভগিনীদের বাসস্থানে আসতেন। নিবেদিতার ইউরোপ ও আমেরিকা থাকাকালে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব যখন কৃস্টিনের উপর ছিল, তখন মা মাঝেমাঝেই তাঁর কাছ থেকে স্কুলের খোঁজখবর নিতেন। কৃস্টিন বেশ ঝরঝরে বাংলা বলতে পারতেন। এটি মা বিশেষ পছন্দ করতেন।

কৃস্টিন ও নিবেদিতা একদিন মা সারদার কাছে এসেছেন। নিবেদিতা তখন সবে একটু একটু বাংলা শিখেছেন। মাকে বললেন নিবেদিতা, "মাতৃদেবী, আপনি হন আমাদিগের

কালী।" কৃস্টিনও ওই কথার প্রতিধ্বনি করলেন। মা শুনে হেসে বললেন, "না বাপু, আমি কালী টালী হতে পারব না। জিব বার করে থাকতে হবে তাহলে।" মায়ের সরল মন্তব্য ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেওয়া হলে নিবেদিতার সঙ্গে কৃস্টিনও বলে উঠলেন, "মাকে অত কষ্ট করতে হবে না, আমরাই তাঁকে জননীরূপে দেখব। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিব।" মা হাসতে হাসতে বলেন, "তা না হয় দেখা যাবে।"[৫৪]

'করুণা-পাথার জননী আমার'

বেটী লেগেট : মিস ম্যাকলাউডের বোন বেটী ছিলেন আমেরিকান কোটিপতি মি. ফ্র্যাঙ্ক লেগেটের স্ত্রী। পাশ্চাত্যে থাকার সময় স্বামীজীকে জো এবং বেটী যেভাবে সেবা করেছিলেন, পরবর্তী কালে মঠ ও মিশনের কাজে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন, তা আজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। বেটী, প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণার মতে ১৯১৩-র জানুয়ারি মাসে অ্যালবার্টা ও তাঁব জামাই জর্জ মন্টেগুকে নিয়ে ভাবতে আসেন। ২০ জানুয়ারি রেঙ্গুনের কাছাকাছি জাহাজ থেকে ম্যাকলাউডকে যে চিঠিটি লিখেছেন, তাতে মনে হয় তিনি ভগিনী কৃস্টিনের সঙ্গে একলা শ্রীমাকে দর্শন করতে যান—অ্যালবার্টা ও তাঁর স্বামী যে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সে-বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। অথচ ওই একই চিঠির এক অংশে তিনি মা ও স্বামী সারদানন্দকে দর্শন করার পর নৌকা করে দক্ষিণেশ্বর আসার বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেখানে পঞ্চবটীর তলায় জর্জ মন্টেগুর ধ্যানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। মনে হয় এখানে কোথাও একটা অসঙ্গতি আছে। সে যাই হোক আমর' এখন বেটীর মাতৃ-দর্শনের বর্ণনা অনুসরণ করব। তিনি ওই চিঠিতে লিখেছেন,

"সারদা দেবীকে দর্শনের বিরাট ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার কথা অ্যালবার্টা তোমাকে জানাবে। আমি নিজেও কিছু অনুভব করেছি। আমি কলকাতা ছাড়াব মাত্র দুদিন আগেই তিনি কলকাতায় এসেছেন। ছোটো বাড়িটিতে তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম এবং তাঁর সান্নিধ্যে বহুক্ষণ ছিলাম—কতক্ষণ তা বলতে পারি না—যেন অনন্তকাল! তিনি খুব স্বচ্ছন্দ ছিলেন, কোনওরকম জড়তা দেখলাম না। তাঁর মাথা এবং হাতদুটি অনাবৃত ছিল; করুণাময়ী শান্ত ও প্রসন্না হয়ে বসে আছেন। অল্পবয়সী মহিলারা নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করছেন এবং ধীরে ধীরে পরম স্নেহের সঙ্গে তিনি তাঁদের একপাশে সরিয়ে দিচ্ছেন... । আমার জন্য তিনি একটি মাদুর পাতলেন; তোমাকে আর অ্যালবার্টাকে কত ভালোবাসেন, তা আমাকে বললেন। আর এও আমাকে বলেছেন, তুমি আমার সঙ্গে আবার কবে তাঁকে দর্শন করতে আসছ?"

বেটী আরও লিখেছেন, "খুব শান্তভাবে, থেমে থেমে, শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তন্ময় হয়ে তিনি তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কথা বলেছিলেন; মাঝে মাঝেই ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর প্রতি সুগভীর ভালোবাসা...। শ্রীমার ছবিগুলির মধ্য থেকে আমি একটি বিশেষ ছবি চেয়ে নিলাম কারণ সেটি তাঁর ছবি হিসেবেও যেমন অসাধারণ, তেমনি নারীসুলভ সৌন্দর্যের দিক থেকেও চমৎকার। তিনি বেশ কয়েকবার আমার মুখটি দুহাতে নিয়ে আদর করলেন; তারপর নিজের সেই হাতদুটিতে চুমো খেয়ে [মাতৃসুলভ স্নেহ প্রকাশ করলেন।] আবেগে আপ্লুত হয়ে আমরা বেশ কয়েকবার পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। কিন্তু কৃস্টিনকে দেখলাম খুব তৎপর এবং বিচক্ষণ—মাঝে-মধ্যেই দু-একটি সঙ্কেতপূর্ণ শব্দ জুড়ে দিয়ে আমাদের কথার ফাঁকটি ভরিয়ে দিচ্ছিল। শ্রীমা তাঁর পূজার ঘরেই বসেছিলেন। আমি

স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়ে মিস ম্যাকলাউড, সারা বুল, নিবেদিতা

জো-র দিদি বেসি লেগেট

সিস্টার দেবমাতা

যখন সেই পবিত্র স্থানটি ছেড়ে ওঠার উদ্যোগ করলাম, তখন দেখি আমার গলায় তিনটি মালা ঝুলছে। মালাগুলিকে ঠিকঠাক সুন্দর করে জামার উপর গুছিয়ে নিলাম, মা দেখলাম তাতে বেশ খুশি হলেন। মেয়েদের সহজাত সৌন্দর্যবোধ, সুরুচি, পারিপাট্য এবং আনন্দের ভাব নিয়েই ফুলগুলিকে তিনি স্পর্শ করলেন। মুখে তাঁর শিশুর সরল হাসি। আমি তাঁর সবকটি ঘর, জিনিসপত্র, মূর্তি, ছবি—যেখানে যা ছিল, সব খুঁটিয়ে দেখলাম আর দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম আমাদের ম্যাডোনার কথা। তিনিও নিশ্চয় এমনই সরল এবং প্রায় এমনই দরিদ্র ছিলেন; পঞ্চাশ বছর বয়সে বোধ করি তিনিও ঠিক এমনটিই ছিলেন! সারা বাড়ি ঘুরে ফিরে দেখা হয়ে গেলে লক্ষ্য করলাম তিনি একেবারে সিঁড়ির মাথায় অপেক্ষা করছেন—বেশ দীপ্তিময়ী দেখাচ্ছিল তাঁকে। শ্রীমা আবার তাঁর দু-হাতের মধ্যে আমার মুখটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমার চোখে জল—মনে হল, তাঁর চোখেও। আমার চোখ ঝাপসা থাকায় তাঁরটা ঠিক দেখতে পাইনি।"[৫৫]

'কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে'

অ্যালবার্টা, কাউন্টেস অব্ স্যান্ডউইচ, ও আর্ল জর্জ মন্টেগু : বেটীর চিঠি থেকেই জানতে পারি, অ্যালবার্টা শ্রীসারদা দেবীকে দর্শনের 'বিরাট ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার কথা' মিস ম্যাকলাউডকে লিখে জানিয়েছিলেন। কিন্তু চিঠিতে তিনি ঠিক কী লিখেছিলেন, তা ম্যাকলাউডের জীবনীকারেরা কেউই উল্লেখ করেননি। হয়তো মূল চিঠিটির সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাই। কিন্তু ওই চিঠির উত্তরে ম্যাকলাউড যা লিখেছিলেন, তা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে অ্যালবার্টা শ্রীশ্রীমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে ম্যাকলাউডের মনের ভাবটিও আর একবার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, "সারদা দেবী সম্বন্ধে কলকাতা থেকে লেখা তোমার চিঠিটি পেয়ে বুঝলাম তাঁর ভিতরের সেই মহামূল্যবান রত্নের সন্ধান তুমি পেয়েছ যা আমরা সকলেই অনুভব করেছি এবং যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে পূজা করেছিলেন। তিনিই প্রকৃত বন্ধু, ষোলো আনা খাঁটি; শান্ত, মধুর, শক্তিময়ী, মানবিক—অথচ কী সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না। আমি তাঁকে ভালোবাসি। অবশ্যই তাঁকে আবার দেখতে যাব।"[৫৬]

কিন্তু ঠিক কোথায় অ্যালবার্টা এবং তাঁর স্বামী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেছিলেন? এ-প্রসঙ্গে স্বামী গিরিজানন্দ লিখেছেন, "এই কাশীতেই আর্ল অফ্ স্যাণ্ডুইচ ও তাঁহার পত্নী মাকে প্রণাম করিতে আসেন। ...আর্ল ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া মাকে প্রণাম করিলেন। আর্লপত্নীও মাকে প্রণাম করিলেন। মা আর্লপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জয়া বিজয়া, (তাঁর মা ও মাসি) কেমন আছে। তিনি সব কুশল নিবেদন করিলেন। মাকে প্রণাম করিয়া আর্লদম্পতি অদ্বৈতাশ্রমে আসেন।"[৫৭]

'সে যে তোমার আমার মা শুধু নয় জগতের মা সবাকার'

ভগিনী দেবমাতা : লরা গ্লেন বা ভগিনী দেবমাতা নিউইয়র্কে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছিলেন। 'My Master' (মদীয় আচার্যদেব) তার মধ্যে অন্যতম। বক্তৃতা শুনে তিনি স্তম্ভিত। স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "[বুঝতে পারলাম] আমার ডাক এসেছে এবং সে-আহ্বানে আমি সাড়া দিলাম।"[৫৮]

সম্ভবত ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন বা জুলাই মাসে মাদ্রাজ থেকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ ১১ আগস্ট এক চিঠিতে লিখেছেন, "ভগিনী দেবমাতা (মিস গ্লেন) মাকে দর্শন করার জন্য মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। তিনি এখন ভগিনী নিবেদিতা এবং কৃস্টিনের সঙ্গে আছেন। খুব শান্ত ও চুপচাপ মানুষ—দেখে মনে হয় ভিতরটা জেগে গেছে।"

দেবমাতার মায়ের প্রতি গভীর ভক্তি ছিল। সারা বুলকে ২২ জুলাই এক চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা, "সিস্টার দেবমাতা এখানে আছেন। খুব সুন্দর, ভারি চমৎকার মহিলা। আমার মতোই পোশাক পরেন। (কিন্তু) ছোটোখাটো এবং শীর্ণ চেহারা; মায়ের চিন্তায় এবং সাধনভজনে ডুবে আছেন।" দেবমাতার ভক্তি তাঁকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর আপন মনোভাবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা। এই দুই গুণের সংযোগে তাঁর বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে শ্রীশ্রীমার অপার্থিব মাতৃত্ব এবং মায়ের প্রতি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। লিখছেন দেবমাতা :

"আমার কলকাতা ভ্রমণ ছিল তীর্থযাত্রার মতো। কলকাতার অদূরে গঙ্গার তীরে রয়েছে সেই মন্দিরটি, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করেছেন ও ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। গঙ্গার অপরতীরে কিছু দক্ষিণ দিকে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় মঠ। সর্বোপরি রয়েছে বাগবাজারে সেই অনাড়ম্বর বাড়িটি, যেখানে বাস করতেন এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধিকা। তাঁর নাম সারদামণি দেবী...। তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশে আমার এই তীর্থযাত্রা।...

"[উদ্বোধনের] সদর-দরজা এবং উঠোন পেরিয়ে চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। পূজার ঘরের পিছনে একটি ঘরে শ্রীমাকে একলা পেলাম। তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করলাম নিজেকে, প্রণামীর সঙ্গে। স্নিগ্ধ স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'ওমা দেবমাতা!' তারপর তাঁর শ্রীহস্ত আমার মাথায় রাখলেন, তাঁর স্পর্শে আমার অন্তর হতে নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে আমার সমগ্র সত্তাকে প্লাবিত করে তুলল।

"তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন মন্দিরের বেদীর কাছে। প্রণাম করে মেঝেতে বসলাম। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তিনি কাছেই শুয়ে পড়লেন। একজন সন্ন্যাসিনী এসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ভারতবর্ষে ভালোবাসায় ভরা সেবার এটি প্রচলিত রীতি। সে-দৃশ্য দেখে মনে হল : 'আমি কি কোনওদিন এই সেবার অধিকার লাভ করতে পারব!' আমার এই চিন্তা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে সন্ন্যাসিনীর স্থান গ্রহণ করতে বললেন। তাঁর কোমল সুঠাম শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শের সৌভাগ্য—সে এক দুর্লভ আশীর্বাদ। কিন্তু পাথরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসা ক্রমেই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। এবারও তিনি আমার মনের ভিতরের কথা বুঝে নিয়ে আমাকে তাঁর পাশে বসালেন। আমরা একে অন্যের ভাষা জানতাম না। যখন পরস্পরের বক্তব্য বুঝিয়ে বলার জন্য কেউ উপস্থিত থাকতেন না, তখন তিনি হৃদয়ের অকথিত গভীরতর ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতেন। সে ভাষা বুঝতে আমাদের কারোরই কোনও অসুবিধা কখনও হত না।

"মা অবিলম্বে আমাকে নিজের কাজকর্মে লাগিয়ে দিলেন। তাঁর ঘর দেখাশোনা করার সুযোগ পেলাম। প্রতিদিন সকালে আসতাম, তাঁর বিছানা ঠিকঠাক করে দিতাম এবং জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতাম।...

"আর একবারের কথা। একজন বাছাই করা সেরা দুটো আম নিয়েছেন। মা চাইছিলেন আমি ওই আম দুটি নিয়ে যাই। কিন্তু আমি রাজী হলাম না, কারণ জানতাম, সেগুলি শেষ মরশুমের আম, আর মা আম খুব ভালোবাসেন। বললাম : 'আম দুটি আপনি নিজে রাখলে আমার বেশি আনন্দ হবে।' মা চকিতে বললেন, 'আমি রাখলে তোমার আনন্দ, আর তুমি নিলে আমার আনন্দ, কার আনন্দ বেশি হবে তুমি মনে কর?' আমার মুখে তখনই কথা জুগিয়ে গেল, 'মা, আপনার আনন্দই বেশি হবে কারণ আপনার অনেক বড় মন।' জবাব শুনে মনে হল মা খুশি হলেন।

"প্রতিটি প্রাণী সম্পর্কে তাঁর অন্তহীন স্নেহ-ব্যাকুলতা। মানুষের মাপে তাঁকে মাপা যায় না।...

"[জয়রামবাটীর মতো] কলকাতাতেও প্রায় প্রতিদিন ভক্ত-তীর্থযাত্রীরা আসতেনই তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে। তাঁরা কোন সময় এলেন, কোথায় তাঁদের বাস, কি তাঁদের জাতি বা বর্ণ এসব ছিল তাঁর কাছে অবান্তর। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যেখান থেকেই আসুন, সকলের জন্যই ছিল তাঁর স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বাগত আহ্বান। সবাই তাঁর সন্তান। মাতৃগর্ভজাত সকলকেই তাঁব মাতৃহৃদয় ঢেকে রাখত তাঁর সর্বপ্লাবী পরম ভালোবাসায়। সমগ্র মনুষ্যসমাজই তাঁর সংসার।...

"...[যখন আমি মাতৃসান্নিধ্যে গিয়েছি] মা তখন বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণেব ভক্তদের তৈরি করা কলকাতার একটি বাড়িতে। সে-বাড়ির দোতলায় তিনি থাকতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গিনী কয়েকজন মহিলা।

"অন্য সকলের মতোই সেখানে তিনি থাকতেন। সবার সঙ্গে একইভাবে গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতেন। কোথাও নিজেকে আলাদা করে রাখার কোনও চেষ্টা তাঁর ছিল না। শুধু পার্থক্য ছিল তাঁর অধিকতর নম্রতায়, অধিকতর মধুরতায় এবং বিনতিতে। ...তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণে তাঁকে অত্যন্ত সাধারণ কেউ বলে মনে হত। সংসারের সবকিছুর মধ্যে নিজেকে এমনইভাবে সম্পূর্ণ আড়ালে তিনি ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহজতার অবগুণ্ঠনতলে বিরাজিত ছিল রাজরাজেশ্বরীর মহিমা, যা অভিভূত করত হৃদয়কে এবং নত করে দিত অপরকে তাঁর চরণপ্রান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। তাঁর অন্তরের দৈবীচেতনার আলোককে গোপন করার পক্ষে তাঁর মানবীয় বাহ্যিক আবরণটি ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। তিনি কখনও ধর্মশিক্ষা দিতেন না। উপদেশ দিয়েছেন কদাচিৎ। তাঁর ছিল শুধু জীবন, যাপিত জীবন। সেই পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত কত মানুষের জীবনকে নির্মল ও ঊর্ধ্বায়ত করেছে, কে তার ইয়ত্তা করবে?...

"তাঁকে ঘিরে থাকত আনন্দ-স্নিগ্ধ এক মধুরতা। সেইসঙ্গে ছিল এমন প্রচ্ছন্ন রসবোধ যে, তাঁর সঙ্গে যে-কোনও বিষয়ে আলাপ করা যেত। তুচ্ছতম বিষয়েও তাঁর কৌতূহল। ...মায়ের কাজে কোনও ছলনা ছিল না। ...শ্রীমা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর সত্তা আজও আমাদের সতত রক্ষা করছে। ...

"শ্রীমায়েব সান্নিধ্যে বাস করার দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা জেনেছেন, ধর্ম কত মধুর, কত স্বাভাবিক, কত আনন্দময় সামগ্রী। তাঁরা জেনেছেন, সেই শুচিতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। তাঁরা জেনেছেন, পবিত্রতা যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ধরা দেয় এমন সুরভি-সুবাস, যা জড়বাদী স্বার্থপরতার কটু গন্ধ ও ক্লেদকে পরাভূত করে নিঃশেষে

বিনষ্ট করে দেয়। করুণা, ভক্তি এবং ঈশ্বরানুভূতি—এই ছিল শ্রীমার সহজাত স্বভাব। কিন্তু এতই সহজ স্বাভাবিক ছিল যে লোকের কাছে সেগুলি আলাদাভাবে ধরা পড়ত না। তাঁর প্রাণ জুড়ানো আশীর্বচনের একটি শব্দ, কিংবা ক্ষণেক স্পর্শের মধ্যে এই গুণগুলির অস্তিত্ব অনুভূত হত।

"বিস্তীর্ণ জলাশয় বা প্রবহমান নদীর মতো তাঁদের জীবন। সূর্যরশ্মি তার জলকণাকে শোষণ করে, তারপর তা আবার বর্ষণরূপে ফিরে আসে পৃথিবীকে সতেজ করার জন্য। তাঁদের পার্থিব দেহ আমাদের সামনে থেকে সরে যায়। কিন্তু আমাদের ক্লান্ত স্তিমিত হৃদয়কে নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত করতে, আমাদের নতুন আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে, আমাদের জীবনে উদ্দেশ্যের নতুন শক্তি ও রূপ উন্মোচন করতে তাঁদের পুণ্যপ্রভাব নিত্য বর্তমান।"[৫৯]

আমার মতে উৎকর্ষের বিচারে নিবেদিতার পরেই দেবমাতার বর্ণনার স্থান—সাধনের গভীরতা ও নিবিড় তন্ময়তা না থাকলে দৃষ্টির এই ব্যাপ্তি ও স্বচ্ছতা আসে না, হৃদয়ে জমাট শুদ্ধভাব না থাকলে পবিত্রতাস্বরূপিণী সারদা-চরিত্রের মহিমা ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাকে প্রকাশ করা দূরের কথা!

'আর কারে ডাকব শ্যামা ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে'

স্বামী অতুলানন্দ : শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মায়েরও পাঁচ ফুলের সাজি। হল্যান্ডের কর্ণেলিয়াস হেইব্লেম, পরবর্তী কালে স্বামী অতুলানন্দ, সেইরকম এক ফুল যা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এবং বিশেষভাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের বেদান্তভাবনার সৌরভে আজীবন আমোদিত ছিল। নির্জনতাপ্রিয় নিসর্গপ্রেমিক এই মননশীল সন্ন্যাসী ১৯০৬-এ ভারতে আসেন এবং ১৯১২ পর্যন্ত একটানা এদেশে থাকেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমার কাছে তাঁর মন্ত্রদীক্ষা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ভারতে কাটান ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত। তৃতীয় ও শেষ পর্বে ভারতে আসেন ১৯২২-এর ডিসেম্বরে। তখন থেকে ১৯৪০ সালে দেহ যাওয়া পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষেই ছিলেন। যেটা লক্ষণীয় সেটা এই, তাঁর চিঠিপত্রে ও স্মৃতিচারণে বিশেষত তাঁর 'With the Swamis in America and India' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের অনেকের কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু মা সারদার কথা একটিবারও চোখে পড়ে না। হয়তো বা 'শান্তি আশ্রম'-এর অতিপরিচিত ও প্রিয় বন্ধুদের কাছে মুখে মুখে তিনি মায়ের কথা কিছু বলে থাকবেন, কিন্তু ছাপার অক্ষরে কিছু পাওয়া যায় না। 'With the Swamis'-এ মাঝে মাঝেই তিনি 'মাদার' শব্দটি বিভিন্ন অনুষঙ্গে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 'হোলি মাদার' নয়। হতে পারে, তিনি যখন 'মাদার' শব্দটি উচ্চারণ করতেন, তখন হয়তো শ্রীশ্রীমায়ের মুখখানিই তাঁর হৃৎ-কমল-মঞ্চে দুলে উঠত, কারণ কালী আর ব্রহ্ম যে অভেদ, এ তো তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু এ আমাদের কল্পনা, ইতিহাস নয়।

আরও একটি বিস্ময়ের ব্যাপার—শ্রীশ্রীমায়ের জীবদ্দশায় তিনি প্রায় বারো বছর ভারতে ছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক মন্ত্রদীক্ষার সময়টি ছাড়া আর কখনও মাকে দর্শন করেছিলেন কিনা বা মার কাছে গিয়েছিলেন কিনা তাও আমরা জানি না। গুরুদাস মহারাজ বা স্বামী অতুলানন্দ সম্পর্কে নথিবদ্ধ কেবল একটি তথ্যই আমরা

পেয়েছি। সেটি এই, পরবর্তী কালে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়—মা যখন তাঁকে দীক্ষা দেন, তখন তাঁর কিরকম অনুভূতি হয়েছিল, কারণ তিনিও বাংলা জানতেন না এবং মাও ইংরেজি জানতেন না—তখন অতুলানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, "শিশু যখন মায়ের কোলে বসে, তখন কোন ভাষায় সে কথা বলে? সেইরকম, ওইসময় আমিও অনুভব করেছিলাম সমস্ত জগৎটাই যেন আমার চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়েছে; আমি কেবল ছোট্টো শিশুটির মতো মায়ের কোলে বসে আছি। আমি তখন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম এবং আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।"[৬০]

আলো-আঁধারি

স্বামী অরূপানন্দের স্মৃতিকথায় আমরা পোল্যান্ডের একটি মেমের কথা পাই।[৬১] তিনি বেদান্ত শিখতে ভারতে এসেছিলেন। কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের সংবাদ পেয়ে তাঁকে দর্শন করতে উদ্বোধনে আসেন এবং মায়ের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলেন। তাঁর নাম-ধাম, শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা কিছুই জানা যায় না।

সরযূবালা-র স্মৃতিকথায় আমরা আরও এক মেমের কথা পাই। তিনি লিখেছেন : "[মহাষ্টমীর দিন] চারটে বেজেছে। মা উঠলেন। ঠাকুরের বৈকালী ভোগ হয়ে গেল। রাসবিহারী মহারাজ এসে বললেন, 'একটি মেম তোমাকে দর্শন করতে এসেছেন। নিচে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।' মা আসতে বললেন। মেমটি এসে মাকে প্রণাম করতেই, মা 'এস' বলে তার হাত ধরলেন (হ্যান্ড-শেক করার মতো)।...তারপর মেয়েটির মুখে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। মেমটি বাংলা জানেন, বললেন, 'আমি তো আসিয়া আপনার কোনও অসুবিধা করি নাই? আমি অনেকক্ষণ হইল আসিয়াছি। আমি বড় কাতর আছি। আমার একটি মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, তার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই মা, আপনার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিবেন, মেয়েটি যেন ভাল হয়।...'

মা বললেন, 'আমি প্রার্থনা করব তোমার মেয়েব জন্যে—ভাল হবে।'

মেমটি এ কথায় খুব আশ্বস্ত হলেন; বললেন, তবে আর ভাবনা নাই। আপনি যখন বলিতেছেন, 'ভাল হইবে' তখন ভাল হইবেই—নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।... তারপর বললেন, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করিলাম, আমায় মাফ করিবেন।'

মা বললেন, 'না, না তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আমি ভারি খুশি, তুমি একদিন মঙ্গলবারে এস।' মেমটি প্রণাম করে বিদায় নিলেন।"[৬২]

আমাদের অজ্ঞাত এই মেমটি, মা যে করুণাময়ী, সে-কথা বুঝেছিলেন এবং তাঁর কথায় ও আচরণে সেই বিশ্বাসের মনোভাবটিই ফুটে উঠেছে জানা যায়, পরে তাঁর মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং শ্রীশ্রীমা মেমটিকে কৃপা করে দীক্ষাও দিয়েছিলেন।[৬৩]

শ্রীশ্রীমাব অন্যান্য দীক্ষিত বিদেশি ভক্তদের মধ্যে আমরা তিনজনের নাম পাই। তাঁরা হলেন মি. জনসন, ডা. হ্যালক ও মিস গ্রে (পরে মিসেস হ্যালক)। এঁদের মধ্যে মি. জনসন পরে সন্ন্যাসী হন। নাম হয় স্বামী অমৃতানন্দ। শ্রীমা যখন মাদ্রাজে যান, তখন সেখানেই তাঁর দীক্ষা হয়। এই তিন জন ছাড়াও গ্যারিসন বলে এক সাহেবও শ্রীমার ভক্ত ছিলেন। মা তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। গ্যারিসন সাহেবের নাম ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-র

বইয়ে পাওয়া যায় না। তবে ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা মায়ের স্মৃতিকথায় লেখেন : "কামারপুকুরে যুগী শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গ্যারিসন সাহেব প্রশ্ন করলেন : "তুমি মাকে দেখেছ, মায়ের কিছু অসাধারণ ঘটনা (miracle) সম্বন্ধে কিছু বল।" উত্তরে তাঁকে বললাম, "তুমি নিজেই তো মায়ের করুণার বড়ো উপমা। খুব কম সময় আর অল্প অর্থ ব্যয় করে আমরা এসেছি কলকাতা থেকে। তুমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কামারপুকুরে এসে হাজির হয়েছ। এটাই মায়ের করুণার ভালো দৃষ্টান্ত নয় কি!"[৬৪] এই চারজন বিদেশি ভক্ত শ্রীমা সম্পর্কে কখনও কিছু লিখেছেন কিনা আমরা জানি না।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের উষালগ্নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সাতটি নামের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত, তাঁদের সম্পর্কে আমরা সামান্য একটু আলোচনা কবব। এঁদের মধ্যে প্রথম জন স্বামীজীর বিশ্বস্ত লিপিকার জে. জে. গুডউইন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজীর সঙ্গে তিনি কলকাতায় আসেন। ২৩ মার্চ স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করতে যান। কলকাতায় স্বামীজীর সঙ্গে তিনি 'ছায়ার মতো'[৬৫] থাকলেও শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কোনও সংবাদ আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয়জন, কলকাতার একদা কনসাল-জেনারেলের স্ত্রী মিসেস মেরীয়ন প্যাটারসন। মেরীয়ন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলে-কে ধরেন যাতে তাঁর স্বামীকে কলকাতায় আমেরিকার কনসাল-জেনারেল করা হয়, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁরা স্বামীজীর কাছাকাছি থাকতে পারবেন।[৬৭] মি. প্যাটারসন ১৮৯৭—১৯০৬ পর্যন্ত ওই পদে বহাল ছিলেন। মেরীয়ন-এর স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। রোলাঁর ডায়েরি অনুযায়ী, স্বামীজী তাঁর কাছে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ না করলেও তিনিই স্বামীজীকে দর্শন করতে যেতেন। স্বামীজী যখন উত্তব ভারত পরিভ্রমণে যান, তখন বুল, ম্যাকলাউডের সঙ্গে মেরীয়নও অনন্তনাগ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। স্বামীজীকে যিনি এত শ্রদ্ধা করতেন, তিনি কলকাতায় থাকতে শ্রীমাকে একবারও দর্শন করতে যাননি, একথা ভাবতেও অবাক লাগে। কারণ ইতিমধ্যেই মা নিবেদিতা, ম্যাকলাউড এবং সারা বুলকে দর্শন দিয়ে সহজভাবে মেলামেশা করেছেন।

তৃতীয় জন স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজ শিষ্য ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার ও তাঁব স্ত্রী 'মাদার' সেভিয়ার। বেদান্তপ্রচারের কাজে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন। মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা তাঁদের হাতেই। ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে দেহত্যাগ করলেও মিসেস সেভিয়ার বহু বছর মায়াবতী ও শ্যামলাতালে বাস করেন। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের কেউই শ্রীমাকে দর্শন করার ব্যাকুলতা অনুভব করেন নি।

স্বামীজীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা স্বামী অভয়ানন্দ বা মেরী লুইস ১৮৯৯-এর ১৭ মার্চ কলকাতায় এসেছিলেন, পরদিন বলরাম বসুর বাসভবনে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে তাঁকে বড়োরকম সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে উপস্থিত থেকে তিনি বক্তৃতাও করেন। সম্ভবত তিনি মাকে দর্শনও করে থাকবেন এইসময়, কারণ মা তখন কলকাতায় ছিলেন (তিনি জয়রামবাটী যান ৩০ অক্টোবর)। কিন্তু এ-ব্যাপারে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। কেবল ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে জানা যায় : "অভয়ানন্দ এখনও সেই পুরোনো জায়গাতেই আছেন। এমনকি শ্রীশ্রীমাতা দেবীও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ও কবে যাবে গো?'... মিত্ররা ওঁকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছেন। উনি সর্বদা এত চটে থাকেন যে, ওঁরা বলেন ওঁদের আর সহ্য হচ্ছে না। ...খরচপত্রের ব্যাপারে উনি

খুবই অবিবেচক এবং নিজে কিছুই দেন না।"[৬৭] শ্রীমা সম্বন্ধে স্বামী অভয়ানন্দের প্রত্যক্ষ কোনও ধারণা ছিল কিনা, বলা শক্ত।

বেলুড় মঠের জমি কেনার টাকা যিনি দিয়েছিলেন, স্বামীজীর সেই ইংরেজ ভক্ত হেনরিয়েটা মূলর সম্ভবত দুবার কলকাতায় এসেছিলেন। একবার ১৮৯৭-এর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। মা তখন কলকাতায় ছিলেন না। ১৮১৮-এর ৭ ফেব্রুয়ারি আলমোড়া থেকে ফিরে ৩৪ বেনেপুকুর রোডের একটি বাড়িতে মিস ম্যুলর কিছুকাল থাকেন। আবার ভারতে আসেন ১৯০১-এর ১২ নভেম্বর। শ্রীমা তখন কলকাতায়। কিন্তু এইসময়ও মার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। সম্ভবত তিনি কোনও তাগিদও বোধ করেননি।

ফরাসি লেখক জুল বোয়া, যাঁর প্যারিসের বাড়িতে স্বামীজী কিছুদিন ছিলেন এবং যিনি স্বামীজীর সঙ্গে ইউরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করেন, তিনিও কলকাতায় এসেছিলেন ১৯০১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। বোয়া মঠে এলে স্বামীজী তাঁকে আপ্যায়ন করেছিলেন। বোয়ার সেই অভিজ্ঞতা 'Visions de I'Inde' নামক গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। বোয়া কলকাতা থাকার সময় শ্রীশ্রীমাও কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু যে-কারণেই হোক, তিনিও মাতৃসান্নিধ্যে যাওয়ার প্রেরণা অন্তরে অনুভব করেননি।

উপসংহার

যে-সাতজনের কথা সংক্ষেপে আমরা সবশেষে উল্লেখ করলাম, তাঁরা সম্ভবত শ্রীমা সারদার কাছে যে যাননি, তাতে মায়ের মহিমা যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা আমরা মনে করি না। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে এসবই যোগাযোগ ব্যাপার। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, এগুলি পূর্বনির্দিষ্ট। ভক্তকবির গানে আছে—"তুমি নাহি দিলে দেখা, কে তোমায় দেখিতে পায়? / তুমি না ডাকিলে কাছে সহজে কি চিত ধায়?" ভক্তজীবনের এই যে সত্য, তা উপলব্ধির বস্তু; যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আমরা কেবল ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টিকে বিচার করতে গিয়েই এঁদের নাম উল্লেখ করেছি, ভেবেছি এঁরা যদি মায়ের কাছে যেতেন তাহলে হয়তো ওঁদের চোখ দিয়ে আমরা মাতৃ-মহিমা আরও একটু আস্বাদন করার সুযোগ পেতাম। অবশ্য তাঁরা যদি কথা বা লেখনীমুখে মায়ের ছবি আঁকার চেষ্টাও করতেন, তাহলে 'অনন্তগুণবতী, অনন্তনাম্নী' মায়ের চিত্র সম্পূর্ণ হত না। কারণ স্বরূপত তিনি বাক্যমনের অতীত। প্রেমিকের গানে আছে 'চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তার বোধের সীমানা'। আমাদের সেই সীমিত বোধ দিয়ে বোধস্বরূপকে ধরার চেষ্টার মধ্যে আনন্দ থাকলেও প্রয়াস হিসাবে তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। 'অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়/ কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়।' তবুও একথা আমরা স্বীকার করবো প্রত্যক্ষদর্শী অ-ভারতীয় ভক্তবন্ধুরা মাতৃদর্শনের যে মনোহর বৃত্তান্ত সাগর পেরিয়ে এসে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে চিরঋণী।

একালের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা

স্বামী মুমুক্ষানন্দ

একালের দৃষ্টিতে কেন?

জগতের ধর্মগুরু বা ধর্মগুরুস্থানীয়রূপে মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি যাঁরা পাচ্ছেন তাঁদের জীবন সর্বদেশের সর্বকালের জন্য—একাল বা সেকালের জন্য নয়। তথাপি মানুষ তার নিজের কালের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শবোধ, চিন্তাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে—এক কথায় তার নিজের কালের দৃষ্টির দ্বারা এইসকল মহাজীবনের মহত্ত্ব, তাঁদের শিক্ষার তাৎপর্য, সমকালীন সমাজে তার উপযোগিতা বুঝে নিতে চায়, সে জীবন ও শিক্ষা আন্তরিকভাবে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনকেও তাই একালের যুক্তিবিচারশীল প্রগতিপন্থী দৃষ্টির আলোকে বুঝবার একটা প্রয়োজন রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে

আধ্যাত্মিক-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমার জীবনকে বোঝা সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ঠিক বুঝেছিলেন। তাই এঁদের দৃষ্টির আলোকে শ্রীমাকে বোঝার চেষ্টা করলে সেটা সঙ্গতই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমার সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।"[১] এই কয়টা শব্দের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে মায়ের স্বরূপ—তিনি ভগবতী, ঈশ্বরী আর তাঁর জীবনের সমস্ত কাজের তাৎপর্য মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-দান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দকে লিখেছিলেন, "শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।... মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"[২] স্বামী যোগানন্দকে স্বামীজী বলেছিলেন, "আমাদের মা আধ্যাত্মিক শক্তির এক বিশাল আধার, যদিও বাইরে গভীর সমুদ্রের মতো প্রশান্ত। তাঁর আবির্ভাবে ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে।... যে আদর্শসমূহ তিনি তাঁর জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নারীবন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টাকেই অধ্যাত্মরসে সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতিকে তা প্রভাবিত করে তাদের হৃদয় ও মানসলোকে অনুপ্রবিষ্ট হবে।"[৩]

একালের শিক্ষিত-সজ্জনদের আপাতদৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীমা সারদা দেবীর জীবন ও অবদান যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে, এমনকি বিদ্বান সজ্জনদের প্রথম

দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তাঁদের আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—এ-জীবন অশেষ দৈবী ও মানবীয়। গুণালংকৃতা, শুচিশুদ্ধা এক মহীয়সী হিন্দুনারীর জীবন—যা বিশেষ শ্রদ্ধার্হ কিন্তু এ-জীবন প্রাচীনপন্থীর জীবন। এ-জীবনে আধুনিক প্রগতিপন্থী পুরুষের বা নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার, জীবনাদর্শের, জীবনচর্যার, চিন্তন-বৈশিষ্ট্যের, এক কথায় তাদের প্রগতিপন্থী জীবনের কোনও মিল নেই। একালের প্রগতিকামী নারীদের জীবনাদর্শ : তাঁরা শিক্ষক, অধ্যাপক, অফিসার, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়র, বৈজ্ঞানিক, সাংসদ, প্রশাসক হবেন; জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের সমানতালে এগিয়ে যাবেন। এগিয়ে যাচ্ছেনও ধীরে ধীরে। প্রগতিবান পুরুষেরাও এটা সঙ্গত মনে করেন। সঙ্গত মনে না করার বস্তুত কোনও কারণ নেই। পাশ্চাত্যের মেয়েরা জীবনের নানাক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন। বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত—ইতিহাসের দুর্যোগময় কিছু কিছু যুগ বাদ দিলে ভারতীয় নারীগণও জীবনের নানাক্ষেত্রে পুরুষদের মতো অথবা কখনও কখনও তাদের অপেক্ষাও উজ্জ্বলতরভাবে নিজেদের প্রতিভার, কর্মদক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে বাক্, অপালা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বিষ্ণুপ্রিয়া, অন্ডাল, মীরাবাঈ, শ্রীমা সারদা দেবী, গোপালের-মা, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা প্রভৃতি অজস্র নামের যেমন উল্লেখ করা যায় তেমনিভাবে সাধিকা ও কবিরূপে মীরাবাঈ, জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশারদ খনা, গণিতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞা লীলাবতী, বীরাঙ্গনারূপে বৈদিকযুগের বিশপলা, উত্তরকালের পদ্মিনী প্রমুখ রাজপুতানীগণ, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, জমিদারি পরিচালনায় বা রাজ্যশাসনে অহল্যাবাঈ, রানী রাসমণি প্রভৃতির নাম এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই—এঁদের ব্যক্তিত্বের মেরুদণ্ড ছিল সংযম, পবিত্রতা, বিশেষ করে সতীত্ব ও সকলের প্রতি মাতৃত্ববোধ যে দুষ্টি শ্রেষ্ঠ গুণের মধ্যে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশ। বর্তমান প্রগতিপন্থী নারীদের অনেকের মধ্যে এই ঐতিহ্যে আস্থা দেখা যায় না, দেখা যায় কেবলমাত্র বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চালচলনে পুরুষদের অনুকরণ করার প্রবণতা। এরূপ প্রগতিপন্থীদের জীবনের সঙ্গে শ্রীমার জীবনের মিল কোথায়?

পাড়াগাঁয়ে রক্ষণশীল, নিষ্ঠাবান, সদাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। অশিক্ষা, গোঁড়ামি, যুক্তিহীন দেশাচার, লোকাচারে বদ্ধ সমাজের মধ্যে তাঁর বাল্য, কৈশোর উত্তরজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর লেখাপড়া স্বল্পমাত্র যেমন তিনি রামায়ণ পড়তেন, তবে চিঠিপত্র অন্যের দ্বারাই লেখাতেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকে মরজীবনের অন্তিম অধ্যায় পর্যন্ত সারাটি জীবন, স্বজন-পরিজন, অতিথি-অভ্যাগত, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-নিরক্ষর, অনাহূত-রবাহূত ভক্তদের, দীন-দরিদ্র-রোগী-নিঃসহায়ের, গৃহপালিত পশুপাখির নিরন্তর সেবা করেছেন মাতৃস্নেহে আপ্লুত হয়ে। আর এই সেবাকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঘর-নিকানো, কুট্‌নো-কাটা, বাসন-মাজা, রান্না করা, কাপড়-কাচা প্রভৃতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ গৃহস্থালির হাজারো রকমের টুকিটাকি কাজ। পল্লীনারীর মতো অতিসাধারণ ছিল তাঁর পোশাকপরিচ্ছদ, দীর্ঘঅবগুণ্ঠনবতী তিনি; জামা-জুতা-চটি ব্যবহারে একেবারেই অনভ্যস্তা। ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের অতি সাধারণ জ্ঞান তাঁর ছিল না বললেই চলে। কেরোসিন-লণ্ঠনের চিমনি খুলে পরিষ্কার করতে তিনি পারতেন না; বলতেন "ওতে অনেক কল-কব্জা; আমি খুলতে পারি না।" একটি মেয়ের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "অমুকের বউ ঘড়িতে দম দিতে পারে।"[৪] অর্থাৎ ঘড়িতে 'দম' দিতে পারা তাঁর কাছে একটা মস্ত বড়ো কাজ! অথচ

স্কুল-কলেজের শিক্ষাদীক্ষা-হীনা এই সারদা দেবীই কত ভক্তকে, সাধুব্রহ্মচারীকে আধ্যাত্মিক, জ্ঞান-উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁদের চেতনাকে দিব্যস্তরে উন্নীত করছেন। শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে জপ-ধ্যান-পূজা-প্রার্থনা-কখনও বা দিনে রাতে লক্ষবার নামজপ, অথবা বিশেষ সংকল্প করে 'পঞ্চতপা' সাধন—তিনি কী গভীর তন্ময়তার সঙ্গে করে গেছেন আজীবন। সাধনার গভীরতম অনুভূতি ভাব-সমাধিও তাঁর হয়েছে অজস্র তবে তা তিনি গোপনে রাখতে চেয়েছেন। কাজেই সচ্চরিত্র, সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত নরনারী যে তাকে 'ঈশ্বরী' বলে, অন্ততপক্ষে উচ্চকোটীর সাধ্বী বলে, শ্রদ্ধাভক্তি-জ্ঞাপন করেও 'সেকেলে' বলে মনে করবেন—আশ্চর্য কি!

শ্রীশ্রীমার প্রগতিপন্থী মনের ও কার্যের পরিচয়

কিন্তু এ-দৃষ্টি অগভীর দৃষ্টি! গভীরভাবে লক্ষ করলে মনোযোগী পাঠক তাঁর জীবনে একটা সূক্ষ্ম বিচারপরায়ণ, স্বচ্ছ যুক্তিনিষ্ঠ উদার প্রগতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। বিস্মিত হন তাঁর প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রগতিশীল কার্য দেখে আর সম্পদে-দারিদ্র্যে, স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা বিপৎকালে সর্বদা অবিচল থেকে যে-কোনও পরিস্থিতির সফলভাবে মোকাবিলা করতে দেখে—যার দৃষ্টান্ত সহস্র প্রগতিবাদীদের মধ্যেও বিরল।

তাঁর শিক্ষাচর্চা, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারে তাঁর চেষ্টা

শ্রীশ্রীমার নিজের লেখাপড়ার চর্চায় ও মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাপ্রসার প্রচেষ্টায় তাঁর প্রগতিপন্থী মনোভাবের পরিচয় প্রথমেই চোখে পড়ে। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে অনেক উদ্যম করে বাল্যকালে ও পরে দক্ষিণেশ্বরে বাংলা পড়তে শিখেছিলেন; রামায়ণ নিজে পড়তেন, তাছাড়া মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ আগ্রহভরে শুনতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধু-মাকুদের স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তেরো-চোদ্দো বছরের রাধুকে তার বিবাহের পরও বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে দিতেন, প্রবীণা গোলাপ-মার আপত্তি সত্ত্বেও। তাঁর শিষ্যা (পরে সেবিকা) সরলা দেবীকে (উত্তরকালে শ্রীসারদা মঠের প্রথমা অধ্যক্ষা ভারতীপ্রাণামাতাজীকে)অপরের অনুরূপ প্রতিবাদ খণ্ডন করে ডাফ্‌রিন হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং নিতে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি স্বয়ংই স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বালিকাদের পাঠানোর জন্য তিনি ভক্তদের উৎসাহিত করতেন। জনৈকা স্ত্রীভক্ত যখন বলেছিলেন, "আমার পাঁচটি মেয়ে, মা, বে দিতে পারিনি, বড়ই ভাবনায় আছি।", মা তাকে বলেছিলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দাও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"[৫]

ছুঁৎমার্গী-জাতপাতভেদের বিরুদ্ধাচরণ, সদাচার ও বিভেদহীন মনোভাবের সমাজে প্রচলন করা

ওই বিদ্যালয়ের অন্য দুটি ছাত্রীর প্রসঙ্গে মা বলেছিলেন, "মাদ্রাজের দুটি মেয়ে, বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা। তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখছে! আর আমাদের। এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে—

'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।'[৬] এইসব অনুরূপ ঘটনা থেকে জানা যায়, মা মেয়েদের শিক্ষাহীনতা ও বালবিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

ছুৎমার্গ ও জাতপাতে যুক্তিহীন সংকীর্ণতাও তিনি স্বীকার করতেন না—যদিও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে সমাজের সঙ্গে সংঘাতেও যেতেন না। প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে সোজাসুজি আঘাত না করে তিনি কোনও কোনও সময় নূতন সদাচার সৃষ্টি করেছেন—লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বিভিন্ন জাতের লোকের একত্রে অন্নাহাব লোকাচারবিরুদ্ধ জেনে তিনি একবার বিভিন্নজাতেব ভক্তদের একপাত্র থেকে মুড়ি-জিলিপি খাইয়ে তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। রক্ষণশীল আত্মীয়স্বজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজবাড়িতে (ব্রাহ্মণবাড়িতে) তৎকালীন সমাজে নিচু জাতি বলে গণ্য 'বাগদি' যুবককে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁব আচরণ গ্রাম্য লোকদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি কবেছিল যে 'ভক্তেরা একজাতি'—তাদের মধ্যে জাতপাতের ভেদ নেই। এইভাবে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে জাতিভেদপ্রথার বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে 'এক নূতন ভেদ-বিহীন সমাজেব আদর্শ' তিনি যেন সমাজপতিদেব অলক্ষ্যে স্থাপন কবে গেছেন।

রক্ষণশীলদের বিধিনিষেধ অবহেলা করে বিদেশিনী নিবেদিতাদের সঙ্গে একত্র আহার ও উদার ব্যবহার

১৮৯৮-এর জানুয়ারিতে ভগিনী নিবেদিতা (তখন মার্গারেট ই. নোবল) ভারতীয় নারীদের মধ্যে উন্নয়ন কাজের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এলেন। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্বেগ ছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করবে। তিনি স্বয়ং একদিন মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল-সহ মার্গারেটকে শ্রীমার কাছে পৌঁছে দিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে এই বিদেশিনীরা ছিলেন 'ম্লেচ্ছ'। কিন্তু যাওয়ামাত্রই শ্রীশ্রীমা সামাজিক বিধিনিষেধ এড়িয়ে 'আমার মেয়ে' বলে তাদের সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন; তাদের সঙ্গে একসঙ্গে আহারও করলেন। তাঁর এতখানি উদার আপন ব্যবহার স্বামীজীকেও বিস্মিত করেছিল। এরপর একই বাড়িতে নিজের কাছে নিবেদিতার বসবাসের ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। শ্রীমার এই আচরণের সামাজিক প্রভাব তাঁর কাজে কতখানি সাহায্য করেছিল এ সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতে হতে পারত না।"[৭]

শ্রীশ্রীমার প্রগতিপন্থী দিব্যমানবিকতা বা কর্মে পরিণত-বেদান্ত

মানবিকতাবোধ (Humanism) আধুনিক কালের সাবা পৃথিবীর প্রগতিবাদী মনের প্রধান বা সর্বপ্রধান বিশেষত্ব বলে অনেকেই মনে করেন। 'মানুষমাত্রেই আদরণীয়, তার হিতসাধন করা মানুষমাত্রেরই কর্তব্য' এরূপ একটা যুগ-প্রবৃত্তি থেকে এই মানবিকতাবোধ উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই মানবিকতা বোধ এক দিব্যমানবিকতায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকটিত হয়েছিল। তাঁদের আচরণে ও বাণীতে প্রদর্শিত দিব্য মানবিকতাবোধ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের নিত্য-বিদ্যমানতার প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর

প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুভব করতেন, "তিনিই (ঈশ্বরই) সব হয়েছেন তবে মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ।"[৮] তাই ঈশ্বরদৃষ্টিতে সেবার উপদেশ তিনি দিয়েছেন। গৃহীদের বলেছেন, "ছেলেদের খাওয়াবে যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছো। পিতা-মাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে।"[৯] এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, আদর্শ স্বামী-স্ত্রী 'ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লয়ে থাকে, ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা দুজনে করে।"[১০] একই প্রকার সেবার কথা তিনি ঠিক ঠিক সাধুর লক্ষণ প্রসঙ্গেও বলেছেন, "সাধু সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা কবেন।"[১১] ওই দৃষ্টিতে নিজ গর্ভধারিণী মায়ের সেবা, মথুরবাবু প্রভৃতি বিত্তবান ভক্তদের সহায়তায় সাধু-ভক্ত, দীন-দুঃখী মানুষের সেবার বহু দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে রয়েছে। সর্বোপরি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ দ্বারা তিনি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' ব্রত মরজীবনের শেষদিন পর্যন্ত উদ্‌যাপন করে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "আমি এত তপস্যা ক'রে এই সার বুঝেছি যে—জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নাই। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[১৮] বেলুড় মঠে নিজে সামনে থেকে 'শিবজ্ঞানে' সাঁওতাল কুলিদের রুচিকর রান্না করে খাওয়ানো এবং অন্যসময় অন্নবস্ত্র, ওষুধপত্র, বিদ্যাদান, ধর্মদান প্রভৃতি বহুপ্রকারের সেবাকর্ম তিনি করে গেছেন; তদপেক্ষা বহুতব গুণ সেবাকর্মের পত্তন করে গেছেন। এইরূপ সেবা ও আত্ম-শ্রদ্ধাব চর্চাকে তিনি 'বেদান্তেব ব্যবহারিক প্রয়োগ' বা 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' বলেছেন।

শ্রীশ্রীমার জীবন ওই একইপ্রকার অনুভব ও মাতৃস্নেহ সিক্ত সেবার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। তিনি বলছেন, "সাধন করতে করতে দেখবে আমাব মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে, বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি—তবে তো মনে দীন ভাব আসবে।"[১৩] শ্রীশ্রীমায়ের কথা,[১৩] ওই অন্তর্দৃষ্টি থেকেই তিনি সকলকে—আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শি, রোগী, আতুর, অনাহূত, রবাহূত ভক্তজন, সৎ-অসৎ, সতী-অসতী নরনারী, গৃহপালিত পশুপাখি, মুসলমান মজুর আমজাদ (সে চুরি-ডাকাতি কবে জেনেও) সমান সন্তানস্নেহে আদরযত্ন, সেবাপবিচর্যা কবেছেন। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দেব প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যাদের তিনি সেবাযত্ন করেন তাদের একই সঙ্গে 'সন্তানভাবে' দেখেন, 'নারায়ণভাবে'ও দেখেন।[১৪] সামান্য পিপীলিকার মধ্যেও ওই রূপের দর্শনের কথা তিনি বলেছেন 'নৈবেদ্য থেকে পিঁপড়েটাকে পর্যন্ত তাড়াতে পারি নে, বোধ হয় যেন ঠাকুর খাচ্ছেন।"[১৫] তাঁব এই সেবাকর্মের পরিধি থেকে কোনও কাজ—গৃহস্থালিব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনও কাজও বাদ ছিল না—আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

শ্রীশ্রীমার প্রগতিপন্থী মন ও কাজের বিশেষ পরিচয়

গৃহস্থালির কাজ, ভক্তসেবা ও ধর্মোপদেশ দানের বাইরে শ্রীশ্রীমাকে বড়ো বড়ো অন্য কাজ কিছু করতে হয়নি মনে করলে বিষম ভুল করা হবে। বস্তুত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মতো এক বিরাট প্রগতিপন্থী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘমাতা ও আধ্যাত্মিক নেত্রীরূপে যে ভূমিকা তিনি নিঃশব্দে নেপথ্যে থেকে পালন করে গেছেন তা তাঁর প্রগতিপন্থী মনের ও কর্মদক্ষতার বিশেষ পরিচয় বহন করে।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূল একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের জীবন চর্যায় প্রাচীন রক্ষণশীল সন্ন্যাসী সঙ্ঘের মুখ্য বিশেষত্বগুলির যেমন, ধ্যান-জপ-স্বাধ্যায়-শাস্ত্রব্যাখ্যান, ধর্মোপদেশ দানের উপযুক্ত স্থান, গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। তবে এগুলিই তার করণীয় সূচীর সব নয়। এর সঙ্গে যুক্ত আছে অন্ন-বস্ত্র-ঔষধপত্র দ্বারা জাগতিক-নৈতিক-আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিস্তার এবং নারায়ণজ্ঞানে নানাপ্রকারে মানুষের সেবার কর্মসূচী। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখাত এই নবযুগধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা ও তথা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত, যদিও সাধারণের নিকট অনেককাল সেটা সুজ্ঞাত ছিল না।

আমেরিকায় 'আমার জীবন ও ব্রত' নামক ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ সালেই বলেছিলেন যে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে লব্ধ এই নবযুগধর্ম-প্রবর্তনে তিনি ও তার মুষ্টিমেয় কয়েকটি তরুণ গুরুভ্রাতা বদ্ধপরিকর তখন একমাত্র শ্রীমা সাবদা দেবীই ওই যুবকদলের আদর্শ ও চেষ্টার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন।

শুধু সহানুভূতি দ্বারা নয়, দিনের পর দিন আকুল প্রার্থনা দ্বারা শ্রীমা রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনে গভীরভাবে সক্রিয়া ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "আহা, এর জন্য ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো তাঁব কৃপায় আজ মঠ-টঠ যা কিছু।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন, "... ঠাকুর, তুমি এলে, এই ক-জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে; আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আব এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায় আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই। ...আমার প্রার্থনা তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা।"[১৬]

শ্রীমার এই প্রার্থনায় মঠবাসীদের জন্য উদ্বেগমাত্র প্রকাশিত হয়নি, অধিকন্তু তাঁব স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টিতে আরও প্রকাশ পেয়েছে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা ও জীবনাদর্শ : ১) তাদের একত্র থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষানুসারে জীবনগঠন করা, ২) সংসারের ত্রিতাপদগ্ধ মানুষকে শান্তি দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচার করা, স্বামী বিবেকানন্দ পরবর্তী কালে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—'নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের (ঈশ্বর-পূজন জ্ঞানে) কল্যাণবিধান'—এই যুগমন্ত্র উচ্চারণ করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে আদর্শ ঘোষণা করেছিলেন—তা-ই বীজাকারে লুক্কায়িত রয়েছে শ্রীশ্রীমার এই প্রার্থনার মধ্যে।

সঙ্ঘস্থাপনার পর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ভূমিকা শেষ হয়ে গেল না। যতদিন তিনি মরদেহে ছিলেন ততদিন সঙ্ঘ যাতে নিজ আদর্শে অবিচল থেকে সুপরিচালিত হয় সে বিষয়ে তিনি সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন।

বিবেকানন্দ, সমগ্র সাধু-ব্রহ্মচারীমণ্ডলী ও ভক্তবৃন্দ তাঁকে সঙ্ঘমাতা বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন ও মান্য করতেন। তাঁর সামান্য ইচ্ছা সকলের নিকট আদেশ অপেক্ষাও অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করত। নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে সম্ভবত এটা লক্ষ্য করে প্রথমে লিখেছিলেন : 'তিনি অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরমশক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী...' আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর লিখেছিলেন : তিনি আপতদৃষ্টিতে খুব সাদাসিধে, 'তবু আমার ধারণায় বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী।'[১৭]

সঙ্ঘস্থাপনের পর প্রথম পর্বে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত সেবামূলক কর্মগুলি সাধু-ব্রহ্মচারীদের করা উচিত কিনা—এ নিয়ে অনেকে সন্দেহ পোষণ করতেন। তাঁরা বলতেন, "সেবাশ্রম, হাসপাতাল চালানো, বই-বেচা হিসাবনিকাশ প্রভৃতি কাজ সাধুর পক্ষে সঙ্গত নহে, কারণ ঠাকুর ওই সব কিছু করেন নাই। কাজ করতে হয় তো পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদিই কবা উচিত...।" শ্রীমা সব শুনে দৃঢ়ভাবে বললেন, "কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যান-জপ করা যায়!... সব সময় জপধ্যান করতে পারে কজন? মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে, কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নবেন আমার ঐসব দেখেই নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।"[১৮]

বারাণসী বামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নারায়ণজ্ঞানে রোগীদের সেবাপরিচর্যা দেখে মাতাঠাকুবানী আবও পরবর্তী কালে মন্তব্য করলেন, "দেখলুম এখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন, তাই এসব কাজ হচ্ছে, এসব তাঁরই কাজ।" বৃদ্ধাদের সেবাযত্ন দেখে তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন :

"এই অনাথা বুড়ীদের সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়।"[১৯] তিনি নিজে যে নারাযণজ্ঞানে সকলের সেবা করতেন—তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। শ্রীশ্রীমার এই দৃঢ় সুস্পষ্ট অভিমত সকল সন্দেহের নিরসন করল। সেবাধর্ম বা 'সেবা-যোগ' যে জপ-ধ্যান-পূজা-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যকরণীয় সাধন তা তাঁর এইবিরূপ দ্বিধাহীন সমর্থন ব্যতীত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারত না।

কলকাতায় প্লেগ-মহামারীব প্রাদুর্ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগে আরব্ধ সেবাকার্য অর্থাভাবে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়েছিল। হৃদয়বান স্বামীজী তখন বেলুড় মঠের জন্য সদ্যক্রীত জমি-বাড়ি বিক্রি করে নিজেরা বরং গাছতলায় বাস করে সেবাকাজটা সুষ্ঠুভাবে চালাতে কৃতসংকল্প হলেন। মাতাঠাকুরানীর কাছে প্রস্তাবটি নিয়ে গেলে তিনি স্বামীজীকে বললেন, "না বাবা! মঠ বিক্রি করতে পারবে না। এ তোমার মঠ নয়, ঠাকুরেব মঠ। তোমরা শক্তিমান ছেলে, গাছতলায় জীবন কাটাতে পার। কিন্তু পরে আমার যেসব ছেলেবা আসবে তারা গাছতলায় জীবন কাটাতে পারবে না। তাদের জন্য এই মঠ।"[২০] মা আরও বুঝিয়ে বললেন, "বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তাঁর (ঠাকুরেব) কত কাজ! ঠাকুরের অনন্ত ভাব সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব চলবে।" তখন স্বামীজী একটু সলজ্জভাবে বললেন, "তাইতো, আবেগভরে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম।..."[২১] তিনি আর মঠ বিক্রি করলেন না। কিন্তু অর্থ সংগৃহীত হল, সেবার কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলল। জটিল এরূপ পরিস্থিতির অতিক্রমণ শ্রীশ্রীমার হস্তক্ষেপেই সম্ভব হল।

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ১৯১৬-তে রামকৃষ্ণ মিশন আর এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখনও শ্রীশ্রীমায়ের সুপরামর্শ মতো কাজ করে সে বিপদের মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। বাংলার তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল প্রকাশ্য দরবারে জনসাধারণের সম্মুখে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্বন্ধে মারাত্মক ক্ষতিকর ও অসত্য কতকগুলি মন্তব্য করলেন যার মর্মার্থ হল : রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবিষ্ট কিছু নিচ, নিষ্ঠুর (mean and cruel) ব্যক্তি সমাজসেবার সুবাদে দেশের যুবকদের কুপথে রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ত্রাসমূলক কাজে প্ররোচিত করছে। অতএব দেশবাসী সাবধান হউন।[২২] হিতৈষী অনেকেই তখন সঙ্ঘের

কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিলেন যে, যেসব সাধু সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্বে বৈপ্লবিক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এখন তাঁরা রাজনীতির সংস্রবশূন্য এবং নির্দোষ হলেও সরকারী 'শনির দৃষ্টি' এড়ানোর জন্য তাদের সঙ্ঘ থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন কর্মসচিব স্বামী সারদানন্দ শ্রীমার কাছে বিষয়টি নিবেদন করলেন। তিনি ধীরভাবে সব শুনে সুমিষ্ট স্বরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলেন, "ওমা! এ-সব কি কথা! ঠাকুর সত্যস্বরূপ। যে-সব ছেলে তাঁকে আশ্রয় ক'রে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের দশের ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, ...তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তিনি রাজপ্রতিনিধি, তোমাদের সমস্ত কার্যধারা তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।"[২৩] শ্রীশ্রীমা এ প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ মিশন হয়েছে। রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।"[২৪] তাঁর নির্দেশমতো প্রথমে গভর্নরকে লিখিতভাবে জানিয়ে পরে 'গভর্নর হাউসে' গিয়ে সরকারকে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে বলায় গভর্নর সুকৌশলী ভাষায় অন্য একটি লিখিত বিবৃতি দিয়ে মিশনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি পরোক্ষভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন। বিপদের ফাঁড়া কেটে গেল।

জটিল পরিস্থিতি বা সমস্যার সম্মুখীন ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত পরামর্শ দেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা শ্রীশ্রীমার মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি লিখেছেন : "তাঁহার সমগ্র জীবন একটানা নীরব প্রার্থনার মতো। তাঁহার সকল অভিজ্ঞতার মূলে আছে বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাস।" "তবু ... তাঁহার নিকট উত্থাপিত প্রশ্নগুলি যতই কঠিন বা অভিনব হউক না কেন, আমি তাঁহাকে কখনও উত্তরদানকালে ইতস্ততঃ করতে দেখি নাই। মায়ের অগোচরে সমাজে যেসব বিপ্লব ঘটিতেছে, তাহা দ্বারা বিভ্রান্ত বা বিপর্যস্ত হইয়া যদি কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তবে তিনি অভ্রান্তদৃষ্টিতে সে সমস্যার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া প্রশ্নকর্তার মনকে সেই বিপদ কাটাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন।"[২৬] যদি কোনও কারণে কঠোর হওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তিনি অর্থহীন ভাবপ্রবণতার দ্বারা কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হন না।

শ্রীশ্রীমার জীবন আধুনিকপ্রগতিবাদী নারী ও পুরুষদের আদর্শ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন ও পরিচালনায় শ্রীশ্রীমার ভূমিকা, ভগিনী নিবেদিতার উপরি-কথিত উক্তি অনুধাবন করে এই ধারণায় আসতে হয় যে শ্রীমাতাঠাকুরানী ভগবৎ-সেবার ভাবে শুধু গৃহস্থালির কাজই করে গেছেন তা নয়, কর্মদক্ষা বিচক্ষণ সাহসী, নির্ভীক, আদর্শে অবিচল আধ্যাত্মিক নেত্রীরূপেও তিনি অসাধারণ ছিলেন। কিন্তু এই অসাধারণত্বের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত থেকেছে সমস্ত প্রাণী ও নরনারীতে তাঁর নারায়ণবুদ্ধি, তাঁদের প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ, সেবাযত্ন, তাঁর দয়া, ক্ষমা, প্রেম, পবিত্রতা, করুণা, তাঁর ধ্যান-জপ পূজাময় জীবনচর্যা—যেগুলি প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতির, বিশেষত নারীসংস্কৃতির নিত্যকালের সম্পদ। একালের উচ্চশিক্ষিতা, সভ্যতার নবালোকপ্রাপ্তা অগ্রগণ্যা স্ত্রীলোকগণ যাঁরা অধ্যাপনায়, গবেষণায়,

সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, কারিগরিবিদ্যায়, চিকিৎসায়, রাজনীতিতে ও প্রশাসনিক কাজে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা এবং পুরুষরাও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন দেখে বুঝছেন যে তাঁদের আধুনিক প্রগতিপন্থী জীবনের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার জীবনাদর্শের ও জীবনচর্যার সমন্বয়, খুবই সম্ভব, শুধু সম্ভব নয়, অত্যাবশ্যকও বটে।

অবশ্য একালের একশ্রেণীর পুরুষ ও নারী যাঁরা উন্নতি ও প্রগতি বলতে শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চার দ্বারা কেবলমাত্র জাগতিক সুখ-প্রাচুর্যই বুঝে থাকেন, তাঁরা মনে করতে পারেন যে পুরুষদের অগ্রগতি ঠিকপথেই চলেছে এখন যদি নারীরা পুরুষদের মতো সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যায় তাহলেই নারী-প্রগতি সার্থক হয়, তার সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনাপরায়ণতা, পবিত্রতা, মাতৃস্নেহ ও সেবা সংযুক্ত জীবনচর্যার সমন্বয় ঘটানোর কী প্রয়োজন? প্রয়োজন, একান্ত প্রয়োজন যে আছে তা সারা পৃথিবীর বিশেষত পাশ্চাত্যের এবং অনেকস্থলে এদেশেরও আধ্যাত্মিক আদর্শহীন, দৈবী ও মানবীয় গুণগুলির চর্চাশূন্য কিন্তু আর্থিক-স্বচ্ছল অর্থাৎ নিঃস্বার্থ-স্নেহ-ভালোবাসা-সেবার প্রলেপহীন, মনঃকষ্টপীড়িত, বড়ো দুঃখী, বড়ো অসুখী পারিবারিক জীবনগুলির কথা চিন্তা করলে বোঝা যায়। বোঝা যায় বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের অনেকের মন্তব্য পাঠ করলেও। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ-শ্রীশ্রীমা এবং ভারতের নবজাগরণের গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সমন্বয়ের কথাই বলে গেছেন।

আধুনিক নারীদের মধ্যে এই সমন্বয়ের প্রয়োজন-প্রসঙ্গে পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের মন্তব্য এইরূপ :

"আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা আগেকার মতো কেবল রান্নাঘরে আবদ্ধ না থেকে বাইরে কাজকর্মে নানাদিকে এগিয়ে আসছেন। কেউ রাজনীতিক্ষেত্রে, কেউ ডাক্তারীতে, কেউ নার্সিং এবং এমনি সর্বত্র তাদের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এর প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু এইসব করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব আদর্শ ভুলে যাওয়ার ভয়ও আছে। সেইজন্যই মা আদর্শজীবন দেখিয়ে গেলেন—যেন আদর্শের একটা ছাঁচ তৈরি করে রেখে গেলেন। আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ হল মাতৃত্ব, পবিত্রতা। আমাদের মেয়েদের আজ মায়ের জীবনের ছাঁচে জীবন ঢেলে নিতে হবে; ... আবার সেইসঙ্গে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েও চলতে হবে। এ আদর্শ শুধু শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন।"[১৭]

ধীরে ধীরে আমাদের দেশে এমনকি পাশ্চাত্যেও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ সকলের মধ্যে বিশেষত নারীদের মধ্যে সমাদৃত ও গৃহীত হচ্ছে। পাশ্চাত্যে সুদীর্ঘকাল বসবাস করে পূজনীয় স্বামী নিখিলানন্দ আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে মন্তব্য নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করেছিলেন তা আজ অধিকতর সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তিনি লিখেছিলেন : "..তাঁর (শ্রীশ্রীমার) জীবন ভক্ত-অনুরাগীদের ক্রম-বর্ধমান-দলকে বিশেষত মেয়েদের গোষ্ঠীকে আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। তাঁরা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারছেন যে শ্রীশ্রীসারদা দেবী ভারতীয় নারীজাতির লুপ্তপ্রায় শুধু প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতিনিধি নন, যে নবীন নারীজাতির অভ্যুদয় হচ্ছে তিনি তাঁদেরও আদর্শ। ...তাঁরা যেন সহজাত প্রেরণাবশে অনুভব করেন যে শ্রীশ্রীমা এযুগের এক অনন্যা, অদ্বিতীয়া, দিব্যচরিত্রা সাধ্বী, তাঁর জন্ম শুধু ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর নারীত্বকে মহীয়ান, গরীয়ান করে তুলেছে।..."[২৮]

সমাজে ও সংসারে কর্মরত নরনারীর নিকট শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে সমধিক উপযোগিতা

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জীবন একালের পুরুষদের নিকটও সমভাবে শিক্ষাপ্রদ, প্রেরণাদায়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন যেমন নারী ও পুরুষ উভয়শ্রেণীকেই পথ দেখায়, শক্তি-সাহস জোগায় ও অনুপ্রেরণা দেয়—শ্রীমার জীবন তাই। বস্তুত এই তিন মহাজীবনই 'ঈশ্বরলাভ'কে (শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবীর ভাষায়) 'অন্তর্নিহিত দেবত্ব-বিকাশকে' (স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়) জীবনের আদর্শ করে চলতে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকেই উপদেশ দিয়েছেন। তিনজনের ভাষায় ঈষৎ পার্থক্য থাকলেও আদর্শটি অভিন্ন এবং এটি সব ধর্মের গোড়ার কথা। এই আদর্শে পৌঁছানোর জন্য এই ত্রয়ী সমস্ত নরনারীকে ঈশ্বরের প্রতিমাজ্ঞানে মর্যাদা দিতে, সমানভাবে ভালোবাসতে ও সেবা করতে উপদেশ দিয়েছেন; সঙ্গে সঙ্গে সর্বধর্মাবলম্বীদের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব পোষণ করতে বলেছেন। এই ভাব-সমষ্টিই সংক্ষেপে স্বামীজী-কথিত ব্যবহারিক বেদান্ত; অন্যভাবে যাকে 'দিব্যমানবতা'ও বলা যায়—আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এঁরা তিনজনই এই 'ব্যবহারিক বেদান্ত' বা 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'র এযুগে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেছেন। তবে এঁদের প্রত্যেকের জীবন ও কর্মপ্রণালীর একটা স্বকীয়তাত্ব, একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য দুইজনের মধ্যে ছিল না—এটা লক্ষ্য করা যায়। সর্বপ্রাণীর (বিশেষত সকল নরনারীর মধ্যে) ঈশ্বরের অবস্থিতি এদের কাছে একটা ভাব বা থিওরি (Theory) মাত্র নয়, অনুভবসিদ্ধ ছিল। তিন জনই নরনারীকে সে দৃষ্টিতে ভালোবাসতে ও সেবা করতে বলেছেন। তিনজনই যা বলেছেন নিজেরাও তাই করেছেন।

তথাপি শ্রীশ্রীমার দৈনন্দিন জীবনে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দৈনন্দিন জীবনে ছিল না। অনুরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবনের বৈশিষ্ট্য স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে ছিল না। আবাব স্বামীজীর বাহ্যজীবনের বিশেষত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীসারদা মাতার জীবনে অনুপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের প্রথমভাগে জগৎসংসার ভুলে, যেন জগৎসংসার থেকে সরে গিয়ে সাধনার সাগরে নিমজ্জিত। দ্বিতীয়ভাগে তিনি যেন সর্বদাই সমাধিতে নিমজ্জিত বা অর্ধনিমজ্জিত। সমাধি থেকে 'তামাক খাব' 'জল খাব' ইত্যাদি বলে ব্যুত্থিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁর দেহমন এমন শুদ্ধ-সত্ত্ব-গুণে নির্মিত যে তিনি সমাধি থেকে নেমে দক্ষিণেশ্বরে বা গাড়ি করে ভক্তদের কাছে গিয়ে যে সত্য তিনি অনুভব করছেন তার কথা বা সে অনুভব লাভের উপায়ের কথা বলছেন। তিনি ব্রহ্মানুভূতির সর্বোচ্চ স্তরে, নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় গিয়ে অবাঙ্‌মনসোগোচর নির্বিশেষ ব্রহ্ম, এবং ওই সমাধির একধাপ নিচে এসে 'সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' (সমস্ত জগৎটা ব্রহ্মময়) এইরূপ প্রজ্ঞানুভূতি, যখন ইচ্ছা তখন লাভ করছেন। এই অনুভূতিই স্বামীজী কথিত 'ব্যবহারিক বেদান্তে'র দার্শনিক ভিত্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্যকাজের স্থান নেই বললেই চলে। তাঁর জীবনের কর্ম ও লোকব্যবহারের দিকটা সাধারণের ততটা চোখে পড়ে না যতটা পড়ে তাঁর আধ্যাত্মিক তন্ময়তা, তাঁর সমাধিমগ্নতা বা সমাধিপ্রবণতা।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনরূপ পরীক্ষাগারে এই চরম সত্য পরীক্ষিত ও প্রমাণিত

দেখে এবং নিজ জীবনেও সে সত্য অনুভব করে একালের সর্বসাধারণের ও বিদ্বজ্জনের নিকট তাঁর ব্রহ্মতেজ-ক্ষাত্রবীর্য-দীপ্ত ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়ে সেই সত্যগুলিই প্রচার করলেন। বেদান্তের এমন যুগোপযোগী ব্যাখ্যান ও প্রচারকার্য শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীসারদামাতার জীবনে অনুপস্থিত। স্বামীজীর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের অহরহ সমাধিমগ্নতা অথবা শ্রীশ্রীমায়ের মতো নিত্য স্বহস্তে অপরের সেবাযত্ন দেখা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধির দ্বারা যে পরমসত্য সাক্ষাৎকার করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ জগৎজুড়ে প্রচার করছেন যে সত্যকে তা জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে মানুষের জীবনে কী সৌন্দর্য নেমে আসে, জীবন কীরূপ কল্যাণময়, শান্তির আগারে পরিণত হয়—শ্রীমা তাঁর দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়ে তাই দেখিয়েছেন। সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন ও সেই সমান ঈশ-দৃষ্টিতে জীবের সপ্রেম সেবা তাঁর কর্মময় জীবনের মাঝে যেমন প্রকাশিত, তেমনটি শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে দেখা যায় না। তাঁর জীবনে সমাধি আছে তবে শ্রীরামকৃষ্ণের অহরহ সমাধিমগ্নতা নেই; সাদাসিধে কথায় গূঢ়-তত্ত্বের প্রকাশ আছে তবে প্রচার-দক্ষতা তাঁর নেই। শ্রীশ্রীমার জীবনের পটভূমি সাধারণ মানুষের জীবনের পটভূমির অনুরূপ। সে পটভূমি দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড় মঠের শুচি-শান্ত-তীর্থভূমি নয়। সে পটভূমি মুখ্যত জয়রামবাটীর 'রোগ-শোক-দুঃখ-হতাশা-দুর্বলতা-বেষ্টিত সংসার'। সেখানে তিনি বাস করছেন রাধুর পাগলি-মা, যোগমায়া অদ্ভুত-মেজাজী অবুঝ-রাধু, শুচিবাই-স্বভাবা ভক্তিমতী নলিনী-দিদি, পরস্পর ঝগড়াঝাঁটিরত ভাইদের নিয়ে; দীন-দরিদ্র গ্রামবাসীদের নিয়ে আর হাজারো প্রকৃতির সৎ-অসৎ, ধনী-দরিদ্র ভক্তদের নিয়ে। আর করে চলেছেন গৃহস্থালির টুকিটাকি সব কাজ, নিত্যকার জপ-ধ্যান, পূজা ও সৎপ্রসঙ্গ। গভীর রাতেও তাঁর ঘুমের সময় নেই, জপ করছেন যাতে জগৎজোড়া সন্তানদের কল্যাণ হয। এই পরিবেশে তিনি একটুও হাঁপিয়ে উঠছেন না। সব কাজ করেও তিনি নির্লিপ্ত, শান্ত, অশান্তি কখনও নেই তাঁর। ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন তাঁর আঁচলে যেন বাঁধাই রয়েছে সর্বদা। বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী সারদানন্দের আর মুসলমান মজুর আমজাদের মধ্যে সমদর্শন, সকলকে সেই সমদর্শনের ভিত্তিতে সমানভাবে সেবাযত্ন করা তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ ও স্বাভাবিক। এই ত্রয়ীর লীলা-অনুধ্যায়ী পূজনীয় স্বামী প্রেমেশানন্দ তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যের দ্রষ্টা ও প্রতিপাদয়িতা, স্বামীজী উহার বক্তা ও প্রচারক, শ্রীশ্রীমা উহার ব্যবহারাদর্শ।"[২৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ হাতে জ্ঞান-ভক্তি-রূপ তেল মেখে সংসারের-সমাজের কর্তব্য, কর্মরূপ কাঁঠাল ভাঙতে, অদ্বৈতজ্ঞানে আঁচলে বেঁধে সংসাব করতে বলেছেন। অশান্ত সংসারে শান্তিলাভের এই-ই উপায়। এরূপ যে করা যায়—সহস্র ঝামেলা-পূর্ণ পরিস্থিতিতে থেকেও এবং তার দ্বারা এই জীবনেই সর্বদা শান্তিতে থাকা যায়—শ্রীশ্রীমার জীবন থেকেই সেটা নিঃসন্দেহে জানা যায়। তাই নর-নারী-নির্বিশেষে সকলের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে শ্রীশ্রীমার জীবনের। তবে কোনও ভাব বা আদর্শ বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে আরূঢ় না হলে সে অনুসারে কাজ করা যায় না। তাই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের—যাঁদের জীবনে একই আদর্শ রূপায়িত হয়েছে—জীবন ও বাণীর চর্চাও একান্ত আবশ্যক।

স্নেহময়ী সারদা দেবী

আমরা মহাপুরুষদের কথা স্মরণ করি এবং তাঁদের ভক্তিভরে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় তাঁদের কথা স্মরণে রাখি না। গৌতম বুদ্ধকে আমরা স্মরণ করি কিন্তু তাঁর স্ত্রী গোপার ত্যাগ যে কতখানি সে বিষয়ে কি খবর রাখি? মৃতপ্রায় সিদ্ধার্থ গৌতমকে সামান্য একটু পায়েস খাইয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন যে সুজাতা তাঁকে কি স্মরণে রেখেছি? জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমানকে ভক্তরা 'মহাবীর' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর ত্যাগ কি কোনও বীরের চেয়ে কম ছিল? কিন্তু আমরা তো তাঁকে স্মরণ করছি না। একদিন স্ত্রীর প্রেমে পাগল তুলসীদাসকে তাঁর স্ত্রী বললেন, "এই তীব্র আকর্ষণ ভগবানের প্রতি থাকলে তাঁকে পেয়ে ধন্য হতে।" তুলসীদাস ঈশ্বরের প্রেমে আসক্ত হলেন এবং অনেকটা স্ত্রীর কারণেই স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রইলেন। আমরা তুলসীদাসকে মনে রাখলাম কিন্তু ভুলে গেলাম রত্নার মতো অমূল্য রত্নকে। আমরা অনেকেই চৈতন্যদেবের নাম শুনলে ভক্তিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা যাঁরা জানেন তাঁদের অশ্রু সংবরণ করা কঠিন। অথচ তাঁর ত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করি না। পৃথিবীর ইতিহাসে এদিক থেকে যাঁরা সব চাইতে ভাগ্যবতী তাঁরা হলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ-এর (সঃ) স্ত্রী হযরত খাদিজা এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী শ্রীসারদা দেবী।

মুসলমান যেমনিভাবে হযরত খাদিজাকে মায়ের আসনে বসিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরাও সারদা দেবীকে নিজের মায়ের মতো মনে করেন। সারদা দেবী স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন দেশের ভিতরে এবং বাইরে। মাতৃত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়েও মা হয়ে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন কোটি কোটি মানুষের অন্তরে। স্ত্রীর কিছু অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও স্বামী দ্বারা পূজিত হয়ে তিনি সারা বিশ্বে নারীর মর্যাদাকে করেছেন সমুন্নত। তাঁর সমস্ত কর্ম ছিল নিষ্কাম সাধনার প্রতীক। জাগতিক মোহকে বর্জন করেছিলেন বলেই অর্জন করেছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা। সারদা দেবী অনেক পরিচয়ে পরিচিতা এবং অনেক বিশেষণে বিভূষিতা। তিনি 'আনন্দরূপিণী', 'ভক্তজননী', 'তপস্বিনী', 'ক্ষমারূপিণী', 'লোকজননী', 'জন্ম-জন্মান্তরের মা', 'পবিত্রতা স্বরূপিণী মা', 'মহত্তমা নারী', 'পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা মা', 'গণ্ডিভাঙ্গা মা', 'সতেরও মা অসতেরও মা', 'শরতেরও মা, আমজাদেরও মা' ইত্যাদি নামে পরিচিত। সত্যিকার অর্থেই 'আজন্মতপস্বিনী' সারদা দেবী 'বিধাতার আশ্চর্যতম সৃষ্টি' এবং 'জন্ম-জন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা'। স্নেহ, প্রেম, উদারতা এবং অদোষদর্শিতা গুণে গুণান্বিতা

সারদা দেবী সত্যিই অনাড়ম্বর সহজতম সাজে পরম শক্তিশালী মহত্তমা এক নারী। সারদা দেবীর অনেক রূপের মধ্যে স্নেহময়ী রূপ নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তপস্যার প্রকৃত অর্থ কামনা-বাসনার নিবৃত্তি। ইন্দ্রিয়নিবৃত্তি এবং মনের একাগ্রতাই পরম তপস্যা। কন্যারূপে, সহধর্মিণীরূপে এবং জননীরূপে অর্থাৎ নারীজীবনের প্রতিটি স্তরে সারদা দেবীর তপস্যার রূপ চির উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং সৃষ্টির প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাই তাঁর সাধনা। জীবকে শিবজ্ঞান করে তার জন্য প্রেমের ফল্গুধারা বইয়ে দেওয়াই তাঁর জীবনদর্শন। দরিদ্র পিতামাতার গৃহে তাঁর জন্ম। শৈশব অবস্থাতেই তিনি দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট, কিন্তু কাতর হননি কোনও দিন। এই দারিদ্র্যের মধ্যে বড়ো হওয়াটাই ছিল তাঁর জীবনের বড়ো আশীর্বাদ। গরিব মানুষের দুঃখ-কষ্ট তিনি বুঝতে পারতেন অতি সহজে। আর একারণেই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাতে অন্ন পরিবেশিত হলে সেই বালিকা অবস্থাতেই তিনি পাখা দিয়ে বাতাস করেছেন গরম খাবারকে ঠাণ্ডা করার জন্য, কারও নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি। মানুষের কষ্টেই নয়, অন্য প্রাণীর কষ্টেও স্নেহময়ী মা কাতর হয়েছেন। গরুর জন্য পুকুরে নেমে দলঘাস কেটে ক্ষুধার্ত গরুকে খাইয়েছেন। বাছুরের হাম্বারব শুনে দড়ি খুলে দিয়েছেন মায়ের কাছে গিয়ে যেন দুধ পান করে ক্ষুধা দূর করতে পারে। কখনও বা যন্ত্রণাকাতর কোনও বাছুরকে জড়িয়ে ধরে তার ব্যথার স্থানে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। তাঁর পোষা চন্দনার নাম ছিল 'গঙ্গারাম'। সে 'মা, ও মা' বলে ডাকত। কোন ডাক ক্ষুধার তা সারদা দেবী ঠিকই বুঝতেন এবং ডাক শুনেই জবাব দিতেন, 'যাই বাবা, যাই'। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে গিয়ে তিনি গঙ্গারামকে ছোলা ও জল দিয়ে আসতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যদের তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। তিনি নিজেকে গুরুপত্নী বলে মনে করতেন না, মনে করতেন তিনি তাদের স্নেহময়ী মা। এজন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। বিশিষ্ট অভিনেতা গিরিশ ঘোষ এসেছেন জয়রামবাটীতে। তিনি মাতৃস্নেহের আস্বাদে তৃপ্ত। গিরিশবাবু সকালে চা খান। তাই সারদা দেবী সাত-সকালে নিজে খোঁজ করে অন্যের কাছ থেকে দুধ এনেছেন তাঁকে চা খাওয়ানোর জন্য। শুধু তাই নয়, নিজের হাতে প্রত্যেক দিন বিছানা করে দিতেন। গিরিশ এসব দেখে বিব্রত বোধ করে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি রকম মা?" সারদা দেবী উত্তরে বললেন, "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথার মা নয়—সত্য জননী।" গুরুপত্নীর এরূপ দৃষ্টান্ত ত্রিভুবনে বিরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে অনেক মহিলা ভক্ত আসতেন। নিজের সমস্ত অসুবিধা উপেক্ষা করে সারদা দেবী নহবতের ছোটো ঘরেই তাদের শোবার ব্যবস্থা করতেন। তিনি ভাবতেন, এরা শুধু স্বামীর ভক্তই নয়, তাঁরও সন্তান-সন্ততি। এইভাবে নিজেকে এদেরই মা মনে করতেন। সন্তানের জন্য পরিশ্রমে স্নেহময়ী মায়ের যেমন কোনও ক্লান্তি নেই, তেমনি তিনি কোনও ক্লান্তি বোধ করতেন না স্বামীর ভক্তদের জন্য পরিশ্রম করতে।

আমরা অনেকেই বি এ, এম এ, পি এইচ ডি ইত্যাদি ডিগ্রির চাদর গায়ে পরে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা শিক্ষিত বলে দাবি করতে পারি না। কারণ শিক্ষা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের মেধাকে ধারালো করা এবং অন্তরকে বিকশিত করা। কিন্তু যে শিক্ষা আমরা লাভ করি তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তর

হয় সংকীর্ণ এবং মেধা হয় ভোঁতা। এক্ষেত্রে সারদা দেবীর মতো চরিত্র ইতিহাসে দ্বিতীয়রহিত। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে তিনি শিক্ষিতা ছিলেন না। ছিলেন 'আনপড়' বা নিরক্ষর। কিন্তু তিনি ভূমিকা পালন করেছেন একজন সত্যিকার জ্ঞানীর, একজন সমাজ সংস্কারকের এবং ধর্মসংস্কারকের। তিনি সমাজের অনেক অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন। এ-কাজটি তিনি করেছেন কোনও লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে নয় অথবা যুক্তিতর্কে ভরা লেখালেখির মাধ্যমেও নয় বরং শুধুমাত্র মাতৃধর্মের ভূমিকা পালনে, কেবল মাতৃত্বের দাবিতে, মাতৃত্বের প্রেরণায়, মাতৃত্বের শক্তিতে। আমাদের সমাজে অনেক ধনী ব্যক্তি আছেন যাদের জায়গা-জমির অন্ত নেই। কিন্তু কোনও মানুষের অন্তরে সামান্যতম জায়গাও তাঁরা করতে পারেননি। আবার অনেকে আছেন যাদের এক ছটাক জমিও নেই কিন্তু কোটি কোটি মানুষের অন্তরে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। মা সারদা দেবী এঁদেরই একজন। তিনি ত্যাগের মহিমায় যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন সারা পৃথিবীতে। সাধারণ অর্থে মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও মা হয়ে বেঁচে আছেন এবং থাকবেন লক্ষ কোটি মানুষের অন্তরে। তিনি মা, এ-পৃথিবীতে একজন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী মা। তিনি ধনীর মা; গরিবের মা, সতের মা, অসতের মা, উঁচুজাতের মা, নিচুজাতের মা, তিনি সাধুরও মা আবার ডাকাতেরও মা।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ছোটো জাত বলে সমাজের এক বিরাট অংশকে দূরে সরিয়ে রাখা হত। ঠিক এই সময় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ কন্যা সেই সমাজের একজন হয়েও নিজেকে অনেক উপরে তুলে নিয়ে ছোটো জাত, বড়ো জাত, মজুর, মালি, ডাকাত, পতিত, চণ্ডাল, মাতাল সকলকে বুকে টেনে নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—আমি সতেরও মা অসতেরও মা; সকলের মা। তিনি বললেন, ছেলে যদি ধুলোকাদা মেখে আসে তাকে ধুয়ে-মুছে কোলে তুলে নেওয়াই তো মায়ের কাজ।

তিনি সহজ অথচ নিশ্চিন্তভাবে সমাজ ও ধর্মের অনেক বিধি-নিষেধের মাথায় কুঠারাঘাত হেনেছেন। তিনি এটা করতে সক্ষম হয়েছেন এই শক্তিতে যে তিনি তাঁর ছেলেদের মধ্যে পার্থক্য করেননি। তাঁর এই সর্বব্যাপী মাতৃত্ব সমাজে এক বৈপ্লবিক চেতনার সূত্রপাত করে। তিনি সামাজিক ভেদাভেদ ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেন তা অবিস্মরণীয়। জয়রামবাটীতে একবার তিনি বলেন, ভক্তের আবার জাত কী? সব ছেলেই তো এক। আমার ইচ্ছা হয়, সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। পরের দিন সারদা দেবীর আদেশে সত্য ময়রার দোকান থেকে দু-সের জিলিপি আনা হল এবং মা সারদা দেবী একটি পাত্রে মুড়ি আর জিলিপি পাঠিয়ে দিলেন ভক্তদের। একই পাত্র থেকে নিয়ে সকল জাতের লোক একসঙ্গে বসে খেল। সেদিন জাতপাতের ঊর্ধ্বে এক সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়লেন স্নেহময়ী মায়ের সন্তানেরা। সেই যুগে এটা অনেক বড়ো ধরনের বৈপ্লবিক ঘটনা। অথচ মা সারদা দেবী এ-ধরনের সামাজিক বিপ্লব ঘটালেন নিঃশব্দে, মাতৃত্বের শক্তিতে।

ধর্মসংস্কারক হিসেবেও সারদা দেবী সমকালীন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছেন। নিজের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে তিনি আচার-অনুষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছেন। ব্রাহ্মণের বিধবা হয়েও তিনি নিয়মিত সেদ্ধ চালের ভাত খেতেন এবং ভক্তকে প্রসাদ দেওয়ার জন্য একাধিকবার ভাত খেতেও তাঁর কোনও দ্বিধা ছিল না। এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে মা বলেন, ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি। ওতে কোনও দোষ হয় না।

ছেলেদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে মা নির্দ্বিধায় রাত্রে চালের পিঠে খান এবং জয়রামবাটীর মতো গ্রামে সহস্তে মাংস রান্না করে ভক্তদের মুখে তুলে দেন।

কি সামাজিক ব্যবহারে কি কর্মাচরণে সারদা দেবী প্রচলিত রীতির বাধা ভেঙে নতুনের দিকে এগিয়ে গেছেন। এমন সব কথা বলেছেন, এমন সব কাজ করেছেন যা একবিংশ শতাব্দীতেও আমবা করে উঠতে পারছি না এবং এ-কাজ তিনি করেছেন মাতৃস্নেহের জোরে। আজ যখন সারা পৃথিবী ধর্মের নামে হিংসায় উন্মত্ত তখন সারদা দেবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজকের মায়েরা যদি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারেন তবেই নতুন যুগের, নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা সফল হতে পারে। আজ সমাজে আমরা ত্যাগস্বীকার করতে চাই না। নিজের ঢোল নিজেই পিটিয়ে জোর করে মানুষের প্রশংসা আদায় করতে চাই। ফলে প্রশংসা প্রহসনে পরিণত হয়। কিন্তু সারদা দেবী কোনওদিন প্রশংসা কুড়োতে চাননি। আর সে কারণেই তিনি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

সারদা দেবী দানের ক্ষেত্রে ছিলেন বেহিসেবি। যখন কেউ তাঁকে 'মা' সম্বোধন করে কিছু চাইত তখন তিনি উতলা হয়ে উঠতেন এবং অকাতরে দান করতেন। স্বার্থত্যাগেও তিনি সর্বদা উদার। কর্মে তাঁর আপত্তি নেই, আপত্তি নেই জীবনসংগ্রামে কষ্ট সহ্য করতে। তাঁর একটাই আপত্তি ছিল এবং তা হল নিজের জন্য কিছু চাইতে। তাঁর জীবনদর্শন হল : মানুষের তপস্যা কর্মত্যাগে নয়, আত্মত্যাগে। দান ও ত্যাগেব ক্ষেত্রে এইরকমই বেহিসেবি ছিলেন মহানবীর স্ত্রী হযরত আয়েশা। তাঁর ত্যাগ ও দানশীলতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। তিনি উদারচিত্তে খোদার পথে ব্যয় করতেন। কম-বেশির কথা চিন্তা করতেন না। যা কিছু পেতেন, অভাবীকে দান করতেন।

সারা বিশ্বে আজ নারীবাদী আন্দোলনের হিড়িক, এতে নারীমুক্তি নেই। এতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। যেটা আজ নারীমুক্তির জন্য প্রয়োজন সেটি হল শিক্ষা। আজ নারীকে শুধু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাতে নয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষাতেও শিক্ষিত করতে হবে। সারদা দেবী যে নারীমুক্তির দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সে মুক্তি ধর্মান্ধতা হতে মুক্তি, কুসংস্কার হতে মুক্তি, অশিক্ষা-কুশিক্ষা হতে মুক্তি, হিংসা-বিদ্বেষ-ঘৃণা-প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি। শিক্ষিতা নারীদের উচিত সারদা দেবীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীজাতিকে সত্যিকারের মুক্তির পথ দেখানো। সত্যিকার অর্থে আদর্শ স্নেহময় মাতৃত্বের বলে বলীয়ান হয়ে এ-সমাজকে আদর্শসমাজে পবিণত করা।

সারদা দেবী স্বামীর যে ভালোবাসা পেয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা অশ্রুতপূর্ব বিরল ঘটনা। মাতৃরূপে আসন দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্ত্রীকে পূজা করার মাধ্যমে দুটি জিনিস ফুটে ওঠে : এক, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মনের বিশালতা ও সাহসিকতা এবং দুই, সারদা দেবীর গুণাবলী যা তাঁর স্বামীকে মুগ্ধ করেছে। সারদা দেবীর মতোই সাধ্বী ছিলেন হযরত খাদিজা। তিনি তাঁর স্বামী অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহম্মদ-এর (সঃ) সন্তুষ্টি, তাঁর আনুগত্য এবং সুখ-শান্তিতে সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তাঁর স্বীয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা স্বামীকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করতে সহযোগিতা করেছেন। তাই তো দেখা যায়, হযরত খাদিজার অবর্তমানে মহানবী সব কাজেই তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন, সভ্যতার ইতিহাসে চারজন নারী বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা হলেন : ঈশা নবী-র (যিশু খ্রিষ্ট) মাতা মরিয়ম, ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া, হযরত খাদিজা এবং স্বীয় কন্যা ফাতিমা।

সারদা দেবী শুধু মুখেই বলতেন না যে, তিনি শরতেরও মা এবং আমজাদেরও মা। তিনি এটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। আজ আমাদের অনেকেই এ ধরনের কথা বলি কিন্তু আমাদের মনের কথা এবং কাজে মিল নেই। একটি প্রচলিত গল্প আছে। সেটা হল, এদেশে রোগী বেশি না ডাক্তার বেশি। গল্পের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে—এদেশে ডাক্তার বেশি। গল্পের সূত্র ধরে বলা যায় এদেশে দর্শক শ্রোতার চাইতে অভিনেতার সংখ্যা বেশি। আমরা বাইরে অসাম্প্রদায়িক বলে অভিনয় করি কিন্তু অন্তরে সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করি এবং সুযোগ পেলেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করি। ফলে অসাম্প্রদায়িক সমাজপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বারবার ব্যাহত হচ্ছে। তাই সত্যিকার অর্থেই যদি সারা পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে এ উপমহাদেশকে সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে চাই তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের মতো অসাম্প্রদায়িক মহৎ ব্যক্তিদের জীবনাদর্শের প্রচার ও প্রসার একান্ত জরুরি।

অতীত ভারতের তেজস্বিনী ও এযুগে শ্রীমা

প্রব্রাজিকা সত্যব্রতপ্রাণা

যুগে যুগে ভারতবর্ষ বহু তেজস্বিনী, পূতচরিত্রা নারীর আদর্শে সুধন্য। বিংশ শতাব্দীতেও এই আদর্শের ধারা অব্যাহত ছিল। আবহমানকাল ধরেই এইসব মহীয়সী নারীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব গাথায় ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল হয়ে আছে। স্বামী বিবেকানন্দও তেজস্বিনী বরণীয়া নারীদের আত্মত্যাগপূর্ণ কাহিনি কী গৌরবের সঙ্গেই না বর্ণনা করে গেছেন! নারীকে তিনি শুধুমাত্র পতিব্রতা, করুণাময়ী, আত্মত্যাগে ব্রতী, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তিরূপে উপস্থাপিত করেননি। নারীর বীর্যবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিপদের মুখে অসঙ্কোচে এগিয়ে যাওয়া—সর্বোপরি স্বাধীনতাস্পৃহাব ভাবটিও তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। সেইসব যুগোত্তীর্ণ, কালোত্তীর্ণ নাবীচরিত্র আজকের নারীর সামনে আদর্শের রূপচিত্র। সাধক-কবির গান মনে পড়ে যায়—''রবিশশী এক ঠাঁই, হেন কভু শুনি নাই/ কঠোরে কোমলে একাবাসে।'' নারীর এই 'কঠোরে-কোমলে' রূপটার পূর্ণ বিকাশ স্বামীজী চেয়েছিলেন। সময় এসেছে আজ সেই অতীত গৌরবের দিকে ফিরে দেখার। আজকের নারী যেন অতীতের মহিমময় চালচিত্রখানির পটভূমিতে নিজেদের আলোকিত, জাগ্রত করে তোলে।

স্বামীজী তাঁর স্বদেশমন্ত্রে ভারতের নারীজাতির আদর্শ বলতে গিয়ে সর্বপ্রথম জনকনন্দিনী সীতার পবিত্র নামোচ্চারণ করেছেন। কী আশ্চর্য সীতার পবিত্রতার শক্তি! কত শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সতীর ধর্মে অবিচল তিনি। রাক্ষসরাজ দশাননের সকল দম্ভ, আস্ফালন এই তেজস্বিনীর কাছে তুচ্ছ হয়েছিল। পাতিব্রত্য, সহনশক্তি, দুঃখের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম সীতা-চরিত্রকে করে তুলেছে মহনীয়। রাক্ষসকুলতিলক রাবণ বন্দিনী সীতার কাছে প্রেমভিক্ষা করছেন। প্রথমে কত সমাদর, কত সানুনয় আবেদন। শেষে কার্যোদ্ধার হল না দেখে লাঞ্ছনা, কটুকাটব্য, ভযপ্রদর্শন। কিন্তু সব কৌশলই ব্যর্থ। পবিত্রতার অসীম শক্তিতে অকুতোভয় সীতা ধিক্কার দিয়ে রাবণকে বলছেন—

> ''মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
> নৃসিংহং সিংহসঙ্কাশমহং রামমনুব্রতা..
> ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি সুদুর্লভাম্।
> নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা...
> যো রামস্য প্রিয়াং ভার্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।
> অগ্নিং প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি
> কল্যাণবৃত্তাং যো ভার্যাং রামস্যাহর্তুমিচ্ছসি।

অয়োমুখানাং শূলানামগ্রে চরিতুমিচ্ছসি ॥...
যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে...
সুরাগ্রসৌবীরকয়োর্যদন্তরং তদন্তরং দাশরথেস্তথৈব চ ॥"[১]

—যাঁর বাহুযুগল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, যিনি পরাক্রমে সিংহতুল্য, সিংহের মতো ধীরগামী, সেই নরশ্রেষ্ঠ রামের আমি অনুগত। রাক্ষস, তুই শৃগাল হয়ে দুর্লভ সিংহীকে কামনা করছিস? যেমন সূর্যের প্রভাকে ছোঁয়া যায় না, তেমনি তুই আমাকেও স্পর্শ করতে পারবি না।... ওরে নীচ! যখন রামের পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মেছে, তখন জ্বলন্ত অগ্নিকে বস্ত্র দিয়ে বন্ধন করতে, লোহার শূলের ওপরে হাঁটতে বাসনা করেছিস। দেখ, সিংহ ও শৃগালের মধ্যে যে তফাত, তোর আর রামের মধ্যে তেমন তফাত জানবি।

কাব্যে সাহিত্যে সীতার সর্বংসহা জন্মদুখিনী রূপেরই বন্দনা। কিন্তু সীতার মধ্যে সেইসঙ্গে আছে নির্ভীকতা ও তেজ যা রাবণকেও বিস্মিত করেছে। নারীর মধ্যে চাই এইরকম পবিত্রতার তেজ যা অশুভকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম।

"জগতে সমগ্র নারীজাতির মধ্যে গান্ধারীর মতো মহীয়সী চরিত্র কি আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে?"[২] সঙ্কটে অবিচল গান্ধারীর সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার উক্তিটি যথার্থ : কৌরব-জননী গান্ধারীর চরিত্রে মাতৃত্ব ও ধর্মনিষ্ঠার এক আশ্চর্য মিলন। স্নেহ-আবেগের ঊর্ধ্বে ধর্ম ও ন্যায়কে তিনি স্থান দিয়েছিলেন।

কৌরবসভায় লাঞ্ছিতা যাজ্ঞসেনীর আর্তক্রন্দন তাঁর নীতিবোধকে তীব্র করে তুলেছিল। আপন দুরাচারী পুত্রদের তিনি সমর্থন করেননি। কোথায় পেলেন এই অসীম শক্তি? এই সেই মাতৃরূপ—'যার করুণায় বিশ্ব মাতায় খড়্গ তাহার করতলে'। এই দ্বিমাত্রিক সত্তায় মাতৃত্বের রূপটি আরও মহনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু গান্ধারী ধর্মবুদ্ধিকে পুত্রস্নেহের কাছে বিকিয়ে দেননি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এই চরিত্রের কাছে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছেন। এরকম দৃঢ়চিত্ত নারীচরিত্রই ভারতীয় নারীর চিরকালের আদর্শ।

শুধু পুরাণকাহিনিতে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অমর হয়ে আছেন বহু বীর রমণী। পদ্মিনীর কথাই ধরি। প্রখর বুদ্ধিমতী মেবারের রানী পদ্মিনীকে বিধাতা যেন রূপ ও গুণের আধার করে সৃষ্টি করেছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়েও তাঁর এমন অসাধারণ বুদ্ধিবিবেচনা ছিল যে রাজ্যসম্পর্কিত কোনও কঠোর সমস্যার মীমাংসাকালে রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ও পদ্মিনীর স্বামী ভীমসিংহ পদ্মিনীর বুদ্ধি ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাঁর অসামান্য রূপের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হলেন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি। পদ্মিনীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র হলেন তিনি। চিতোর ধ্বংস করে পদ্মিনীকে লাভ করতে অগ্রসর হলেন। ছলে, বলে, কৌশলে পদ্মিনীর পতি ভীমসিংহকে বন্দী করে তার মুক্তিপণ হিসেবে রানী পদ্মিনীকে সুলতান দাবি করলেন। মহাবুদ্ধিমতী রানীও অত্যন্ত সাহসিকতায় ও কৌশলে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে স্বামীকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিনের পাঠান রক্ত জ্বলে উঠেছিল রানীর এই চক্রান্তে। পরিণতিস্বরূপ এক ভয়াবহ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে চিতোর বীরশূন্য হল। চিতোর অধিকৃত। এইরকম এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ধীরবুদ্ধি পদ্মিনীর আহ্বানে অন্যান্য সকল রাজনারী একত্রিত হয়ে জহর-ব্রতে নিজেদের জীবন আহুতি দিলেন। ঘৃণ্য লালসার কাছে আত্মসমর্পণ না করে গৌরবে ও মহিমায় স্থাপন করলেন এক অতুলনীয় কীর্তি। এ মৃত্যু তাই আত্মহনন নয়, বীরের মতোই যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুবরণ।[৩]

দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির দেখিয়ে গেছেন বীরাঙ্গনা মুসলিম নারী চাঁদ সুলতানা। তেজস্বিতায়, বীরত্বে, স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত এক মহীয়সী নারী এই চাঁদবিবি। 'দেশজননীর জন্য প্রাণবিসর্জনে মৃত্যুকেও জয় করা যায়'—রানীর এই উক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। কিন্তু নীচ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে অকালে তিনি প্রাণ দিলেন। বীরনারীর রক্তে রঞ্জিত হল দেশমাতৃকার বেদী।[৪] তাই দেখি, কবির লেখনীও সোচ্চার হয়েছে—"সেদিন সুদূর নয়—যেদিন ধরণী পুরুষের সঙ্গে গাহিবে নারীরও জয়।"[৫] বাস্তবিকই বীরপুরুষের সঙ্গে এইসব বীরনারীর জয়গানে মুখর হয়েছে ইতিহাস।

স্বামীজী এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নারীদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁদের অন্যতমা নাটোরের রানী ভবানী। ভারতে মুসলিম রাজত্বের প্রায় শেষভাগে নাটোরের রাজা রামকান্তের দেহত্যাগের পর তাঁরই সুযোগ্যা, শাসনকুশলা পত্নী রানী ভবানী রাজ্যের সকল দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। এই বঙ্গরাজবধূর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, দানশীলতা, পরদুঃখকাতরতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলীর এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ সত্যনিষ্ঠার জন্য নবাবি আমল থেকে শুরু করে পরবর্তী ইংরেজ রাজত্বকালেও তিনি রাজশাসকদের কাছে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বহুক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে অন্যায়ের দৃঢ় প্রতিবাদ করেছেন। ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার হীন চক্রান্ত করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, মীবজাফরের মতো দেশের তথাকথিত কর্ণধাররা জগৎশেঠের প্রাসাদে এক গোপন মন্ত্রণাসভার আয়োজন করেন। সেদিন কিন্তু রানী ভবানী তেজোদৃপ্ত-কণ্ঠে এই হীন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ করে অসীম নির্ভীকতা ও নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৬] নারীর এই বলদৃপ্ত ওজস্বী রূপটির সম্যক বিকাশেই সূচিত হবে নারী-স্বাধীনতার প্রকৃত জয়যাত্রা।

অষ্টাদশ শতকের আর এক মারাঠা বীরাঙ্গনা রানী অহল্যাবাঈয়ের চরিত্রে একদিকে যেমন ছিল রাজনৈতিক কুশলতা, সুতীক্ষ্ণ বিচারবোধ সর্বোপরি যোদ্ধৃ-মনোভাব, অন্যদিকে তেমনি ছিল ঈশ্বরভক্তি, প্রজাবাৎসল্য ও অনাসক্তি। এই দুই আপাতবিরোধী ভাবের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল বানী অহল্যাবাঈয়ের জীবনে।

শ্বশুর মলহার রাও-এর পরলোক গমনের পর সিংহাসনে বসলেন অহল্যার শঠ, দুর্বৃত্ত পুত্র মালে রাও। কিন্তু অহল্যার জীবৎকালেই পুত্র মালে রাও-এর মৃত্যু হয়। দেশে তখন রাজনৈতিক সঙ্কট চরমে। ওই রাজ্যেরই দেওয়ান গঙ্গাধর পেশোয়া মাধব রাও-এর খুল্লতাত রঘুনাথ রাও-এর সঙ্গে এক গোপন ষড়যন্ত্রে রানী অহল্যার প্রাণনাশে তৎপর হলেন। তাঁরা ভাবলেন পুত্রশোকাতুরা রানীকে সরিয়ে রাজ্য অধিকারে বিশেষ কোনও আয়াসের প্রয়োজন হবে না। আশ্চর্য! রানী অহল্যাবাঈ শোকতাপ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাজ্যরক্ষায় হাতে তুলে নিলেন যুদ্ধাস্ত্র। রণসজ্জায় সজ্জিত বীরাঙ্গনা অহল্যার কী তেজোদৃপ্ত উক্তি—"আমাকে কেহ সামান্যা নারী মনে করিবেন না, আমি হস্তে বল্লম লইয়া দণ্ডায়মান হইলে পেশোয়ার সিংহাসন বিকম্পিত হইবে।... "[৭] এ যেন সপ্তশতী চণ্ডীতে দেবীর সেই দৃপ্ত উদ্‌ঘোষ—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'[৮]—একা আমিই এই জগতে বিরাজিতা, দ্বিতীয়া আর কে আছে? প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না রানী এই সঙ্কট-মুহূর্তে মারাঠা রাজ্যের সামন্ত রাজার কাছে গোপনে পত্র পাঠিয়ে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাঁর এই

অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও সমরকুশলতার পরিচয় পেয়ে অবশেষে ষড়যন্ত্রকারীরা রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। কিন্তু মাতৃ-মমতায় তিনি ওই হীন ষড়যন্ত্রকারীদের সব অপরাধ মার্জন করেছিলেন। রানীর মধ্যে যেন দেবী ভগবতীরই প্রকাশ ঘটেছিল—'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ।'[৯] আশ্চর্য বীর্যবত্তার সঙ্গে অপূর্ব ক্ষমাশীলতার নিদর্শন। ভারতের মেয়েদের কাছে স্বামীজীর আরও প্রত্যাশা—"ভাবী নারীদের মহত্ত্ব অহল্যাবাঈয়ের মহত্ত্বের প্রতিরূপ মাত্র হবে না, তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।"[১০]

এ এক ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রায় চলেছি আমরা। বুন্দেলখণ্ডের পথে পথে আজও যে ইতিহাস থমকে যেতে চায়। সেই মাটির বুকে আজও গুমগুম করে ওঠে প্রতিবাদের সমুদ্রগর্জন 'মেরী ঝাঁসী নহী দুঙ্গী'। অষ্টাদশী বধূর হাতের কঙ্কণের আওয়াজ সেদিন অসির ঝনৎকারের সঙ্গে এক হয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশের রাজহৃদয়। আজও যেন শোনা যায় এক অস্ফুট গীতি—"পত্থর মিট্টিসে ফৌজ বনাই,/ কাঠ সে কাঠোয়ার; / পাহাড় উঠাকে ঘোড়া বনাই,/ চলি গোয়ালিয়র।"[১১]

—রানী যদি হাতে মাটি তুলে নিতেন তো সেই মাটি ফৌজ হয়ে যেত, কাঠ তাঁর হাতের স্পর্শে হয়ে উঠত উদ্যত তরবারি। পাহাড়কে উঠিয়ে ঘোড়া বানিয়ে তিনি গোয়ালিয়র চলে গেছেন।

কে এই মাটির দেবী? শক্তিরূপিণী দুর্গার যেন মর্তে আগমন! হ্যাঁ, আমরা সেই রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের কথা বলছি যিনি ঝাঁসির গর্ব, শুধু ঝাঁসির কেন সমগ্র নারীজাতির গর্ব। স্বামীজী নারীকে অবলা ভাবতে ভালোবাসতেন না, তিনি নারীর মধ্যে দেখতেন বীরত্বের স্বপ্ন। তিনি বলতেন—"আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপ্যানে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এসময়ে তাদের মধ্যে self-defence শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রানী কেমন ছিলেন!"[১২]

পরাধীন ভারতবর্ষ। মারাঠা রাজ গঙ্গাধর রাও তাঁর নাবালক দত্তক পুত্র দামোদর রাওকে রেখে পরলোকগমন করেছেন। গঙ্গাধরের অষ্টাদশী বধূ লক্ষ্মীবাঈ দত্তক পুত্রকে সামনে রেখে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন ঝাঁসির শাসনভার। এদিকে লর্ড ডালহৌসী রায় ঘোষণা করলেন—গঙ্গাধর রাও-এর দত্তক গ্রহণ সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। অতএব ঝাঁসির পূর্বতম রাজাদের কোনও জীবিত বংশধর না থাকায় স্বত্ববিলোপ নীতির ভিত্তিতে ঝাঁসির রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ। দর্পিত ইংরেজ ঝাঁসির দুর্গে উড়িয়ে দিল 'ইউনিয়ন জ্যাক'। রানী কিন্তু এই মহাবিপদে হতবুদ্ধি না হয়ে যুক্তিপূর্ণ কথায় ডালহৌসীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইংরেজ সিদ্ধান্তে অনড়, অটল। নিরুপায় হলেও লক্ষ্মীবাঈ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেন। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হল তাঁর দৃপ্ত প্রতিবাদী সুর—'মেরী ঝাঁসি নহী দুঙ্গী'। দেহমন তোলপাড় করে একটি প্রশ্নই উঠল—শতশত দেশবাসীর অন্তরের অগ্নিশিখা কি প্রজ্বলিত হবে না? পুড়বে না বিদেশির ওই পতাকা? স্বদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। প্রতিটি দেশবাসী তাঁর কাছে ছিল সন্তানতুল্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন এই বীরাঙ্গনা রানী। যুদ্ধে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করলেন।[১৩] তাঁর বীরত্ব, সমরকুশলতা অভিভূত করেছিল স্বদেশবাসীকে। স্বামীজী নারীর কোমলে-কঠোরে এই রূপটিরই সর্বাঙ্গীণ বিকাশ চেয়েছেন।

সাধারণ সাজে পৃথিবীর মহোত্তমা নারী

দৃঢ়তা ও মাধুর্যের সংমিশ্রণে গঠিত আর এক মহীয়সী নারী রানী রাসমণি যাঁর প্রতি স্বামীজীর ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধা। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলানাট্যে ইনি পালন করে গেছেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রানী রাসমণির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, শাসনকুশলতা সর্বোপরি হৃদয়বত্তা তাঁকে ভারতীয় নারীর শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একবার নিজের অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার জোরে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদেশকে কৌশলে অগ্রাহ্য করে এমন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যাতে দেশের দরিদ্র মৎস্যজীবী প্রজারা বিনা করে গঙ্গায় মাছ ধরার অধিকার ফিরে পেয়েছিল। একদিকে শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম অন্যদিকে দরিদ্র, উৎপীড়িত মানুষের প্রতি সমবেদনা তাঁকে শ্রদ্ধেয় চরিত্ররূপে গড়ে তুলেছে।

এমন বহু তেজস্বিনীর চরিত্রপ্রভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে ভারতের ইতিহাস যাঁরা আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহস ও বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দেশ ও জাতির গৌরব রক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু সর্বকালে সর্বদেশে যে মহীয়সী আমাদের বর্তমান নারীসমাজের যথার্থ দিগ্‌দর্শক হয়ে উঠতে পারেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদা দেবী। মূলত আধ্যাত্মিক চরিত্র হয়েও সারদা দেবী আজকের নারীর বাস্তবজীবনে এক সুদৃঢ় অবলম্বন। রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণঘরের বধূ হয়েও তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়ে গেছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এই অনবদ্য জীবনচর্যার রূপকার ছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যিনি পরম যত্নে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে গড়েছিলেন এই আদর্শ মাতৃপ্রতিমাটিকে। শ্রীমায়ের জীবনদর্শনে স্নেহ-কোমল মাতৃসত্তাটির পূর্ণ বিকাশ হয়েছে সত্য কিন্তু তার অন্তরালে ছিল এক দৃঢ় অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, প্রয়োজনে সেই তেজস্বী রূপটির প্রকাশে তিনি দ্বিধা করেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর শ্রীশ্রীমা যখন একাকী কামারপুকুরে স্বামীর ভিটায় বাস করছেন তখন ঠাকুরের ভক্ত হরিশ উন্মাদ অবস্থায় সেখানে আসে। অপ্রকৃতিস্থ হরিশ তাঁর পিছনে ঘুরতে থাকায় উপায়ান্তর না দেখে মা বাড়ির ধানের গোলার চারদিকে ঘুরতে থাকেন। হরিশও মায়ের পিছন পিছন ঘুরতে থাকে। সেই কথা স্মরণ করে মা পরে বলেন, " ... সাতবার ঘুরে ...আমি পারলুম না। তখন আমি নিজমূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁহেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙ্গুল ফুলে লাল হয়ে গিছল।'[১৪] আত্মসম্মান রক্ষার্থে শ্রীমা সেদিন অতিসহজেই লজ্জা-সম্ভ্রমের বেড়া ভেঙে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন। 'রুষ্টা তু কামান্ সকলান্ অভীষ্টান্।'[১৫] স্থূলদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে মায়ের রোষ বলে মনে হলেও এক্ষেত্রে এই রোষদৃপ্ত আচরণ সন্তানকে অশুভ থেকে ফিরিয়ে এনে শুভ জীবনপথে তাকে প্রেরণ করেছিল। স্বামীজী একবার মায়ের সম্বন্ধে বলছেন, "তিনি বগলার অবতার। সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা... উপরে মহাশান্তভাব কিন্তু ভেতরে সংহারমূর্তি।"[১৬] হরিশের ঘটনায় মায়ের এই বগলারূপের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও তাঁর স্বাধীন চিন্তার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশকে বাধা দিতেন না। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও শ্রীমার অন্তরে স্বাধীনতাস্পৃহার ভাবটি যথেষ্ট ছিল। একবার কোয়ালপাড়ায় তাঁর এক সেবক-ভক্ত মায়ের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বড়ো বেশি নজর রাখছিলেন। মায়ের কিন্তু তাঁর এই বাড়াবাড়ি একেবারেই মনঃপূত হচ্ছিল না। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি সেই সেবককে জানালেন, "এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হল

আমার বৈঠকখানা।... আমি এদেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ। আমাকে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামতো পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না, শরৎকে লিখে দাও।"[১৭]

যথার্থ বিচার-বোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, প্রশাসনিক দক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সাহায্যে তিনি সঙ্ঘজননীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি অত্যন্ত নীরবে ও শান্তভাবে পালন করে গেছেন।

বর্তমান সমাজে নারীর মধ্যে সেই তেজস্বিতা, সেই বীরত্ব যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, যে পবিত্রতা ও তেজের আগুনে সমস্ত অন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যেত! প্রতিনিয়ত নারীলাঞ্ছনার যে রূপটি চারদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তার অবসানের কথা ভাবতে হবে আমাদের। বীর, তেজোদৃপ্ত ঐতিহাসিক নারীচরিত্রের অনুধ্যান আজ প্রয়োজন। এইসব মহীয়সীর জীবনকথাকে ইতিহাসের ও ধর্মপুস্তকের পাতায় বন্দী করে রাখলে চলবে না, প্রতিদিনের জীবনচর্যায় এর নির্যাস গ্রহণ বড়ো প্রয়োজন।

বর্তমানে অনেকক্ষেত্রে আধুনিকতার নামে নারী তার স্বাভাবিক লজ্জা-সম্ভ্রম অনায়াসে বিসর্জন দিচ্ছেন। কিন্তু অতীতের গৌরবপূর্ণ নারীচরিত্রে দেখি দেশের ও দশের কল্যাণে নিজের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলেও তারা নিজেদের মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

একবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যপ্রভাবে ভারতবর্ষে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যেও এসে গেছে এক অকল্পনীয় বিপ্লব। কিন্তু, সেটি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা সত্যই চিন্তাব বিষয়। আজকের নতুন প্রজন্মে নারীর বিপ্লবাত্মক মনোভাব মর্যাদাকার অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এর মধ্যে ফাঁক রয়ে গেছে অনেকটাই। তাকে উপলব্ধি করার দায় তাব নিজের। নারীকে বুঝতে হবে আত্মশক্তি জাগরণের অর্থ আনুষ্ঠানিকতার বেদীমূলে নিজের বলিদান নয়। নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে এক অপূর্ণ অসমঞ্জস ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে তারা হারাচ্ছে নৈতিক যোগ্যতা। পুরুষের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠাকেই তারা অত্যাধুনিক মানসিকতার যথার্থ মানদণ্ড বলে মনে করছে। ঠিক এইখানটিতে চাই সূক্ষ্ম বিচারবোধ। জড় দর্পণে নিজের সুসজ্জিত প্রতিচ্ছবি নয়, চেতনার দর্পণে নিজের আত্মিক রূপের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কী করে সেটা সম্ভব? উত্তর—যেসব নারী দেশকাল জাতির সীমা অতিক্রম করে এখনও মানুষের মনে স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন করে নিয়েছেন, তাঁদের চরিত্রেব অনুধ্যান করা চাই। অনুশীলন করতে হবে তাঁদের মহনীয় জীবনের আদর্শকে। তবে উদয় হবে শ্রদ্ধাবোধ, তবেই নারী নিজেকে ভোগের বেদী থেকে উন্নীত করতে পারবে পূজার বেদীতে। একদিকে চরিত্রের বজ্রদৃঢ়তা, তেজস্বিতা, পবিত্রতা, অন্যদিকে মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-কোমলতা নারীকে করে তুলবে অদ্বিতীয়া, অনন্যা। জগৎ এই দৃপ্ত নারীদের সামনে প্রণত হয়েছে। শ্রীমার স্নেহধন্যা বিদেশিনী শ্রীমতী ম্যাকলাউডের উক্তি স্মরণ করি : শ্রীমার অনুপম জীবনটি আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে রেখে গিয়েছে আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ। শুধু হিন্দু নারী নয়, বিশ্বের সমগ্র নারীজাতির আদর্শ শ্রীমা সারদা দেবী। শ্রীমাকে কেন্দ্র করে তাই জগতের সকল নারীর মধ্যে উদ্বোধিত হোক সেই মহাশক্তি যা সর্বকালে সমাজ, দেশ ও জাতির অভ্যুত্থানে সহায়ক হয়ে উঠবে।

আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের উপায়

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা

অনুবাদ : প্রব্রাজিকা অচিন্ত্যপ্রাণা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য সর্বজনবিদিত কিন্তু বর্তমানে সারদা ভাবান্দোলন সাহিত্য সম্বন্ধেও দেখা যাচ্ছে ক্রম-বর্ধমান আগ্রহ। যদি ভগবদ্-উপলব্ধি সম্বন্ধে কেউ জানতে চান তবে তা কেবল একালের সর্বোত্তম বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা থেকে জানতে পারবেন। যদি কেউ ভারতবর্ষের সনাতন বা চিরন্তন দর্শন এবং তার বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক, আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রয়োগবিধি সম্পর্কে জানতে চান তবে তা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাসমূহেই খুঁজে পাবেন।

এঁদের পাশাপাশি আমরা আর একজনকে পাই যিনি নিজের জীবনে আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। তিনি শ্রীমা সারদা দেবী। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে যাঁরা উৎসুক শ্রীশ্রীমায়ের জীবন যাত্রা থেকে পাঠ তাঁদের নিতেই হবে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত-সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি, সমষ্টি ও ব্যষ্টি একই যা মনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধ হয়। অধ্যাত্মজীবন ও ব্যবহারিক জীবনে কোনও সংঘাত নেই কারণ ব্যবহারিক জগৎ ও ঈশ্বরের জগৎ স্বতন্ত্র নয়। যদি সব-কিছুই পরস্পর সম্পর্ক-যুক্ত হয় তবে জীবনই ধর্ম। যেমন ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—শ্রমই প্রার্থনা। আধ্যাত্মিক ও লৌকিকের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। সকল শ্রম ও সকল পূজাই সেই এক আধ্যাত্মিক জাগরণের পথে নিয়ে যায়। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সময় নেই এমন হতেই পারে না।

অপর দিকে নিছক সৎকর্ম মাত্রেই আধ্যাত্মিক সাধনা না-ও হতে পারে। কেননা যদি ব্যক্তির উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক না হয় এবং তিনি যদি আধ্যাত্মিক সত্তা সম্পর্কে সচেতন না হন, সেক্ষেত্রে সেই কর্ম তার অহংভাবকে স্ফীত করে বিপরীত ফল প্রদান করবে। অধিকাংশ জীব নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন নয়। সমগ্র জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার কোনও অংশ, জীব বা বস্তুকে দেখলে তা হবে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।

শ্রীশ্রীমা দেখিয়েছেন কীভাবে ব্যক্তিসত্তার জাগরণের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আমাদের যাবতীয় কর্মোদ্যমের উদ্দেশ্য প্রাথমিক ভাবে ব্যক্তি-স্বার্থ। নিজেকে ক্ষুদ্র সত্তায় আবদ্ধ দেখা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভাব, 'এই জগৎ এবং এই জগতের সবকিছুই আমার'—এই বোধ-ই হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রকাশ কীভাবে হবে? যদি আমি অতি মূল্যবান কিছুর অধিকারী হই, তবে নিশ্চিতই তা আমি জীবন দিয়ে রক্ষা

করব। আমি তাকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করব। কোনও বস্তু বা জীব আমার কাছে যত প্রিয় বা যত মূল্যবান, তার সম্পর্কে আমরা তত যত্নশীল। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিটি বস্তুতে এই দৃষ্টি ছিল। তাঁর কাছে প্রতিটি মানুষ নিজের সন্তানতুল্য। তিনি তাদের মধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যেব স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি যে কোনও জীবমাত্রেই, বস্তুমাত্রেই অতি পবিত্র জ্ঞান করতেন। সকল কিছুই তাঁর নিবিড় মনোযোগ, সেবা ও আন্তরিক স্নেহের অধিকারী মনে করতেন। যদি তোমার দৃষ্টিতে এ জগতের প্রতিটি মানুষ নিখুঁত, নির্দোষ ও দিব্য হয় তবে তোমাব জীবন কেমন হবে? কল্পনা কর তোমাব সেই আনন্দ! সেই কারণেই তিনি সর্বক্ষণই হয় গভীর ধ্যান করতেন নয় তো কাজের সময় গুনগুন করে গান গাইতেন অথবা সংসারের অচল অবস্থার মধ্যেও সহাস্যে অন্যান্যদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। একবার ভেবে দেখ, প্রতিটি নরনারীকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভালোবাসায় কী আনন্দ!

শ্রীশ্রীমা তাঁর শরণাগত প্রতিটি মানুষকে নির্দ্বিধায় একই আন্তরিকতায় ও স্নেহে সেবা করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—যার দয়া মায়া নেই, সেকি আবার মানুষ? যদি তাঁর কোনও ভক্তেব আশ্রমে ফিরতে বিলম্ব হত, তিনি তাকে ভোজন না করিয়ে কখনও স্বয়ং অন্নগ্রহণ করতেন না। একবার তিনি বলেছিলেন—তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে, আমার বুকে শেল বাজে।

আপাতদৃষ্টিতে তিনি পারিবারিক বিষয়ে এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি যত্নশীলা একজন সাধাবণ গৃহস্থ বধূরই জীবন যাপন করতেন। এমনকি তাঁর অতি নিকট একজন মনে করতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক অথচ শ্রীশ্রীমা যিনি তাঁর স্ত্রী এবং শিষ্যা, তিনি কিনা দিবারাত্র তাঁর আত্মীয়-পরিজন নিয়েই ব্যস্ত! তাঁকে একজন অতি সাধারণ গৃহবধূব মতোই মনে হত। কিন্তু সংসারের যাবতীয় দায় বহন করার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী, শিষ্য ও আগন্তুকদের তিনি সমানভাবে যত্ন করতেন।

একটি ঘটনার ভিতর দিয়ে শ্রীশ্রীমা সর্বজীবে সমদৃষ্টি ও প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। একবার একটি শিশু তার পরিবারে সব সদস্যকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল এবং সে সর্বদাই তাব নিজের দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ কবতে চাইত। বালিকাটির মা তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসতেন। শিশুটি মার কক্ষে প্রবেশ করেই তাঁকে আঁকড়ে ধরত। মা সর্বদাই তাকে প্রচুর মিষ্টি খেতে দিতেন। একবার জয়রামবাটী যাওয়ার আগে শ্রীশ্রীমা ছোট্টো মেয়েটিকে প্রশ্ন করলেন—"বাছা, তুমি তো অনেক দিন ধরেই আমার কাছে আস। তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

"হ্যাঁ মা আমি তোমাকে খু....ব ভালবাসি।"

"কতখানি?"

বালিকাটি তার ক্ষুদ্র বাহু দুটি দুই দিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করে বলল, "এতখানি।"

শ্রীশ্রীমা জানতে চাইলেন, "যখন আমি জয়রামবাটীতে থাকব তখনও আমায় ভালোবাসবে তো?"

"হ্যাঁ মা তখনো আমি তোমায় ভালবাসব। আমি কখনো তোমায় ভুলে যাব না।"

"আমি কেমন করে জানব?"

"বলো, কি করলে তুমি জানতে পারবে?"

"তুমি যদি বাড়ির সবাইকে ভালোবাসতে পার তা হলেই আমি বুঝব, তুমি আমায়

ভালবাস।"

"ঠিক আছে, আমি তাদের সবাইকে ভালবাসব। আমি আর দুষ্টুমি করব না।"

"খুব ভাল, কিন্তু আমি কেমন করে বুঝব তুমি তাদের সবাইকে সমান ভালবাসলে—কাউকে বেশী কাউকে কম নয়?"

বালিকাটি মাকে কথা দেয় সে প্রতিদান না চেয়েই সকলকে ভালোবাসবে এবং জানা যায় যে বাস্তবিকই তার পরিবারে তার ব্যবহার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

শ্রীশ্রীমা আধ্যাত্মিক জীবন বলতে কী বোঝায় আর কী বোঝায় না—এই শিক্ষা দেন। আমাদের বর্তমান যুগে ও পরিবেশে আধ্যাত্মিক সাধনার জীবন্ত নিদর্শন হল তাঁর জীবন। বাসনা এবং অহং থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হতে পারলে আধ্যাত্মিক সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সাধনার দ্বারাই এর উপলব্ধি সম্ভব কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনা শুধুমাত্র জপ-ধ্যান-যাগ-যজ্ঞ-কর্মকাণ্ড ইত্যাদি মতবাদ, নৈতিকতা বা অধ্যয়ন নয়। এসবই সহায়ক কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার মূল উদ্দেশ্য দেবত্বের উন্মেষ এবং প্রতিটি কর্মে তার প্রকাশ। এই হল ধর্ম। জীবমাত্রে নিজের সন্তানজ্ঞানে সেবাই হল তাঁর প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক পথ।

তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তরকারি সংগ্রহ করতেন, ভক্তদের জন্য রন্ধন ও তাদের অসুস্থতায় শুশ্রূষা করতেন। ভোরে উঠে তাদের চায়ের জন্য দুধ সংগ্রহ করতেন। পরে তাঁর কোনও শিষ্য, ভক্ত এবং আত্মীয়দের প্রতি তাঁর সেবার উল্লেখ করলে তিনি মন্তব্য করেন—বাবা, আদর্শ হিসাবে যা করতে হয় তার ঢের বাড়া করেছি নইলে লোকে বলবে কই সাধারণের মতো খায়, দায় ও থাকে। পরবর্তী জীবনে তাঁর কোনও শিষ্য যখন এই ভেবে অনুযোগ করেন যে তিনি তাদের জন্য অত্যাধিক কায়িক পরিশ্রম করেন, শ্রীশ্রীমা বলেন--বাছা কাজে মন ভাল থাকে। ঠাকুরকে বল যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবা করে যেতে পারি।

একবার এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, শুধু জপ-ধ্যান করেই কি কেউ আধ্যাত্মিক জীবনে সফল হতে পারে? মা বলেন—এত জপ করলামই বল আর ধ্যান করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! তুমি কি কখনও দেখনি যে মানুষের বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে দৈবাধীন—এ যেন স্ক্রু-র প্যাঁচ। একচুলও প্যাঁচ কেটে গেলে সে ভারসাম্য হারায় অথবা সে মহামায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেকে অতীব বুদ্ধিমান মনে করে। কিন্তু যদি স্ক্রু-র প্যাঁচ সঠিক এঁটে দেওয়া যায় তবেই সে ঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং সুখ-শান্তি ভোগ করে।

তিনি আরও বলেন—সর্বদাই ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত ও তাঁর কাছে সদ্‌বুদ্ধি প্রার্থনা করা উচিত। সর্বদা জপধ্যান করতে পারে এমন কজন আছে? শুরুতে এসব সর্বান্তঃকরণে অভ্যাস করলেও ক্রমাগত আসনে বসে থাকতে থাকতে ক্রমশ তাদের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলত শিথিলতা দেখা যায়। বিভিন্ন ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

মনকে যথেচ্ছ বিচরণ করতে না দিয়ে কোনও কাজে নিবদ্ধ করাই শ্রেয়। কেননা মনের অবাধ স্বাধীনতা কেবল বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে। আমার নরেন এসব চিন্তা করেই নিষ্কাম কর্মের জন্য সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা করে। যখন স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের সমাজসেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করেন, কেউ কেউ তার প্রতিবাদ করে বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের কখনও এ-ধরনের কাজ করতে বলেননি। সারদা দেবী বলেন—নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। ঠাকুরই নরেনের

মধ্য দিয়ে জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর সন্তান ও ভক্তদের কর্তব্য নির্ধারণ করছেন। নরেন যা বলছে সব সত্য। তোমরা ভবিষ্যতে এর ফল দেখতে পাবে।

রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা পরিচালিত বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণকার্য, দীন ও আর্তদের সেবামূলক কাজে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন শ্রীশ্রীমা এবং তিনি সর্বদাই সন্ন্যাসীদের উৎসাহ দিতেন। যখনই কোনও সন্ন্যাসী বা সাধু ত্রাণকার্য থেকে ফিরে আসতেন শ্রীমা তাঁর কাছে সেই কাজের সার্থকতা, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও কতটা তাদের ত্রাণ করা গেল জানতে চাইতেন। তিনি একেই কর্মযোগ বলেছেন। জপ-ধ্যানের সঙ্গে এই কর্মযোগের সংযোগে সাধকের জীবনের ভারসাম্য বজায় থাকে। তিনি বলেছেন যে—এই জন্যই আমার নরেন এ-সব সেবাকেন্দ্রগুলির পত্তন করে গেছে। আমাদের সঙ্ঘ এইভাবেই চলবে।

শ্রীশ্রীমা বেনারসে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল—'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস'—পরিদর্শন করতে যান। সেখানে মা বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বৃদ্ধাবাস ঘুরে ঘুরে দেখেন। মা যখন জানতে পাবলেন কত সামান্যভাবে এ কাজ শুরু হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক বছরেই এত উন্নতি হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা কোয়ালপাড়াতে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় শুরু করেছিলেন স্থানীয় গ্রামবাসীদের ওষুধ বিতরণের জন্য। একবার এক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমার কাছে অভিযোগ করেন যে বহুলোক যাদের সামর্থ্য আছে তারাও দাতব্যের সুযোগ নিয়ে বিনে পয়সায় ওষুধ নিয়ে যায়। তিনি মার কাছে জানতে চান যে তাদের ওষুধ দেওয়া হবে কিনা কারণ কেবল দরিদ্রদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মা বলেন—যে কেউ বিনা পয়সায় ওষুধ নিতে আসবে, তাকে গরিব বলেই জেনো। এ দাতব্য চিকিৎসালয়ের দরজা সকলের জন্যই খোলা থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারীদের তাঁর (শ্রীশ্রীমার) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেন। তিনি বলেন—জয়রামবাটীতে পরিচিত অপরিচিত সকলকেই মা কী অক্লান্তভাবে সেবা করেন! ... সংসারে আদর্শজীবন যাপনের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। নানাবিধ কর্মের ভিতরও তিনি কী নিরাসক্ত!

কলকাতার মানুষ মাকে দেখার জন্য ভিড় করে থাকত। একবার তাদের একজন মার উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন—কত ছেলে-মেয়েই তো তোমাকে মা মা বলে বিরক্ত করে কিন্তু তারা তো কেউ তোমার নিজের সন্তান নয়। এ কথায় গম্ভীরভাবে মা বললেন—তারা আমার গর্ভের সন্তান নয় একথাই বলতে চাও? তারা যদি আমার নয় তাহলে তারা কার? বলতে পার এখানে এমন কে আছে যে আমার সন্তান নয়?

মা উঁচু-নিচু ধনী-দরিদ্র চোর-সাধু নির্বিশেষে সকলকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। এমন কি তিনি বলতেন যে, তিনি পশু পাখি, পতঙ্গেরও মা। শ্রীশ্রীমা কখনও কোনও জিনিসের অপচয় হতে দিতেন না, যেমন তরকারির খোসাগুলি দিতেন গরুকে, যা গরুকে দেওয়া যেত না তা দিতেন কুকুরকে, যা কুকুরকে দেওয়া যেত না, তা দিতেন পুকুরের মাছকে। তিনি মানুষকে বলতেন সংযম অভ্যাস করতে। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে বলতেন। শ্রীমা বলতেন—মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক মানুষটি চেনা যায়। একজন মানুষের কাজ করার ধরন দেখেই তার চরিত্র বোঝা যায়। তিনি বলতেন সংসারে থাকা মানে খালি স্থান কাল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলা।

যখন তুঁতে ডাকাতরা তাঁর ভক্তে পরিণত হল তিনি তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন যদিও স্থানীয় লোকেরা তাদের ভয় পেত। মা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের দারিদ্র্যই তাদের এমন দুষ্কর্মের পথে ঠেলে দিয়েছে। তিনি ডাকাতদের খাদ্য-বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতেন। এদের একজন ছিল আমজাদ যে প্রায়ই জেলে যেত। একবার সে অনেকদিন পর মার কাছে এলে মা জানতে চাইলেন সে কোথায় ছিল। সে বলল সে গরু চুরি করে জেলে গিয়েছিল। মা তক্ষুনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন—তাই তো ভাবছিলুম, আমজাদ আসে না কেন।

তিনি বলতেন—সংসারী জীব কত কষ্টই না পায়। দেখি, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোনও কষ্ট পাচ্ছে না, তিনিই পাচ্ছেন। তাই তো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিসে তাঁকেই করি।

শ্রীশ্রীমা যা কিছু পেতেন তা অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। নিজের বলে কোনও কিছু রাখতেন না। বস্তুত তাঁর নিজের বলতে কোনও কিছুই ছিল না। তাঁর দেহ-মন-শক্তি সবই ছিল অন্যের জন্য এবং সকলের মধ্যে প্রকাশিত ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক আদর্শ।

শ্রীশ্রীমা বলতেন—আমি কি করে ঘুমাই? আমার মনে হয় সে সময়টুকু জপ করলে কাজে দেবে। সংসারের মঙ্গল হবে। কত সময় আমি মনে মনে বলি—যদি এই ক্ষুদ্র শরীরের পরিবর্তে একটা বিশাল শরীর পেতাম, মানুষের কত কাজেই না লাগতাম!

শ্রীসারদা দেবীর দীন-দুঃখীর ভিতর দিয়ে ঠাকুরের সেবা আজও অব্যাহত। মানুষকে তাঁর উপদেশের মধ্য দিয়ে উৎসাহিত ও নিরাময় করে—যারা তাঁর উপদেশ ও জীবনী পড়েন ও যাদের তিনি আজও দেখা দেন, অগণিত ভক্ত শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তিনি আজকেও সর্বত্র সেবা করে চলেছেন।

বছর কয়েক আগে লক্ষ্ণৌ-এ যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন মন্দির ও হাসপাতাল, সেখানে এক মজুরের স্ত্রী তার মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে আসে। মেয়েটির মুখে দগ্‌দগে ঘা। একজন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার ওষুধ দিলেন কিন্তু তাতে ঘা আরও বেড়ে গেল। অন্য ডাক্তারেরাও তাকে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি চিকিৎসা করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু কোনও ফল হল না। শেষকালে হতাশ হয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল।

সপ্তাহ দুয়েক পরে মজুরের স্ত্রী একদিন হাসিমুখে এসে হাজির। তার মেয়ের মুখের ক্ষত সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছে। কেমন করে হল? সে বলতে বলতে আনন্দে কেঁদে ফেলল। "অবাক কাণ্ড। আল্লার কৃপা। শেষবার হাসপাতাল থেকে কাঁদতে কাঁদতে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলুম। সেইদিন রাত্রিবেলায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখলাম যে শ্রীশ্রীমা আমার কাছে এসে কাঁদতে বারণ করছেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে আমার মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে যদি রোজ সে কোরাণের নির্দিষ্ট একটি পঙ্‌ক্তি বলতে বলতে জল খায়। মা নিজে সে পঙ্‌ক্তিটি বলে দিলেন। আমি সকালে উঠে তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। দিনে দিনে ক্ষত সেরে গেল।"

যুগজননী শ্রীমা

এই শতকের মেয়ে ও মা সারদামণি

অনিতা অগ্নিহোত্রী

মা সারদামণির যে একটি মাত্র ছবি আমরা সাধারণত দেখে থাকি, তাতে কোলের উপর জড়ো করা দুহাত, কঙ্কণ পরা, সাদা থানের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে এসে পড়া চুলের রাশি, এমন এক নারীর। সমস্ত অবয়বে, মুখে এমন এক শমতা আর সংহৃতি আছে যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে দীর্ঘসময়। দেবত্ব বা অলৌকিকত্বের কোনও ইশারা নয়, স্নেহে ভালোবাসায় ত্যাগে একজন মানবীর হাজার হাজার মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার আকুলতা ছবিটির মধ্যে স্থির হয়ে আছে। সারদামণি একজন শাশ্বত ভারতীয় নারী ও মা। শাশ্বত বলেই একশো বছর আগে মানুষের ভালোত্ব-মন্দত্ব অথবা জাত-পাত নিয়ে তাঁর নির্বিকারত্ব আশ্চর্য ঠেকত, আবার শাশ্বত বলেই আজকের সময়ে তাঁকে দূরের কোনও নক্ষত্র বলে মনে হয় না।

একুশ শতকের মেয়ে উনিশ বা বিশ শতাব্দীর মেয়ের চেয়ে কিসে আলাদা? জীবনযাপনেব ভঙ্গি, ভোগের সরঞ্জাম, নিত্য-নতুন টেকনোলজি, উদ্দাম গতি, নতুন নতুন জীবিকা এসব হল বাইরে থেকে দেখতে পাওয়ার মতন বদল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বাহ্যিক এইসব শর্ত বদলে যাবেই। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের মতো ভারতও বদলেছে। কেবল তফাত এই যে ভারত কোনও একমাত্রিক সভ্যতা নয়, এখানে গ্রাম ও শহরের জীবন, পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের জীবনযাপন কোনওটাই পরস্পরের প্রতিলিপি নয়। কলকাতার কি মুম্বই-এর করপোরেট দফতরের কোনও সীনিয়ার ম্যানেজার যেমন একুশ শতকের নারী, মতিহারীতে সদ্যজন্মানো কন্যাসন্তানকে মুখে নুন দিয়ে হত্যা করতে বাধ্য হওয়া ফুলওয়ারী বা তেত্‌বীও তেমন এই শতকের। (করপোরেট নারীটির ভিতরেও কতখানি সংস্কার বা প্রথামুখীনতা লুকিয়ে আছে সেটাও দেখা দরকার)। আমাদের সংসারে ঢুকে পড়েছে অপর্যাপ্ত টেলিভিশন-উপচোনো ধ্বংস, হিংসা এবং যৌনতার মহোৎসব। খবরের কাগজ এবং পত্রপত্রিকাগুলিও পিছিয়ে নেই। আমাদের একদিকে বিনোদন অন্যদিকে বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন-লালিত আমাদেব খেলোয়াড়দল, আমাদের পূজা-অর্চনা, আমাদের সমস্ত কেনাকাটা ও সংসারপালন। একই সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি জাতপাতে, মাদুলি-কবচে, মানতে, শিকড়-বাকড়ে, যৌতুকে, বধূনির্যাতনে এবং সর্বোপরি পুরুষজাতকের শ্রেষ্ঠত্বে। সেইজন্য আমাদের সরণিসমূহ জুড়ে কেবলি গজিয়ে ওঠে সোনা হীরে জহরতের দোকান, (তারই সামনে ফুটপাথে অন্ধকারে অনাহারে ঘুমাতে যায় পথশিশু ও তার মা), জ্যোতিষী ও গ্রহরত্নের শো রুম, কন্যা-ভ্রূণ ধ্বংসকারী ক্লিনিক, যার পাশে নতুন মডেলের গাড়ি, কুকিং রেঞ্জ, ইলেক্ট্রনিক্‌স্ সরঞ্জামের দোকানপত্র সুন্দরভাবে সহাবস্থান করে। উনিশের শতকে বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিধবাকে বঞ্চিত করে রাখা বা বিধবাকে দাহ না করতে পারলে নিদেনপক্ষে কাশী

বাসিনী করা, অরক্ষণীয়া কন্যার বাপকে সমাজচ্যুত করা—এসবের মধ্যে মূঢ়তা ছিল। কিন্তু দ্বিচারিতা ছিল না। এখন অ্যালেনসলির পোশাক আর বিপত্তারিণী ব্রতের লালসুতোর সহাবস্থানের মধ্যে ভণ্ডামি আছে, রাস্তায় সামাজিক সংগঠন করে ঘরে নাবালিকা পরিচারিকাকে দিয়ে রাঁধানোর মধ্যেও সেই একই ভণ্ডামি।

এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যে ঘেরা ক্ষয় ও পতনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনের কাছে। অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে আছে মানুষ, আগের চেয়ে ভালো খাচ্ছে-পরছে, বাস-ট্রামের বদলে গাড়ি চড়ছে, কিন্তু প্রসন্নতায় পূর্ণ কি তাদের মন? হৃদয়ে শান্তি আছে কি? তারা কি নিষ্ঠার সঙ্গে করছে নিজের কাজটুকু? তারা কি অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম? তারা কি নিজেদের চেয়ে দুর্বলতর, দরিদ্রতর মানুষের জন্য ভাবে? তাদের পরমায়ুর কোনও অংশ কি তারা নিয়োজিত করছে সাধারণ মানুষের কল্যাণের কাজে?

সমস্ত দেশে সর্বকালেই জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত দার্শনিকরা জন্মান, তাঁরা জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশ। তাঁদের হাতেই সর্বকালে সাধিত হয় পরিবর্তন—মানবসভ্যতার। কিন্তু যে-কোনও দেশেরই বৃহৎ জনসমষ্টি যদি প্রসন্নতা, প্রেরণা অথবা কাজের আদর্শরহিত হয়, তবে সেই দেশ বা সমাজ পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য। সেখানে পরিবর্তনের কাজও হয়ে পড়ে দুঃসাধ্য। ভারতের সর্বত্র জনাকীর্ণ, অপরিষ্কার স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষকবর্জিত ভাঙাচোরা স্কুলগুলি, পানীয় জলের ভাঙা কল, বন্ধ কারখানা, আর সংরক্ষণের অভাবে জীর্ণ পথঘাট, সৌধ দেখলে অন্তঃসারশূন্য, অনুপ্রেবণাহীন সভ্যতাব সামগ্রিক চেহারাটা প্রকট হয়ে ওঠে। তখনই মনে হতে থাকে, আমাদেব সবই আছে বহিরঙ্গে, কিন্তু হৃদয় নেই, নেই নিজেকে, নিজের আত্মীয়-পরিজনকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষকে ভালোবাসার, করুণা ও স্নেহে ভরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। স্বামী প্রেমানন্দ চিঠিতে একজনকে লিখছেন, "তোরা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরিত্র অনুকরণ কর না। তিনি ত এখনও জীবিতা রয়েছেন।... ফটোতে ত' মা কত স্থানে ভোগ খাচ্ছেন কিন্তু তাঁর ঐ বেতো শরীরে, নিজে কাহারও সেবা নিচ্ছেন না। পরিচিত হউক আর অপরিচিত হউক, যে কেউ দেশে তাঁর কাছে যাচ্ছে তাকে কত যত্ন, কত সেবা! দেশে নিজে রাঁধেন, জল তোলেন, এমনকি ভক্তদের জন্য কোথায় ভালো দুধ, ভালো আনাজ, আহা, তার জন্য এক মাইল পর্যন্ত খুঁজে মা নিজে নিয়ে আসেন। ভক্ত প্রসাদ পেয়ে গেল, বাড়িতে ঝি চাকর বাসন মাজবার কেউ নেই, তার হুঁস নেই, শ্রীমা নিজে তাদের লুকিয়ে সক্‌ড়ি পাড়ছেন।" "মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট কচ্ছেন, গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য্য—অপরিসীম করুণা—সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য।"[১]

প্রেমানন্দ অন্যত্র লিখেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু মার—বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! "দেখছ না কত লোক সব ছুটে আসছে। যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে—সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন।... আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন! আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখ্‌ছি? অদ্ভুত অদ্ভুত!! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন—সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন—আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে!"

মা সারদামণির মূলশিক্ষাগুলির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব, তার মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই, আছে সংহত, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের মন্ত্র।

সারদামণি বলতেন—"শ, ষ, স—যে সয়, সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।" নিজের

দুঃখকষ্টের জন্য মা কখনও অন্যকে দোষ দিতেন না। স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেন : "শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এমনই ছিল যে, তাকে একাধারে ভগবদ্ উপাসনার স্থান—মন্দির, সুশিক্ষার প্রতিষ্ঠান—বিদ্যালয়, দীন-আর্ত সেবার আশ্রম এবং নিরাশ্রয় রোগীর হাসপাতাল বলা চলে।"

"স্বার্থৈকদৃষ্টি পরস্পর দ্বন্দ্বপরায়ণ দুঃখী অশান্ত সন্তানগণকে সুখশান্তির পথ, পরস্পর মিলেমিশে থাকার শিক্ষা দেওয়ার জন্য জগজ্জননীর দেহধারণ, কঠোর তপশ্চারণ এবং আত্মদান। লীলাসংবরণের পূর্ব মুহূর্তে জনৈকা কন্যাকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর শেষ উপদেশ উচ্চারণ করেছিলেন : "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

মায়ের শিক্ষা দেওয়ার ধরনটি ছিল অদ্বিতীয়। "স্নেহের ভিতর দিয়ে শিক্ষা।... কোনও ভর্ৎসনা না করে, 'আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি' এই অভিমান না নিয়ে, কোনও বড়ো বড়ো দার্শনিক কথা না বলে শুধু 'আমি তোমাদের মা', এই ভাব নিয়ে তিনি সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন।"[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর শ্রীমা যেমন একদিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছেন, তেমনই নারী জাগরণের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন—নিজের আদর্শ দিয়ে এবং চেষ্টা দিয়েও।

নারীর উন্নতি ও শিক্ষার বিষয়ে শ্রীমায়ের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। "লেখাপড়া শিখলে, কাজকর্ম শিখলে নিজেরাও সুখে থাকবে, অপরকেও সুখী রাখতে পারবে তাদের উপকার করে।" নিবেদিতাকে যেমন স্নেহ করতেন মা, তাঁর স্কুলের প্রতিও স্নেহদৃষ্টি ছিল তাঁর।

"শ্রীরূপিণী সারদা সর্বক্ষণ আমাদের বিশৃঙ্খলা থেকে ছন্দের গতিপথে, বিষমা থেকে সুষমার চর্যায়, অসুন্দর থেকে সুন্দরের মননে, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের নিত্য প্রেরণা। .. এই শ্রীরূপিণী ঐশ্বর্যে ও লাবণ্যে পূর্ণা কিন্তু কখনই বহির্বৈভবে অতিরঞ্জিতা নন।"[৩]

স্বামীজী বলেছেন, 'আর্টও ধর্মের একটা অঙ্গ'। জীবনযাপনের মধ্যে কারুশিল্পের চেতনা জীবনকে সুন্দর করে ও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর প্রতি মমতা বাড়ায়। এর ফলেই ভোগসর্বস্ব জীবনের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের আলো এসে পড়া সম্ভব।

ঠাকুরের ব্যবহার না করা, শিকের জন্য আনা, ফেঁসো দিয়ে বালিশ তৈরি করেছেন সারদা-মা। পশমের ছোটো পাখা বানিয়ে দিয়েছেন নিবেদিতাকে। অতি সাধারণ বিষয়েও সুষমা ও যত্নের প্রাচুর্য্য থাকত তাঁর কাজে। পাতা ভালো করে ধোয়া-মোছা হয়নি ভক্তদের জন্য। পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করে আসন পাতা হয়নি। সংশোধন করে তিনি নিশ্চিন্ত। সারদা দেবী নিত্য শিল্পেরও আদর্শ। একজন ঝাঁট দেওয়ার পর ঝাঁটাটি অবহেলা ভরে ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দিলেন। মা সারদা বলে উঠলেন—"ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোটো জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই রাখে।... তাছাড়া, এ সংসারে ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়।... সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।"

সামান্য কাজটি শ্রদ্ধার সঙ্গে করলে আজ আমাদের দেশ ও সভ্যতার চেহারা বদলে যেত।

"রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ—এই ত্রয়ী এক মহাবিপ্লবের প্রতীক। এঁদের বিপ্লবে চাঞ্চল্য নাই, গতির চমক নাই।...নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলেছে—মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে

মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হল বিপ্লবের প্রকৃতি"—বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কথায়।

সারদা দেবীর যুক্তিনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামী সোমেশ্বরানন্দ বলেছেন, মায়ের যুক্তিনিষ্ঠাই ছিল তাঁর সমাজচেতনার ভিত্তি।

তাঁর জীবন অনুধাবন করার চেষ্টা করলে আমরা দেখি, জ্ঞানের প্রতি মায়ের ছিল গভীর অনুরাগ যদিও স্কুল-কলেজের ডিগ্রি ছিল না। এই শতকের নারী যদি স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষিণী বলে নিজেকে মনে করেন, তবে দেখবেন, দক্ষিণেশ্বরে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে অবলুপ্ত করে, অসাধারণ পতিনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেও, শ্রীমা দেখিয়েছিলেন তিনি একজন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নারী। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই এই স্বাতন্ত্র্য উদ্‌ভাসিত। এখানে মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবদ্দশাতেই অবতার বলে পূজিত হতেন। এমন বিরাটত্বের সামনে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্তঃপুরচারিণী সারদা মায়ের এই স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ অতি সামান্য শক্তির প্রকাশ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর বহু সমস্যা সারদা মা যুক্তির সাহায্যে সমাধান করেছেন। স্বামীজীর মতকে খণ্ডন করতেও তাঁর বাধেনি। কেবল স্বামী বিবেকানন্দ নন, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যরা সকলেই মায়ের প্রখর বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, প্রশাসনিক বিচারবোধের জন্য তাঁকে সঙ্ঘজননী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে দেশাচারের নানা খুঁটিনাটি, পীড়নকারী আচার-বিচাবকে এড়িয়ে শুদ্ধজীবন-যাপনের পদ্ধতিটিও তাঁর নিজস্ব ছিল। বিধবাদের আচার আচরণ নিয়ে বলতে পেরেছিলেন, "ঐসব খুঁটিনাটি নিযে মনকে বিচলিত করবে না। যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তা-ই করবে।" দেশজ আচারকে তুচ্ছ করে স্বামীজীকে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি মা-ই দিয়েছিলেন। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ লিখেছেন, "যেসব হিন্দু সেযুগে সমুদ্রযাত্রা করত, ফিরে এলে তাদের একঘরে করা হত।... যেখানে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্যক্তিও বলেছিলেন, সন্ন্যাসী হয়ে ম্লেচ্ছদেশে যাওয়া উচিত নয়, সেখানে মা গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণী হয়েও স্বামীজীকে আমেরিকা যেতে অনুমতি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন..."

আমরা, একবিংশ শতাব্দীর মেয়েরা, বস্তুজাগতিক অর্থে অনেকটা অগ্রসর হয়েছি কিন্তু সত্যিই কতটা যুক্তিনিষ্ঠতা আমাদের করায়ত্ত হয়েছে? অব্রাহ্মণের পাতা পরিষ্কার করতে, ভিন্ন জাতির অন্ন খেতে সারদামণি সেযুগেও সংকোচ করেননি। "শুদ্দুর কে গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কি?" গোলাপ-মাকে সারদামণি বলেছিলেন। সমাজের তথাকথিত শ্রেণীবিহীনদের পারস্পরিক ভালোবাসার মর্মোদ্ধার করতে তাঁর কোনও কষ্ট হয়নি। উপপত্নী সেবারত সমাজবহির্ভূত মানুষ, ডোমের মেয়ের উপপতিব প্রতি টান—মাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিল। একই সঙ্গে আবেগসর্বস্বতা পরিহার করে ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে শক্তি ও উদ্যমকে সংহত করার শিক্ষা ছিল মা সারদামণির। ভাবাবেগের মত্ততা মানুষকে খর্ব করে বলে সমস্ত জীবন শান্ত, ধীর, স্থির ও নিজেকে পরার্থে নিবেদনের আদর্শস্থাপন করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর ছেঁড়া কাপড় গিঁট দিয়ে পরে, পুকুরের শাক তুলে চরমদারিদ্র্যে যিনি দিন কাটিয়েছেন অথচ বিপুল আত্মসম্মানবশত কারও কাছে হাত পাতেননি, তিনিই পরবর্তী জীবনে বিরাট রামকৃষ্ণসঙ্ঘের মা হয়ে একের পর এক সিদ্ধান্তে নিঃশব্দে চালনা করেছেন সকল সদস্যকে।

আজ এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর, তাঁর জীবনের দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই তোমার দিকে চেয়ে। মুক্ত, সভ্য, সাম্যবাদী পৃথিবীর শাশ্বতমন্ত্র তোমারই কাছে আছে।

বর্তমান পাশ্চাত্যে শ্রীশ্রীমার প্রাসঙ্গিকতা

স্বামী বিবেকানন্দের গোঁড়ামি ছিল। কথাটি শুনে অসংখ্য মানুষ বিস্মিত ক্ষুব্ধ হবেন, বিশেষ করে যাঁবা স্বামীজীর ভক্ত, অনুবাগী, তাঁব জীবন ও বাণীব সঙ্গে পবিচিত, তাঁর অনুধ্যান কবেন। কিন্তু এই কথাটি আমার নয়। স্বামীজীব নিজের স্বীকৃতি। প্রমাণ অকাট্য! স্বামীজীব একটি বহুপঠিত চিঠি। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন ১৮৯৪ সালে, আমেরিকা থেকে স্বামী শিবানন্দকে। তিনি লেখেন, "দাদা, মাযেব কথা মনে পডলে সময সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ওই যে বলছি, ঐ খানটায আমাব গোঁডামি।"[১] ওই চিঠিতেই তিনি 'জ্যান্ত দুর্গা'র জন্য জমি কিনে তাঁকে বসিয়ে দেবার জন্য জোব দিয়েছিলেন। হলে তিনি 'একবাব হাঁপ ছাডবেন।' সেই 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীমা সারদার কথা তখন খুব কম লোকই জানতেন, বুঝতেন। সত্যিই জানতেন এমন মানুষের সংখ্যা তো তখন প্রায় নগণ্য। স্বামীজীই প্রথম শ্রীমাকে সত্যিই চিনতে পেরেছিলেন। এই চিঠিটিকে স্বামীজীর একটি 'দুর্দমনীয় জেদ' (stubborn obstinacy) বললে খুব ভুল হবে না। কী সেই 'গোঁড়ামি' বা জেদ? সেটি হল মাতৃশক্তি। শ্রীমা ও 'মহাশক্তি' স্বামীজীর দৃষ্টিতে ছিলেন অভিন্ন। আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের শক্তির ও জাগতিক সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ 'শক্তির পূজা' অর্থাৎ নারীর স্বীকৃতি ও সম্মান বলে তিনি মনে করেছিলেন। পক্ষান্তরে ভাবতবর্ষের শক্তিহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ শক্তির (নারীর) অবমাননা বলে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। 'মাঠাকুরানী' সারদার আবির্ভাব ভারতে সেই মহাশক্তির জাগরণের সূচনা করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

মহাপ্রয়াণের অল্পকিছুকাল পূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (সন ১৩০৯) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এ স্বামীজী ইউরোপে শক্তিপূজা প্রসঙ্গে লেখেন : "প্রটেস্ট্যান্ট তো ইউরোপে নগণ্য—ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে-ধর্মে জিহোবা যিশু ত্রিমূর্তি—সব অন্তর্ধান, জেগে বসেছেন 'মা'! শিশু-যিশু-কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা' 'মা'।... 'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী'—দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে। আর মেয়ের পুজো। এ শক্তিপুজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপুজো কুমারী-সধবা-পুজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ কল্পনা নয়—সেই শক্তিপুজো। তবে আমাদের পুজো ওই তীর্থস্থানেই, সেই ক্ষণমাত্র, এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর-খাতির।"[২] 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' একশো বছর আগে

স্বামীজী লিখেছিলেন। তারপর দুটো মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। সারা বিশ্বে বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম-চিন্তা এবং দর্শনে অভূতপূর্ব অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে।

স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই সময় জন্মেছিলেন। দুবছর আগে-পরে—রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১-তে, স্বামীজী ১৮৬৩-তে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘায়ু হন। তাঁর প্রয়াণ ১৯৪১। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্বামীজী অত্যন্ত স্বল্পায়ু, তাঁর মহাপ্রয়াণ ১৯০২। মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে লিখেছিলেন, 'সভ্যতার সঙ্কট'। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর সব আশা-ভরসা-প্রত্যাশা ভেঙে গিয়েছিল শেষ জীবনে। তিনি সেই হতাশা বেদনা ব্যক্ত করেছিলেন। প্রশ্ন জাগে, স্বামীজী যদি আজকের পাশ্চাত্য তথা বিশ্বকে দেখতেন তাহলে তাঁর কী মনে হত? তিনিও কি তাঁর হতাশা ব্যক্ত করতেন? পাশ্চাত্যে শক্তিপূজার কী রূপ দেখতেন? এই প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেই প্রসঙ্গেই আমাদের বিশেষভাবে মনে হয় শ্রীমার কথা, বর্তমান পাশ্চাত্যে তাঁর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ, দৃশ্যত ও অদৃশ্য প্রভাবের প্রসঙ্গটির বিচার-বিশ্লেষণ।

যিশুখ্রিষ্টের প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রায় ভক্তির পর্যায়ে গিয়েছিল। ইউরোপ ভ্রমণকালে মাতা মেরীর মূর্তির পদতলে তিনি শ্রদ্ধাভরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন। বিবেকানন্দের কাছে মাতা মেরী ছিলেন, ঐশ্বরিক জননীর দিব্যপ্রতিমা। তিনি বলেছিলেন, "যীশুর সমকালে আমি যদি প্যালেস্টাইনে থাকতাম, তাহলে অশ্রুধারায় নয়, আপন রক্তের অর্ঘ্যে তাঁর চরণযুগল নিষিক্ত করতাম।"[৩] শ্রীমা বাইবেল পড়েননি। মাতা মেরী, যিশু ও খ্রিষ্টধর্মের তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল না। পাশ্চাত্য জগৎ ও জীবন তাঁর অপরিচিত ছিল কিন্তু তাঁর মাতৃভাব, বিশ্বমাতৃত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছিল মাতা মেরী, যিশু ও খ্রিষ্টীয় উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধায়। নিবেদিতার ইচ্ছানুসারে একজন সন্ন্যাসী মাকে মাতা মেরীর গান পড়ে শুনিয়েছিলেন। শ্রীমা তা গভীরভাবে উপভোগ করেছিলেন। অপরিচিত ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে ওই প্রথম পরিচয়ে তার মর্মকথা উপলব্ধি করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এক ইস্টার উৎসব-দিনে শ্রীমা নিবেদিতার বাড়ি গিয়েছিলেন। সঙ্গিনীদের সঙ্গে সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখার পর ঠাকুরঘরে বসে খ্রিষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য শোনার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন। তখন একটি ছোটো ফরাসী অর্গানযোগে ইস্টারের গান হল। খ্রিষ্টের পুনরুত্থান-স্তোত্র মাকে শোনানো হল। শ্রীমার কাছে ওই বিদেশি স্তোত্র ও গান অজ্ঞাত হলেও তিনি তার মর্ম ও গভীর ভাব অনুভব ও প্রকাশ করে উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করলেন। নিবেদিতা ওই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, সেই প্রথম "আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অসন্দিগ্ধভাবে উন্মোচিত হলো—সারদা দেবীর ধর্মসংস্কৃতির মহিমা কি বিরাট।"[৪]

আর একদিনের কথা। নিবেদিতা ও সিস্টার কৃস্টিনের সঙ্গে তাঁর সহজাত হাসিখুশি মনে গল্প করতে করতে শ্রীমা খ্রিষ্টীয় মতে বর, কনে, বিবাহের পুরোহিত, বিবাহের মন্ত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন। নিবেদিতা ও সিস্টার কৃস্টিন খ্রিষ্টান বিবাহের রীতি-পদ্ধতি বললেন। মা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন। বিবাহের শপথ—স্বামী-স্ত্রীর শপথ শুনে শ্রীমার যে ভাবোদয় হল তা দেখে নিবেদিতা ও কৃস্টিন বিস্মিত হলেন। নিবেদিতা বলেছেন, 'মা'র ওই প্রতিক্রিয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। এই শপথটি হল : "সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শক্তিতে-অশক্তিতে, যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে।" শপথবাক্য

শুনে শ্রীমার মুখ পরিতৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কথাগুলি তিনি বারবার শুনতে চাইলেন। বললেন, "কী অপূর্ব ধর্মকথা, কী অপূর্ব ধর্মকথা।"[৫]

খ্রিষ্টান বিবাহরীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে শ্রীমার কোনও ধ্যানধারণা ছিল না। খ্রিষ্টানবিবাহ ('চার্চ ম্যারেজ') দেখার সুযোগ তাঁর হয়নি। হিন্দু বিবাহপদ্ধতি, রীতি, স্ত্রী-আচার, হিন্দু বিবাহের মন্ত্র ও খ্রিষ্টান বিবাহের 'শপথে'র মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বহু পার্থক্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টান বিবাহ-শপথ শুনে মা কেন ভাবাবিষ্ট বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন? প্রশ্নটি আমরা গভীরভাবে ভেবে দেখিনি। কিন্তু তা ভেবে দেখার, উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। বর্তমান পাশ্চাত্যে (এবং আমাদের) সামাজিক জীবন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, নারীর অধিকার ও নারী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে একটি চিরন্তন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (socio-religious institution) রূপে বিবাহের স্বীকৃতি, বিবাহের প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠেছে। বিবাহপ্রথাই একটি প্রাচীন অপ্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কার বলে অনেকেই মনে করছেন। এই নিয়ে প্রকাশ্যে লেখালেখি ও বিতর্ক হচ্ছে। বিবাহকে একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে 'চুক্তিপত্র' (contract) মাত্র বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'কী প্রয়োজন' এই চুক্তিপত্রের? 'বিবাহ' তো একটি শৃঙ্খল—বন্ধন! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর, বিরোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, নির্ভরতা, বিশ্বাসের অভাব যদি হয় তাহলে ওই চুক্তিপত্রের অর্থ কী? দৈহিক সম্পর্কেরও তৃপ্তি যদি না হয়, অন্য স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি যদি একজন বা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আকৃষ্ট হয় তাহলে কেন সহজেই নিজের ইচ্ছামতো সঙ্গীর সঙ্গে ঘর বাঁধা যাবে না? এ তো ব্যক্তি-অধিকার। সমাজ, চার্চ বা আইন-আদালত সেই অধিকার কেন খর্ব করবে? কী প্রয়োজন ওই ঝামেলার? তার থেকে অনেক বেশি সহজ পথ হল—বিবাহ না করে একটি পুরুষ ও একটি নারী যতদিন ইচ্ছা হবে একসঙ্গে বাস করবে। ইংরেজিতে যার নাম হল 'Living Together', বিবাহ না করে বিবাহিত জীবনের সব সুখ, পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় এই ব্যবস্থায়। সন্তান চাই কি না-চাই তা দুজনেই স্থির করবে। সন্তানের জন্মের পূর্বে বা পরে বিবাহ না হলেও কোনও ক্ষতি নেই। পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজন নেই। আইনের দৃষ্টিতে 'Living Together' সম্পূর্ণ সিদ্ধ। সামাজিক বাধাও নেই। সনাতন 'বিবাহ' পদ্ধতি, বিবাহবন্ধনের পবিত্রতায় বিশ্বাসীরা অবশ্য এই 'সহাবস্থান'-প্রথার বিরোধী। ধর্মীয় সংস্থান ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষও এর বিরোধী। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে এখনও পাশ্চাত্য দেশের বেশির ভাগ মানুষ বিবাহপ্রথায় বিশ্বাস করেন। তবু বিবাহবন্ধনের বাইরে নারী-পুরুষের সহাবস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে। অসংখ্য Single mother (অর্থাৎ স্বামী/সঙ্গীহীন হয়ে এক বা একাধিক সন্তান পালন করছেন এমন মা) রয়েছেন। অবশ্য Single parent অর্থাৎ একটি পুরুষ সন্তান পালন করছে এমন ঘটনাও কম নয়। এর ফলে ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খল, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি, একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাংসারিক সুখ-শান্তির অভাবে শুধু একটি পুরুষ, একটি নারী ও তাদের সন্তানরাই নয়, সমগ্র সমাজ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ছে। তার প্রতিফলন ঘটছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্য জগতের এ এক বিরাট সমস্যা। সেই সমস্যা ক্রমেই গভীরতর, জটিলতর হচ্ছে। এই বিপর্যস্ত ব্যক্তি, পারিবারিক ও সমাজ জীবনের মধ্যে কিন্তু একটি মূর্তির প্রয়োজন ও অভাব সবাই বোধ

করছে। সেটি হল স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি। সন্তান-সন্ততিদের নিদারুণ সমস্যা ও সঙ্কটের মধ্যে তাদের লালন-পালন করছে মায়েরা। সব-কিছু ত্যাগ করে, নিজের জীবিকা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা—সব-কিছু ত্যাগ করে ছেলেমেয়েকে মানুষ করছে এমন বরাভয় মাতৃমূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা পাশ্চাত্যের সর্বত্র।

আধুনিক যুগের এই জটিল বিতর্কিত বিষয়টির সঙ্গে শ্রীমার জীবনের ও দৃষ্টান্তের কী সম্পর্ক তা দুর্বোধ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ওই বিশ্লেষণের পূর্বে খ্রিষ্টান মতে বিবাহের শপথ শুনে মার ভাবাবেশ প্রসঙ্গে ফিরে আসি। মার ওই মুহূর্তে সম্ভবত মনে পড়ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। যখন শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ হয় তখন মা এক পাঁচ-ছ বছরের শিশু, বালিকামাত্র। বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন, পতি-পত্নীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। বিবাহের মন্ত্রপাঠ, তার অর্থ বোঝার প্রশ্ন ছিল না কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তাঁর পাত্রী নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ওই সারদাকে বেছে নিয়েছিলেন। বিবাহমন্ত্রের অর্থ তাঁর অবোধ্য ছিল না। কিন্তু মা সারদা তা বুঝেছিলেন ধীরে ধীরে। হিন্দু বিবাহের 'শপথ' মন্ত্র তিনি প্রকৃত অর্থে শুনেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, পালন করেছিলেন অক্ষরে অক্ষরে। সেই 'শপথ' মন্ত্রটি হল :

"ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

বর নববধূকে বলছেন, "তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, আর আমার এই হৃদয় তোমার হৃদয় হউক।"[৬] প্রসঙ্গত মনে পড়ছে একটি মিষ্টি মধুর কথা। বলেছিলেন শ্রীসারদা মঠ'-এর প্রথম অধ্যক্ষা, শ্রীমার স্নেহের 'কোলের মেয়ে', সেবিকা, ভগিনী নিবেদিতার স্কুলের ছাত্রী প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সরলা দেবী) : "একবার মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরসেবার ভার যাঁর ওপর ছিল তিনি দুপুর বেলায় শয়নের পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে তুলে মালা পরাবার সময় শ্রীশ্রীমায়ের মালা ঠাকুরকে ও ঠাকুরের মালা শ্রীশ্রীমাকে পরিয়ে ফেললেন। ব্যাপারটি ভারতীপ্রাণামাতাজীর কানে যাওয়ামাত্র তিনি সকৌতুকে বলে ওঠেন, "এই নিয়ে এত ভাবছ কেন গো? ওঁরা কি মালাবদল করেননি? জানবে ওঁদের মধ্যে কোনও ভেদ নেই।"[৭] শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মার 'মালাবদল' তাঁদের হৃদয়-বদলের শুধু নয়, সম্পূর্ণ এক অভিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রতীক ছিল। খ্রিষ্টান বিবাহের স্বামী-স্ত্রীর শপথের কথাগুলি শুনে শ্রীমার সেই অনির্বচনীয় মধুর, গভীরতম প্রেম ও ঐশ্বরিক দাম্পত্যজীবনের স্মৃতি মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে তাঁকে ভাবাবিষ্ট করেছিল।

এই ঘটনাটি 'ধান ভানতে শিবের গীত' নয়। আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনের জটিল সমস্যা ও সঙ্কটের বাস্তব চিত্র এবং সেই পটভূমিতে শ্রীমার জীবনচর্চার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করতে এটি একান্ত প্রয়োজন। তার আগে আর একটি ছোট্টো কাহিনি। একটি দিনের কথা। শ্রীমার কাছে অনেকে বসে আছেন। একজন যিশুখ্রিষ্টের কথা তুললেন। মা শুয়েছিলেন। যিশুর কথা ওঠায় উঠে বসে দুটি হাতজোড় করে যিশুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন, "নিবেদিতার কাছে যিশুখ্রিষ্টের কথা আমি অনেক শুনেছি। ওদের যে বই আছে 'বাইবেল' তা থেকে সে আমাকে যিশুর কত সুন্দর সুন্দর কথা পড়ে শুনিয়েছিল। আহা, জগতের লোককে উদ্ধার করতে এসে যিশুকে কত দুঃখ-কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে, তবু হাসিমুখে তিনি সব সহ্য করেছেন, সবাইকে ভালোবেসে অত অত্যাচারের

পরও নিঃশর্তে ক্ষমা করে গেছেন! নিজের শিষ্যই তো তাঁকে ধরিয়ে দিলে! আহা, হাতে পায়ে বুকে পেরেক বিঁধে কত যন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে তারা মারল। অত যন্ত্রণা, অত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও হাসিমুখে সবাইকে ক্ষমা করে গেলেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন তাদের অপরাধ না নেন। এই ভালোবাসা, এই সহ্যশক্তি, এই ক্ষমা—এ কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? ভগবান ছাড়া এরকম আর কে সহ্য করতে পারে? ভগবানই তো যিশুর রূপ ধরে এসে জগতকে প্রেমের শিক্ষা দিলেন।"[৮] এই মা-ই তো সকলের মা। যিশুরও মা, নরেন, রাখাল, শরতেরও মা। সন্তানের যন্ত্রণায় মা কাতর, সন্তানের আত্মত্যাগে তাঁর গর্ব। মাতা মেরী ও মা সারদা তো এখানে অভিন্ন মাতৃমূর্তি। সেই অনুভূতি হয়েছিল শ্রীমার আদুরে কন্যা নিবেদিতার। সুদূর আমেরিকা থেকে শ্রীমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, (১৯১০, ডিসেম্বর) :

> "আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম সারার জন্য (শ্রীমার পরমভক্ত স্নেহের পাত্রী মিসেস সারা বুল তখন গুরুতর অসুস্থ) প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই যিশুর মাতা মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালোবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা সবকিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম...সারার রোগের ঘরটিকে শান্তিতে আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমার পরশ...ভালোবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালোবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালোবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ করে, অমঙ্গল করে না কারো।"

অপূর্ব চিঠিটির শেষে নাম স্বাক্ষর করে লিখেছিলেন, "প্রিয়তমা মা, আমার, তোমার চিরকালের বোকা খুকি, নিবেদিতা।"[৯]

মার 'বোকা খুকি' যেমনভাবে তাঁর মাকে বুঝেছিল তেমনভাবে খুব কম মানুষই বুঝেছিল। যারা মাকে খুব কাছ থেকে দেখার, তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরাও মাতৃরূপী 'প্রহেলিকা' ভেদ করতে বিভ্রান্ত হতেন। বিস্ময়কর ছিল বিদেশিনী কন্যাদের প্রতি শ্রীমার গভীর ভালোবাসা। তাঁর অবিচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে ধরা পড়েছিলেন সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা বা কৃস্টিন ও লরা এফ. গ্লেন (দেবমাতা)। মিস ম্যাকলাউডকে মা আদর করে বলতেন 'জয়া'। শ্রীমা নিবেদিতাকে বলেছিলেন ধ্যানের সময় তিনি সারাকে তাঁর বামে ও জয়াকে তাঁর সামনে সারাক্ষণ দেখেছেন। দেবমাতা চলে যাওয়ার পর একটি চিঠিতে নিবেদিতা তাঁকে জানান :

"মা প্রায়ই তোমার কথা বলে থাকেন। প্রথম রাত্রে তোমার শূন্য স্থানটির দিকে গভীর ব্যথার সঙ্গে দেখালেন।" সারা বুলের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদে স্নেহময়ী মা গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার তাঁর খোঁজ নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অধীর হয়ে তাঁর স্নেহের কন্যা সারাকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি মায়ের হয়ে লিখে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। ওই ইংরেজি চিঠির শেষে মা বাংলায় মস্ত বড়ো আকারে 'মা' শব্দটি লিখে দিয়েছিলেন।[১০] অন্তিম যাত্রার পূর্বে শ্রীমার 'মা' স্বাক্ষরিত ওই চিঠি ছিল সারার পরম প্রাপ্তি, সান্ত্বনা। (সারা বুলের ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় শ্রীমার প্রথম ছবি তোলা হয়েছিল।)

ভগিনী দেবমাতা শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধি ব্যক্ত করে বলেছেন,

"শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে বাস করার দুর্লভ সৌভাগ্য যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা জেনেছেন ধর্ম কত মধুর, কত স্বাভাবিক, কত আনন্দময় সামগ্রী। তাঁরা জেনেছেন, সেই শুচিতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। তাঁরা জেনেছেন, পবিত্রতা যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ধরা দেয় এমন সুরভি-সুবাস, যা জড়বাদী স্বার্থপরতার কটু গন্ধ ও ক্লেদকে পরাভূত করে নিঃশেষে বিনষ্ট করে দেয়। করুণা, ভক্তি এবং ঈশ্বরানুভূতি—এই ছিল শ্রীমার সহজাত স্বভাব। কিন্তু এতই সহজ স্বাভাবিক ছিল যে, লোকের কাছে সেগুলি আলাদাভাবে ধরা পড়ত না।" শ্রীমা ও তাঁর বিদেশিনী কন্যাদের কাহিনি, মার অপার স্নেহ, জীবন্ত মাতৃমূর্তি কেমনভাবে তাঁদের জীবনকে প্রভাবিত, রূপান্তরিত করেছিল তা রূপকথার মতো শোনালেও ঐতিহাসিক সত্য। সে প্রায় এক শতাব্দীর পূর্বের কথা। সেই যুগ ও পরিবেশ হারিয়ে গেছে। সেই স্বপ্নরাজ্যের যুগ থেকে বর্তমানের কঠোর বাস্তব রাজ্যের মুখোমুখি হতে হবে।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় (১৮৯৩) ও তারপর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় এমন ঝড় তুলেছিলেন যে তাঁর পরিচিতি হয়েছিল 'The Cyclonic Monk'। মনে হয়েছিল, ব্যাপক প্রত্যাশা জেগেছিল যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আমেরিকা তথা সারা পাশ্চাত' জগতে বন্যার মতো ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, বৈদিক দর্শন ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্লাবন ঘটাবে। তা কিন্তু হয়নি নানান কারণে। এটি যিনি জানতেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন (৬ মার্চ, ১৮৯৫) :

"আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্মভাব জেগেছে, সবটাই উড়ে যাবে। সুতরাং চলে যাওয়ার আগেই কাজের ভিত্তিটা পাকা করে যেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না করে সম্পূর্ণ করা উচিত।" কিন্তু স্বামীজী বড্ড তাড়াতাড়ি সব কিছু ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় একজন স্বামীজীর আবির্ভাব হয়নি। তা হয়ও না।

অন্য একটি বাস্তব মেনে নিতে হবে। স্বামীজী পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমদৃষ্টি, আদান-প্রদানের কথা বলেছিলেন। সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতা বিরোধ-হানাহানির অবসান হয়ে নতুন যুগের সূচনা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের ধারা ভিন্ন পথে চলে; নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে স্বামীজী বা রবীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। স্বামীজী তা দেখে যাননি। রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে দেখেছিলেন, তাঁর হতাশা ও মর্মবেদনা ব্যক্ত করেছিলেন 'সভ্যতার সঙ্কট'-এ। এই পটভূমিতে পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রায়, ধ্যানধারণায়, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাবের বাস্তব চিত্রটি জানার চেষ্টা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা—দুজনের নাম একই সঙ্গে এসে পড়ে কারণ শ্রীমা যা কিছু বলেছেন, দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও নির্দেশে। মা বারবার বলেছেন তিনি ও ঠাকুর অভিন্ন, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও নির্দেশকে শ্রীমা তাঁর করুণা, মাতৃস্নেহে, ক্ষমায় সিক্ত করে সহজতর মধুরতর করেছিলেন।

শ্রীসারদা মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষা মোক্ষপ্রাণামাতাজী একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা অতি সহজভাবে বলেছেন, "বর্তমানযুগের যন্ত্রণাকাতর মানুষ ধারণাও করতে পারবেন না কী সে এক সর্ব-দোষ-মুক্ত স্বর্গীয় ভাবের আনন্দের আবেশ মার সন্তানদের মন ভরপুর করে রাখত।"[১১] সংসার-অনভিজ্ঞ সন্ন্যাসী হয়েও স্বামী বিবেকানন্দের দেশ-কাল-মানুষ সম্পর্কে

জ্ঞানের পরিধি, গভীরতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এবং শাণিত মন্তব্য ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে। স্বামীজীকে আমরা দেখিনি। কিন্তু কিছু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে যাঁদের কথায় ও লেখায় সেই স্ফুলিঙ্গ লক্ষ করি। তেমনি একজন হলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দ (প্রভু মহারাজ)। তিনি শ্রীমার দীক্ষিত সন্তান, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্ঘগুরু ছিলেন। 'শ্রীশ্রীমা ও নারীজাতির আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে, "পৃথিবীতে নারীজাতির দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট পবিবর্তন ঘটছে। পুরুষ ও স্ত্রীর প্রকৃতি ও ক্ষমতা আলাদা, সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও তাদের কাজ ভিন্ন, এই দৃঢ়মূল প্রাচীন ধারণাটিকে পাশ্চাত্য দেশের নারীরা ধূলিসাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে নারীরা প্রতিযোগিতা করছে। বহু ক্ষেত্রে তারা ওই প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। যদিও ওই সাফল্যে তাদের সুখ বেড়েছে কিনা বলা কঠিন। ভারতবর্ষেও নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে। নিছক পারিবারিক ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনকে সীমাবদ্ধ রেখে তারা আর তৃপ্ত নয়। কয়েকটি 'বৃহৎ ব্যতিক্রম' ছাড়া শত শত বছর ধরে গৃহই ছিল ভারতীয় নারীর কর্মকেন্দ্র। আজ আর তা নয়। নারী এখন পূর্ণতর জীবন যাপন করার দাবি করছে। এই দাবির স্বপক্ষে অনেক কিছু বলার আছে।" স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্বীকার করেছেন, "আমাদের সমাজে নারীদের স্থান আদৌ সন্তোষজনক নয়।" বিবিধ কর্মক্ষেত্রে নারীদের যোগদান বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মেনে নিয়েছেন।[১২] এত কম, সহজ সরল স্পষ্ট কথায় বর্তমান যুগের নারীর মনের ক্ষোভ, দাবি ও প্রতিবাদের মূল কারণ ও বক্তব্যটি এক সন্ন্যাসী উপলব্ধি করে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন তা বিরল। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি নারীর অধিকার ও প্রতিবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু সতর্কতার প্রয়োজনের কথাও বলেছেন। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে 'নারীচরিত্রের মহনীয় বৈশিষ্ট্য', 'ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন উত্তরাধিকার' তারা যেন হারিয়ে না ফেলে। তার মধ্যে অন্যতম হল বিবাহ। 'বিবাহ আত্মায় আত্মায় যোগের প্রতীক', শুধু শারীরিক সম্বন্ধ নয়। এই জন্যই "বিবাহবন্ধন এত পবিত্র...দৈহিক প্রীতির উদ্দেশ্য একটি স্থায়িতর, গভীরতর ভালোবাসা—আত্মিক সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বুদ্ধ করা।" দৈহিক ভালোবাসা 'যেন মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ'। দৈহিক ভালোবাসাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই 'মূলমন্দিরের দ্বারে' উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু এমন বিশুদ্ধাত্মা নর-নারী আছেন, যাঁদের বহিঃপ্রাঙ্গণে অপেক্ষা করতে হয় না। প্রথম থেকেই সরাসরি পূজা স্থানে প্রবেশ করেন। 'আত্মিক মিলন' ছাড়া তাঁরা অন্য কিছু কল্পনাও করতে পারেন না। যেমন আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমার ক্ষেত্রে।[১৩]

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ দৈহিক সম্পর্কযুক্ত প্রেমকে বিবাহ বন্ধনের প্রাথমিক পর্যায় এবং পরবর্তী উন্নততর কামশূন্য দাম্পত্য-জীবনকে সুন্দরতম মহত্তম 'আত্মিক সম্মিলন' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের দাম্পত্য জীবন, বিবাহ, সন্তানের জন্ম, সন্তান পালন, পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, নারীবাদ ও নারীর অধিকার দাবির যে বাস্তবচিত্র, সেখানে এই সনাতন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের স্থান কোথায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমার দৃষ্টান্ত এই পটভূমিতে পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে কতখানি অর্থবহ সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করেছিলেন বিশ বছর আগে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা ন্যান্সি টিলডেন (জ্যাকম্যান)।[১৪]

আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রামকৃষ্ণ-সারদা ভক্ত ন্যান্সি টিলডেন আমেরিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসঙ্গে লেখেন, "আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন সাধারণ বক্তৃতায় শ্রীমায়ের বিষয়ে আদৌ কিছু বলা হত না। ...শ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন অন্তরঙ্গ ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হত নীরবে, শান্তভাবে। আমাদের বেদান্তকেন্দ্রের উপাসনাগৃহের বেদীতে একই কারণে শ্রীমায়ের প্রতিকৃতি অনুপস্থিত। চল্লিশের দশকে স্বামী অশোকানন্দের নেতৃত্বে যখন এখানকার মন্দির নির্মিত হয় তখনই মনে হয়েছিল শ্রীমাকে সকলের সামনে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না।" কেন? কারণ তাঁরা আশঙ্কা করতেন, "হয়তো নানাজনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে শ্রীমায়ের কী সম্পর্ক ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন তুলতেন; অতএব এমন সব প্রশ্ন করে বসতেন যার উত্তর দেওয়া অস্বস্তিকর। এইসব কারণে প্রথম দিকের সাধুরা লক্ষ্য রেখেছেন যাতে শ্রীমা তাঁর দেহত্যাগের পরেও নিরুপদ্রবে অন্তরালে থাকতে পারেন, যেমন তিনি ছিলেন তাঁর জীবৎকালে। সেই জিনিসই ঘটেছে ভারতবর্ষে এবং এখানেও।" বেদনাদায়ক হলেও এই স্পষ্ট স্বীকৃতি আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি করে। এর পরেই লেখিকা আশার আনন্দের কথা শুনিয়েছেন, "দিন বদলেছে। মায়ের ছবি এখন সর্বত্র দেখা যায়, দেখা যায় তাঁর মূর্তি, তাঁর প্রতিকৃতি-সম্বলিত লকেট ইত্যাদি।..."[১৫]

কেন 'দিন বদলেছে' তার কাবণ কিন্তু লেখিকা ব্যাখ্যা কবেননি। 'মা আত্মপ্রকাশের জন্য নিজেই এগিয়ে এসেছেন', এ ভক্তির কথা, যুক্তির নয়। লোকশিক্ষকদের যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও বিচারে কেন সারদা-মার দেশে-বিদেশে প্রকাশ ঘটছে, তাঁর জীবন ও শিক্ষা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ কবছে, প্রত্যক্ষ না হলেও তাঁর পরোক্ষ উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে তা কিন্তু মাতৃভক্ত ন্যান্সি টিলডেন নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "উইমেনস লিবারেশন মুভমেন্ট (নারীমুক্তি আন্দোলন) দ্বারা প্রভাবিত পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের জন্য শ্রীমায়ের কী বিশেষ বার্তা বা উপদেশ?" সুন্দরভাবে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি লিখেছেন যে, শ্রীমায়ের জীবনের পাশে কোনও আন্দোলনকে টেনে আনা অসংগত। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন এমন এক সভ্যতার ঐতিহ্যে যেখানে মেয়েদের 'অধিকার' নয়, 'কর্তব্যে'র কথাই গুরুত্ব পেয়েছে। সংসারে সকলের প্রতি আচরণে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কথা মা বলেছিলেন। শুধু বলেননি, নিজের দিব্যজীবনের প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, ভুল-ভ্রান্তি, পথভ্রষ্ট হলেও ক্ষমা করে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা ও ঔদার্য জীবনের সবচেয়ে পার্থিব বস্তু 'শান্তি' এনে দেয়। সংসারে অশান্তিতে জর্জরিত মেয়েদের প্রতি মার উপদেশ ছিল : "যদি শান্তি চাও মা, কাবো দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" পালন করা কঠিন হলেও শান্তিলাভের এর থেকে প্রশস্ত পথ নেই। এই কথাটি মা বারবার বলেছেন নানাভাবে। মার সান্নিধ্যে, পদপ্রান্তে যাঁরা এসেছেন তাঁদের স্মৃতিচারণে এমন অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ আছে।

এমন এক মায়ের কথা শোনার, জানার ইচ্ছা যে ক্রমেই বাড়ছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। সুদুর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে গড়ে উঠেছে 'রামকৃষ্ণ-সারদা বেদান্ত সোসাইটি'। এই কেন্দ্র বা আশ্রমে অস্ট্রেলিয়া-নিবাসী ভারতীয়রা

ছাড়াও আসেন স্থানীয় ভক্তজন। বেদান্ত, ভারতীয় দর্শন পাঠ ও আলোচনা হয়। মাঝে মাঝে নিভৃতে নির্জনে শ্রীমার জীবন ও শিক্ষার অনুধ্যানের জন্য আধ্যাত্মিক শিবিরে যোগ দিতে আসেন। আর একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ডে কভেন্ট্রি (Coventry) শহরে। কেন্দ্রটির নাম 'সারদা বেদান্ত সেন্টার'। এই কেন্দ্রটি স্থাপন করেছেন কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক দম্পতি—জয় ও অ্যালেন হান্টার, দুজনেই দীক্ষিত। স্বামী গহনানন্দের স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভের জন্য দুজনে প্রায়ই বেলুড় মঠে আসেন। মুখ্যত বেদান্ত শিক্ষা ও প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কেন্দ্রটির 'সারদা বেদান্ত সেন্টার' নামকরণ করেছেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ। তাঁরই অনুমোদনে এই কেন্দ্রটির প্রার্থনা-ঘরের পুজোবেদীতে ত্রি-মূর্তির (শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ) ছবির মধ্যমণি হলেন শ্রীমা। 'অশিক্ষিতা' মা তাঁর বাহ্যত অতিসাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে, আচরণ ও সহজ সরল কথাবার্তার মাধ্যমে যেমনভাবে বৈদান্তিক ধর্ম ও দর্শনচিন্তাকে সর্বসাধারণের কাছে প্রচার ও জীবন্ত করেছিলেন তার কোনও তুলনা নেই। বেদান্ত সেন্টারের নামকরণ ও উপাসনাগৃহের মধ্যবিন্দুতে ছবিটি তাঁর সেই ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি, কল্পতরু উৎসবে, বিশেষ আলোচনা-বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বিদেশি ভক্ত, বিদ্বজ্জনের বিনম্র উপস্থিতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের একাধিক বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকায় একটি বিশেষ বিভাগ বা স্তম্ভ (column) আছে। পাঠক-পাঠিকারা (বিশেষত পাঠিকারা) তাঁদের পারিবারিক সমস্যা, দাম্পত্যজীবনের অশান্তি, অন্য মহিলার প্রতি আসক্তি, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি স্বামীর চরম ঔদাসীন্য, দায়িত্বহীনতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সমস্যা জানিয়ে কোনও মনস্তাত্ত্বিক, খ্যাতনামা নারীবাদী, জনপ্রিয় লেখিকা বা মনোবিৎকে নিজের মানসিক দুঃখ-কষ্ট, একাকিত্ব, দুঃসহ জীবনের কথা জানিয়ে কী করণীয় তা জানতে চান। ওই পরামর্শদাতা বিশেষজ্ঞরা নিজনামে বা চটকদার ছদ্মনামে (pseudonym) ওইসব প্রশ্নের উত্তর দেন। এইরকম একটি জনপ্রিয় নাম হল 'Agony Aunt'। কথাটির সঠিক অনুবাদ করা মুশকিল। মোটামুটি বলা যেতে পারে 'নিদারুণ যন্ত্রণার, মনোবেদনা'র সুরাহার উপায় বাতলাতে পারেন এমন এক খুড়ি-মাসি বা মাসিমা। সমস্যার সমাধানের বা পত্রলেখিকার কী করা উচিত তার পরামর্শ তিনি দেন। ওইরকম শতশত চিঠি আসে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকারা পড়েন। চিঠিগুলি সমাজজীবনের একটি দর্পণের মতো। আমাদের দেশেও, অনেক মহিলা-পত্রপত্রিকায় এইরকম স্তম্ভ (column) আছে।

পাতানো কোনও মামিমা, কাকিমা-মাসিমা নন, একেবারে নিজের মার মতো আপন, এমনকি গর্ভধারিণী মার থেকেও আপন, কল্যাণময়ী মা, 'সবার মা' ছিলেন সারদা-মা। সব যন্ত্রণা-দুঃখ-বেদনা, অশান্তি থেকে বাঁচার পথনির্দেশ করেছিলেন তিনি। এই মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন মাব দুই বিদেশিনী কন্যা। একজন হলেন নিবেদিতা, অন্যজন জোসেফিন ম্যাকলাউড, মার 'জয়া'। নিবেদিতা বলেছেন, "যত নতুন বা জটিল সমস্যাই হোক না কেন, আমি কখনও তাঁকে উদার ও মহৎ সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপনে দ্বিধান্বিত দেখিনি।" ম্যাকলাউড বলেছেন, "আধুনিক হিন্দুনারীর কাছে (মা) রেখে গেছেন আগামী তিনহাজার বছরে নারীকে যে মহিমময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে, তারই আদর্শ... ওঃ! তাঁর জীবন অবলম্বনে আমরা প্রত্যেকেই কী দৃষ্টান্তই না দেখাতে পারি! তিনি আদর্শের নতুন নতুন নজির সৃষ্টি

করে গেছেন... আর অন্য কোন উপায়ে জগতের সমস্যাগুলোর সমাধান করা যাবে না।"

মার 'জয়া' কথাগুলি বলেছিলেন প্রায় আট দশক আগে। এখন তার একটি সংশোধন বা সংযোজন করা প্রয়োজন। 'হিন্দু নারী' নয়, মার শিক্ষা ও ভালোবাসার প্রয়োজন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব নারীর। 'আর কোনো উপায়ে জগতের সমস্যাগুলির সমাধান করা যাবে না'—উক্তিটি মাতৃপ্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস মনে হতে পারে। কিন্তু ঘরে.ও বাইরে যে শান্তির সন্ধান সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ করছে তার চাবিকাঠির সন্ধান মার জীবন ও লোকশিক্ষার মধ্যেই আছে। এটি কোনও যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী মানুষেরও না মেনে উপায় নেই। শ্রীমার প্রয়োজন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব নারী-পুরুষ সকলের কাছে, সেই কারণে।

দুটি বাণীর আলোকে মাতৃদর্শন

তরুণ গোস্বামী

মহাপ্রয়াণের আর পাঁচ দিন বাকি। ১৫ জুলাই ১৯২০। মা সারদামণির শরীর অত্যন্ত খারাপ। ঘরের মধ্যে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অন্নপূর্ণার মা নামে একজন স্ত্রীভক্ত এসেছেন মার সঙ্গে দেখা করতে। ভিতরে যাওয়া নিষেধ তাই তিনি দরজার পাশেই বসে ছিলেন। সকলেই বুঝতে পেরেছেন মা শেষযাত্রার জন্য প্রস্তুত। রাধুর ওপর থেকেও মন তুলে নিয়েছেন। হঠাৎ পাশ ফিরে অন্নপূর্ণার মাকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় মা তাকে ডাকলেন। ভক্তটি মাকে প্রণাম করে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন, "মা আমাদের কি হবে?" মা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি?" তারপর কিছুক্ষণ থেমে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"[১]

তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত মার এটিই শেষ উপদেশ। আমরা কৃতজ্ঞ অন্নপূর্ণার মার কাছে তিনি আমাদের সকলের হয়ে মার কাছে জানতে চেয়েছিলেন মার অবর্তমানে আমাদের কী হবে। যাঁরা মার জীবনী এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ করেন তাঁরা মার এই বিখ্যাত উক্তিটির সঙ্গে পরিচিত। বহুবার পাঠ করেছেন। কেউ কেউ, মুখস্থও বলতে পারবেন। কিন্তু এই উক্তিটি যদি গভীরভাবে আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে শুধু এই উক্তিটির ওপরেই কয়েক খণ্ড আধুনিক মনোবিজ্ঞানের, নীতিবিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের বই লেখা চলে। শুধু অন্নপূর্ণার মার উদ্দেশ্যেই মার এটি উপদেশ নয়, এ উপদেশ সকলের জন্য। অনাগত ভবিষ্যতের সব মানুষের জন্য। দেশি-বিদেশি সকল সন্তানের জন্য উচ্চারিত এই মহাবাক্যটি।

মা ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল, খোলা মনের একজন মানুষ। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। এমন যে একটা ভারতবর্ষকে ঘুরে দেখেছেন তাও নয়। তাঁর দেখা উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজের মনকে তিনি এভাবে শিক্ষিত করতে পেরেছিলেন যে মনটি হয়ে উঠেছিল একটি আন্তর্জাতিক মন—universal mind। ঈর্ষা করার মতো একটি মন। যে মন সবাইকে গ্রহণ করতে পারে অনায়াসে। যে মন মায়া, মমতা, দয়া, ক্ষমায় পরিপূর্ণ। এমন ক্ষুরধার বুদ্ধি যে, এক মিনিট লাগে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে। আবার এমন একটি মন যেটি সংসারের সব কর্তব্য, দায়িত্ব নীরবে পালন করে। মার উক্তি এখন পৃথিবীর সম্পদ। ঘাত-প্রতিঘাতময় বেসুরো জীবনে শান্তির প্রলেপ দিতে মা অদ্বিতীয়া। তিনি শিখিয়েছিলেন সংসার নরককুণ্ড নয়, আনন্দের জায়গা। মা সারদামণি যখন এই উপদেশ অন্নপূর্ণার মাকে দিচ্ছেন তখনকার সমাজের ছবিটি একটু দেখা যাক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে (১৯১৪-১৯১৯)। বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে বিষিয়ে গেছে। শুরু হয়েছে জার্মানির দোষ দেখা। জার্মানদের প্রতি ঘৃণা। ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানির সামরিক শক্তি খর্ব করা হয়েছে অনেকখানি। জার্মানির প্রশংসা করলেই অবধারিত মৃত্যু। ব্রিটিশ সৈন্যবা জার্মানি থেকে লোমওয়ালা কুকুর নিয়ে এসেছে। বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই তাদের প্রশ্ন করা হবে কোথা থেকে পেলে এই সারমেয়র দলটিকে? কুকুরগুলির নাম জার্মান শেপার্ড ডগ। সঠিক নামটি বললেই কুকুর তো যাবেই, নির্দ্বিধায় হত্যা করা হবে যে ওটিকে সংগ্রহ করে এনেছে তাকেও। সৈন্যদের এতো প্রিয় কুকুর তারা ছাড়তে রাজি নয়। তাই বুদ্ধি করে নাম পালটিয়ে দেওয়া হল কুকুরগুলির। বলা হল ওগুলির নাম অ্যালসেশিয়ান। অ্যালসাস প্রদেশে ওদের জন্ম। ভার্সাই চুক্তির পর অ্যালসাস ও লোরেনজ চলে গেছে ফ্রান্সের কাছে। তাই কোনও প্রতিবাদ হল না। কুকুরগুলি চলে এল ইংল্যান্ডে। এতটাই ঘৃণা তখন জার্মানদের ওপর।[২]

আমরা জানি না মাকে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হত কিনা। আমরা এও জানি না তিনি মানুষের হত্যার কথা শুনেছিলেন কিনা। কিন্তু একথা বিশ্বাস করতেই পারি যে মা বিশ্বযুদ্ধের কথা জানতেন। যেহেতু তাঁর সার্বজনীন মন ছিল তাই অতি অল্পতেই সমস্যার মূলে চলে যেতে পেরেছিলেন। বুঝেছিলেন যতদিন না দুটি দেশ পরস্পরের দোষ-ক্রটি ধরা ছেড়ে দিচ্ছে ততদিন মনুষ্যসমাজে কোনও শান্তি আসতে পারে না।

মা যখন এই উক্তি করছেন তার কিছুদিন আগে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব শেষ হযেছে। রাশিয়ায শুরু হয়েছে কমিউনিস্ট শাসন। বুর্জুয়াদের নির্বিচারে হত্যা কবা হয়েছে। মহিলা এবং শিশুরাও বাদ যায়নি। কারণ তারা তো শ্রেণীশত্রু। নতুনভাবে দেশ গড়তে হবে। নতুনভাবে সমাজকে তৈরি করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার। রাশিয়াতেও সকলের প্রতি ভালোবাসা নেই লেনিন সরকারের। বুর্জুয়াদের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা—love for a few and hate for many। বুর্জুয়াদের ক্রটির কথা বলা হচ্ছে সোচ্চার করে। তাদের বিলাসপূর্ণ কদর্য জীবন, তাদের অত্যাচারের গল্প তখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। চার্চের দখল নেওয়া হয়েছে। বুর্জুয়াদের বাড়িগুলি এসে গেছে সরকারের দখলে। সেখানে তৈরি হয়েছে সরকারি দপ্তর।

কিন্তু ক্রটি ধরার রাজনীতি যে কি ভয়ংকর চেহারা নিতে পারে পৃথিবী তা দেখল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পব জার্মানদের প্রতি যে ঘৃণা করা হয়েছিল তারা তার শোধ তুলল। হিটলারের অভ্যুত্থান তার থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস—হত্যা, অবিশ্বাস আর দোষ ধরার ইতিহাস। আকাশ-বাতাস ভরে গেল বারুদের গন্ধে। মাটি ভিজে গেল রক্তে। কত শিশু অনাথ হল তার সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। হারিয়ে গেল মানুষে মানুষে বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, বোঝাপড়া। হতাশা গ্রাস করল পৃথিবীকে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয় নেমে এল না, মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হল।

রাশিয়াতেও টিকল না দোষ ধরার নীতি। সত্তর বছরের সঙ্গে ভেঙে পড়ল কমিউনিজম। টুকরো টুকরো হয়ে গেল রাশিয়া। খোলা হাওয়ার নামে মূল আদর্শ থেকে সরে এল সেদেশের মানুষ। লেনিনগ্রাদ আবার তার পুরানো নাম ফিরে পেল সেন্ট পিটার্সবার্গ। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে স্বপ্নেও কেউ কখনও ভাবতে পারেনি। কিন্তু এমনটিই হল।

মা জানতেন ক্রটি ধরার অভ্যাস কখনও কোনওদিন শান্তি আনতে পারে না। বরং

বিরোধকে বাড়িয়েই দেয়। দুটি মানুষের দূরত্বকে অনেকগুণ বাড়ায় এই মারণ খেলা। গোটা জীবনে যে শান্তির মন্ত্র মা জপ করেছেন, যে আদর্শকে সম্বল করে তিনি নিরহংকার, নির্লিপ্ত জীবন কাটিয়েছেন, সে বোধের ছোঁয়ায় তিনি শুদ্ধ করেছিলেন অন্নপূর্ণার মাকে। আমরা জানি না অন্নপূর্ণার মা এত গভীরভাবে ভেবেছিলেন কিনা। কিন্তু তিনি ছিলেন মাধ্যম। এই মহাবাণীকে তিনিই প্রথম ধারণ করেছিলেন। আগামী দিনে যে দর্শন ঘরে ঘরে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া মনকে জুড়ে দেবে, শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেবে সংসারের বিশ্বাসহীনতার জ্বালায় ছটফট করা মনগুলিকে।

এবার আলোচনা করব আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কী বলেন এই দোষ ধরার অভ্যাসটিকে নিয়ে। তারা মনে করেন কারও ত্রুটি খোঁজার অভ্যাস মনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এটি নেতিবাচক মনের প্রকাশ। ত্রুটি ধরার অভ্যাস আসলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। আমরা সবসময় নিজেরা ভালো সাজতে চাই। লোককে দেখাতে চাই আমরা কত মহৎ, কত উদার, কত উচ্চ আদর্শে ভরা আমাদের জীবন। আর নিজের ভুল ঢাকতে যাবার সবচেয়ে সোজা পথ হল পরের ত্রুটি ধরা, খুঁত খুঁজে বের করা। ব্যস, একবার খুঁত পেলেই হল, চলল তা নিয়ে আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদে ফেলা। চলল চর্বিত-চর্বণ। আসলে আমরা আমাদের ত্রুটি খুঁজতে ভয় পাই। তাই অপরকে দোষ দেওয়া আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। এই অপরের ত্রুটি খোঁজাতে বেরিয়ে আসে আমাদের নির্লজ্জ অহংকার। অহংকারে অন্ধ হয়ে আমরা ধ্বংস করতে চাই সেই প্রতিপক্ষকে যার খুঁত আমি পেয়েছি।

যখন আমি এই লেখা লিখছি অর্থাৎ আগস্ট মাস ২০০৩ সালে, তখন তিনটি ঘটনা কলকাতার সব সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় ছেপে বের হয়েছে। এই তিনটি ঘটনাতেই রয়েছে অপরের ত্রুটি খোঁজা এবং তারপর তাকে নির্মমভাবে শাস্তি দেওয়ার কাহিনি।

উত্তরবঙ্গের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রকে ওই কলেজের বড়ো দাদারা প্রচণ্ড মারধর করেছিল। ছেলেটি মার খেয়ে জ্ঞান হারায়। কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয় সে। তারপর থানা-পুলিশ, গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত ছাত্ররা। প্রথম বর্ষের ছাত্রটির দোষ, সে দাদাদেব কথামতো কুৎসিত গালাগাল দিতে পারেনি; হাত দিয়ে হাঁটতে পারেনি। অতএব মার। চলল চড়, কিল, ঘুঁষি। শেষ করে দাও ওকে। হস্টেলে সবাই মেতে উঠল অভিনব নবীনবরণ অনুষ্ঠানে। প্রতিবছরই ভারতবর্ষের নামী ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এই র‍্যাগিং-এর শিকার হয়। র‍্যাগিং রোধে আইন প্রণয়ন হতে যাচ্ছে। প্রতিটি বড়ো প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং বন্ধ করার সেল তৈরি হয়েছে। তবুও মুছে যাচ্ছে না এই অত্যাচারের বাসনা। যারা অত্যাচার করছে তারা ভালো ছাত্র, ভালো স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছে, নামী দামী স্কুলে পড়েছে কিন্তু ত্রুটি ধরার নেশা মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে ক্ষণিকের জন্য হলেও লোপ পায় তার শুভবুদ্ধি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও ভয়াবহ। ছোটো ভাই বাড়ি প্রোমোটারকে বিক্রি করতে রাজি হল না। দাদা প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলেছে পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি উঠবে। সঙ্গে মোটা টাকাও পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাই দাদার মতো অতি আধুনিক নয়। সে একটু সেকেলে, তাই পূর্বপুরুষের ভিটে বেচতে রাজি নয়। দাদা, বৌদি ও দুই আত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, ভাইকে গলা টিপে হত্যা করল। তারপর মৃতদেহটি মাটিতে পুঁতে দিল। ব্যাপারটি ঘটে গেল অতি গোপনে তাদের উত্তর কলকাতার বাড়িতে। কেউ টের পেল না। তারপর ভাই নিখোঁজ

বলে মিথ্যা ডায়েরি করা হল স্থানীয় থানায়। পুলিশের সন্দেহ হল। শুরু হল অনুসন্ধান। মৃত ভাইয়ের কঙ্কাল মিলল বাড়ি থেকেই। মৃত্যুদণ্ড হল দাদা, বৌদি এবং দুই আত্মীয়ের। এখানেও আমরা দেখি দাদার কথা না মানার ত্রুটির জন্য প্রাণ দিতে হল ছোটো ভাইকে।

তৃতীয় ঘটনাটিও খুব সাড়া ফেলেছে কলকাতায়। কোনও এক রাজনৈতিক দলের এক নেতার নির্দেশে খুন হল দুটি ছেলে উত্তর চব্বিশ পরগণাতে। ছেলে দুটির অপরাধ তারা কথা শোনেনি রাজনৈতিক দাদাদের।

সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর 'Introductory Lectures on Psycho-analysis' গ্রন্থে বললেন ত্রুটি খুঁজতে গিয়ে মানুষ নিজের কুকর্মকে ঢাকতে চায়। এবং আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে তার বুদ্ধির ধারটিকে। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ক্ষমতা আস্তে আস্তে চলে যায়। জেঁকে বসে আমিত্ব। আমিই যা বলছি তাই ঠিক আর অন্যেরা সকলেই ভুল করছে এমন বোধ তাড়িত করে অন্যের ছিদ্র-সন্ধানকারী ব্যক্তিকে। এইভাবে হারিয়ে যায় Enos অর্থাৎ গঠনমূলক চিন্তা। আত্মসমীক্ষা আগেই লোপ পেয়েছে, অতএব অহংবোধে অন্ধ মানুষটি পশুর মতো ব্যবহার করতে আরম্ভ করে—ধরো, কাটো, মারো, খাও। তার মধ্যে সুকোমলবৃত্তিগুলি আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। অতি সত্বর সে পরিণত হয় একটি জড় পদার্থে যার কোনও মন নেই, নেই কোনও বোধ, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা।[৩]

এটি অতি দুর্ভাগ্যের কথা যে, সভ্যতার বয়স যত বাড়ছে ততই আমরা সহানুভূতিহীন হয়ে পড়ছি। ততই একটি হিংস্র নরপশুতে পরিণত হচ্ছি। আমাদের ভিতরের পশুটি সর্বদা বাইরে আসতে চাইছে। তার ধারালো নখ, দাঁত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চাইছে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী—এমনকি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। সকলেই খারাপ আর আমি একমাত্র ভালো, এটাই এখনকার যুগধর্ম। ডেসমণ্ড মরিস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Human Zoo'-তে লিখেছেন, "As civilization grew, so did man's arrogance." তিনি দুঃখ করে ওই গ্রন্থেই লিখছেন, "Reading about or watching an act of persecution is liked by majority of people." অর্থাৎ শুধু ঘৃণা আর অত্যাচার—এভাবে যদি সভ্যতা চলতে থাকে তবে তার বিষময় ফল যে কী হবে মরিস সেটি আন্দাজ করতে পেরে শঙ্কিত, ভীত। "For us, the super tribesmen of the twentieth century, it will be interesting to see what happens. For our children, however,—it will be more than merely interesting. By the time they are in charge of the situation, the human species will be facing problems of such magnitude that it will be a matter of living or dying."[৪]

মরিসের মতো আমরাও সত্যিই শঙ্কিত আমাদের উত্তরসূরীদের দিকে তাকিয়ে। যে ভয়ংকর দিনের দিকে পৃথিবী এগোচ্ছে, সেখানে সুস্থভাবে বাঁচা যাবে কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ দেখা দিতে শুরু করেছে। বিখ্যাত নোবেল পুরস্কারজয়ী দার্শনিক সাহিত্যিক লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল দেখেছেন—ত্রুটি ধরা থেকে যে ঘৃণার জন্ম তা কী ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে রাসেল ইংল্যান্ডে বহু যুদ্ধবিরোধী সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন, অনুরোধ করেছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের তোমরা খুঁত ধরা ছেড়ে দাও। সুস্থ, স্বাভাবিক. শান্তির জীবন যাপন করো। বহু লেখা তিনি লিখেছেন যার মধ্য দিয়ে রাসেল দেখাতে চেয়েছেন যদি মানুষের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাহলে সমাজে বাঁচা যাবে কীভাবে? কী

'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমাব সকল সন্তানদেব জানিযে দিও মা,
আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলেব উপব আছে'

নিয়ে মানুষ থাকবে। রাসেল দেখেছিলেন সমাজের বহু মানুষ একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যার কোনও মন নেই এবং যে যন্ত্রের মূল অস্ত্র ঘৃণা। এ ঘৃণা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তির আর একটি ব্যক্তিকে ঘৃণা করা নয়। একটি গোষ্ঠীর আর একটি গোষ্ঠীকে ঘৃণা করা; একটি জাতির আর একটি জাতিকে ঘৃণা করা। তিনি দেখেছিলেন মানুষের মনগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্মবোধগুলি। রাসেল বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রকে যদি সার্থক, সফল করতে হয় তবে প্রথমেই ছাড়তে হবে ঘৃণা এবং ধ্বংসাত্মক মানসিকতা।

'Power' গ্রন্থে রাসেল লিখলেন, "If democracy is to be workable, the population must be as far as possible free from hatred and destructiveness, and also from fear and subservience."[৫]

রাসেলের আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'Human Society in Ethics and Politics'-এ রাসেল বললেন—চাই হৃদয়ের উষ্ণতা এবং জ্ঞান। যে পৃথিবীর স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন সেখানে মানুষের হৃদয়ের আদান-প্রদান হবে এবং আবেগগুলি ধ্বংস নয়, গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাসেল লিখছেন, "The world that I wish to see is one where emotions are strong but not destructive, and where, because they are acknowledged, they lead to no deception either of oneself or of others. Such a world will include love and friendship and the pursuit of art and knowledge."[৬] রাসেল বিশ্বাস করতেন আগামী দিনের পৃথিবী হবে সুন্দরতর যেদিন মানুষ অন্যকে ঘৃণা করতে, অবজ্ঞা করতে, আঘাত করতে ভুলে যাবে।

তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই আনতে পারে এই পরিবর্তন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি ভালোবাসা, নিরপেক্ষতা, নিয়ন্ত্রিত আবেগ তৈরি করা যায় তবে পৃথিবীর মানুষ আনন্দে থাকতে পারবে। 'On Education' গ্রন্থে তিনি সেই সৎ মানুষকেই খুঁজেছেন, "intellectually honest, socially fearless, vigorous in action and tolerant at heart."[৭]

মা সারদামণি রাসেলের মতো কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি। ফ্রয়েডের মতো ডাক্তারও তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর উপলব্ধি ছিল, ছিল তীব্র অনুভূতি। তাই এত সহজ সরল ভাষায় এত গভীর তত্ত্বটিকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। কথাগুলি বলেছেন অত্যন্ত অসুস্থ শরীরে কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে।

১৯২০ সাল থেকে ভারতবর্ষে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। কলকাতা যদিও তখন আর পরাধীন ভারতের রাজধানী নয় তবুও শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক চেতনায় কলকাতা ভারতবর্ষের অন্যান্য শহর থেকে অনেক এগিয়ে। আধুনিক মানুষের কাছে মা তাঁর উপলব্ধি, তাঁর অন্তরের বোধ ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে।

এই অতি পরিচিত উক্তিটির এত গভীর ভাব থাকতে পারে, প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আসলে ঠাকুর-মার অধিকাংশ উক্তিই এরকম। খুব সোজা যদি ওপর থেকে দেখা যায় আর অসম্ভব গভীর যদি একটু স্থির হয়ে বসে আমরা ভাবতে শুরু করি।

মা এসেছিলেন আমাদের ঘর-সংসারকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে। তাঁর সন্তানেরা কষ্টে থাকবে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে, কাদা ছোঁড়াছুড়ি করবে, বাড়িগুলো হয়ে উঠবে আস্তাকুঁড়ের মতো, সেখানে দিনের শেষে বাড়ি ফিরে আসতে চূড়ান্ত বিরক্তি বোধ হবে বাড়ির মানুষগুলোর, মা—কখনও এমনটি চাইতে পারেন না। আর চান না বলেই

মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত আগে তাঁর এই মহা আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদ যদি আমরা মাথায় ধারণ করে সংসারজীবন কাটাতে পারি তবে আমাদের কোনও বিপদ কোনওদিন হতে পারে না। চাই আত্মবিশ্লেষণ—self-assessment। একটি কাজের পর যদি বিচার করা যায় তবে একদিকে যেমন ভবিষ্যতের একই ভুল করার থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি অন্যদিকে আমাদের বুদ্ধিও আরও ধারালো এবং যুক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবেগ হয়ে ওঠে সুনিয়ন্ত্রিত। 'Ideas and Opinion' গ্রন্থে Albert Einstein বলছেন, "what we need today is controlled emotion."[৮]

কিছুদিন আগে কলকাতার একজন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং একজন মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। দুজনেই বললেন যদি বাপ-মায়েরা একটু যত্নবান হয়ে তাদের সন্তানদের নিজের দিকে তাকাতে শেখান, নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করতে শেখান এবং সেইসঙ্গে অপরের ত্রুটি, অপরের দোষ না ধরতে শেখান তাতে গৃহের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। কমে যাবে বিবাহবিচ্ছেদের মতো সামাজিক ব্যাধি। আমরা যারা মাকে এত কাছে পেয়েও বোঝবার চেষ্টা করলাম না, তারা সত্যিই অভাগা। আমাদের দেশে গত পঞ্চাশ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে। কারিগরী-প্রযুক্তির জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে। এত উন্নতি আমাদের শান্তি দিতে পারছে না কারণ মানসিকভাবে আমরা রিক্ত থেকে রিক্ততর হয়ে পড়েছি। এখনই আদর্শ সময় মার কথা অনুসরণের, নিজের ত্রুটি, অক্ষমতাগুলোকে সারিয়ে সুরিয়ে নেবার জন্য। আর মা তো দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন সকলের উদ্দেশে। মার চিন্তা করলে একটা ইতিবাচক মনোভাব আমাদের সমৃদ্ধ করে, আমাদের আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। নীচতা, হীনম্মন্যতা, কপটতার দিকে নজরই যায় না। মনে হয়, ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা গলাব কেন? জীবন হয়ে উঠবে ঝকঝকে, সুন্দর। আমরা নিশ্চয়ই এমনটিই হতে চাই—একজন পরিপূর্ণ মানুষ। একজন আদর্শ সংসারী। আর যদি তেমনভাবে নিজেদের গড়বার চেষ্টা করি, মা সারদামণি হবেন আমাদের ধ্রুবতারা।

"ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে"—সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। বস্তুর জ্ঞান পেতে পেতে আমরা যখন ক্লান্ত, অহংকারী হয়ে উঠেছি তখনই মার আগমন। মা দিলেন হৃদয়টিকে প্রসারিত করার জ্ঞান। ডানিয়েল গোলম্যানের বই 'Emotional Intelligence' সম্প্রতি best seller হয়েছে। বইটিতে গোলম্যান বলছেন শুধু বুদ্ধি থাকলেই হবে না। চাই হৃদয়ের বিকাশ। তিনি বইটিতে দেখাতে চেয়েছেন যদি শুধুমাত্র বুদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়, আর হৃদয়কে অনাদরে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, তবে কোনও মানুষের সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশ যদি ঠিক ঠিক না হয় তবে সে মানুষ কখনও সংসারে শান্তি আনতে পারে না। সে দানবে পরিণত হয়। এ দানব কোনওদিন কাউকে স্বস্তি দিতে পারবে না। সে বারবার আঘাত করবে সমাজকে। নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে তার শত্রুদের। এবং পৃথিবীর বুকে হতাশা নামিয়ে আনবে।

গোলম্যান তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "The art of soothing ourselves is the fundamental life skill. Attempt to manage the mood is the biggest job."[৯] ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছে বইটি। সাড়া ফেলে দিয়েছে পৃথিবীতে। কলকাতা শহরেও বহু কর্মশালা এবং সেমিনার হচ্ছে emotional intelligence আলোচনা করার জন্য। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন—জীবনে আসল কাজ হচ্ছে উদার মনোভাব তৈরি করা এবং নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শেখা। যে যত নিখুঁতভাবে এই খাপ

খাওয়াতে পারবে সে ততই সুখী হবে জীবনে। প্রথমে নিজেকে বুঝতে হবে তারপর বুঝতে হবে পরিবারের, সমাজের অন্যান্য মানুষদের—তবেই খাপ খাওয়াতে পারা যাবে পরিবর্তনের সঙ্গে। গোলম্যান জানতেন না তাঁর বই প্রকাশিত হওয়ার আগে কলকাতায় একজন রমণী 'adjustment' তত্ত্ব অনেক সহজ ভাষায়, অনেক প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন।

এখানে আমি মার অপর একটি উক্তি নিয়ে আলোচনা করব। বহুপঠিত এই উক্তিটিও আপাততভাবে সহজ মনে হলেও তাতে গভীর ভাব রয়েছে। এভাব থেকে আমরা অতি সহজে মার সর্বজনীন মন বা universal mind-এর সন্ধান পাই।

স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দের ভ্রাতা স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকা যাবেন ১৯০৬ সালে। স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত কেন্দ্রে তিনি প্রচারকরূপে যাচ্ছেন। স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে তিনি প্রথম আমেরিকা যান। পরের বছর প্রেরিত হন স্বামী বোধানন্দ। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ তখন আমেরিকাতে প্রচারকাজে ব্যস্ত। মূলত তাঁকে সহায়তা করার জন্য পাঠানো হচ্ছে প্রকাশানন্দকে যার বয়স তখন ৩২ বছর (প্রকাশানন্দ ১৮৭৪-১৯২৭)। বিদেশ যাবেন তাই মার আশীর্বাদ নিতে হবে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এটাই প্রথা। গুরু বিবেকানন্দ মার আশীর্বাদ না নিয়ে বিদেশে যাননি।

মা প্রকাশানন্দকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁকে উপদেশ দিয়ে মা সারদামণি বলছেন, "বাবা মনে রেখো, যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।"[১০] স্বামী প্রকাশানন্দ এই মাতৃ আদেশ শিরোধার্য করে আজীবন চলেছিলেন। ১৯০৬-১৯১৪ তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজের বহুবিধ কাজে সহায়তা করেছেন। 'Voice of Freedom' নামে একটি মাসিকপত্রও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অধ্যক্ষতায় ও স্বামী প্রকাশানন্দের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছিল স্যানফ্রান্সিসকোতে। ১৯১৫ সালে প্রকাশানন্দ মহারাজ স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সমিতির দায়িত্বভার নেন, একটি নিদারুণ দুর্ঘটনায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের দেহত্যাগ হলে। ১৯২৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রকাশানন্দ নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। মাঝে ১৯২২ সালে একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করা হয় আমেরিকায় তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ। দীর্ঘ প্রবাসজীবনে তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। সহজ, সরল জীবন-চর্চা আকৃষ্ট করত পাশ্চাত্য ভক্তদের। পঠন-পাঠন, আলোচনাতেই তাঁর দিন কেটে যেত।

প্রকাশানন্দ মহারাজের জীবন মার আশীর্বাদের ওপর তৈরি হয়েছিল। নির্বান্ধব পাশ্চাত্যে তিনি একদিনের জন্য কর্মবিরতি নেননি। ক্লান্তি কাকে বলে তিনি জানতেন না। অলসভাবে শুয়ে বসে কাটানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কাজ, কাজ, আর কাজ। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের মূল-দর্শন—ভালো থাকো এবং সকলকে ভালো হতে সাহায্য করো—প্রচার করতে নিজের জীবনীকে উৎসর্গ করেছিলেন প্রকাশানন্দ। মৃত্যুকালে প্রকাশানন্দ মহারাজের বয়স ৫৩ বছর হয়েছিল।

যে সময় উনি আমেরিকায় যান সেসময় ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে যাওয়ার চলটাই বেশি, আমেরিকাতে বড়ো বেশি কেউ যেত না। সেদেশের ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, মানুষজন সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার ওপর প্রকাশানন্দ মহারাজ একজন তরুণ সন্ন্যাসী। গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে আমেরিকাতে ঠিক কীভাবে চলতে হবে তা শিখিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনিও তখন লোকান্তরিত। অতএব যুবক সন্ন্যাসীটি

কীভাবে থাকবেন ওদেশে সেটিও ঠিক ঠিকভাবে বলে দেওয়ার—এখন যাকে বলে briefing তা করার কেউ নেই।

অতএব এগিয়ে এসেছিলেন সঙ্ঘজননী। বুঝতে পেরেছিলেন প্রকাশানন্দের মনের অবস্থা। উপদেশ দিলেন ওদেশের সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে থাকার জন্য। 'যখন যেমন তখন তেমন—যেখানে যেমন সেখানে তেমন'। প্রকাশানন্দের জীবনে এই বাণী ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। বহু মানুষ বিদেশ থেকে home-sick হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। প্রকাশানন্দ মহারাজ ফিরে আসেননি। সামনাসামনি লড়াই করে, রামকৃষ্ণভাব আন্দোলনকে আমেরিকার মাটিতে প্রতিষ্ঠা করে তবেই ছুটি নিয়েছেন। তার আগে নয়।

মার এই সহজ, সরল উপদেশ শুধুমাত্র প্রকাশানন্দ মহারাজের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়নি। এটিই আধুনিক সমাজের বাঁচার অন্যতম মূলমন্ত্র। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, খাপ খাওয়াতে পারছি না। দুজন শিক্ষিত মানুষ কোথায় মিলে মিশে থাকবে তা না শুধু ঝগড়া, বিবাদ আর একের প্রতি অন্যের গালিগালাজ। মানিয়ে নেওয়া যেন স্বাধীনতা বিসর্জনের নামান্তর। আমরা সকলেই স্বাধীন হতে চাইছি। অপরকে মানব না, একসঙ্গে চলব না, মিলেমিশে থাকব না।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে শুরু করেছে। বাড়িগুলোর দিকে তাকালেই দেখা যাবে সেখানে কোনও ছন্দ নেই। পরিবারের সবাই নিজেদের তালে, ছন্দে চলেছে। বাড়িগুলোর সুর কেটে যাচ্ছে আর তা বারবার বের হয়ে আসছে কথা কাটাকাটি, মারধোরের মধ্যে দিয়ে। সবাই নিজের ছন্দে চলার একটা বড়ো সমস্যা হল এভাবে চলতে চলতে মানুষ মানসিকভাবে বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। সারাজীবন একটা অজানা ভয় তাকে তাড়া করে বেড়ায়। এই ভয়ের তাড়নায় সে কখনও অত্যাচারী, কখনও দাম্ভিক কখনও পশুর মতো আচরণ করে। মানসিক ভয় কাটাতে প্রয়োজন একটা সুন্দর, সুষ্ঠু জীবনবোধের। চাই সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা, চাই মানসিকতা উদারতা এবং পরের জন্য অনুভূতি।

বিখ্যাত সাহিত্যিক 'Eric Fromm' তার অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ 'The Sane Society'-তে লিখছেন, "A sane society is one which permits man to operate within manageable and observable dimensions, and to be an active and responsible participant in life of society, as well as the master of his own life. It is one which furthers human solidarity and not only permits, but stimulates its members to relate themselves to each other lovingly; a sane society furthers the productive activity of everybody in his work, stimulates the unfolding of reason and enables man to give expression to his inner needs in collective art and rituals."[১১]

Fromm-এর 'Sane Society' আসতে পারে মা সারদামণির দুটি বাণী, যা নিয়ে আলোচনা করলাম, তার সঠিক মূল্যায়ন এবং নিবিড় অনুশীলনের ফলে। প্রশ্ন আসে মার আগমনের একশো পঞ্চাশ বছর পরেও আমরা কি মাকে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছি? আমার মনে হয়, বোঝা তো দূরের কথা বোঝার চেষ্টাই আমরা করিনি। একটি ফটোর ফ্রেমে তাঁকে আবদ্ধ করে রেখেছি এবং অভ্যাসবশত প্রণাম করছি। ব্যক্তিগত জীবনে মার বাণী কাজে লাগিয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। আমি বহু মহিলা এবং পুরুষকে দেখেছি যাঁরা

মার নাম উচ্চারণ করে মাথায় হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করেন কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন তাঁদের অত্যন্ত কদর্য, কুরুচিপূর্ণ, স্বার্থপরতায় ভরা। যেখানে নিজেকে জাহির করা, নিজের সামাজিক অবস্থানটিকে নির্লজ্জভাবে তুলে ধরার খেলাতেই তাঁরা মত্ত।

যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা বর্তমানে যাচ্ছি তাতে যদি সমাজটিকে সুন্দর না করা যায় তবে আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এত অবিশ্বাস, এত মায়ামমতাহীন অবস্থা অতীতে কখনও ছিল না। বাড়িগুলো এত শ্রীহীন কোনওকালে হয়নি। বাঁচার উপায় শুধু মাকে আঁকড়ে ধরা। একেবারে শিশুকাল থেকে বাবা-মার উচিত তাদের সন্তানদের মধ্যে মার উচ্চভাব আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে সারা জীবনটি সুন্দর এবং নিশ্চিত হয়। মার দেড়শো বছরের আগমনের উৎসবে আমাদের সেই শপথ নিতে হবে নিজেদের বাঁচার তাগিদে। মার স্নিগ্ধমূর্তি আমাদের প্রেরণা দিক মার কাছে সেই প্রার্থনা। তিনিই আমাদের জীবনে আধুনিক ভাষায় 'most wanted person' হয়ে উঠুন। আমাদের জীবনকে একটি মহৎ আদর্শ দিয়ে ভরিয়ে দিন—তবেই তো কারিগরি-প্রযুক্তির জয়যাত্রা, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উন্নতি আমাদের সত্যিকারের সমৃদ্ধি এনে দেবে।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন মাকে ঘিরে মহাশক্তিশালী মেয়েদের দল তৈরি হবে, যারা ভারতবর্ষে ঐক্যের, সামাজিক উন্নতির বাণী প্রচার করে বেড়াবে। স্বামীজী মার কথা বলতে গিয়ে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে একটি চিঠিতে। ১৮৯৪ সালে লিখিত এই পত্রটি আমাদের অবশ্যপাঠ্য।

স্বামীজী লিখেছেন, "মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পারনা, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।... মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই, মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে।"[১২]

ওই পত্রে স্বামীজী লিখছেন, "...দাদা রাগ কোরো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।... রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।"

একি শুধুই গুরুমাতা বলে মার বন্দনা? স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন মার বাণীর আদলে আমাদের সংসারে মেয়েদের গড়তে না পারলে সংসার ভেসে যাবে। পবিত্রতা, আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণতা, স্নেহ, মায়া, মমতা দিয়ে তৈরি আধুনিক নারী ভারতের কল্যাণ করবে।

স্বামীজীর এই বিশ্বাস, এই স্বপ্ন মিথ্যা হওয়ার নয়। যেভাবে সমাজের সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে আসছে তা সত্যিই দেখার মতো। এবার দরকার তাদের মনের প্রসারণ, মনের শিক্ষা। আমরা ভাগ্যবান, আমাদের হাতের কাছে মা আছেন। তাঁর অজস্র বাণীর মধ্যে দিয়ে তিনি সদাজাগ্রতা। অজস্র ছবির মধ্যে দিয়ে তিনি প্রেরণা যোগাচ্ছেন তার সন্তানদের। 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী না, পাতানো মা না, কথার কথা মা নয়—সত্য জননী'—মার এই আশীর্বাদ আমাদের আলোকিত করুক, জীবনের পথ দেখাক।

উপনিষদের আলোতে সারদা দেবী

জীবন সান্ত, কিন্তু জীবনের জিজ্ঞাসা অনন্ত। জীবন ও জগতের সত্যোপলব্ধির অদম্য প্রচেষ্টার দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে উপনিষদের সূচনা। 'রক্তমাংসের উপনিষদ' বলে আখ্যায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনযাপনে, সমাজ-নিরীক্ষণে, কর্মসাধনায় উপনিষদের প্রভাব জীবনের মর্মমূলে রস সঞ্জীবিত করেছে।

সৃষ্টির শুরু ও জীবনের প্রকাশ আনন্দেই। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-এ আছে :

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।" (৩/৬ ষষ্ঠ অনুবাক)—আনন্দরসে জন্ম নিয়েছে নিখিল ভুবন। সেই আনন্দে জীবন রয়েছে বেঁচে। আনন্দে আবার ফিরে চলবে। সারদা দেবী ছিলেন আনন্দময়ী। শ্রীমা তাঁর জীবনযাপনে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে আনন্দের আলোক-বলয় সৃষ্টি করেছিলেন তা বিচ্ছুরিত হয়েছে তার আশে-পাশে অন্যদের মধ্যেও। আনন্দে তাঁর অন্তর সবসময় পরিপূর্ণ হয়ে থাকত—অপূর্ব ভাষায় তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন তিনি, 'হৃদয়-মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে'[১]—ওইকাল থেকে সর্বদা এরূপ অনুভব করতাম। সেই ধীরস্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কত ভবে থাকত তা বলে বোঝাবার নয়। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আনন্দের আধার। কামারপুকুরের জীর্ণ কুটীর থেকে কাশীপুরের বাগানের অট্টালিকায় সেই আনন্দ যেন ঝংকৃত হত। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারের ঘরখানিতে প্রত্যহ 'আনন্দের হাটবাজার' বসে যেত। গান, অভিনয়, রঙ্গরস, নৃত্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তিনি যেন আনন্দসাগরে ভেসে আছেন। নাচ-গান-যাত্রা-অভিনয়-কৌতুকের অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণবন্ত পদচারণা ও কর্ম-উদ্দীপনা সকলকে আনন্দে উজ্জীবিত করে রাখত। শ্রীমাও ছিলেন সেই আনন্দের নিত্যসঙ্গী। রসবোধের তীক্ষ্ণতা ছিল তাঁর অসাধারণ। দুর্গাপুরী দেবী লিখেছেন, "মাতাঠাকুরানী সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, নিজেও গাহিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠ ছিল অতিমধুর। কিন্তু পাছে কেহ শুনিতে পায়, এইজন্য নিম্নকণ্ঠে গাহিতেন।"[২]

উপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দের আধার বলা হয়েছে। পৃথিবীতে কত বিচিত্র ধর্ম-কর্ম, শিল্প-সাহিত্য, সুর-সাধনা, স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা—সবই তাঁর লীলা। ব্রহ্মানন্দবল্লীর আরম্ভ হয়েছিল জ্ঞানোপলব্ধিতে—ব্রহ্ম অনন্ত সত্য, অনন্ত জ্ঞান, ক্রমশ এই জ্ঞান ব্রহ্মের মূল স্বভাব আনন্দের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ প্রাণ, মন ও অন্নের উপাসনা করেছে, বারবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মানুষকে তার স্বরূপে ফিরে যেতে। এই ইহলোকেই বন্ধনমুক্তির দ্বারা পরম অমৃত লাভ করা যায়। সংসারের ক্ষুদ্র আনন্দদানের মাধ্যমেই চলবে অমৃতের সাধনার ধারা।

শ্রীমা সারদা দেবীর সংসারের কোনও কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব ছিল না। রামকৃষ্ণের শিক্ষা তাঁকে 'কর্মযোগী' করে গড়ে তুলেছিল। তুচ্ছ কাজেও তিনি আশ্চর্য শ্রী ফোটাতেন। তাঁর ছোটো ছোটো কথা ছিল সুষমামণ্ডিত। দৈনন্দিন জীবনকে তিনি তাঁর মাধুর্য দিয়ে করে তুলেছিলেন আনন্দময়। কৃচ্ছ্রতাসাধনের মধ্যেও তাঁর হৃদয় আনন্দে সদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সারদা দেবীর ব্যবহারিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সুধীজন মুগ্ধ হতেন। সদা-আনন্দময়ী মা বিপদে, দুঃখ-যন্ত্রণায় কখনও মলিন চেহারা ধারণ করেননি।

সারদা দেবী ছিলেন ধ্যান ও তপস্যায় অবিচল। তাঁর প্রতিটি কথা, কর্ম, আচার-ব্যবহার ছিল প্রেম, সেবা, ত্যাগ ও বিনয়ের প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর পঞ্চতপা ব্রতের মতো কঠিন তপস্যা তিনি করেছিলেন। অসাধারণ সহিষ্ণুতা নিয়ে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে তিনি মানুষের বহু দ্বন্দ্ব-বিবাদের নিরসন করেছেন। সংসারের হীনম্মন্যতা, নীচতা, ঈর্ষা, কুটিলতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। সমাজের ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান—সকল ধর্মের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয় ছিল উন্মুক্ত। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত প্রগতিবাদী মানবী। জাতি-ধর্ম-ভেদাভেদ তাঁর অন্তরে ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—একদিন সিস্টার নিবেদিতা ভোগ রান্না করে ঠাকুরকে নিবেদন করেছিলেন, মা সেই প্রসাদ গ্রহণ করলে গোঁড়া মহিলাদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। মায়ের সুস্পষ্ট বক্তব্য "নিবেদিতা আমার মেয়ে। ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে। তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে কোনও দ্বিধা না রেখে আমি নেব। যদি কারও তাতে আপত্তি থাকে, সে নিজেকে নিয়েই থাক।[৩]

জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সবাই তাঁব স্নেহাশীর্বাদে ধন্য হয়েছে। তিনি ছিলেন সতেরও মা, অসতেরও মা। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মানুষ ঘৃণার চোখে দেখত। মা সারদা বলতেন, "কে বলেছে, তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে। ঘরে এসে বস।"[৪] সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা থেকে শুরু করে ডোম-শূদ্র কেউই তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়নি। মুসলমান ডাকাত আমজাদ, মাতাল পদ্মবিনোদ সকলকেই তিনি স্নেহাঞ্চলে বেঁধেছেন। একবার এক নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী বৃদ্ধা ম্যালেরিয়া রোগী মায়ের কাছে এসে রাত হয়ে যাওয়ায়, মা তাঁর ঘরের দাওযায় তার থাকার ব্যবস্থা করেন। অসুস্থ মহিলা অসাড়ে বিছানা নোংরা করে ফেলায় তিনি পাছে সকলের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে যান তাই খুব ভোরে তাকে জাগিয়ে দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিজের হাতে সব পরিষ্কার করে ফেললেন। শ্রীমা বুঝেছিলেন বিশ্ববিধাতার আসন মানুষের মধ্যেই। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা জীবই ব্রহ্ম।' 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', শুধুমাত্র মন্দির বা দেবালয়ে ধ্যান বা তপস্যা করেই তাঁকে পাওয়া যায় না। সেজন্য ধ্যান-তপস্যা ছাড়াও মানবসেবা ছিল তাঁর মহান ব্রত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ,/ পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,/ খাটছে বারো মাস,/ রৌদ্রজলে আছেন সবার সাথে/ ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—/ তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধূলার পরে॥"[৫]

অতিথিপবায়ণতায় শ্রীমার জুড়ি ছিল না। অতিথির সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার দিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন। জনৈক সাধু বাঁকুড়া থেকে মায়ের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে দেখা করতে এসে তাঁর গামছাখানি ফেলে যান। মা ঠিক মনে করে রাজেন্দ্র দত্তের হাত দিয়ে সেটি পাঠিয়ে দেন। অন্নহীনকে অন্ন দেওয়া, অতিথিকে সেবা করা শ্রীমার নিত্যকর্ম ছিল। এ-প্রসঙ্গে

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-এর দশম অনুচ্ছেদের কথা স্মর্তব্য—"ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।" ।

তোমার কুটিরে বাসের জন্য যে-কোনও অতিথি যখনই আসুক দ্বারে, কখনও তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না—এই হোক তোমার ব্রত ॥ (নিরলসে) তাই অন্ন যোগাড় করো, যেমন করে পার। উপনিষদের দর্শনই শ্রীমার জীবনসাধনা ছিল। ঈশোপনিষদে আছে :

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥ "

—এই ধরণীতে যা কিছু সচল সবই ঈশাময় (ধন্য)
তাই আগে ভোগ কর, লোভ কোর না গো, কার ধন, কার জন্য?

ত্যাগের দ্বারা ভোগ কথাটির অর্থ হচ্ছে সংসারে ভোগ করেও ভোগের সামগ্রীর ক্রীতদাস না হয়ে 'আসক্তিহীন ভোগ' (Detached attachment) করা এবং আসক্তিশূন্য ও নির্বিকার হলেই যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও বস্তুর আসক্তি ত্যাগ করা সম্ভব। শ্রীমা সারদা দেবী অর্থসম্পদের প্রতি নিরাসক্ত ছিলেন। তাঁর মতে সংসারে অর্থের প্রয়োজন আছে কিন্তু তার একটি পরিমিতিবোধ থাকতে হবে। বিষয়-আশয়ের লোভ মহা ভয়ংকর এটা তিনি বুঝতেন বলেই বলেছেন, "চাকি (টাকা) না করতে পারে এমন জিনিস নাই—প্রাণসংশয় পর্যন্ত; টাকা এমন জিনিস, দেখলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।"[৬] অপচয় বা অপব্যয়কারীদেব তিনি তিরস্কার করতেন। সামর্থ্যের বাইরে অযথা খরচ করলে তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি নিজে ছিলেন নির্লোভি। ছোটো একটি ঘটনা তাঁর নির্লোভ মনোভাবের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। একবার এক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দশহাজার টাকা দিতে চাইলে তিনি সে টাকা গ্রহণে অক্ষমতা জানান। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাকে পরীক্ষা করার জন্য সে টাকা নিতে বলেন। কিন্তু সারদা দেবী দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। জাগতিক জীবনের স্থূল আবাম ভোগের প্রতি তিনি নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত ছিলেন। সারাজীবনের কর্মকাণ্ডে, জীবনযাপনে, সমাজমননে উপনিষদের এই ত্যাগের আদর্শ সারদা দেবী প্রচার করেছেন শুধু উপদেশ দিয়ে নয়, নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী আজ হিংসায় উন্মত্ত। জাতি-ধর্ম-ভাষার বিভাজন, দরিদ্র ও ধনীর আকাশ-চুম্বী বিভেদ। এই নির্মম সভ্যতার অশান্ত সময়ে উপনিষদের আলোকে সারদা দেবীর শান্তি-সাম্যের বাণী বিশ্বকে আলোকিত করুক—এটাই কাম্য।